রাহুল সাংকৃত্যায়ন

আমার জীবন-যাত্রা

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদনা

সতীশ মিশ্র
সৈকত রক্ষিত

অনুবাদ

শুকতারা মিত্র

রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

মুখবন্ধ

'মেরী জীবন-যাত্রা'র পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায় রাহুলপত্নী কমলা সাংকৃত্যায়ন উল্লেখ করেছেন যে, রাহুল চান নি তাঁর জীবদ্দশায় এই খণ্ডটি প্রকাশিত হোক। তাঁর দেহাবসানের পর পাঠকদের আগ্রহাতিশয্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এই খণ্ড শেষ হয় রাহুলের চৌষট্টিতম জন্মদিন উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে। তাঁর এই অসামান্য জীবন-যাত্রার কাহিনীতে তিনি সহসা যতি টেনে দিলেন স্বভাবসিদ্ধ নিরাবেগ, নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে। তিনি লিখেছেন, 'বিক্রম সংবৎ ১৯৫০-এর ৮ বৈশাখ অর্থাৎ ৯ এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে পন্দহাতে আমার জন্ম হয়েছিল। এখানে মুসৌরিতে এসে কমলা আমার ষাটতম জন্মদিন বিশেষভাবে পালন করেছিল। আজ আমার চৌষট্টিতম জন্মদিন। আমি স্থির করেছিলাম এই দিনটিতে খাওয়া-দাওয়ার কিছু বিশেষ আয়োজন হবে। কিন্তু এবারে পার্টি-টার্টি একেবারেই হবে না। সকালে প্রাত্যহিক নিয়ম অনুসারে আমি তিন ঘণ্টা টাইপ করালাম। মধ্যাহ্নভোজন ও বিকেলের চায়ের সঙ্গে কিছু ভালমন্দ খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত ছিল। এভাবে দিন শেষ হল।'

এখানেই তিনি হঠাৎ থামিয়ে দিলেন তাঁর অসাধারণ জীবন-যাত্রার কাহিনী। যে-কাহিনী পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় তাকে অত্যন্ত আবিষ্ট করে রাখে। পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয় এক অনন্য জীবন-চর্যার তুলনাহীন নির্যাস। সেই গ্রাম্য কিশোর আমাদের হাত ধরে নিয়ে চলেন পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে, নদী-পাহাড়-উপত্যকায়, কৃষকের কুটিরে। ক্লান্তিহীন এই পরিব্রাজকের জ্ঞানান্বেষণ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে। দীর্ঘ পাঠপরিক্রমার পর প্রতীতি হয় রাহুলের জীবন যেন বহু জীবনের সমাহৃত রূপ। তাঁর তেষট্টি বছরের জীবন-কাহিনীতে আমরা বহু যুগের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকে উপলব্ধি করি। যে-উপলব্ধি শুধু কালপ্রবাহের নয়, সমাজ-ধর্ম-ইতিহাস তথা সংস্কৃতির পরম্পরার। রাহুল তাঁর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, অদম্য কৌতূহল ও স্বকীয় মনীষার আলোকে এক অসামান্য জীবন-দর্শনকে ক্রমশ বিচ্ছুরিত করেছেন। এই আলেখ্য বিশ্বের এক বিশিষ্ট মনীষী হিসাবে যেমন তাঁকে উন্মোচিত করে, একইভাবে প্রকাশ করে অন্তর্লীন সাধারণ মানুষটিকে। এই দুইয়েরই সমন্বয়ে 'জীবন-যাত্রা'র মধ্য দিয়ে আমরা পেয়ে যাই পূর্ণ মানুষ রাহুল সাংকৃত্যায়নকে। যে-মানুষটি সতত উত্তরণ-প্রয়াসী। যিনি অতিক্রম করে চলেছেন মানুষের প্রাত্যহিক মূঢ়তা, অন্ধতা, সংস্কারের আবর্ত। উত্তরণের সন্ধান দিচ্ছেন ব্যক্তিক ও সর্বজনিক সমস্যা থেকে, পীড়ন-অবিচার ও বৈষম্য থেকে। কিশোর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন বৈরাগ্য, জ্ঞানার্জন ও পরিব্রাজনের নেশায়। গ্রামের ছোট্ট জগৎ, চেনা-পরিচিত আত্মীয়স্বজনদের ভালোবাসা ও মায়ার সীমিত বন্ধনকে অতিক্রম করে উন্মুক্ত জগৎ ও জীবন পরিক্রমা সম্পন্ন করে ঘুমক্কড় রাহুল পরিণত জীবনে ফিরে আসেন সংসারী মানুষের গণ্ডীতে। হয়তো জীবনেরই নিয়মে।

এই শেষ খণ্ডে যেমন আমরা তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সংবাদ পাই, তেমনি আভাস পাই তাঁর পারিবারিক জীবনের আনন্দ-বিষাদের। তাঁর যেন মনে হয়, আমার সময়কে যে-ভাবে কাজে লাগানো উচিত, তা আমি যথার্থ ভাবেই কাজে লাগিয়েছি। যা লেখার ছিল, তাও আমি লিখে

ফেলেছি। একটু একটু করে শরীরে অবসন্নতা আসে, কঠিন অসুখ জেঁকে ধরে, মৃত্যুচিন্তা আসে, অর্থকষ্ট ও সংসারের নানা দুর্ভাবনা আচ্ছন্ন করতে থাকে। মুসৌরীর যে-বাড়িটি একদা তিনি প্রবল উৎসাহে কিনে ফেলেছিলেন, সেই বাড়িটিই বিক্রি করার জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন। যে কর্ম ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সংস্রব, এখন যেন সেসব থেকেও তিনি নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে চান। অসংখ্য বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী মানুষজনের কোলাহল থেকে যেন নিঃসঙ্গতার দিকে চলে আসতে চান। সে-কারণেই তাঁর ৬৪তম জন্মদিনটি তাঁর ইচ্ছানুসারেই নির্বান্ধব নীরবতায় কেটে যায়। গ্রন্থের শেষ পঙক্তিতে তিনি যখন বলেন, 'এভাবেই দিনটি শেষ হয়ে গেল'—আমরা তখন বিষাদে আচ্ছন্ন হই। আমরা যেন চেয়েছিলাম যে এই জ্ঞানপিপাসু ঘুমক্কড়ের জীবন চির-প্রবহমান হোক। সংসার-জীবনের সীমাবদ্ধতা তাঁকে যেন স্পর্শ না করে, গ্রাস না করে।

'ঘুমক্কড় শাস্ত্র'-তে স্থবির গৃহস্থরা কী ভাবে নুন-তেল-লকড়ির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং খুঁটিতে বাঁধা বলদে পরিণত হয় তা নিয়ে রাহুল বিদ্রূপ করেছেন। মুসৌরিবাসের সময় রাহুল প্রথম বুঝতে পারলেন কেন নুন-তেল-লকড়ি জীবনের প্রাথমিক স্তরে উঠে আসে। সংসারী মানুষকে হিসেব করে চলতে হয়, যা রাহুল কোনোদিন শেখেন নি। ১৯৫১-র জুনে রাহুল টাকা-পয়সার চিন্তায় বিব্রত ছিলেন। 'ব্যাঙ্ক থেকে ছশো টাকা তোলা হয়েছে। এখন রয়েছে ষোলশো। বড় চিন্তা হচ্ছে। ধার করাটা আমার জীবনের নীতির বিরোধী।'

কমলার পড়াশোনা যাতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় সে-জন্য রাহুল ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। কমলার সঙ্গে তাঁর বয়সের দুস্তর ব্যবধান মনে রেখে তাঁর মৃত্যুর পর কমলা যাতে সন্তানকে নিয়ে নিজস্ব যোগ্যতা ও আত্মসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারেন, সে-ভাবেই কমলাকে তৈরি করে নিচ্ছিলেন। এরই মধ্যে আস্বাদন করেছেন দাম্পত্যজীবনের অম্লমধুর রস। মাঝে মধ্যে ছন্দপতন ঘটায় লোলা কিংবা ইগরের চিঠি। ১৯৫৩-র ১৩ নভেম্বর ইগরের চিঠি ও ফটো এল লেনিনগ্রাদ থেকে। তা দেখে কমলা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। অনেক কান্নাকাটি করলেন। ব্যক্তি সম্পর্কের অভাবনীয় জটিলতায় বিক্ষুব্ধ রাহুল লিখছেন, 'আমার কথা আমি খুলে বললাম। আমি তো বলেছিই জয়াকে ও তোমাকে আমার প্রয়োজন। রাশিয়ায় চলে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু কমলা চাইছিল আমি লোলা ও ইগরকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিই। সেটা করার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক সোজা। যে বাবা ইগরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে তাকে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারবে? যখন কমলার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো তখন আমার কোনো আশা ছিল না যে রাশিয়ার সঙ্গে পুনরায় আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। আবার যদি তা হলো, তখন ইগরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা মানবতাবিরোধী হবে।'... রাহুলের দুঃখ ও ক্ষোভ আমাদের পীড়িত করে। রাহুল ও কমলার অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাস আমরা বিশেষ জানি না। তবে কিছুটা অনুমান করা যায়। সকলের মতো কমলাও ভালোই বুঝেছিলেন বয়সের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। রাহুলকে বিয়ে করার পরে এই গৌরব আর কারও সঙ্গে কোনোভাবে ভাগ করে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৫২-এর সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে

কমিউনিস্ট পার্টির ফল ভালো হয়নি। তার যে-কারণগুলি রাহুল নির্দেশ করেছিলেন, তা থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম খণ্ডে তিনি লিখেছেন যে, ভারতের কমিউনিস্টরা চীনের বিপ্লব থেকে কোনো শিক্ষা নেয় নি। শহুরে রাজনীতির কানাগলিতেই কমিউনিস্টরা ঘুরে মরছিল। তাদের জনসাধারণের কাছে যেতে হবে, গ্রামে যেতে হবে। হাড় যেমন মাংসের মধ্যে লুকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত অভিন্ন হয়ে যায়, তেমনি কমিউনিস্টদেরও জনসাধারণের মধ্যে অনুরূপভাবে মিশে যেতে হবে। ভারতের কমিউনিস্টরা রাশিয়া ও চীনের কমিউনিস্টদের মতো জনসাধারণের ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে শেখে নি। তাই বিরোধীরা কমিউনিস্টদের ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের শত্রু বলে প্রচার চালিয়ে তাদের প্রতি জনসাধারণের সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। দক্ষিণের কমিউনিস্টরা জনসাধারণের সুখ-দুঃখ, ভাষা ও শিল্পকলার সঙ্গে নিজেদের অনেকখানি মিশিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু উত্তর-ভারতের কমিউনিস্টরা এতদিনেও জনতার ভাষা (যেমন মৈথিলী, ভোজপুরী, মগহী, কুমায়ুনী, অওয়ধী) ব্যবহার করে জনতার হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারে নি। জনতার মুখের ভাষা নিয়ে তারা সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করে নি। গণশিল্প ও গণসঙ্গীতকে পুরোপুরি নিজেদের করে নিতে পারে নি। যতদিন কমিউনিস্টরা জনসাধারণের জীবনস্রোতে সম্পূর্ণ মিশে যেতে না পারবে, ততদিন তারা কখনই জনতার ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

সাম্যবাদী রাহুল তৎকালীন কমিউনিস্টদের মধ্যেও ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম। কারণ তিনি নিজের দেশকে চিনতেন, জনসাধারণের ভাষায় কথা বলতে পারতেন, প্রয়োজনে তাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিতে পারতেন। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে প্রায় স্বেচ্ছায় বহিষ্কৃত রাহুল তাগিদ অনুভব করলেন পার্টির সদস্যপদ ফিরে পাওয়ার জন্য। কারণ মার্কসবাদী রাহুল চিরদিন বুদ্ধের অনুগত শিষ্যই থেকে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ সংঘ ও তার মাধ্যমে পরিব্রাজক-বৌদ্ধভিক্ষুদের লোকহিতকর কার্যকলাপ তাঁকে সবসময় প্রেরণা দিয়েছে। কাজেই সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ রাহুল পার্টির মাধ্যমেই সক্রিয় হতে চাইবেন—এ খুবই স্বাভাবিক।

১৯৫৫-র ফেব্রুয়ারিতে দিল্লীর পার্টি অফিসে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সেক্রেটারি অজয় ঘোষের সঙ্গে রাহুলের এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। রাহুল লিখেছেন, 'আমি আবার পার্টির সদস্য হওয়ার কথা বলি। অজয় ঘোষ বলেন, খুব ভালো। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ঐদিনই আবেদনপত্র দিয়ে দিলাম। একথা তো সবাই জানত যে যখন আমি পার্টির সদস্য ছিলাম না, তখনো আমি পার্টিরই ছিলাম। আমার কলম দিয়ে আমি পার্টিরই কাজ করতাম।-এ-কথাও জানিয়ে দিলাম যে, পার্টির সদস্য হয়েও কলম দিয়েই আমাকে পার্টির কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্যের এই অবস্থায় বেশি চলাফেরা করা সম্ভব হবে না। আজকের দিনটি আমার বড় আনন্দের। আমার ভয় ছিল পার্টির সদস্যপদ ফিরে পাওয়ার আগেই আমার না মৃত্যু হয়। আমার সারা জীবনের লালিত আদর্শের প্রতীক হলো পার্টি। আমি নিজেকে বললাম, এখন সারাজীবনের জন্য আমি পার্টির সদস্য।'

কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে যাওয়ার পরে রাহুলের মনে নিশ্চিতই এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ জেগেছিল। নিপীড়িত, দলিত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে দুঃসহ ছিল। তাঁর কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণের মধ্যে অনেক স্ববিরোধ

আছে একথা স্বীকার করেও একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাঁর জীবন-যাত্রার মূল সুরই ছিল নিঃস্ব, নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা। তাদের সঙ্গে গভীর ঐক্যের সম্পর্ক হয়তো কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে খণ্ডিত হয়েছিল। মানবসভ্যতার ইতিহাসে রাহুল সেই বিরলতম মনীষীদেরই অন্যতম যিনি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার উচ্চতম সোপানে পৌঁছেও সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের দুঃখ, দারিদ্র, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কখনো ছিন্ন করেন নি।

'মেরী জীবন-যাত্রা'র প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর আর কোনো খণ্ডই রাহুল তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাদের পাণ্ডুলিপি মোটামুটি তৈরি ছিল। তবু লেখক বেঁচে থাকলে মুদ্রিত গ্রন্থের চেহারা অনেকটাই পালটে যেত। কোনো এক জায়গায় রাহুল নিজেই বলেছেন, বই লেখার চেয়েও বইয়ের প্রুফ দেখতে তিনি বেশি আনন্দ পান। কারণ তখন গ্রন্থটি মার্জিত হতে হতে প্রকৃত আদল পায়। সুতরাং এ-কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, পঞ্চম খণ্ডটি সেই আদল একেবারেই পায় নি। এই পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছিলেন লেখকের অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধু আনন্দ কৌশল্যায়ন। তবুও সম্পাদনার অসতর্কতা ও অজস্র মুদ্রণত্রুটি থেকে গেছে। হয়তো মূল পাণ্ডুলিপির অপূর্ণতার খুব বেশি মার্জনা তিনি করতে চান নি। আমরাও এখানে অনূদিত খণ্ডটিকে মূলগ্রন্থের তুলনায় আরো সুন্দর ও মার্জিত করে তুলতে চাই নি। আমরা সচেষ্ট থেকেছি শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপির অসঙ্গতি দূর করতে ও মুদ্রণত্রুটি সংশোধন করতে। কোথাও উহ্য একটি-দুটি শব্দ সন্নিবেশ করে দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই খণ্ডের কয়েক জায়গায় পাঠক লেখকের কথনের পুনরুক্তি টের পাবেন। যেখানে সেটা নিছক পুনরুক্তি, আমরা তা পরিহার করেছি। কিন্তু যেখানে পুনরুক্ত হলেও লেখক সেই সূত্রে আরো কিছু বক্তব্য পরিবেশন করতে চেয়েছেন, তাকে অক্ষতই রাখা হয়েছে।

সর্বশেষ কথাটি হলো গ্রন্থের পর্ববিভাজন নিয়ে। লেখক স্বয়ং দুটি খণ্ডের পর্ববিভাজন করেছিলেন। তার সঙ্গে মোটামুটি সাযুজ্য রেখে, তাঁর ভাবনা ও ধরনটিকে অনুধাবন করে, আমরা পরবর্তী খণ্ডগুলির পর্ববিভাজন করেছি। পূর্বের খণ্ডগুলির মতো এই খণ্ডেও, পাঠকের সুবিধার্থে, প্রতিটি ঘটনার সালভিত্তিক পরিচয় আমরা প্রতিটি পাতার শীর্ষে সন্নিবেশিত করেছি। এ-ছাড়াও সম্পাদনার কাজে ইতিপূর্বেও যে দৃষ্টিভঙ্গি বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল, এখানেও তাই অনুসৃত হয়েছে।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের জন্মশতবর্ষ পূর্তিকে উপলক্ষ্য করে আমরা অনেকখানিই বিস্মৃত এই অসাধারণ মানুষটিকে নতুন করে চিনে নেওয়ার জন্য তাঁর অসামান্য জীবনকথা বাঙালী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলাম। দু-বছরে এই দুরূহ কার্যসম্পন্ন করতে পেরে আমরা ধন্য। এই উপলক্ষ্যে কত সহৃদয় ব্যক্তির অকৃপণ সহায়তা পেয়েছি, তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। পাঠকমণ্ডলী আমাদের প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছেন, নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, নানাভাবে রাহুলচর্চা শুরু হয়েছে। আমরা চাই 'আমার জীবন-যাত্রা'কে কেন্দ্র করে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির পুনরুজ্জীবন ঘটুক।

তুষারকান্তি তালুকদার
সভাপতি
রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

বিষয়-সূচি

নবম পর্ব

মুসৌরীর জীব

দশম পর্ব

শেষ পরিক্রমা

'পার হওয়ার জন্য ভেলাব মতো আমি ভাবনাগুলিকে গ্রহণ করেছি,
মাথায় বয়ে বয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়।'

১৯৫১-১৯৫৬

নবম পর্ব

মুসৌরীর জীবন

নতুন সাহিত্য-পরিকল্পনা

এই বর্ষ-গণনাও কি রকম? একটি শীত দুটি সালে, একটি রাত দুটি তারিখে রাখা হয়। এখন ১৯৫০ সালের শেষভাগের শীত কাটিয়ে ১৯৫১-র শুরুর শীতে আমরা ছিলাম। আমাদের এখানে নববর্ষের কোনো মহিমা নেই। অথচ আমাদের নববর্ষ অনেক বিজ্ঞানসম্মত যা শীত শেষ করে বসন্ত থেকে আরম্ভ হয়।

অমৃতসরে যে আঁচড় লেগে ছিল এখনো তা সেরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। শুধু ইনসুলিনে কাজ হচ্ছিল না তাই আজ (১ জানুয়ারি) তিন ঘণ্টা পরপর চারবার পেনিসিলিন নিলাম। এ তো চলছিলই কিন্তু সেজন্য কি জীবনের কাজ থেমে ছিল? দক্ষিণী কবিদের বিষয়ে লিখতে লিখতে 'দক্ষিণী কাব্যধারা' লিখেছি। ১৯৫১ সালেই সেটা শেষ করে ফেলেছিলাম কিন্তু প্রকাশক তা বের করবে তবে না? দক্ষিণী ভাষার কবিতা পড়তে পড়তে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে, দক্ষিণী ভাষার সাহিত্য ভারতীয়করণের জন্য নয়, বরঞ্চ ইসলামীকরণ বা আরবী কাঠামোয় ফেলার জন্য রচিত হয়েছিল। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডায় আগে ফারসী সাহিত্যিকদেরই রমরমা ছিল। ফারসী যাদের মাতৃভাষা এমন কবিরাই জিতে যেত। স্থানীয় লোকরা তাদের জীবনের ১২ বছরের বেশি সময় ব্যয় করেও ফারসী শেখার পর তা আয়ত্ব করতে পারত না। ফলে তারা পরের ভাষা ছেড়ে নিজের ভাষাতেই লিখতে শুরু করে। সাহিত্য ছিল এমন লোকদের জন্য যারা ফারসীর সঙ্গে পরিচিত ছিল। কথ্যভাষাতেও গত দু-তিন শতাব্দীতে অনেক আরবী-ফারসী শব্দ চলে এসেছিল, যেমন ইংরেজদের সময়ে আমাদের ভাষায় ইংরেজি শব্দ এসেছিল। আগে ফারসী ভাষাকে হিন্দি বা হিন্দবী বলা হতো। কথ্যভাষা ছিল, এর অর্থ এই নয় যে, এটা দক্ষিণে সাধারণের ভাষা ছিল। গোলকুণ্ডা অঞ্চলে তেলুগু ছিল সাধারণের ভাষা আর বিজাপুরে ছিল মারাঠী। দিল্লীর শাসন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণে প্রথমে বহমনী এবং তারপর তার উত্তরাধিকারী দেশীয় রাজ্য গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আহমদনগর ইত্যাদি কায়েম হয়েছিল। দিল্লীর অধীনে থাকার জন্য দিল্লী থেকে এখানে রাজ্যপাল আসতেন, ছোটবড় অফিসার আর সৈন্যদলও ছিল উত্তর-ভারতের। এরা এবং এদের সন্তানরা হিন্দিতে কথা বলত, যাদের সংখ্যা সে সময় ওখানকার জনসংখ্যার এক শতাংশও ছিল না। দরবারী ভাষা ফারসী হলেও বেশি ব্যবহার ছিল হিন্দি ভাষারই। এটাকেই পরে 'দক্ষিণী'নাম দেওয়া হয়েছিল।

দক্ষিণী কবিতা দরবারীরা শুরু করেননি বরঞ্চ ধর্মপ্রচারক ফকিররা ছিলেন তার প্রবর্তক। হয়তো কিছু লোককবিও ছিলেন। তাঁদের কীর্তি সুরক্ষিত করা হয়েছিল। ভারতের মুসলমান

শাসক দিল্লী পৌঁছনোর আগে পাঞ্জাবে দেড় শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেছিল। সেখানে ফারসীর সঙ্গে পাঞ্জাবীও ছিল অলিখিত শাসনভাষা। তারপর রাজধানী দিল্লীতে আসার পর দিল্লীর ভাষা অর্থাৎ কৌরবীর পাঞ্জাবীর সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পাঞ্জাব থেকে আগতরা কৌরবীর ওপর তাদের নিজেদের সঙ্গে আনা প্রভাব ফেলেছিল আর সেটাই পরে দক্ষিণীরূপে দক্ষিণে গিয়েছিল।

কমলা দেরাদুনে পরীক্ষা দিয়ে কালিম্পং গেছে। মহাদেবভাই সঙ্গে গেছেন। মুসৌরীতে এখন আমি আর মাতবরসিং থেকে গেছি। আমি 'দক্ষিণী কাব্যধারা'র কাজে নিযুক্ত ছিলাম। 'রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি'কে যে-যোজনা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল এখন তা কার্যে পরিণত করার ছিল। মহাদেব ভাই এসে পড়েছিলেন কিন্তু তাঁর হাতের যন্ত্রণা এমনই ছিল যে তুলসী বাবার 'হনুমান বাহুক'-এর পাঠও কোনো প্রভাব ফেলতে পারত না। নাগার্জুনজীর চিঠি থেকে কখনো মনে হতো আসবেন, আবার কখনো মনে হতো আসবেন না। অন্যান্য পরিচিতদের কথাও ভেবে দেখলাম কিন্তু এখন কারও আসার ঠিক ছিল না। ওয়ার্ধা থেকেও লিখে দিয়েছিল যে যাকে পাবে তাকে পাঠাও।

'হর্নক্লিফ'-এর এখন ছমাসও হয়নি তাতেই মন বলতে লাগল এই বাড়িটা পর্যাপ্ত নয়। সত্যিসত্যিই তিনটে বড় বড় হলঘর যার মাত্র দুটিকে শোবার ঘর বানানো যায় তা কি করে পর্যাপ্ত হতে পারে? আসা-যাওয়ার লোকের জন্য কোনো জায়গা ছিল না। কখনো দোষারোপ করতাম—জমি আর উচ্চতার এত বেশি অপব্যয় বোধ হয় কেউ করে নি। উচ্চতার অপব্যয় বাংলোটাকে এমন করে দিয়েছে যে শীত তাড়ানোই যাবে না। এই জায়গাতেই আটটি ঘর ভালভাবে বানানো যেত এবং এই ছাতের ওপরেই দেওয়াল তুলে দোতলা করলে এর ষোলটা ঘর হয়ে যেত। কোন বোকা এরকম বাংলো বানিয়েছিল? বোকা বলা ভুল হবে কেননা নির্মাণকারীকে এখানে শীত কাটাতে হতো না। তার মূল বাংলো ছিল ওপরের 'হর্নহিল', যার প্রতি আঙুল জমি ও উচ্চতা খুব সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাতে আটটি স্নানঘর, আটটি ড্রেসিংরুম, ততগুলোই শোবার ঘর এবং দুটি বড় বড় খাবার ও বসার ঘর ছিল। সম্ভবত এটিকে অতিথিদের পানশালা এবং নাচঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কল্পনা করতাম এটা যদি তিরিশ হাজারে বিক্রি হয়ে যায় তাহলে আরও দশ-পনের হাজার যোগ করে 'হর্নহিল' নিয়ে নেব। সেইসময় 'হর্নহিল'-এর জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারের কথা বলা অভদ্রতা ছিল কিন্তু আজ যদি তার অর্ধেকও কেউ দিতে রাজি থাকে তো মালিক খুশি হয়ে বিক্রি করতে সম্মত হয়ে যাবে।

৮ জানুয়ারিতে এখনো অনেক জায়গায় বরফ ছিল। দেড় ইঞ্চি বরফ পড়লে ছায়া ঢাকা জায়গাগুলোতে তা দশ-পনের দিন পর্যন্ত গলার নাম করে না। এখানে জোর শীত থাকে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কৃপায় আজ বন্দুকের লাইসেন্স চলে এলো। মাচবেজী ডা· কেসরওয়ানীর পরামর্শ উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন যে সাধুমোহান্তের জন্য শীতের হিমালয় ভাল নয়। কিন্তু আমি তো হিমালয়কে বেছে নিয়েছিলাম বারো মাসের জন্য আর যদি লিখতে হয় তো বইয়ের সুবিধে এখানে রয়েছে, সেগুলো এখান থেকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত না।

৯ জানুয়ারি ঘুরতে বেরোলাম। সে সময় এরকম বেরোনোর অর্থ ছিল লণ্ডৌর-এর কিষাণসিংহর ঘর পর্যন্ত যাওয়া। এখান থেকে চার্লবিল হোটেলের ফটক পর্যন্ত বরফ পাওয়া যেতে লাগল। কোথাও কোথাও গলে গিয়েছিল—সওয়াই হোটেলের কাছ পর্যন্ত তার ছেঁড়া-ফাটা সাদা চাদর দেখা গেল। প্রথম হল্ট হলো ড· সত্যকেতুর বাড়িতে। এগিয়ে গেলাম, কাঠের সীমার পর কোথাও কোথাও একটু বরফ পাওয়া গেল। এক জায়গায় একজন তরুণ তাতে পিছলে পড়ে গেল। শীতে বরফের শহরে এটা সাধারণ ঘটনা সেজন্য যারা দেখে তারা বেশি হাসে না।

সভা-সম্মেলনগুলোর জন্য নিমন্ত্রণদাতারা কি করে জানবে যে মুসৌরী ছাড়ার কি কি অসুবিধে রয়েছে? গোরখপুর, দেওরিয়া, আগ্রা, এলাহাবাদ, রিওয়াঁ থেকে নিমন্ত্রণ এসেছিল, না যাওয়ার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে লিখে পাঠাতে হলো।

১২ জানুয়ারি নাগাদ ফ্লাশ কাজ করতে শুরু করেছিল। পরিচ্ছন্নতার এই আধুনিকতম উপায় এবং হাতমুখ ধোয়ার বেসিনের জন্য ঘরের মূল্য বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। খুব মেঘ ছিল, সেজন্য শীত বেড়ে গিয়েছিল। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালানোর জায়গায় আগুন জ্বালালে ধোঁওয়া চিমনি দিয়ে বাইরে না বেরিয়ে ঘরেই থেকে যাচ্ছিল। একটি বৈদ্যুতিক রুমহিটার আনালাম কিন্তু প্রথমত তার আঁচ মাত্র এক ফুট যাচ্ছিল আর দ্বিতীয়ত তার খরচও বেশি পড়ছিল।

১৬ জানুয়ারি সকালে আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। সারাদিন বৃষ্টি হতে লাগল। বৃষ্টি আর হাওয়া তাপমাত্রা নামিয়ে দেওয়ার কাজ করে। যখন তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রির নীচে নেমে যায় তখন বৃষ্টি হিমবর্ষায় পরিণত হয়। রাতে এরকমই হলো। সারাদিন আগুন জ্বালিয়ে ঘরের ভেতরে বসে আমি গোওয়াসীব 'সৈফুলমূলক' আর 'তূতীনামা' পড়তে পড়তে তা সংক্ষিপ্ত করতে লাগলাম। গোওয়াসী ছিলেন তুলসীদাসের সমসাময়িক তরুণ। শাহজাহানের সময় পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন।

১৭ সকালে প্রচুর বরফ দেখা যাচ্ছিল। মনে হলো রাতে তাপমাত্রা কিছুটা ওপরে উঠেছিল সেজন্য কোথাও কোথাও তা ফেটে গিয়েছিল। বরফ দেখার আনন্দ তখনই হয় যখন সমস্ত ভূমি, বৃক্ষের ডালপালাই নয়—তার এক-একটি পাতা আর ঘরের সামনের কাঁটা দেওয়া জালির এক-একটি তার রূপোলি বরফে ঢেকে যায়। আজ সে-আনন্দ পাওয়া গেল না। ১৯ তারিখের রাতে বরফ খুব মন দিয়ে কাজ করল। সকালে চারদিকে তাই-ই ছিল। এই শীতের এটা ছিল চতুর্থ এবং সবচেয়ে বড় হিমবর্ষা—প্রায় দু-ইঞ্চি পুরু হয়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সমস্ত গাছপালা বরফের তুলো লেপ্টে আছে। সামনের হেঁতালের পাতা আর দেবদারুব ডালপালায় যা খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। দিনের বেলায় আকাশ ছিল নির্মল। সূর্য দিনের বেলায় তার কিরণ দিয়ে বরফের ওপরে প্রহার করতে লাগল। সারাদিনে অনেক বরফ গলে গেল। সন্ধেবেলায় ফের বৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু তাপমাত্রা অনুকূল না থাকায় তা বরফ না হয়ে বরফের গুঁড়ো (বজরী) রূপে ঝরে পড়ছিল।

ফ্লাশ ইত্যাদির ২৫৩০ টাকার বিল এলো। যদি আগে জানতাম যে দেড় হাজারের বেশি লাগবে ত হলে না করে দিতাম, কিন্তু এখন তো করানো হয়ে গেছে। সব লেখাজোখা করার পর হর্নক্লিফে ২০ হাজার লেগেছিল।

আজই প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক কৌশাম্বীর খননন সম্বন্ধে কিছু লিখেছিলেন আর সেইসঙ্গে ব্রাহ্মী শিলালেখের ফটোও পাঠিয়ে ছিলেন। শিলালেখটি সেই জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল যেখানে ঘোষিতারাম ছিল। পালি-পরম্পরা আমাদের ইতিহাসের ওপর কতখানি সত্যিকারের আলো ফেলেছিল, এটা ছিল তার প্রমাণ। পালি ত্রিপিটক পড়তে গিয়ে, সেই সময়ের ইতিহাস, ভূগোল আর সামাজিক তত্ত্বের দিকে আমার মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। আমি বইয়ে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছিলাম আর সেগুলো খাতাতেও তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু দেশ-দুনিয়ায় ঘুরে এবং আরো বহু রকমের কাজ করে আমি এর সম্বন্ধে লেখার সময়েই পেতাম না। 'বুদ্ধচর্যা'য় এর কিছুটা অবশ্যই ব্যবহার করেছিলাম, কৌশাম্বী এবং জেতবন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র লেখাও লিখেছি। ভাবলাম, 'উৎপৎস্যতে তু মম কোঅপি সমানধর্মা' এবং তার জন্য বেশি অপেক্ষা করারও দরকার হলো না। শ্রীভরতসিংহ উপাধ্যায় এই কাজটি করলেন।

তিন-চার দিন ধরে প্রতীক্ষায় ছিলাম, শেষে ২১ জানুয়ারি অন্ধকার হলে কমলাজী আর মহাদেবভাই এলো। কাল ওরা লক্ষ্ণৌতে গাড়ি পায়নি। মহাদেবভাই কালিম্পং যাননি, শিলিগুড়িরই আশেপাশে থেকে গিয়েছিলেন। পাহাড়ের পুলিস কমিউনিস্টদের দেখতে ভালবাসে না। শুনলাম কালিম্পঙে তিব্বতের লোকে ভরে গেছে। কোনো বাংলো খালি নেই। লাসায় কমিউনিস্টরা পৌঁছে গেছে এবং সরকার এখন তাদের। গত ৩২-৩৪ বছর ধরে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তিব্বতে প্রবল প্রচার হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল—কমিউনিস্টরা রাক্ষস। তারা ধর্ম ও মানবতার শত্রু। তাই ভয় পেয়ে তিব্বতের কিছু ধনী লোক কালিম্পং চলে আসে। কিন্তু ওখানকার সবচেয়ে বড় জমিদার সুরখংগ পরিবার না আসায় এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, এই ভয় আর আতংক আরো বেশি দিন থাকবে না।

এতদিন ঘর খালি-খালি মনে হতো, এখন তা ভরা-ভরা দেখাচ্ছিল। কমলা ঘরের ব্যবস্থাপনা সামলে নিল।

২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিন। তাঁর অনুরাগীরা হলমেন হোটেলে একটা ছোটমতো উৎসব-সভা ডাকলেন, সভাপতি হতে হলো আমাকে। আট-দশ জন বক্তা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন কিন্তু তার মধ্যে অনেকেই এই অছিলায় কংগ্রেসী শাসনের প্রতি নিজের মনের ঝাল মেটালেন। বর্তমান ভাল হলেও তা সন্তুষ্টি দেয় না আর যখন তা অনেক রকম চিন্তার বাহক হয় তখন তো অসন্তোষ আরো বেড়ে যায়, এটাই স্বাভাবিক।

মহাদেবভাই সাহিত্য-পরিকল্পনায় কাজ করার জন্য রাজি হয়ে গেলেন। ২৬ জানুয়ারি শ্রীহরিশ্চন্দ্র পুষ্পও সত্যযুগের রেমিংটন টাইপ রাইটার নিয়ে পৌঁছে গেলেন। ওটা দিয়েই তাঁর কাজ করার ছিল আর ওটাতে তাঁর হাতও বসে গিয়েছিল।

দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে বিশ্বাস না করার মতো ঘটনা মানুষকে দেখতে হয়। আমি আমার সামনে ন্যাংটো অবস্থায় খেলা করা সব বাচ্চাদের সারা মাথা সাদা হতে দেখলাম। ২০ বছর আগে আমি মহাদেবভাই আর তাঁর দুই সঙ্গী বৈজনাথসিংহ বিনোদ এবং ধাওলেকে কলকাতায় দেখেছিলাম, সে-সময় তাঁরা একেবারে কাঁচা তরুণ ছিলেন। মহাদেবভাইকে এখন শরীর আর মনের দিক দিয়েও বার্ধক্যের পথে পা বাড়াতে দেখা যাচ্ছে। মানসিক বার্ধক্য তখনই আসে যখন

মানুষের কথাবার্তায় মুদ্রাদোষ আসতে শুরু করে, বলার সময় সে শুধু নিজের কথাই খেয়াল করে, শ্রোতার মনের কথা চিন্তা করে না।

মানুষের মানসিক অবস্থা ভাল-মন্দ বা উভয়ই হচ্ছে স্বতন্ত্র, যার মুখ্য কারণ হচ্ছে বাইরের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক চোখের, কানের বা লিখিত পত্রের—যারই হোক না কেন। সমাজ এমন ভাবে তৈরি যে তাতে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে না।

৩১ জানুয়ারি বার্লোগঞ্জ থেকে একজন চঞ্চল তরুণ এলো। ইংলণ্ডে ১৪-১৫ বছর থেকেছে। পড়াশোনা করে ওখানকার স্কুলেই শিক্ষক হয়েছে। ভালভাবেই দিন কাটছিল। ওখানকার জীবন-যাপনের মান তো উঁচুই, যদি কাজ পাওয়া যায় তো মাইনে ছ-সাতশো টাকার কম কি আর হবে? দেশ স্বাধীন হয়েছে শুনেই সে ছুটে এসেছে। এখানে আসার পর তেল-নুন-কাঠের কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার স্ত্রীও সুশিক্ষিতা। ভাবল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে, কাজেই দুজনে মিলে ছোট বাচ্চাদের জন্য একটা আশ্রম-স্কুল খুলে দিই। বার্লোগঞ্জে বার্ষিক পনেরশো টাকায় খুব বড় বাংলো পাওয়া গেল। বাজার থেকে দূরে যেতে রাজি থাকলে মুসৌরীতে মাটির দরে বাংলো পাওয়া যাচ্ছে। একটা প্রাসাদের মতো বাংলো সম্বন্ধে তার মালিক বলছিল, 'যদি কোনো সংস্থা এটা কাজে লাগাতে চায় তাহলে আমি বিনা ভাড়ায় দিয়ে দিতে পারি।' যাকগে, বার্লোগঞ্জে তাদের স্কুল খুলল। সব মিলে আটাশটি বাচ্চা ছিল। এটুকুতে কি করে খরচ উঠে আসবে? ঘরের পুঁজিও তাতেই চলে গেল। ঠাণ্ডা ছিল। দরজা বন্ধ করে, আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে আমরা কথা বলছিলাম। তাকে আমি কী সাহায্য করতে পারতাম? কারু কষ্টের কথা সহানুভূতির সঙ্গে শোনাও এক ধরনের বড় সহায়তা করা।

৩১ জানুয়ারি শ্রীমহেন্দ্রকুমার ন্যায়াচার্যও এসে পড়ছিলেন। [illegible] রাজস্থানের বাসিন্দা ছিলেন। শীত কেটেছিল বোম্বাই বা সমতলের অন্য কোনো শহরে। পণ্ডিত সুখলালজীর সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন, আর সেই সময় থেকেই তিনি আমার পরিচিত। এবার এখানে শীতের এমন সময়ে এলেন যখন বরফ পড়ছিল।

১ ফেব্রুয়ারিও বরফ পড়তে থাকল। ২ ফেব্রুয়ারি দেড়-দু ইঞ্চি পুরু হয়ে মাটি ঢেকে রেখেছিল। এটা ছিল এই বছরের পঞ্চম হিমবর্ষা। যতক্ষণ অত্যধিক শীত বা গরমের প্রত্যক্ষ অনুভব না হয় ততক্ষণ সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণা হতে পারে না। মহেন্দ্রজী আর হরিশ্চন্দ্রজীর সবার আগে গরম পোশাক বানানোর চিন্তা হলো।

৭ ফেব্রুয়ারি কোম্পানি বাগের দিকে হাঁটতে গেলাম। কোম্পানি বাগ পর্যন্ত বরফ ছিল। ওখান থেকে ডাঁড়া পার হয়ে 'মানব ভারতী' গেলাম। এই অংশটা দেরাদুনের দিকে পড়ে। সেখানে বরফ বেশি সময় টিকতে পারে না। ড· দুর্গাপ্রসাদ পাণ্ডে অনেক বছর আগে ছেলেমেয়েদের এই সংস্থাটিকে দেরাদুনে স্থানান্তরিত করেছিলেন। ওখানে থেকে বাইরে কয়েকশো একর জঙ্গলের জমিও একটি পাহাড়ী এলাকায় নিয়েছিলেন। যাওয়ার জন্য রাস্তাও তৈরি করলেন। কিন্তু মানব-ভারতীকে 'বিশ্বভারতী'-র রূপ দেওয়ার জন্য লাখ লাখ টাকার বাড়ির দরকার ছিল এবং প্রতিবছর খরচের জন্য লাখ খানেক করে টাকাও প্রয়োজন ছিল। স্বপ্ন যারা দেখে তারা এভাবেই দেখে, তাদের মধ্যে কারুর স্বপ্ন চরিতার্থ হয়, কারুর কাছে শুধু স্বপ্নই

থেকে যায়। ড· পাণ্ডে জন্মেছিলেন আরা জেলায়, বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করে ওখান থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে এসে কাজ শুরু করলেন। যখন ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল আর শুধু তাদের জন্য বানানো শিক্ষণ সংস্থাগুলো উঠে যেতে লাগল তখন তাদের সেই খালি বাড়িগুলো কম ভাড়ায় পাওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। পাদরীদের স্কুলের এই বিশাল বাড়ি পাণ্ডেজী তাই পেয়েছিলেন এবং তিনি নিজের সংস্থাটি দেরাদুন থেকে মুসৌরীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সেই সময় ওখানে ৮০-৮৫ জন ছাত্রছাত্রী ছিল, এফ এ পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার স্তর উঁচু রাখার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা রাখা হয়েছিল। খরচের ভারে বিপর্যস্ত ছিলেন। পরের বছর ছাত্রদের সংখ্যা আরও কমে গেল, কিন্তু পাণ্ডেজী একবার শুরু যখন করেছেন—লেগেই রইলেন। এবার কিছুটা অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তবু চিন্তা দূর হয়ে গেছে বলা যায় না। আসলে এই ধরনের সংস্থাগুলো উচ্চ-মধ্য শ্রেণীর মানুষের ভরসায় চলে যার অভাব আমাদের এখানে রয়েছে। যারা আছে তারা ইউরোপিয়ান স্কুলে নিজেদের ছেলেদের পাঠাতে চায়। তাদের ভারতীয় সংস্কৃতির চাইতে ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি, ভারতীয় ভাষার চাইতে ইংরেজি ভাষা বেশি পছন্দ। কারণ তারা নিজেদের সন্তানদের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে দিতে চায়।

মুসৌরীতে আট মাইল লম্বা আর দু-আড়াই মাইল চওড়া জায়গায় প্রতি রাত্রে দীপমালা জ্বলতে দেখা যেত। জঙ্গলেও সারা রাত স্তম্ভের মাথায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলত। এটা কিসের জন্য? এতে কি বিদ্যুৎ খরচ হয় না? বিদ্যুতের সেই খরচ কি নাগরিকদের দিতে হয় না? মধ্যরাতের পর এই জঙ্গলে কে যাতায়াত করে যে ওখানে অবিরাম দেওয়ালি জ্বলে? শীতের সময় যখন এখানে কোনো লোকজন থাকে না, সে-সময় কিসের জন্য এই দীপাবলী? ভাবতাম রাত বারোটার পর যদি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়া যেত তাহলে হাজার হাজার টাকা বেঁচে যেত। শীতের সময় অনেক লাইন বন্ধ করে দিলেও সেই পয়সা বেঁচে যেত। সেই সময় মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম জনগণ-নির্বাচিত লোকদের হাতে ছিল না—এটা অজুহাত ছিল। কিন্তু গণ-নির্বাচিত পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর কতবার এই বক্তব্য তার সামনে রাখা হলো, কারু কানেই কিছু ঢুকল না। তারা খরচ বাড়াতে চায়, কমাতে চায় না।

মুসৌরীর অবস্থা ১৯৫১ সালের শুরুতে যেমন ছিল, আজ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে তা আরও খারাপ হয়ে গেছে। এখানকার লোকদের কাছে সেই সময়কার পরিস্থিতিও ছিল উদ্বেগজনক। গ্রীষ্মের এই বিলাসপুরীর বুনিয়াদ নির্ভর করছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমৃদ্ধি ও সম্পন্নতার ওপর। এখানকার আর্থিক অবস্থার এটাই হচ্ছে থার্মোমিটার। যখন এর অবস্থা খারাপ হয় তখন বুঝতে হবে মধ্যবিত্তরা খারাপ অবস্থায় রয়েছে আর যখন এর মধ্যে জাঁকজমক দেখা যায় তখন বুঝতে হবে মধ্যবিত্তের অবস্থা বেশ ভাল রয়েছে। বছর বছর ধরে মানুষের মুখ না দেখার ফলে ভাল ভাল বাংলো, তাদের টিন আর ফার্নিচার ভেঙে যেতে দেখে মনে হতো, আর কখনো কি এদের দিন ফিরবে? পরে প্রায়ই মুসৌরীর লোকেরা এই প্রশ্ন করত, তখন আমার মনে হতো যে, দিন ফিরবে—ভারত যখন সমাজবাদী হবে তখন।

আমাদের বাংলো থেকে মাত্র দুটো বাংলো পেরোলেই বিড়লা-নিবাস। যেন রাজপ্রাসাদ। কোনো ইংরেজের 'হার্মিটেজ' নামে বিশাল বিলাসভবন ছিল, এটা তারই নতুন নামকরণ।

বাংলো জলের দরে ভালই পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাকে আবার সারাতে এবং সাজাতে দেড় লাখ টাকা লাগল। ঠিকাদার সাহেবের ৪৭ হাজার এখনো বাকি আছে, তার জন্য তিনি চোখের জল ফেলছিলেন। বড়লোকদের ধার দেওয়া বা ধারে কাজ করার মানেই হলো ঝামেলা ডেকে আনা।

আমাদের সাহিত্য-পরিকল্পনায় যাঁরা কাজ করবেন তাঁরা সবাই আসেন নি। কার্যক্ষেত্রে অসুবিধে দেখা দিতে লাগল। কিছু লোক ভাবতেন আমরা বেতনের জন্য কাজ করছি, কাজের জন্য নয়। আমি ভেবেছিলাম বেতন তো চাই, কিন্তু কাজের কথা খেয়াল রাখতে হবে। এখন কাজ করছি একমাসও হয় নি, অমনি বেতন বাড়ানোর কথা উঠল। এটাও বললেন, আমরা তো মাত্র দু-ঘণ্টা কাজ করতাম। ভাবলাম, কি ঝামেলায় পড়া গেল! দিনে যদি পাঁচ ঘণ্টাও কাজ না হয় তাহলে কি করে হবে? তাঁদের দৃষ্টিতে দেখলে আরও কিছু ব্যাপার চিন্তা করার আছে। তাঁরা যদি শহরে থাকতেন তাহলে দু-একটা টিউশন পেয়ে যেতেন, তা থেকেও কিছুটা রোজগার বেড়ে যেত। কিন্তু এখানে এই জঙ্গলে তারও কোনো আশা ছিল না। এখানে বিনোদনেরও কোনো সুযোগ ছিল না। শীতে সিনেমা বন্ধ থাকত আর গরমে তার জন্য দু-তিন মাইল যেতে হতো। দেখা-সাক্ষাৎ করার অর্থাৎ কথা বলার লোকও খুবই কম আসে। শীতে তো তাও নয়। কিছুদিন পর কাজ করার জন্য অন্য বন্ধুরাও এলেন—বিনোদজী, কুমঠেকর আর আমার বন্ধু স্বামী সত্যস্বরূপজী। সকলের প্রতিই অভিযোগ ছিল তা নয় কিন্তু একটি গাড়িতে জোতানো সব ঘোড়া যখন একভাবে শক্তি প্রয়োগ করে তখনই গাড়ি ঠিকভাবে চলে। যদি তাদের মধ্যে একজনও হরতাল করার জন্য তৈরি হয়ে যায় তাহলে কাজ এগোয় না। আমাদের এক সহকারী তো কাজের আধিক্যের জন্য ড. সত্যকেতুর কাছে কাঁদুনি গেয়ে আসতেন। বলতেন যে, 'ওয়ার্ধায় তো আমরা মাত্র ২ ঘণ্টা কাজ করতাম আর ২২ ঘণ্টা বিশ্রাম। ওয়ার্ধায় আমাদের ছুটিও মিলত। এখানে তো ছুটিও নেই। আমরা তো মস্ত শোষকের হাতে পড়ে গেছি।' আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি এই উপাধি আমাকে পেতে হবে। নাগার্জুনজীও ২৫ মার্চ নাগাদ চলে এলেন। যাঁদের আগে থেকেই আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল তাঁরা তো সেভাবেই কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু সমস্যা ছিল দলবদ্ধভাবে কাজ করার।

এতদিন পর্যন্ত আগে লিখে টাইপ করার জন্য আমি বই-এর পাণ্ডুলিপি বা লেখা দিতাম। ১৫ ফেব্রুয়ারি মুখে বলে বলে টাইপ করালাম। ভাবলাম হাতে লেখার ঝামেলা কেন করব যদি সেই সময়টা বাঁচানো যেতে পারে? এ রকম তিন-চারটে কপিও কার্বন দিয়ে বের করা যেতে পারে। কিন্তু অত দরকার হলো না, দু-কপিই যথেষ্ট ছিল। লিখে টাইপ করা বা মুখে বলে টাইপ করা দুটিকেই একবার দেখে নেওয়া দরকার ছিল, তাই ভুলের জন্য চিন্তা করার কিছু ছিল না। কতদিন ধরে ভাবছিলাম টেপ রেকর্ডারে মুখে বলে রেকর্ড করিয়ে নিই। যখন জানলাম যে তা থেকে লিখে নেওয়ার সময় ধীর গতিতে সেটা চালানো যায় না, তখন শর্টহ্যান্ডে (দ্রুত লেখন) লেখা আবার তাকে টাইপ করানো অনাবশ্যক ঝামেলা বলে মনে হলো এবং সেই ভাবনা ত্যাগ করতে হলো। এই নতুন অভিজ্ঞতা একটি দিশা খুলে দিল যার ফলে আমার কাজের গতি যে খুব বেড়ে গেল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাহিত্য-পরিকল্পনায় কাজ করার জন্য আগত বন্ধুদের এই বাংলোতে থাকা সম্ভব ছিল না তাই আশেপাশে অন্য কোনো বাংলো নেওয়া দরকার ছিল। 'হর্নলজ'' নিয়ে কথাবার্তা হলে বৃদ্ধ

ল্যাডলি পুরনো যুগের ভাড়া থেকে একটুও কমাতে রাজি হলেন না। তাঁর ছেলে জন ল্যাডলি দিতে চাইছিলেন কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে যাবেন কি করে? শেষে 'হর্নহিল'-এর দিকে নজর গেল। সেটা অনেক বছর ধরে মেরামত হয় নি, ফার্নিচারও সব আছে কিনা সন্দেহ ছিল। এসব কারণে সেটা সেই পরিমাণ ভাড়ায় পেয়ে গেলাম যা দিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। দর-কষাকষি করার পরে বার্ষিক পনেরশো টাকায় হর্নহিল পাওয়া গেল। সরকারি রেট অনুযায়ী এর ভাড়া ছিল পঁয়ত্রিশশো টাকা। মার্চের শেষ নাগাদ আমার সঙ্গীরা 'হর্নক্লিফ'-এই কোনো রকমে কাটাতে লাগল।

দেরাদুন 'দেহরা' আর 'দুন' এই দুটো শব্দ মিলে তৈরি হয়েছে। দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী (দ্রোণী) দোনার মত ভূমিকে বলে দুন। এটা যে খুব পুরনো শব্দ তা এর থেকে বোঝা যায় যে, রুশ ভাষাতেও এই শব্দটিকেই সামান্য উচ্চারণভেদে দোলিনা (দ্রোণা) বলা হয়। হিমালয় আর সিবালির মাঝে যেখানে ফাঁক রয়েছে সেখানে এরকম অনেক দুন দেখা যায়! এই দুনের পাশেই যমুনা পারের দুন রয়েছে, আর পরেও অনেক দুন আছে। দুন নামে এই দেশ অনেক আগে থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। প্রকৃত নাম কি ছিল তা জানা যায় না। তারপর আওরঙ্গজেবের শাসনকালে গুরু তেজবাহাদুরের কাকা গুরু রামরায় সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়ে আওরঙ্গজেবের সুপারিশ নিয়ে গাড়োয়াল (শ্রীনগর)-এর রাজার এই দেশে আসেন। এখানে দেরা (ডেরা) বাঁধেন আর সেই থেকে গ্রামের নাম 'দেরা' হয়ে যায়। আজও পুরনো লোকেরা নগরের নাম দেরাদুন বলে না, শুধু বলে দেরা। গুরু রামরায়কে গাড়োয়ালের রাজা কয়েকটি গ্রাম দিয়েছিলেন, সে-সময় যার খুব বেশি মূল্য ছিল না। গুরু রামরায়ের দেরাকে দরবার বলা হতো। আজও তার সেই নাম প্রচলিত আছে। গুরু নানকের পরম্পরা তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা দুটি ধারায় চলেছিল। শ্রীচন্দ ছিলেন সাধু এবং ভবঘুরে। তাঁর শিষ্যরা এখন উদাসী-সাধু নামে প্রসিদ্ধ। গুরু নানকের গৃহস্থ শিষ্যদের পরম্পরায় পরে নজন গুরু হয়েছিলেন, যাঁরা শিখ নামে বিখ্যাত। গুরু রামরায় নিজের উত্তরাধিকারী করেছিলেন একজন উদাসী-সাধুকে। সেজন্য দেরাদুনের গুরু রামরায়ের দরবার হয়ে গিয়েছিল উদাসী-মঠ। মার্চ (চৈত্র) মাসে গুরু রামরায়ের দরবারে ঝাণ্ডার মেলা হয়। ৫০-৬০ হাতের একটি বিশাল লাঠি হলো ঝাণ্ডার দণ্ড। সেইদিন তাতে শুধু নতুন ঝাণ্ডাই লাগানো হতো না সেই সঙ্গে পুরো লাঠিটাকেই দামী রেশমি কাপড় দিয়ে মুড়ে দেয়া হতো। প্রতি বছর এই ঝাণ্ডা নতুন করে লাগানো হয়। এই সময় বড় মেলা বসে। তিন-চার দিন ধরে খুব জমজমাট থাকে। ২৭ মার্চ মহাদেবভাই আর কমলা তা দেখতে গেল। আমার এরকম মেলা আর প্রদর্শনী দেখার শখ আগে থেকেই কম ছিল অথবা শখ আছে সেই জিনিসই দেখার যার সম্বন্ধে কিছু লেখা যায়। আমিও এই সুযোগে একবার ওখানে গেলাম।

মুসৌরীতে চাকরের খুব সমস্যা। সিজনের সময় সব পাহাড় থেকে লোক কাজ খুঁজতে চলে আসে। কিন্তু সিজনের পর তাদের পাওয়া মুশকিল। নিয়ম চলে এসেছে— সেই অনুসারে দেরাদুনের চেয়ে এখানকার বেতন দ্বিগুণ। ইংরেজরা এই নিয়ম চালু করেছিল, কেননা বেতন দেওয়ার সময় ইংল্যান্ডের কথা তাদের মাথায় থাকত। এখন নিয়ম বাঁধা হয়ে গেছে, তা ভাঙবে কি করে? আমি মাতবর সিংহকে খাওয়া-দাওয়া আর ৩৫ টাকা বেতনে রেখেছিলাম, কিন্তু সে

তাতে সন্তুষ্ট ছিল না। আর ৪০ টাকা দেয়ার সামর্থ আমার ছিল না। কতবার এমন অবস্থা হয়ে যেত যে, চাকর ছাড়িয়ে নিজের হাতেই সব কাজ করার কথা আমাকে ভাবতে হতো। বেতন না বাড়ানোয় মাতবর সিংহকে হারাতে হলো। সব মিলিয়ে তার কাজ সন্তোষজনক ছিল। তার পরে তো কতজনকে নিয়ে কত অভিজ্ঞতা হলো।

ভূত—শাক-সবজি চাষ করতে আমি খুব আগ্রহী ছিলাম। তাতে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল দুটি জাতের বাঁদর। এই সময় মনে হলো, যদি একটা কুকুর পুষে রাখি তাহলে সে বাঁদরদের তাড়াবে। কিষাণ সিংহকে বললাম। একবার তিনি একটা ভুটিয়া কুকুরের বাচ্চাকে জোগাড় করে দিতে চাইলেন। নিতে ভয় করছিল—ভুটিয়া কুকুর নিজের প্রভুকে ছাড়া অন্য কাউকেই না কামড়ে ছাড়ে না। তার স্বভাবে জংলীভাব বেশি থাকে। শরীরে ভালুকের মতো বড় বড় লোম থাকে, তা পরিষ্কার রাখাও সহজ কাজ নয়। আমি একটা বাচ্চাকে নিতে কিছুটা রাজিও হয়ে গেলাম কিন্তু মনস্থির করাব আগেই সেটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল। আবার কিষাণ সিংহ তাঁর বন্ধু এক খ্রিস্টান কসাই-এর অ্যালসেশিয়ান বাচ্চা ঠিক করলেন। ২ এপ্রিল আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি দুটো বাচ্চাকে সামনে এনে দিলেন। দুটো একই রকম গাঁট্টাগোট্টা। আমি একটাকে নিয়ে আমার থলিতে ফেলে দিলাম। চার সপ্তাহের বাচ্চা আর কতই বা বড হয়? সে মার্চ মাসের কোনো সময় জন্মেছিল। ঝোলায় নিয়ে ড· সত্যকেতুর বাড়ি এলাম। সেখানে কুকুব বাচ্চা নিয়ে কথা হলে তিনি শুধোলেন, 'এনেছেন না আনেন নি?' সে এত ছোট ছিল যে ঝোলাতে দেখাই যাচ্ছিল না।

ঘরে আনার পর কমলা খ্যাঁক খ্যাঁক করে ছুটে এলো, 'কেন আনলে, আমি এখানে রাখতে দেব না!' এখন আমি কোন মুখে তাকে ফেবত দিতে যেতাম? কিষাণ সিংহর বন্ধু বিনা পয়সায় দিয়েছিল এবং খুব ভাল জাতের সে-বাচ্চা, লোভও ছিল। আমি বললাম, 'এসো, আমরা মিটমাট করে নিই। আমি এটাকে এনেছি। যা অপরাধ হবার তা হয়েছে। এবার তুমি এর নাম রেখে দাও, এটি তোমার কাজ।' বলে রাখি যে, অ্যালসেশিয়ান কুকুর রাখা নিয়ে কমলা একবার সম্মতি প্রকাশ করে ফেলেছিল। রাগ করে সে বলল, 'ভূত নাম থাক।' ব্যাস্, তার নাম 'ভূত'ই হয়ে গেল। কয়েক মাসের মধ্যে সে বুঝতে শুরু কবল যে ওটাই আমার নাম। ততদিনে কমলার কৃপা-দৃষ্টি সে পেয়ে গেছে। কমলা নাম বদলানোর চেষ্টাও কবল কিন্তু ভূত এখন অন্য নাম গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। কোনো বন্ধুকে আমি যখন নামের ব্যাপারে আপত্তি করার সম্ভাবনা দেখতাম, তখন বলে দিতাম, 'আসল নাম তো ভূতনাথ, তারই সংক্ষেপ ভূত।' ভূত প্রথমে তো খুব জ্বালাতন করত। যেখানে করা উচিত নয় সেখানেও পায়খানা-পেচ্ছাপ করে দিত। তার জন্য একটা কাঠের বাক্স স্নানের ঘরে রেখে দিলাম। ধীরে ধীরে রাতের বেলায় সে তার মধ্যে থাকতে লাগল। তারপর এটাও বুঝে গেল যে, যেখানে-সেখানে পায়খানা করা ঠিক নয়। সে বাথরুমটাকে নিজেরও পায়খানা ধরে নিল। 'কিলডের'-এর প্রতিবেশী কুকুরপ্রেমিক ছিলেন। তিনিও ভূতকে দেখে পছন্দ করলেন। তাকে শেখানো-পড়ানোর সময়ের কথাও জানালেন। তিনি বলেছিলেন নমাসের আগেই শিক্ষা শেষ করতে হবে। আমি শুনলাম—নমাসের পরে। সেজন্য ভূতনাথ নিজের শিক্ষার জন্য প্রকৃতির ওপরই নির্ভর করে থাকল। অ্যালসেশিয়ান কুকুর নানান রকমের কথা বলা শিখে যায়, ও সেটা লিখতে পারল না। আমি প্রথম কিছুদিন শুধু দুধ

খাইয়ে রেখেছিলাম। তারপর তার সঙ্গে রুটিও খাওয়াতে লাগলাম, তারপর রুটি-ডাল দিতে লাগলাম। তার কাশি দেখে এক বন্ধু বললেন যে কুকুরকে নুন খাওয়ানো ঠিক নয়। তখন আলুনি ডাল দেওয়া হতে লাগল। আলুনি ডাল আর রুটি এখনো ভূতের প্রধান খাদ্য। সপ্তাহে দুবার মাংস পেয়ে যায়। অন্যান্য অ্যালসেশিয়ান পালকরা বিস্মিত হয়—তারা তো রোজ দুবার করে মাংস দেয়।

বাঁদরের সমস্যা ভূত সমাধান করল না। কেন না বাঁদর এলে সে একটা দলের পিছনে ভউ ভউ করে ডাকার জন্য দূরে চলে যেত, ততক্ষণে অন্যদল এসে কাজ সেরে ফেলত। রাতের বেলা সে ঘরের বাইরে পাহারাদারি করতে পারত না, কেননা বাইরে রাতের মালিক হচ্ছে নেকড়ে। অ্যালসেশিয়ান, বিশেষ করে আমাদের ভূত, হচ্ছে নেকড়ের সমান। দুটো অ্যালসেশিয়ান একটা নেকড়েকে তাড়িয়ে দিতে পারে এই ভেবে এক সর্দার সাহেব নিজের জোড়া কুকুর বাংলোর বাইরে রেখে দিয়েছিল। নেকড়ে এলো। দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে একটাকে ভীষণভাবে আহত করল আর অন্যটাকে মুখে করে নিয়ে চম্পট দিল। নেকড়ে আসলে পঞ্চানন। তার চার পাঞ্জার নখও শক্তিশালী হাতিয়ার। দাঁতযুক্ত চোয়ালের কথা তো বলারই নয়। কুকুরের চোয়ালই সব, তাও বাঘ বা সিংহের মতো মজবুত নয়। অন্ধকার হওয়ার আগেই চিন্তা হতো যে ভূতকে ঘরের ভেতর ঢোকাতে হবে। সকালে ঘরের বাইরে এবং রাতে ঘরের ভেতরে ভূতকে এড়িয়ে কারও আসার সাহস হতো না। ভূত দু-একজন লোককেই কামড়ে ছিল, আর শুধু তাদেরই কামড়েছিল যারা পালাতে চেয়েছিল। একজন পালিয়ে গাছে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি। ভূত তার গরম পাজামা ছিঁড়ে দিয়েছিল। ২৫ টাকা দণ্ড দিতে হয়েছিল। ১৯৫৫ সালের শীতে এই এলাকায় খুব চুরি হচ্ছিল। একবার কমলা আর আমাদের চাকরটিই শুধু বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে ছিল। সে-সময় ভূত ছিল বলেই কোনো চোর এদিকে উঁকি দিতেও সাহস করেনি। এটা নিশ্চিত ছিল যে কোনো অপরিচিত লোক যদি রাতের বেলায় এদিকে পা বাড়াতে চাইত তাহলে ভূত তাকে না কামড়ে ছাড়ত না।

১ এপ্রিল থেকে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির বন্ধুরা হর্নহিলে চলে গেল। আলাদা করে রান্নার ব্যবস্থা করতে গেলে ঠাকুরের সমস্যা দেখা দেয়। সে-সময় মুসৌরীর অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না বলে লোকে এই এলাকায় খাবার হোটেল খোলার সাহস করেছিল। মাসিক ৩০ টাকায় খাবার পাওয়া গেল। ১১ এপ্রিল থেকে নাগার্জুন, হরিশ্চন্দ্র এবং মহেন্দ্রজী ওখানে খেতে শুরু করলেন।

কিষাণ সিংহের সঙ্গে আমার বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। আঘাত পেয়ে তিনি খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে হাঁটা-চলা করা কষ্টকর ছিল। তারপর তাঁর বাড়ি থেকে আমার বাড়ি ছিল চার মাইল, সেজন্য ইচ্ছে থাকলেও তিনি কদাচিৎই আসতে পারতেন। ৮ এপ্রিল ছিল রোববার। এখন সপ্তাহে একদিন বাজার বন্ধ রাখা হতো, সে-কারণে রোববার ছুটি থাকত। সেদিন তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে আমার নিমন্ত্রণে বাড়িতে এসেছিলেন। মাংস আর তিব্বতী চা-ও সঙ্গে করে এনেছিলেন। ভাপে সেদ্ধ মাংসের সমোসা (মোমো) হলো। আমরা সবাই সেটা খুব ভালবাসতাম। সেই সঙ্গে মাখন ঢেলে তিব্বতী চা-ও পান করলাম। সাড়ে চারটে পর্যন্ত তাঁর পরিবার এখানেই থাকল। কথাবার্তা আর হাসিখুশিতে সেই দিনটা কাটল। তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে, মুসৌরী থেকে যত ভুটিয়া এখন দিল্লী গেছে তাদের পেছনে পুলিস লেগেছে এবং

বলেছে, 'তোমরা পারমিট (অনুজ্ঞা-পত্র) নিয়ে নাও।' জোর করে তাদের ফটোর সঙ্গে পারমিটও দেওয়া হয়েছে। তার মানে যে কিষাণ সিংহ আর তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা এখন ভারতের নাগরিক নন, তাঁরা তিব্বত (চীন)-এর নাগরিক এবং ভারত সরকার তাঁদের কৃপা করে কিছুদিন থাকতে অনুমতি দিয়েছে। এর ফলে তাঁদের উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আমি এ ব্যাপারে ড. কেসকরকে চিঠি লিখলাম। সে-সময় তিনি বিদেশ-বিভাগের উপমন্ত্রী ছিলেন। আমি লিখলাম, 'যদি তিব্বতী চেহারা-টেহারা দেখে আপনি তাদের ভারতীয় নাগরিক বলে মানতে রাজি না হন তাহলে আসাম থেকে লাদাখ পর্যন্ত লাখখানেকের বেশি এমন লোক রয়েছে, যাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব খারিজ করে দিতে হবে। মুসৌরীর এই মানুষগুলি তিন-চার প্রজন্ম ধরে এখানকার বাসিন্দা। এদের মা-বাবা হয়তো কখনো তিব্বত থেকে এসেছিলেন। কিন্তু এদের জন্ম-কর্ম মুসৌরীতেই। কিষাণ সিংহের মতো লোকের তো তিব্বতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই। তিনি কনৌরের বাসিন্দা।' এই চিঠিতে ফল হয়েছিল এবং পরে এখানকার বাসিন্দাদের অসুবিধে দূর হয়েছিল।

১৩ এপ্রিল আগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বোঝা গেল যে, মটর বাদ দিয়ে সমস্ত শাক-সবজির ক্ষেত্রে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আগে সময়মতো বোনা রাই, টমেটো এবং আরও দু-একটা শাক ভাল মতো হয়েছে।

কলকাতায় যাওয়ার পর একবার সাহিত্যাচার্য পণ্ডিত ভগবানদত্ত শাস্ত্রী রাকেশ 'কামায়নী'-র নিজস্ব সংস্কৃত পদ্যানুবাদের তিনটি মুদ্রিত পরিচ্ছেদের একটি কপি দিয়েছিলেন। সেটি পড়ে আমার তৎক্ষণাৎ এই লাভ হয়েছিল যে, আমি কবি প্রসাদ[১]কে খুব বড় কবি বলেও স্বীকার করেছিলাম। তাঁকে আধুনিক হিন্দি সাহিত্যেরই সবচেয়ে বড় কবি নয় বরং আমাদের দেশের মহান কবিদের সারিতে সম্মানের সঙ্গে বসার যোগ্য বলেও মনে করেছিলাম। আমি রাকেশজীকে লিখলাম যে, 'কামায়নী' সম্পূর্ণ অনুবাদ করে ফেলুন। তিনি একত্রিশটি পরিচ্ছেদ অনুবাদ করে করে আমার কাছে পাঠাতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে পুরোটা অনুবাদ হয়ে গেল। এত ভাল অনুবাদ যে মূল থেকে কোনো অংশে তা কম সুন্দর ছিল না। আমি ভাবলাম, যদি এই বইটি ছেপে বেরোয় তাহলে ভারতের অন্যান্য ভাষার বিদ্বানরা বুঝতে পারবেন আধুনিক হিন্দিতে কত উচ্চমানের কবিতা লেখা হচ্ছে। অসমিয়া, বাংলা, উড়িয়া, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কন্নড়, মারাঠী, গুজরাটী সমস্ত ভাষার উঁচুদরের সাহিত্যিক ও সমালোচকরা সংস্কৃত জানেন। এটা দেখে তাঁরা আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের মূল্যায়ন করবেন। এ রকম গ্রন্থ ছাপানোর ব্যাপারে আমাদের সংস্থা এগিয়ে আসবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তাঁরা স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু মাত্র তার এক-আধ পৃষ্ঠা 'রাষ্ট্রভারতী'-তে ছাপা হয়ে পড়ে থাকল। আনন্দজী ঢিলেমি করলেন, না হলে তা প্রকাশিত হয়ে যেত। সাহিত্য-সম্মেলন চেয়ে পাঠাল, কিন্তু ততোদিনে সে-ব্যাপারটা রিসিভারের হাতে চলে গিয়েছিল বলে ওখানেও কিছু হলো না। রাকেশজীর চাইতেও আমার বেশি অস্থিরতা ছিল যে এই বইটি ভালভাবে প্রকাশিত হয়ে পণ্ডিতজনের কাছে যাক। কখনো কখনো রাকেশজী তাঁর পুরোহিতগিরির পয়সা দিয়ে

[১] লেখক এখানে কবি জয়শঙ্কর প্রসাদের কথা বলতে চেয়েছেন।—স.ম.।

ছেপে ফেলতে চেয়েছেন কিন্তু আমি বলেছি বই-এর ছাপাটাপা ভাল হতে হবে। প্রচ্ছদেরও গুরুত্ব রয়েছে। প্রচ্ছদ করতে বেশি টাকা লাগবে। জানি না সংস্কৃত 'কামায়নী' কখন প্রকাশিত হবে।

বড় সাধ করে তিব্বত থেকে কপি করে আনা 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য' ১৫-১৬ বছর ধরে বহু দরজায় ঘুরিয়ে নিরাশ হয়ে ফেলে রেখেছিলাম। ভয় হচ্ছিল পোকায় না কেটে ফেলে। বিহার রিসার্চ সোসাইটি সামান্য আগ্রহ প্রকাশ করা মাত্র ১৫ এপ্রিল আমি সেটা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু সেখানেও তার উদ্ধারকার্য সম্পন্ন হলো না। সে-পুণ্য পাওনা ছিল জয়সওয়াল ইনস্টিটিউটের—তার অধিকর্তা ড· অল্তেকর সেটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিলেন।

চার্লউইসের ফটকের কাছে একটি প্রাইমারি স্কুল আছে, যার দ্বিতীয় শিক্ষকের অবস্থা দেখলে মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর পুরো বারোজনের পরিবার অথচ মহার্ঘভাতা নিয়ে বেতন হচ্ছে মাসিক ৬০-৬৫ টাকা। আজকালকার যুগে তিনি কিভাবে সংসার চালান তা ভাবতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়। মাস্টারজী সেন্যবাহিনীতেও চাকরি করেছিলেন। ভেবেছিলেন ফিরে এলে তাঁর পদোন্নতি হবে কিন্তু এসেও দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবেই থাকলেন। তিনি আমাদের আউট-হাউসে থাকার জন্য জায়গা চাইলেন। কাচ্চা-বাচ্চার সঙ্গে থাকা অবশ্যই চিন্তার ব্যাপার কিন্তু তাঁর অবস্থার কথা ভাবলাম। আমি জায়গা দিয়ে দিলাম। পরে হর্নহিল নিয়ে নেওয়ার পর এখানের চেয়ে ওখানে আরো ভাল জায়গা ছিল বলে ওখানে ব্যবস্থা করে দিলাম।

আমি মুসৌরী এবং তার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বাসিন্দাদের শব্দচিত্র কাহিনীর আকারে লিখে 'মধুপুরী' নাম দিয়ে ছাপতে চেয়েছিলাম। ইতিমধ্যে এই নাম দিয়ে কারু কবিতার বই বেরিয়ে গেল তাই সেই একুশটি গল্প 'বহুরঙ্গী মধুপুরী' নামে প্রকাশিত হলো। সেগুলিতে কল্পনা কম এবং বাস্তবতা বেশি রয়েছে। পড়ে কেউ যদি মনে করেন যে তা হচ্ছে কোনো একটি লোকের জীবন-চরিত তাহলে সম্পূর্ণ ভুল করবেন। অনেক মানুষের জীবন ও সমস্যা নিয়ে এক-একটি গল্প তৈরি করা হয়েছে। কেউ যাতে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনার সাদৃশ্য উল্লেখ করার সুযোগ না পায় তার জন্য ব্যক্তির ও স্থানের কল্পিত নাম দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের সাহিত্য-কর্মীদের সমস্যার সমাধান দেখতে পাচ্ছিলাম না। সবাই নয়, তবে কিছু লোক কাজ করায় কম সময় দিচ্ছিল আর কয়েকজন তো সেটুকুও কথাবার্তা বলে কাটিয়ে দিতে চাইছিল। এদিকে কিছু বই-এর অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ৩০-৩৫ হাজার শব্দের রাষ্ট্রভাষা-কোষ তৈরি করা হলো। আশা ছিল এই শব্দগুলিকেই প্রাদেশিক ভাষা এবং তিন-চারটি বিদেশি ভাষায় পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি কোষের আকারে ছেপে দেওয়া যাবে। ওয়ার্ধাতেও ছাপার ব্যাপারে সেই ঢিলেমি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, পরিভাষা কোষের ব্যাপারে সম্মেলনে যে রকম হয়েছিল। এই অসুবিধে দূর করার জন্য ২৩ এপ্রিল নাগার্জুনজী ওয়ার্ধা রওনা হয়ে গেলেন।

কমলা বিশারদ পরীক্ষায় অনেক নম্বর পেয়েছিল। ইংরেজিতে ৭৭-এর মধ্যে ৬৬। পালির পরীক্ষক ছিলেন নতুন, তিনি ভেবেছিলেন যে, সাহিত্য-সম্মেলনের পরীক্ষাদেওয়াছাত্রীরও শুদ্ধ সংস্কৃত বা পালির বিদ্যার্থীদের মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। তিনি কয়েক নম্বরের জন্য কমলাকে ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন। ভয় হতে শুরু করেছিল যে হয়তো ওর একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। অল্প কয়েক নম্বরের জন্য ফেল করা উচিত নয়, যখন সে অন্য বিষয়গুলোতে

অনেক বেশি নম্বর পেয়েছে। পাস করে গেল। সামনের পথ খুলে গেল। এতে আমার খুব আনন্দ হলো।

২৪ এপ্রিল কুমঠেকরজী এলেন। ড· সত্যকেতুর কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছিলাম। তাঁর জীবনে এমন কোনো সময় আসে নি যা তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য জেলে না গিয়ে কাটিয়েছেন। জেলের মধ্যেও তাঁর অখণ্ড সত্যাগ্রহ ছিল। তিনি জেলের লোকদের সঙ্গে থাকতেন যার জন্য তাঁকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো। ড· সত্যকেতু নৈনিতালের কথা বলছিলেন। কি একটা ব্যাপারে কোনো লোক তাঁকে মারতে শুরু করে এবং তিনি প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মতো তাকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল মারাঠী। হিন্দিতেও যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি জন্মেছিলেন কর্নাটকে সেজন্য কন্নড়ও তাঁর কাছে মাতৃভাষা ছিল। আমরা কন্নড় আর মারাঠী থেকে কয়েকটি সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস হিন্দিতে অনুবাদ করাতে চাইছিলাম। এই কাজের জন্য তিনি ছিলেন উপযুক্ত লোক। তিনি অত্যন্ত সুন্দর একটি কন্নড় উপন্যাসের অনুবাদও করেছিলেন। কাজে দেরি হওয়ার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা যায় না।

কেদার-বদ্রীতে

'গঢ়ওয়াল' নিয়ে আমি অনেক কিছু লিখেছি। হিমালয় পরিচয় সম্বন্ধীয় প্রতিটি গ্রন্থে নিজের যাত্রারও একটি অধ্যায় দিতে চেয়েছিলাম। এর ফলে গ্রন্থের চিত্তাকর্ষকতা যেমন বেড়ে যায় তেমনি নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে সুবিধে হয়। জানতে পারলাম যাত্রায় আগতদের কলেরা ইত্যাদির ইঞ্জেকশন নিয়ে প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখাটা জরুরি। পুরসভার ডা· মাথুর ইঞ্জেকশন দিয়ে প্রমাণপত্রও দিয়েছিলেন। ২ মে আমি একলা এই যাত্রার জন্য এখান থেকে রওনা হলাম। এখান থেকে বা দেরাদুন থেকে মালপত্র বওয়ার জন্য আর রান্নার জন্য লোক নিয়ে নিলে ভাল হতো। কিন্তু ভাবলাম ওদিকে লোক পেতে অসুবিধে হবে না। সেদিন এগারোটার সময় শুক্লজীর বাড়ি পৌঁছলাম। রিভলবারের লাইসেন্সও পেয়ে গিয়েছিলাম তাই এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে ছোটমতো একটা রিভলবার কিনলাম। বন্দুকের মতো এ ব্যাপারেও আমি তাড়াহুড়ো করলাম। যে রাইফেলের জন্য সওয়া দুশো টাকা দিয়েছিলাম তা দুশোরও কমে পেয়ে যেতাম। যে রিভলবার আমি ১২৫ টাকায় কিনেছিলাম, তা দেরাদুনের দোকানে ৯০ টাকা ৭ আনায় পাওয়া যাচ্ছিল। যাক্‌গে, এতো সবসময়ের বালাই, কিন্তু আমার ফিলসফি বলে যে, যে-টাকা খরচ হয়ে গেছে তার কোনো মূল্য নেই আর যে জিনিস কিনে নিয়েছি তার দাম পরের দিন অর্ধেক হয়ে যায়।

হৃষিকেশ—৩ মে হৃষিকেশের বাস ধরলাম। মে মাসের দিন। দুন যথেষ্ট গরম জায়গা। ডোইবালা হয়ে একটার সময় হৃষিকেশ পৌঁছলাম। পাঞ্জাব-সিন্ধু ক্ষেত্র আর কালীকমলীর ক্ষেত্র

দুটিরই নাম আমি ১৯১০ থেকেই জানতাম। সেই সময়ের হৃষিকেশ জঙ্গলের মধ্যে দশ-বিশটি সাধারণ ঘর নিয়ে একটি গ্রাম ছিল আর এখন তা ছোটখাটো বেশ ভাল একটা শহর হয়ে গেছে। সেখানে বাজার আছে। বড় বড় বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিদ্যুৎও এসে গেছে।

আমি পাঞ্জাব-সিন্ধ ক্ষেত্রে গেলাম। এখানকার বাড়িগুলো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল যেখানে যাত্রী ছাড়া গরুদেরও থাকার জায়গা ছিল। দুধ পাবার জন্য তো কয়েকটা। বাড়িকে গোয়ালঘর বানাতেই হয়। অফিসে নাম-ধাম লিখে একটা ঘরে থাকার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দ্বিতীয় বার আমাকে চেনেন এমন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে অফিসে দেখা হয়ে গেল। তাঁর কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে শুনে সেখানে আমার কদর বেড়ে গেল এবং একটা ভাল ঘরে মালপত্র রেখে দেওয়া হলো। হৃষিকেশ মশার দেশ। ঘরের মধ্যে খুব গরম ছিল তাই ছাতে শুলাম। বাঁদররা আর কিছু না পেলে জুতো অথবা অন্য যা কিছু পাবে তাই নিয়ে পালাবে, সেজন্য জুতো শতরঞ্চির তলায় লুকোতে হলো।

কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াব পর সেদিন ঘুরতে বেরোলাম। ডেরা ইসমাইল খাঁ-এর এক ভক্তর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি ভক্তরাজ জয়দয়াল গোয়েঙ্কার গীতাভবনের মহিমা শোনালেন কিন্তু সেটা ছিল দূরে এবং গঙ্গার তীরে সেজন্য অতদূর যেতে পারলাম না। রাজাদের যখন প্রতাপ ছিল তখন রাজসিংহাসনেই নিজেকে সীমিত না রেখে তাঁরা রাজর্ষিও সাজতেন। এখন শেঠদের প্রতাপ তাই তারা যদি শেঠর্ষি সাজে তো অবাক হওয়ার কি আছে?

যেখানে প্রাইভেট বাস চলে সেখানে যাত্রীদের অসুবিধের কথা ভাবা হয় না এবং যত বেশি পারা যায় যাত্রী ঠেসে তোলার চেষ্টা করা হয়। কেদাব-বদ্রীর যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গার লোকেরা ওপরের দিকে যাচ্ছিল। সন্ধেবেলায় আমি উচ্চশ্রেণীর টিকিটের জন্য নাম লেখালাম কিন্তু পরের দিন চড়ার সময় নিম্নের শ্রেণীর টিকিট পাওয়া গেল। যতক্ষণ জায়গা পাওয়া যায় ততক্ষণ সে সম্পর্কে অভিযোগ করলে পাপ হয়। একজন মাদ্রাজী বুড়ি আমার চেয়েও খারাপ অবস্থায় বসেছিল। আমি আমার জায়গা তাকে দিয়ে দিলাম আর তার জায়গায় আমি বসে পড়লাম। কেদার-বদ্রীর শীতের কথা মনে ছিল, সেজন্য ঢাকা নেওয়ার চাদর, বিছানা বেশি করে নিয়েছিলাম। যদিও তা অনাবশ্যক বোঝা হয়ে পড়েছিল কেননা একটা কম্বলে কাটে না এমন শীত দুটি ধামেই থাকে এবং সেখানে পাণ্ডাদের কৃপায় যত ইচ্ছে ঢাকা নেওয়ার জিনিস ও বিছানা পাওয়া যায়।

যাত্রীদের মধ্যে বাঙালী পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা বেশি ছিল। আমাদের বাস মাঝে অনেক জায়গায় একটু একটু করে দাঁড়িয়ে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর এই পারে গিয়ে থামল। এখানে কিছু লোক নেমে যাওয়ায় নিজের শ্রেণীতে জায়গা পেয়ে গেলাম। আরও দেড় ঘণ্টা চলার পর কীর্তিনগর পৌছলাম। রোদ আর গরমের কথা কি বলব? এখান থেকে অলকনন্দার পুল পার হয়ে প্রায় তিন মাইল হেঁটে শ্রীনগরে দ্বিতীয় বাস পাওয়ার ছিল। অনেক হরিজন-কন্যা মালপত্র বওয়ার জন্য এলো। আমি দুজনকে আমার মালপত্র দিলাম। নদী পার হতেই মুখ শুকিয়ে যেতে লাগল। তেষ্টার চোটে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। অনেক দূর যাওয়ার পর জল খেতে পেলাম। 'গঢ়ওয়াল' লিখে ফেলেছিলাম তাই অনেক ব্যাপার জানা ছিল, যার মধ্যে এটিও একটি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের মহাপ্রলয় থেকে শুধু কমলেশ্বর রক্ষা পেয়েছে, বাকি সব পুরনো

মন্দির আর ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিহ্ন গেছে। এই ভেবে রাস্তা থেকে সরে কমলেশ্বরে গেলাম। এখানে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সূর্যের মূর্তি পাওয়া গেছে।

শ্রীনগরে ঢোকার আগে রাস্তা ঘিরে স্বাস্থ্যবিভাগের লোকজন দাঁড়িয়েছিল। কলেরার টিকে আমি মুসৌরীতে নিয়েছিলাম কিন্তু এখন বাক্স খুঁজে প্রমাণপত্র পা' য়া গেল না। দ্বিতীয়বার ইঞ্জেকশন এবং নতুন প্রমাণপত্র নিতে বাধ্য হলাম।

শ্রীনগর বাজারে পৌঁছলাম। বলা বাহুল্য, এটা ছিল মহাপ্রলয়ের পরে গড়ে ওঠা নতুন বাজার। মজদুররা শ্রীখড়গ সিংহের হোটেলে পৌঁছে দিল। রাতটুকুর জন্য আমি ওখানেই থেকে গেলাম।

পরের দিন (৫ মে) পৌনে দুটোয় বাস ছিল। সেজন্য এই সময়ে এখানকার দর্শনীয় জিনিসগুলো দেখে নেওয়ার ছিল। প্রাচীন কোনো জিনিস তো ছিল না। রাস্তার ধারে দুদিকে অনেক দূর পর্যন্ত বাজার চলে গিয়েছিল। শ্রীমুকুন্দীলালজীর কাছ থেকে জানলাম যে, শিল্পী ভোলারাম (১৭৪০-১৮৩৩)-এর বংশধর এখানে থাকেন। ভোলারামের পুত্র জ্বালারামও শিল্পী ছিলেন কিন্তু তাঁর পুত্র তেজরাম চিত্রকর হন নি। তেজরামেব পুত্র আত্মারাম চিত্রকর ছিলেন যিনি পরে পাগল হয়ে গেছেন। তাঁর এই পাগল হওয়ার ফলে মহান শিল্পীর কিছু কীর্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। ভোলাবামের প্রপৌত্র আর তেজরামের পুত্র বালকরাম এখনো জীবিত ছিলেন। তিনি সংবত ১৯২৪ (১৮৯৭ খ্রি·)-এর কার্তিক মাসে জন্মেছিলেন। এখন বয়স ছিল ৮৪ বছর। নিজের বড় ছেলে বৈজনাথকে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর আর্ট স্কুলে শ্রীঅসিত কুমার হালদারের কাছে চিত্রকলা শেখার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সে চার-পাঁচ বছর ওখানে থেকেছে কিন্তু শিল্পীর ঘরে জন্মালেই কেউ শিল্পী হয় না। মেরে-পিটে বৈদ্যরাজ বানানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। বালকরামের বৈজনাথ, রামনাথ, নারায়ণপ্রসাদ তিন পুত্র ছিল। আত্মারামের পুত্র ফতেরাম (জন্ম সংবত ১৯২৯, ১৮৭১ খ্রি·) জীবিত ছিলেন। ফতেরামের পুত্র মদনমোহন আর তাঁর পুত্র ছিলেন ব্রজমোহন লাল ও মনমোহন লাল। অল্প কিছু চিত্র এখনো ঘরে অবশিষ্ট ছিল, সেগুলো তাঁরা দেখালেন।

বাস ধরার আগে এখান থেকেই পুরো যাত্রার জন্য একটি লোক নিয়ে নিতে হতো। খড়গ সিংহ রোজ দেড় টাকা আর খাওয়া এই সর্তে বলবাহাদুর নামে এক নেপালী তরুণকে ঠিক করে দিল। তার রোগা-পাতলা শরীর দেখে ভয় হলো যে সে এক মণ মাল নিয়ে যেতে পারবে তো! দেখা গেল তার হাড়গুলো লোহার। শৈশব থেকেই পরিশ্রম করে বোঝা বয়ে-বয়ে মানুষের শরীর কি না হতে পাবে?

পাঁচটার সময় রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছলাম। ছাতা ছিল না। রোদ আর বৃষ্টি দুই-এর জন্যই তা দরকার ছিল। রাস্তায় থামার জায়গাগুলোতে কখনো কখনো মোমবাতিরও দরকার পড়ত, সেজন্য প্যারেলালের দোকান থেকে দুটি জিনিসই কিনে নিলাম। অলকনন্দা পেরিয়েও দোকান রয়েছে। ওখান থেকে বাস রাস্তা ওপরের দিকে যাচ্ছে। তীরেও অনেক বাড়ি, ধর্মশালা আর দোকান আছে। প্রজ্ঞাচক্ষু স্বামী সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম তাই তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। বলা বাহুল্য, দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল বলতে ছিল থাকার জন্য জায়গা পাওয়া। স্বামী সচ্চিদানন্দ এখানে ছেলেদের জন্য হাইস্কুল আর মেয়েদের জন্যেও স্কুল বানিয়ে ছিলেন।

সেজন্য তাঁর জীবন ছিল সর্বজনীন উপযোগিতার জীবন। এটা দেখার পর আমার প্রতি তাঁর ব্যবহারের রুক্ষতায় আমার কোনো খেদ ছিল না। রাতটুকু থেকে সকালে ওখান থেকে চলে যাওয়ার ছিল। যদি কোমল হতেন তাহলে তাঁর অতীতের কথা শুনতাম এবং তা লিখে ফেলতাম।

৬ মে (রোববার) সকালে উঠে চললাম। কোনো বাহকের পিঠে ছিলাম না বলে ওঠা-বসায় স্বাধীন ছিলাম। রাস্তায় এক জায়গায় কলা আর পেঁপে পাওয়া যাচ্ছিল। একটা মন বলল, নিয়ে নাও। অন্য মন বলল, এতো জায়গায় জায়গায় পাওয়া যাবে, এত সকালে নেওয়ার দরকার কি? দ্বিতীয় মনের কথা দেখা গেল ভুল। এখানে লোকের ফলের গাছ লাগানোর শখ নেই আর সম্ভবত তা নেবার লোকও বেশি নেই। সাতটার সময় ছমাইলেরও বেশি হেঁটে রামপুর চটি পৌঁছলাম। তার আগে তিলওয়াড়ায় ক্ষেতের মধ্যে নবম ও দশম শতাব্দীর দুটো ছোট ছোট মন্দির দেখলাম। মুখ্য মন্দির বিলিন হয়ে গেছে। এগুলি তার পার্শ্বচর ছিল। কোনো মূর্তি ছিল না। রামপুরেও একটি নতুন ছোটমতো মন্দিরে ময়ূরের পিঠে চড়া কার্তিকের মূর্তি এবং কত্যুরী যুগের অন্য একটি দ্বিভূজ মূর্তিও ছিল। বৃদ্ধরা পাঠানদের আক্রমণ এবং মন্দির-মূর্তির ধ্বংস হওয়ার কথা এখনো বলে। দলতংগের একটি মন্দির আর কিছু মূর্তির কথাও বলা হলো। এটি ভাঙার ব্যাপারে পাঠানরা সফল হয়নি কেননা শিবজী তার ওপর ভোমরা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আজ ১১ মাইল হেঁটে অগস্ত্য মুনিতে রাতে থাকার ছিল কিন্তু বলবাহাদুর ওখান থেকে এগিয়ে চলে গিয়েছিল। মন্দিরে অষ্টধাতুর দ্বিভূজ-মূর্তি ছিল। সন্দেহ হয়, বোধহয় এটা সূর্যের মূর্তি, যার ওপর পরে ধাতুর স্থূল একটি মুখ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে বাগানওলা ছোট মন্দিরের ডান দিকের গবাক্ষে হরগৌরীর একটি সুন্দর মূর্তি দেয়ালে আটকানো ছিল। এখানে মন্দাকিনীর কিনারায় বেশ বড় মাঠ আছে। সেটা খালি পড়ে থাকা আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হচ্ছিল কিন্তু দেবতার ক্রোধভাজন কে হতে চাইবে? দু-মাইল পর নদীর অপর পারে ছিল সিল্লা গ্রাম। সেখানে আমি যেতে পারি নি, লোকের কাছে শুনলাম ওখানে দুটো বড় আর কয়েকটা ছোট ছোট প্রাচীন (কত্যুরী যুগের) মন্দির আছে। পঙ্গপালের প্রকোপ এবার পাহাড়েও পড়েছিল। এখানে তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি বলে মণ-মণ ঘি আর শস্য আগুনে ঢালা হচ্ছিল।

রাতে একটা ছোটমতো চটি সৌড়ীতে থেকে গেলাম। ৪১ বছর আগে আমি এদিকে যাত্রা করেছিলাম। সেই সময়ের স্মৃতি খুব ধোঁয়াটে ছিল তবু এটা তো বুঝতে পারছিলাম যে, তখনের চেয়ে চটির সংখ্যা এখন অনেক বেড়ে গেছে। প্রতিটি চটিতে ঘরের সংখ্যাও বেশি হয়েছে। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা রাস্তার ধারে যেখানেই তাদের নাগালে অনুকূল জায়গা পেয়েছে সেখানেই একতলা বা দোতলা বাড়ি তুলে দিয়েছে। আটা-চাল-ঘি কিছুটা নিজের ঘর থেকে আর কিছুটা বাইরে থেকে এনে দোকান দিয়ে বসেছে। এ-কারণে যাত্রীদের খুব সুবিধে হয়েছে। যদি কেউ সঙ্গে একটি কম্বল আর ঝোলায় সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তার খাওয়া-পরা, শোয়া-বসার কোনো কষ্ট হবে না। কেবল সঙ্গে শুধু টাকা থাকতে হবে। কিন্তু মানুষ জেনে বা না জেনে নিজেই নিজের অসুবিধে তৈরি করে নেয়। আমার এত মালপত্র নিয়ে চলার দরকার ছিল না। অন্য কোনো যাত্রীকে সঙ্গী করে নিলে রান্না করারও সমস্যা হতো না। আজ পশ্চিম-পাঞ্জাবের দুজন স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। স্ত্রীর মাথায় দশ সের ঘি ভরা টিনের ভার

ছিল, পুরুষটি নিজেও যথেষ্ট মালপত্র বইছিলেন আর বলছিলেন, 'কি জানি ওখানে বিশুদ্ধ ঘি পাওয়া যাবে কি না, তাই সঙ্গে করে এনেছি।' সকালের যাত্রার জন্য তাঁরা সন্ধেতে শাক-পরোটাও বানিয়ে নিতেন। তাঁদের যাত্রা বলা যায় ঘরে থাকার মতোই চলছিল। কিন্তু ঘি-এর ব্যাপারে এত মনোযোগ দেওয়া আর বেচারা রোগা-পাতলা বৌ-এর ওপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কেমন ধারার আক্কেল? তাও আবার আজকের দিনে ঘি-এর ওপর তখনই আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন যখন সেটা আপনার ঘরের গরু-মোষের ঘি হবে।

৭ মে ভোর পাঁচটায় বেরোলাম। ভিরীতে আজ থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু কুণ্ড থেকে চড়াই-এর কথা শুনে ভাবলাম, ওখানে আজই পৌঁছে যেতে হবে যাতে সকালেই গুপ্তকাশীর চড়াই-এ উঠতে পারি। ভিরী মন্দাকিনীর বাঁ দিকে। এখানে ভীমসেনের মূর্তি একেবারে নতুন আর স্থূল, কিন্তু পাশে দেড় ফুট উঁচু কত্যুরী যুগের বিষ্ণুমূর্তিও আছে। কেদারখণ্ড খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই নিজের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এজন্য এখানে জায়গায়-জায়গায় প্রাচীন অবশেষ পাওয়া যায়। লোহার ঝুলন্ত পুল পার হয়ে রাস্তা মন্দাকিনীর ডান তট ধরে চলছিল। কুণ্ড চটি এলো ২১ মাইল পরে। আজকাল এখানে কোনো কুণ্ড দেখা যায় না। হতে পারে কোনো সময়ে কুণ্ড ছিল, মন্দাকিনী তাকে টেনে নিয়ে গেছে। সাড়ে নটার সময়ই চটি পৌঁছে গেলাম। বলবাহাদুর খাবার বানাল। আমি স্নান করলাম। দু-দিনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিয়েছিল যে সকালে তাড়াতাড়ি বেরোও, চার-পাঁচ ঘণ্টার দূরত্ব পেরিয়ে নটা-দশটার সময় কোনো চটিতে থেমে দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম করো। রোদের তেজ কমে এলে তিনটে-চারটে নাগাদ আবার দু-তিন ঘণ্টা সামনের দিকে এগিয়ে চলো। কুণ্ডতে প্রচুর মাছি ছিল। প্রায় প্রতিটি চটিতেই মাছি ঘিনঘিন করছিল। সত্যিই, চাটাই আর বিছানাকে ওরা মাছির চাদর বানিয়ে ফেলতো।

সওয়া তিনটের সময় সামনে এগোলাম। আবার দেড় মাইলের চড়াই শুরু হলো। এখানে প্রত্যেক জায়গার চড়াইতে ঘোড়া পাওয়া যায়। চড়াই শেষ হওয়ার পর ওপর থেকে মন্দাকিনীর পারে উখী মঠের বসতি চোখে পড়ছিল।

গুপ্তকাশী—এই নামটি পরে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের নকল কাশী আর প্রয়াগ গত এক-দেড়শো বছরে এখানে অনেক তৈরি হয়েছে। আসলে এর ফলে কিছু পুজো-অর্ঘ্য তো পড়েই, সেজন্য ফাঁদ পাততে লোকে কেন পিছোবে?

অনেক পাণ্ডাও আমাদের পিছনে লাগল। তাদের দোষ দেওয়া ঠিক নয়। আধুনিক পৃথিবীতে সব জায়গাতেই গাইডের প্রয়োজন হয়। এরাও সেরকমই। তাদেরকে দেওয়া টাকা গাইডের পারিশ্রমিক বলে মনে করতে হবে। বাজার বলতে ছিল রাস্তার দু-ধারে তিরিশটি দোকান। দোকানের ওপরের তলা যাত্রীদের থাকার কাজে লাগত। এখানে লণ্ঠন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছিল। এর থেকে বোঝা যাচ্ছিল এই সব দোকানে স্থানীয় লোকরাও কেনাকাটা করে। প্রধান মন্দিরে গেলাম। জলের নালা দিয়ে দুটি ধারা কুণ্ডে গিয়ে পড়ছে। প্রধান মন্দিরের সঙ্গে একটি ছোট মন্দিরও ছিল। পাশের বারান্দায় 'পাণ্ডবদের' মূর্তি ছিল এবং তার মধ্যে একটি সুন্দর মূর্তির খণ্ডিত অংশও ছিল। প্রধান মন্দিরের পাশে বানানো হয়েছিল বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি 'গঙ্গা-যমুনা'। শিবের মূর্তি হচ্ছে চতুর্ভুজ অর্থাৎ প্রাচীন পাশুপতের মূর্তি।

পাণ্ডারা জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম যে তাকেই আমি পাণ্ডা হিসেবে নিতে পারি যে

সবচেয়ে বৃদ্ধ এবং যে সবচেয়ে বেশি খবর জানে। ৭৮ বছরের পাণ্ডা কাশীনাথজী (কেদার-পুত্র)-র মধ্যে এই গুণের পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি লুওয়ানী গ্রামের বাসিন্দা। তাঁকেই আমি আমার পাণ্ডা নিলাম। তাঁর স্মৃতি দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। আজমগড় জেলার কত গ্রামের নাম তিনি বলে যাচ্ছিলেন, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু যখন কনৌরের বারোটারও বেশি গ্রামের নাম তিনি জানালেন তখন চিন্তা করতে লাগলাম যে, এই বয়স স্মৃতিশক্তির ওপর কেন প্রভাব ফেলেনি। তিনি জানালেন, পাঠানরা এখান থেকে এগিয়ে মস্তা পর্যন্ত গিয়েছিল। সেখানে শংকর ভগবান তাদের ওপর পাথর ফেলতে শুরু করেছিলেন এবং তারা ফিরে এসেছিল। গুপ্তকাশীতে আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়, তিরিশটি দোকান এবং প্রায় কুড়িটি অন্যান্য ঘর ছিল। এখানকার মন্দির ছিল কেদারনাথ মন্দিরের অধীন। কেদার-বদ্রীর সম্মিলিত ব্যবস্থাপক সমিতি এটি দেখাশোনা করত।

গুপ্তকাশীতে আরও কিছু ফটো তোলার ছিল সেজন্য দ্বিতীয় দিন সাড়ে দশটা পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হলো। কেদারনাথ পাণ্ডে ব্রাহ্মণ, কিন্তু ক্ষত্রিয় (খশ) কন্যা বিবাহ করার কারণে কেউ তাঁর ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে তা লিখে দিয়েছিল। মামলা হলো, তাতে লেখকের জরিমানা হলো। বাদী আর প্রতিবাদী দুজনের চিন্তার মধ্যেই সত্য ছিল। কেদারনাথ পাণ্ডে ব্রাহ্মণ যদি না হতেন তাহলে সারা ভারতের লোক কি ভাঙ খেয়েছে যারা তাঁর চরণ বন্দনা করে? প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ মেয়েকে বিয়ে করতেন এবং তাঁর সন্তানদের শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলা হতো। এই নিয়ম এখানে এখনো পর্যন্ত মেনে চলা হচ্ছে, যখন ভারতের অন্য অংশে তা অনেক আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। বলা যায় কেদারনাথের পাণ্ডা এখনও পর্যন্ত প্রাচীন ধর্মই মানত।

সাড়ে দশটার সময় আমরা ওখান থেকে বেরোলাম। বেশিরভাগটা সাধারণ উতরাই দিয়ে নেমে এক মাইল পর নালা চটিতে পৌঁছলাম। এখানেও প্রাচীন মন্দির রয়েছে যা পাঠানদের বংশধররা ধ্বস্ত করে দিয়েছিল। পাণ্ডা ছিল কুমাই জোশী। পিছনের দিকে বাম কোণে ছোট মন্দিরের দরজাতে কত্যুরী লিপিতে ছোটমতো একটা লেখা ছিল। সেই সময়েরই লক্ষ্মী-নারায়ণ আর হরগৌরীর অন্য মূর্তিও মন্দিরে ছিল। দরজায় সেই ব্যক্তির মূর্তি ছিল যার টাকায় মন্দির তৈরি হয়েছিল।

সামনে মস্তা পড়লো। গুপ্তকাশীতেই আমি শুনেছিলাম যে এখানে পাঠানদের ওপর পাথর পড়েছিল এবং তারা প্রাণ নিয়ে নীচের দিকে পালিয়ে ছিল। কিন্তু মস্তার গৌড় ব্রাহ্মণ নারায়ণ দত্ত জানালেন যে, মুসলমানরা (পাঠান) লুটপাট করতে করতে কেদারনাথ পর্যন্ত গিয়েছিল। কেদারনাথের ভাঙা-ফুটো মূর্তিও তার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। মস্তা থেকে এগিয়ে ভেত পৌঁছলাম। এখানে সাহিত্যরুচি-সম্পন্ন মানুষ পণ্ডিত বিশালমণির নিবাস। তিনিই পাণ্ডাদের সম্বন্ধে কিছু লিখে দিয়েছিলেন যা নিয়ে মামলা চলেছিল। জানা যায়, ভেত কোনো এক সময়ে মন্দাকিনী উপত্যকার খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। সম্ভবত এখানেই উপত্যকার রাজা থাকতেন। এখানে অনেকগুলো পুরনো মন্দির ছিল। অনেক ভাঙাচোরা মূর্তিও পড়েছিল। বিশালমণিজী কালীমঠের মহিমা শোনালেন। ফেরার সময় এসে সব জায়গা দেখব বলে আমি এগিয়ে গেলাম।

তিন মাইল চলার পর মৈখণ্ডা এলো। মৈখণ্ডা (মহিষখণ্ড) হচ্ছে এই এলাকার পুরনো নাম, কিন্তু গ্রামের কোনো বিশেষত্ব নেই। এখনও এই জায়গার নাম মৈখণ্ডা। রাস্তায় একটা ছোটমতো

মন্দিরে ভাঙা মূর্তি ডাঁই করে রাখা ছিল। অনেক ছোটখাটো হালকা মূর্তি লোকে নিশ্চয় তুলে নিয়ে গেছে। ডাঁই-এর মধ্যে হর আর গৌরীর ভাঙা ও সুন্দর মূর্তি আলাদা-আলাদা ছিল। মনে হচ্ছিল পাথরের গায়ে নয় শিল্পীর ছেনি মাখনের ওপর পড়েছিল। মূর্তি তো নয় যেন অজন্তার ছবি। এটা যে কোনো মিউজিয়ামের শোভা বৃদ্ধি করতে পারত। এখানে অরক্ষিত স্থানে এগুলি হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। কালো পাথরের গণেশ, শিব আর দেবীমূর্তিও ছিল। প্রথম মূর্তিটি সম্ভবত ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর। ফাটা চটিতে গিয়ে রাতটুকু থাকলাম।

তিরজুগী নারায়ণ—৯ মে সকাল পাঁচটায় বেরোলাম। পাঁচ মাইল পর রামপুর এলো। এখানেই প্রাতরাশ করলাম। চা, কিছু মিষ্টি, ছোলাভাজা এখানে সহজ প্রাপ্য। রামপুর থেকে দেড় মাইল যাওয়ার পর কেদারনাথের রাস্তা ছাড়তে হলো। এখানেই তিরজুগীর রাস্তা আলাদা হয়ে যায়। কলকাতার কোনো ভক্ত সাতহাজার টাকা দিয়ে এক মাইল রাস্তা বানিয়ে পাথর বসিয়ে দিয়েছিল। চড়াই ছিল। তিরজুগী যখন আর দু-মাইল বাকি তখন দু-টাকায় ঘোড়া পেয়ে গেলাম। ঘোড়ার মালিক ছিল শিল্পকার। গান্ধীজী হরিজন নাম দেওয়ার আগেই পাহাড়ে এই উৎপীড়িত শ্রেণী নিজেদের শিল্পকার বলতে শুরু করেছিল। ঘোড়াওলা খুব আনন্দিত হয়ে বলল, 'আমরা উপবীত নিয়ে নিয়েছি।' উপবীত নেওয়া আজকালকার দিনে খুব অসুবিধের ছিল না কিন্তু অকিঞ্চন থেকে কিঞ্চন হওয়া ছিল কঠিন কাজ। সাড়ে নটার সময় তিরজুগী পৌছলাম। স্থানটির উচ্চতা ৭০০০ ফুট তো অবশ্যই হবে। ফেব্রুয়ারিতে এখানেও পঙ্গপাল এসেছিল। লোকে বলছিল যে জঙ্গলে এখনও তারা ডেরা বেঁধে শিশুপালন করছে।

তিরজুগীতে আগে বিষ্ণুর প্রাধান্য ছিল। মন্দিরের বাইরে দেয়ালের কাছে পাঠানদের দ্বারা খণ্ডিত দেড় হাত লম্বা অন্তিমশয়ান-এর মূর্তি এবং দুটি দাঁড়িয়ে থাকা বিষ্ণু মূর্তি আছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে লক্ষ্মীর সঙ্গে। আরও তিনটে পুরনো অন্তিমশয়ান মূর্তি দেখা গেল। এগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বেশি পুরনো নয় বলে মনে হচ্ছিল। এখানকার কুণ্ডে সাপ থাকে যাকে অলৌকিক মনে করা হয়। কিন্তু আমাকে নাগদেবতা দর্শন দিলেন না। গঙ্গোত্রীর যাত্রীরা ওপরের পাহাড় হয়ে এখানে এসে বেরোয়। ১৯১০ সালে আমি এই রাস্তা পার হয়েছিলাম।

বলবাহাদুর খাবার তৈরি করতে শুরু করল। আমি দেড়টা পর্যন্ত ঘুরতে ও বিশ্রাম করতে লাগলাম। দু-মাইলের একটু বেশি গিয়ে সেই রাস্তায় ডানদিকে ঘুরে আমরা কেদারের পথ ধরলাম। নদীর ধার পর্যন্ত উতরাই, তারপর ঝুলন্ত পুলে পার হয়ে বেশিটাই চড়াই ছিল। এক জায়গায় উচ্চতা লেখা ছিল ৬০০০ ফুট। গৌরীকুণ্ড প্রায় ৭০০০ ফুট উঁচু হবে।

গৌরীকুণ্ড—সাড়ে চারটের সময় আমরা গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে গেলাম। তপ্তকুণ্ডের পাশেই ধর্মশালায় উঠলাম। ঠাণ্ডা এলাকায় তপ্তকুণ্ড পাওয়া গেলে তাতে স্নান না করে কি থাকতে পারা যায়? কিন্তু এই তপ্তকুণ্ডের জল অতিরিক্ত গরম ছিল। ঠাণ্ডা ধার করে যদি ঢেলে দেওয়া যেত তাহলে গরম একটু কমে যেত। তবে গরম এমন ছিল না যে ফোস্কা পড়ে যাবে। শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি গরম হওয়ায় প্রথমে তাতে ডুব দিলে মনে হয় শরীর জ্বলে গেল। কিন্তু অন্য লোককে স্নান করতে দেখে লোকে বুঝে যায় যে সেরকম ব্যাপার নয়। এখন কি জানি

কতদিন পর আবার ভাল করে স্নান করার সুযোগ পাওয়া যাবে। গৌরীকুণ্ডে স্নান করা থেকে আমি নিজেকে তাই বিরত রাখতে পারলাম না। মন্দিরে কিছু মূর্তি ছিল। পথে মাথা কাটা গণেশ আর নুলো গৌরী দেখে নিয়েছিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে এখানে বহু সুন্দর মন্দির ও মূর্তি দেখা যেত।

কেদারনাথ (১১৭৬০ ফুট)—সন্ধেতে আমি সাত টাকায় কেদারনাথের জন্য ঘোড়া ঠিক করে নিয়েছিলাম। কিন্তু সকালে এই ভাড়া ঘোড়াওলার কম মনে হলো। অথবা অনেক ফ্যান্সি খদ্দের এসে পড়ল তাই সে ভাড়া বাড়াতে চাইল। আমি পায়ে হেঁটেই চলতে শুরু করলাম। এমনি হবে জানলে পাঁচটার সময় বেরিয়ে পড়তাম। ঘোড়ার প্রতীক্ষা এক ঘণ্টা দেরি করে দিল। পথ ছিল চড়াইয়ের কিন্তু খাড়া চড়াই খুব কম ছিল। মাইল চারেক যাওয়ার পর রামবাড়া চটি পেলাম। এখান থেকে কেদারনাথ আর তিন মাইল। ঠিক হলো এখানেই খেয়ে নেওয়া হোক, তারপর সামনে এগোনো যাবে। সাড়ে নটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তারপর বলবাহাদুরের সঙ্গে এগোলাম। চড়াই খাড়া ছিল না কিন্তু আমরা ১০-১১ হাজার ফুটেরও বেশি ওপরে চলছিলাম যার জন্য বাতাস ক্ষীণ ছিল এবং টেনে টেনে শ্বাস নিতে যাচ্ছিল। বলবাহাদুরকে আমি আগেই বলেছিলাম একটা লাঠি নিয়ে নাও, কিন্তু এটাকে সে তার যৌবনের অপমান মনে করেছিল। এই ক্ষীণ বাতাসে লাঠির গুণ সে বুঝতে পারল। খুকরি নেপালীদের অভিন্ন অঙ্গ কিন্তু বলবাহাদুরের কাছে তা ছিল না। বড় বড় বৃক্ষময় ভূমিকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছিলাম তবে লাঠি করা চলে এমন ঝোপঝাড় এখানে ছিল। বলবাহাদুর বিষাদ-ভরা দৃষ্টিতে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর তার অবচেতন মন বলে দিল যে, এক সময় আমাদের কাছে ধাতুর নামগন্ধ ছিল না। তখন কি হতো? একটি ধারালো পাথর তুলে সে ঝাড় থেকে লাঠি কেটে নিল। দুটো দিক কেটে তারপর সে তার শিল্পপ্রেমের পরিচয় দিয়ে ছালও তুলতে লাগলো। আমি তো ভয় পেতে লাগলাম—কে জানে ও বোধ হয় এখন গোটা লাঠিটার ছাল ছাড়িয়ে তবেই এখান থেকে যাবে। কিন্তু সে এক বিঘৎ ছাড়িয়েই রেখে দিল। আমাদের পূর্বজরা এর চেয়ে ভাল পাথর ব্যবহার করত। কাঠিন্যের দিক দিয়ে ধাতুর পরে চকমকি পাথর (ফ্লিন্ট)-এর স্থান। এখানে বলবাহাদুর সাধারণ পাথর ব্যবহার করেছিল যা আজ থেকে তিন লক্ষ বছর আগে জাভা-মানুষরা ব্যবহার করত।

সাড়ে বারোটার সময় কেদারনাথ পৌঁছলাম। আধ মাইল আগে থেকে বরফের ওপর চলতে হয়েছিল। শহরে এখনও যেখানে-সেখানে যথেষ্ট বরফ ছিল। আমরা পৌনে ১২০০০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। মে মাস শুরু হয়ে যাওয়ার পরও এখানে এখন ছিল শীতকাল। কাশীনাথ শর্মা চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে ডাকঘরের ওপর তার বাড়িতে আমাদের একটি ভালো ঘরে জায়গা দিল। ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল, এক ঘণ্টা ঘুমিয়েই তা কেটে গেল। আসার সময় আকাশ মেঘমুক্ত ছিল কিন্তু অপরাহ্ণে এদিকে প্রায়ই মেঘ ঘনিয়ে আসার আশঙ্কা থাকত। শহর ঘুরে দেখলাম। একটি ছোট দুর্গে নবদুর্গার অনেক 'খণ্ডস্ফোট' মূর্তি পড়ে ছিল। কেদারমন্দিরের পিছনে ডান কোণায় মন্দির কমিটির ইন্‌চার্জ থাকতেন, তাঁর সঙ্গে কথা হলো। উত্তরাখণ্ড বিদ্যাপীঠের শাস্ত্রীজীর সঙ্গেও দেখা হলো। তিনি আমার নাম জানতেন না কিন্তু পরিচয় দেওয়ার

পক্ষে অনেক কথা ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন যে আমি ঐতিহাসিক সামগ্রী সম্বন্ধে কৌতূহলী তখন আগ্রহের সঙ্গে আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। জানালেন যে, তুঙ্গনাথে ধাতু আর পাথরের দুটি বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। কেদারনাথের রাওল (মোহান্ত) কর্নাটকের জঙ্গম (পাশুপত) সাধু ছিলেন। এর আগে তামিল জঙ্গমও থাকত। ১৯১০ সালে আমাকে এখানে প্রায় দু-মাস থাকতে হয়েছিল। কালীকমলীর সেই ক্ষেত্র এবং সম্ভব হলে সেই ঘরটি দেখার ইচ্ছে হলো। আগে এটা পাঁচ-সাতটি ঘরের দোতলা ধর্মশালা ছিল, এখন তা এক বিশাল সুন্দর বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এটাও জানা গেল যে, কেদারনাথ থেকে একটু ওপরে সেই স্থানটিও 'খুঁজে বের করা' হয়েছে, যেখানে শংকরাচার্যকে যৌবনেই পাশুপতের হাত থেকে বিষপান করে মরতে হয়েছিল। ওখানে একটি লিঙ্গ ছাড়া আর কোনো বাড়ি নেই।

সন্ধেতেই ঠিক হয়ে গেল যে যাত্রীরা আসার আগেই আমি মন্দিরে গিয়ে ওখানকার ভেতরের জিনিসপত্র দেখে নেব। সাতটার সময় সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব আমাকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাইরে বড়, তার ভেতর একটি ছোটমতো মণ্ডপ এবং তারপর গর্ভগৃহ ছিল। গর্ভগৃহতে পাথরের চারটি স্তম্ভ ছিল। এদের মাঝখানে মোষের পিঠের মতো একটা পুরনো চাটান পাথর ছিল। এটাকে দেখে লোকে কল্পনা করত যে, পাণ্ডবরা যখন শংকরকে দর্শন করতে এখানে এসেছিল তখন কুলঘাতী পাপীদের দর্শন দেওয়ার ইচ্ছে না থাকায় শংকর মোষের পালে লুকিয়ে গিয়েছিলেন। মোষরা সন্ধেয় ঘরের দিকে ফিরতে শুরু করল, সে-সময় ভীম দুটি পর্বতের ওপর পা রেখে দিল। শংকর পায়ের তলা দিয়ে কিভাবে যাবেন? বড় ধর্ম-সংকটে পড়ে গেলেন। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি মাটিতে ঢুকে যেতে লাগলেন। মুখ-পা সব মাটির নীচে ঢুকে গেল, শুধু পিঠ থেকে গেল। পাণ্ডবরা চিনতে পারল। সেই পিঠ এখানে পাথরের আকারে এখনো বিদ্যমান।

ভেতরে খুব ঠাণ্ডা ছিল, এটুকু বললে যথেষ্ট বলা হবে না। মন্দির বলে জুতো পরে ভেতরে যেতে পারছিলাম না অথচ পা যেন বরফে কেটে যাচ্ছিল। পূজারী কম্বল দিলেন যা নিয়ে সামান্য উপকার হলো। শাস্ত্রীজী আগেই একটু খোজ-খবর নিয়েছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন যে, দেওয়ালের ওপর শিলালেখ রয়েছে। শিলালেখ ছিল কিন্তু কেদারনাথের গায়ে ঘি মাখানোর সময় হাত পরিষ্কার করার জন্য দেওয়ালের গায়ে তা পুঁছে দিত, যার ফলে কয়েক শতাব্দীর ঘিয়ের মোটা আস্তরণ অক্ষরগুলিকে ঢেকে দিয়েছিল। গরম জল এলো তবে বুরুশ না হলে পরিষ্কার করা মুশকিল। কিছুটা পরিষ্কার করলে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর লিপিতে 'রজ দেব...কে...ইতি' লেখা পাওয়া গেল। কুমায়ুনের প্রথম কমিশনার ট্রেল লিখেছিলেন, মন্দির নতুন বানানো হয়েছে। জানা যায়, তাঁর সময় (১৮২০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি)-এর কিছুটা আগে ভূমিকম্পে ভেঙে যাওয়া মন্দিরের মেরামত হয়েছিল, যা থেকে তিনি মনে করেছিলেন যে, মন্দির সদ্য বানানো হয়েছে। দেওয়ালগুলো পুরনো, ভাঙা যদি ছিল তা ওপরের কিছুটা অংশ। দেওয়ালগুলোর এই শিলালেখগুলি বলে দিচ্ছিল যে, মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীর পরের নয়। এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছিল বাইরে রাখা মূর্তিগুলিও। গর্ভের বাইরে মণ্ডপেও বড় বড় চারটি চতুষ্কোণ থাম ছিল। এখানকার গবাক্ষে আটটি মূর্তি রাখা ছিল যার মধ্যে পাঁচটি ছিল প্রায় তিন হাত লম্বা। সবই পুরনো এবং প্রত্যক্ষ চিহ্নগুলিতে বিশ্বাস না রেখে লোকে তাদের দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি

নাম দিয়ে রেখেছে। মন্দিরের বাইরে অম্বাদত্ত তঙ্গওয়াল-এর অধীনে ঈশান মন্দির রয়েছে। সেখানে একটি পাথরের ওপর দুটি পঙ্‌ক্তির খণ্ডিত লিপি দেখলাম। কুমায়ুন গাড়োয়ালের এটি সবচেয়ে পুরনো লিপি যা গুপ্ত, ব্রাহ্মী এবং তিব্বতী (উমেদ) লিপির সঙ্গে বেশি মেলে। নবদুর্গা মন্দিরে বৈষ্ণবীর সঙ্গে পাঁচ মাতৃকা ছিল অর্থাৎ দুটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এগুলিও একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পরের হতে পারে না। যা কিছু দেখলাম তা থেকে বোঝা গেল যে, চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে কোনো মন্দির ছিল আর সে-সময়ও পাশুপতের জন্য এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মন্দিরের ভেতর কেদারনাথের যে দিব্য বিগ্রহ আছে, বোঝা যায়, তা কোনো প্রাকৃতিক শিলা ছিল। তার এক প্রান্ত থেকে তলদেশ পর্যন্ত যে যথেষ্ট ফাঁপা তা বুঝতে পারা যায় জল পড়ার আওয়াজ থেকে। গুপ্তযুগে হয়তো মন্দির সুন্দর ছিল। তারপর একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কেউ নতুন বিশাল মন্দির বানিয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভূমিকম্পে যেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তার মেরামত করা হয়েছিল। মন্দির বোধহয় বৈভবসম্পন্ন ছিল। হতে পারে, আকবরের সময়ে কোনো কোনো দল এখান পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ১৮৪১-৪২ খ্রিষ্টাব্দে পাঠানরা তো অবশ্যই এখানে এসেছিল। তারা এখানকার মূর্তি ভেঙে দিয়েছিল। ধনসম্পত্তি লুঠ করেছিল। ধাতুর মূর্তি থাকলে সেগুলো তারা গলিয়ে ধন হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছিল।

সাড়ে নটার সময় আমরা কেদারনাথ থেকে চললাম। উতরাই ছিল আর চলার অভ্যাসও হয়ে গিয়েছিল বলে পা তাড়াতাড়ি চলছিল। গৌরীকুণ্ডে দেড় ঘণ্টা থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেললাম। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ ও হরগৌরীর খণ্ডিত মূর্তি দেখলাম। মন্দিরে ছোটবড় চারটি ধাতব মূর্তিও আছে।

কালীমঠ—সেদিন পাঁচটার আমরা রামপুর পৌঁছে রাতে ওখানেই থেকে গেলাম। ভোর (১২ মে) পাঁচটায় আবার চললাম। পাঁচ মাইল হেঁটে গিয়ে ফাটাতে চা খেলাম এবং ব্যোংগ-এ মধ্যাহ্নভোজন করার কথা বলবাহাদুরকে জানিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। আমি খণ্ডায় মূর্তি দেখার পর রাস্তার ধারে বসে যারা জুতো বানাচ্ছিল সেই কারিগরদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। সরকার শ্রীনগরে চপ্পল-জুতো বানানোর প্রশিক্ষণের স্কুল খুলেছে। সেখানে যারা শিখছে তাদের ছাত্রবৃত্তিও দেওয়া হয়। তাদের আমি এর থেকে সুবিধে নেওয়ার কথা বললাম কিন্তু তাদের জবাব শুনে নিজের বড় বড় কথায় আমার অনুতাপ হলো। তারা বলছিল, 'আমরা চপ্পল আর বুটজুতো বানাতে জানি। (তারা তাদের বানানো জুতো দেখিয়ে তা প্রমাণ করল।) আমাদের ছেলেরা নিজের ঘরে এসব শিখতে পারে। আসলে ভাল পাকা চামড়া সস্তায় না পাওয়ায় আমরা কানপুরের চামড়া আনিয়ে নিই। একটি জুতোতে সাত-আট টাকা চামড়াতেই বেরিয়ে যায়, আমাদের মজুরি ওঠে না। চামড়া পাকানোর রীতি যদি শেখানো হয় তাহলে ঠিক আছে।'

যাত্রায় জিনিসপত্রের দামের কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। সাধারণভাবে এটা বুঝে নিতে হবে যে, যত ওপরে যাওয়া যায় ততই দাম বেড়ে যায়। কিন্তু ব্যোংগ চটি সামান্য দূরত্বের মধ্যে দুটি খণ্ডে বিভক্ত। ওপরের ব্যোংগ-এ ১১ আনা সের আলু পাওয়া যাচ্ছিল আর নীচের ব্যোংগ-এ পাঁচ সিকে সের। আমাদের আপসোস হলো যে ওপরের চটিতে কেন খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই নি। বলবাহাদুর ভাত আর আলুর তরকারি বানাল। ডালে খামোখা বেশি সময় লাগে, তাই দুপুরে

সেটা আমরা দরকার নেই বলে মনে করতাম। পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া আলুর তরকারি আর কত ভাল হতে পারে,কিন্তু এখানে ধর্মধুরন্ধদের মত চলে তাই কোনো দোকানদার ঘরে হয়তো খায় কিন্তু দোকানে পেঁয়াজ-রসুন রাখে না।

যাবার সময় জুরানীতে নারায়ণ সিংহের ফলের বাগান দেখেছিলাম। সেটা ছিল মাত্র পাঁচ ফার্লং নীচে, ওখানে গেলাম। আঙুর, কমলালেবু, আপেল অনেক রকমের ফলের গাছ লাগানো হয়েছিল। যদি পাকা ফল বিক্রিরও ব্যবস্থা থাকতো তাহলে কি ভাল হতো! নারায়ণ সিংহ একজন পেনসনার ওভারসিয়র, গ্রামের অন্য কোনো জায়গায় থাকতেন। বাগানে মালী ছিল। জানা গেল, এর আরেকটু ওপরে সরকার ফলের একটি নার্সারি চালু করেছে। বোকা লোকগুলো নার্সারি এমন জায়গায় করেছিল যেখানে জল নেই। এই সব লোকরা এই দেশকে ফলে পরিপূর্ণ করবে? আধিকারিকদের কাজ থেকে কিছু আশা করা যায় না।

সাড়ে বারোটার সময় আমরা ভেত পৌঁছলাম। চাইছিলাম বিশালমণিজী তাড়াতাড়ি কালীমঠ নিয়ে চলুন, যেখানকার অদ্ভুত মূর্তির বর্ণনা দিয়ে তিনি আমাকে পাগল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িই যদি তৈরি হবেন তাহলে আর সংস্কৃতের পণ্ডিত কি? দু-ঘণ্টা তো বোধহয় রানীদের সাজগোজ করতে লাগত। ছটফট করছিলাম কিন্তু কী করার ছিল? ভেতের মূর্তিগুলোও দেখলাম। নীচে পাথরের একটা সুন্দর পুকুর পেলাম। সেটা পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল নইলে এখনো তাতে জল থাকত। এখানে অনেকটা দূর অব্দি সমতল ভূমি আছে। পাহাড়ে এরকম জায়গাকে রাজধানীর জন্য বেছে নেওয়া স্বাভাবিক এবং সেই সময়ের অবশেষ হচ্ছে এই মন্দির ও পুকুর। পুকুর ঘেরা দেয়ালে চতুর্দশ শতাব্দীর লিপিতে 'ভৈরবনাথ জোগী সিধ' লেখা ছিল। আর নীচে নর্বলিঙ্গ কেদারের ধ্বংস দেখালেন যার মধ্যে সওয়া এক বিঘতের একটি ধাতুর মূর্তি ছিল। আরও কিছু কুৎসিত মূর্তি ছিল, ভক্ত স্ত্রী-পুরুষও ছিল। ধাতুর মূর্তি গ্রামবাসীরা ভয়ে সরাত না কিন্তু সেগুলো বেশিদিন এখানে রোদ আর বৃষ্টি সহ্য করার জন্য পড়ে থাকবে বলে মনে হয় না। সম্ভবত সুন্দর নয় বলেই সেগুলি পড়ে ছিল।

উতরাইয়ে নেমে মন্দাকিনীর পুলে পৌঁছলাম। সেটা পেরিয়ে প্রায় সওয়া এক মাইল চড়াইয়ে উঠতে হলো। আবার কিছুটা উতরাইয়ে নেমে কালীগঙ্গার তীরে কালীমঠে পৌঁছলাম। কোনো এক সময়ে এটা পাশুপতের কেন্দ্র ছিল। মুখ্য মন্দিরের বাইরে কত্যুরী লিপিতে লেখা আঠারো পঙক্তির একটি ২০ ইঞ্চি লম্বা ও ১০ ইঞ্চি চওড়া শিলালিপি ছিল। বিশালমণিজী যদি দেরি না করে দিতেন তাহলে আমরা ভাল সময়ে পৌঁছে যেতাম এবং ফটো তুলতে পারতাম। কিন্তু এখন সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু কয়েকটা ফটো তুললাম। শিলালিপির কয়েকটি পঙক্তি ছিল এই রকম—

'ওঁ সন্ধ্যাসমাধি ঘটিতাঞ্জলিতঃ স্বপাণৌ কৃষ্ণে সর্কেপি সৃম···ক্ষিণাংসঃ শর্বস্য ত··· স্বকর সংস্থিত তোয়রাশেঃ (১) সংঘিত্র (১) দয়িতয়েব গৃহীতকেশঃ।। দক্ষোদ্ভবাং তরুমপাস্য শিরে প্রস্তুত শর্ব্ব···পতিমবাপ্য···(৪) ···গিরিপতিগৃহগোপ্তা মহারুদ্রাভিধার··· (৪) বালএবাভবত্ স্বামী সর্ব্বসংগ্রামকংদ্যতঃ রুদ্রসূন··· ১১··· কলিকা ১লা শৈল··· ১৪··· সংগ্রামকীর্তিঃ প্রাকৃত কবয়ো ১৫ কর্ত্তুং কুন্দ কৈঃ পাষণি···।'

লিপিটি কত্যুরী। এই শিলালেখ যে রাজার ছিল তিনি ছিলেন রুদ্রের পিতা। কত্যুরীদের প্রাপ্ত

'বিবরণীতে এই নামের কোনো রাজার উল্লেখ নেই। হতে পারে, তিনি শুধু ভেত-এরই রাজা ছিলেন।

গৌরীমন্দিরে ৪০ ইঞ্চি লম্বা ও ২৪ ইঞ্চি চওড়া হরগৌরীর অত্যন্ত সুন্দর পাথরের মূর্তি ছিল যা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। শিব ছিলেন চতুর্ভুজ, গৌরী দ্বিভূজ, নীচে গণেশ আর ময়ূরারূঢ় কার্তিকেয় ছিলেন। দাতার মূর্তিও সেই সঙ্গে উৎকীর্ণ ছিল। অখণ্ডিত এত সুন্দর হরগৌরীর মূর্তি সম্ভবত ভারতের কোথাও নেই। ভারতের এই অমূল্য শিল্পসম্ভার এমন একটি কোণায় পড়ে রয়েছে যেখানে প্রতি বছর কেদারনাথ যাচ্ছে এমন হাজার যাত্রীদের কেউই যেতে রাজি নয়। আমার তাই খুব আফসোস হলো যে আলোর অভাবে আমি তার ফটো তুলতে পারলাম না।

হরগৌরী ছাড়াও লক্ষ্মী আর সরস্বতীরও মন্দির এখানে আছে। লক্ষ্মীর মন্দিরেই উক্ত শিলালিপি লাগানো ছিল। বাইরের খোলা জায়গায় কত্যুরী যুগের অনেকগুলি খণ্ডিত মূর্তি ছিল। মুখলিঙ্গ (এক মুখওলা, তিন মুখওলা, চার মুখওলা) এবং শিশ্ন-লিঙ্গ এই স্থানটিকে পাশুপতদের প্রধান স্থান বলে পরিচয় দিচ্ছিল।

গাড়োয়াল-কুমায়ুন কেন, পশ্চিম নেপাল অব্দি অধিকাংশ লোক হচ্ছে খশ, যার মধ্যে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রীয় দুই আছে। বর্তমান শতাব্দীতে খশ নামটি অপমানজনক বলে মনে করতে শুরু করা হয়েছে, এজন্য লোকে নিজেদের খশ বলতে অস্বীকার করছে এবং সবাই এখন নিজেদের রাজপুত বলছে। এখানে খশদের প্রথাতে নিজের মেয়েকে দেবদাসী করে দেবতাকে অর্পণ করার প্রথাও ছিল। এই শতাব্দীতেও দেবদাসী হতো। শেষ দেবদাসীর মারা যাওয়া এখন মাত্র কয়েক বছর হয়েছে। দেবদাসীরা যে-ঘরে থাকত সেই ঘরও বিশালমণিজী দেখালেন। দেবতার প্রকোপের ভয় থাকলেও জাতীয় অপমান মনে করে এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাজের মতো এখানে দেবদাসী-প্রথা নিষেধ করার কোনো আইন বানানোর দরকার পড়ে নি। বিশালমণিজী হচ্ছেন দুগামী ব্রাহ্মণ। সম্ভবত গঙ্গাড়ী আর খশ দুই ব্রাহ্মণের মাঝে হাত-পা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই নাম দেওয়া হয়েছিল। সেই সন্ধেয় ভেত ফিরে এসে আমার মনে হচ্ছিল এই অদ্ভুত মূর্তি বেঁচে গেছে? হয়তো লোকে তাকে কোথাও লুকিয়ে দিয়েছিল এবং এটা করে তারা যে মহান কাজ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উখীমঠ—১৩ মে সওয়া পাঁচটায় আমরা দুজনে চললাম। বিশালমণিজীও নালা পর্যন্ত পৌঁছতে এলেন। যাওয়ার সময় আমি খেয়াল করি নি কিন্তু এখন দেখলাম, রাস্তার ধারে নালা মন্দিরের দেওয়ালে একটা ছোটমতো শিলাস্তূপ আছে। বৌদ্ধধর্মের এমন জীবন্ত অবশেষ কুমায়ুন, গাড়োয়ালে আর দেখতে পাই নি। ছোট মন্দিরের চার পঙ্ক্তির লেখা পড়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার জন্য কিছুটা সময়ের দরকার ছিল। লেখায় শক ১১৯৮ (১২৭৬ খ্রি·)-এর উল্লেখ ছিল। ৯ 'অংক সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলাম না। এতে 'সরস্বতী প্রসাদেন ঘটিতা প্রতিমা সুভা' লেখা ছিল। সরস্বতী প্রসাদ কি মূর্তিশিল্পী ছিল?

নালা থেকে এগিয়ে গেলে উত্তরাখণ্ড বিদ্যাপীঠ এলো। সেখানকার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক। বিদ্যালয় এখন ছুটি ছিল। তিনি জানালেন এই এলাকায় শিক্ষার

প্রসারের জন্য বিদ্যাপীঠ কী করছে। পুল পেরিয়ে চড়াই শুরু হলো। আটটার সময় আমরা উষীমঠ পৌঁছে গেলাম। বদ্রীনাথ ব্যবস্থাপক সমিতির সহ-সচিব বহুগুণাজী এবং কেদারনাথের রাওল[১] এখানেই ছিলেন। দুজনের আপসোস হচ্ছিল যে তাঁরা এই সময় কেদারনাথে ছিলেন না। এখানকার জিনিসগুলো রাওলজী দেখালেন। একটি তাম্রপত্র ছিল সংবত ১৮৬৮ (১৮১১ খ্রি·)-এর গীর্বান যুদ্ধ-বিক্রম শা-হ-র সময়ের, যাতে রামদাস থাপার মায়ের দানের কথা উল্লেখিত ছিল। শক ১৭১৯ (১৭৯৭ খ্রি·)-এর তাম্রপত্রে 'মাঘ কৃষ্ণ ১৪ সোম রণবাহাদুর শাহ··· কনিষ্ঠ পত্ন্যা শ্রীকান্তবতী দেব্যা নিজভর্তৃ বিক্রমার্জিত কূর্মচল' লিখে কারও দানের উল্লেখ করা হয়েছিল। এই দুটি লেখা ছিল এই ভূখণ্ডের ওপর গোর্খা-শাসনের অবশিষ্ট চিহ্ন।

এখানকার পুরনো বই আর বিবরণী থেকে সেই সময়ের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। চলতে চলতে আমি সেগুলো দেখতে পারতাম না। সেগুলো হলো অনুসন্ধানের বিষয়। এই মঠের সঙ্গে উষার সম্পর্ক কেন জোড়া হয়েছিল? পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়া গাড়োয়ালের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। পাশুপতদের গড় হওয়ায় তারও অবকাশ ছিল, কিন্তু উষা তো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। উষা-মন্দিরের বারান্দায় অনেক মূর্তি ছিল যার মধ্যে নটরাজও ছিল। এক জায়গায় মুখোমুখি দুটি পাথরের সূর্যমূর্তি ছিল, ভেতরে ছিল শিবলিঙ্গ আর ওপরে মুখলিঙ্গ। মূর্তিগুলোর মধ্যে একটি দাড়িওলা রাজার মূর্তি ছিল যার মাঝখানে দাড়ি-জটাধারী পাশুপতাচার্য এবং পাশে রাজকুমার ও রাজকুমারীর মূর্তি ছিল। এগুলি বিগত কত্যুরী যুগের হতে পারে। উষীমঠও প্রাচীন স্থান।

মধ্যাহ্ন-ভোজন করার পর তিনটের সময় আমরা ওখান থেকে চললাম। বলবাহদুর এখন খুব ধীরে ধীরে চলছিল। শ্রীনগরে তার খাওয়া-দাওয়া আর সেই সঙ্গে রোজ দেড় টাকা যথেষ্ট মনে হয়েছিল কিন্তু এখন সে তার জাতভাইদের তার চার-পাঁচগুণ রোজগার করতে দেখছিল। এক জায়গায় তো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো, সন্দেহ হচ্ছিল ওর কিছু হয়ে যায় নি তো? কোনো রকমে গ্যালিয়াবগড় পৌঁছলাম আর রাতটুকু ওখানেই থেকে গেলাম। রমণীয় স্থান। এর আগের চটিতে জলের খুব অভাব ছিল। এখানে স্বচ্ছ জলের একটি নদী বইছিল, যার ধারা আমাদের থাকার জায়গার পিছন দিয়ে জলচক্র চালানোর জন্য যাচ্ছিল।

তুঙ্গনাথ—১৪ মে পাঁচটায় ঘোড়ার পিঠে চললাম। নদী পেরোতেই চড়াই শুরু হয়ে গেল। এই রকম জায়গায় ঘোড়া পেয়ে যাওয়া যাত্রীদের কাছে আশীর্বাদের মতো আর যে তা না নেয় সে বহুবার অনুতাপও করে। বানিয়াকুণ্ডী পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেল। তাকে ওখানেই ছেড়ে দিতে হলো। সাড়ে ন টাকায় তুঙ্গনাথের জন্য সাড়ে চার হাজার থেকে ১২ হাজার ফুটের উচ্চতায় পৌঁছে দেবে এরকম অন্য ঘোড়া পেয়ে গেলাম। নদীর এই পারে আসতেই পাহাড় ছিল শ্যামল। বানিয়াকুণ্ডী ছিল বরফ পড়ার জায়গায়, এখানে খরশু আর তুন গাছ বেশি ছিল। এই পাহাড়ী এলাকায় গ্রাম বেশি নেই কিন্তু জঙ্গলের কারণে পশুর পাল চরানোর সুবিধের জন্য লোকে এদিকে ঝুপড়ি বানিয়ে থেকে যায়। তাদের মধ্যেই কিছু লোক

[১] কেদারনাথের মোহান্ত।—স·ম·

চটির মধ্যে নিজের দোকানও খুলে দিয়েছে। চটির অনেক ঘর নষ্ট হয়ে পড়ে ছিল। দোকান করে লোককে বড়লোক হতে দেখে অন্যদেরও লোভ হলো আর প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দোকান তৈরি করে ফেলল। তারপর কিছু লোককে নিরাশ হয়ে নিজের ঘর ছাড়তে হলো—যাদের ঘরের দেওয়াল এখনও দাঁড়িয়ে।

গাছপালার ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে লাগলো। আমরা তুঙ্গনাথের আগে এমন জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে ঝোপঝাড়ও শেষ। শুধু ঘাসই থেকে ছিল। দশটার সময় তুঙ্গনাথ পৌঁছলাম। কোথাও কোথাও বরফ ছিল। তুঙ্গনাথের চেয়ে বেশি উঁচু জায়গায় কোনো হিন্দু-মন্দির নেই। এখানকার পুরনো, ভাঙা মূর্তি বলে দিচ্ছিল এটি প্রাচীন স্থান। মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে, যার পিছনে পদ্মাসনে বসা কুণ্ডলধারী ভক্তমূর্তি রয়েছে। তার পাশে রয়েছে পাঁচ-ছ ইঞ্চি লম্বা, ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধাতুর বুদ্ধমূর্তি। তুঙ্গনাথ রয়েছে হিমালয়ের গর্ভে। তার উত্তর দিকে তুষার-শিখরের পঙ্‌ক্তি চলে গেছে আর নীচে হাজার হাজার পাহাড় যেন মনোযোগ দিয়ে একদৃষ্টিতে তুষার-শিখরের দিকে চেয়ে আছে। এখান থেকে অনেক দূর অব্দি নিসর্গ দেখা যায়। বদ্রীনাথের সব যাত্রীরা এখানে আসে না বলে গ্রামটি ছোটমতো। কাঠ দূর থেকে আনতে হয় অতএব দাম বেশি, শীতও বেশি। রুটি বানিয়ে খাওয়ার চেয়ে পুরী খাওয়াই সুবিধের, যা তিন টাকা সেরে পাওয়া যাচ্ছিল।

খেয়ে-দেয়ে এগারোটার সময় আমরা নামতে শুরু করলাম। শুধু উতরাই আর উতরাই চলছিল সেই চটি পর্যন্ত যেখানে সোজা রাস্তা এসে মিশে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলবাহাদুর এলো। পৌনে তিন মাইল হেঁটে পাঁগরবাসা পেলাম। চেস্টনাটকে পাহাড়ে 'পাঁগর' বলে। এখানে জঙ্গলে সে-গাছ দেখা যায়। সেজন্য জায়গার এই নাম দেওয়া হয়েছে। পাঁগর ছাড়াও খরশু আর কলা এখানে প্রচুর রয়েছে। শ্যামলিমার স্থানটি অত্যন্ত রমণীয়। রাতটুকু আমরা এখানেই থেকে গেলাম।

পরের দিন (১৫ মে) আবার পাঁচটার সময় চললাম। গগনচুম্বী বৃক্ষের ঘন জঙ্গলের মাঝে মণ্ডল চটি পর্যন্ত উতরাইয়ের পথ ছিল। ডাকবাংলো একটু ওপরে থেকে গিয়েছিল আর চটি ছিল নীচে—সমতলের মতো খুব চওড়া উপত্যকায়। এখানেও টিকা দেখা আর দেওয়ার জন্য ডাক্তারদের ক্যাম্প ছিল কিন্তু সে-ব্যাপারে কোনো চিন্তা ছিল না। একটু অপেক্ষা করার পর বলবাহাদুর এলো। তাকে টিকা নিতে হলো। এদিকেও পঙ্গপাল এসে ফসলের ভীষণ ক্ষতি করেছিল। চাপী নদী পার হয়ে তার অন্য তীর ধরে নীচের দিকে নামলাম এবং তারপর পেরিয়ে পাহাড়ের নীচে পৌঁছলাম। জায়গাটা প্রায় সাড়ে চার মাইল হবে। ঘোড়া পাওয়া গেল। চাইলে বদরীনাথ পর্যন্ত তা সঙ্গে যেত কিন্তু সেই সময় এ ভাবনা মাথায় আসে নি। চড়াইতে উঠে গোপেশ্বর পৌঁছলাম।

গোপেশ্বর-এর মন্দির কেদারনাথের মতোই বিশাল। ষষ্ঠ আর দ্বাদশ শতাব্দীর বিবরণী তার প্রাচীনতা তথা মহিমা প্রকাশ করে। মন্দিরের সভামণ্ডপ পরে বানানো হয়েছিল। ভাঙা মূর্তিগুলো একটা বেদিতে রাখা ছিল, অন্যান্য জায়গাতেও অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। চতুর্মুখলিঙ্গ আর শিশ্নলিঙ্গ জানিয়ে দিচ্ছিল যে, এটা পাশুপতদের স্থান ছিল। পুরনো ঢঙের সূর্যের মূর্তিও মন্দিরের ভেতর পাওয়া গেল। বিশাল ত্রিশূলের ওপর অশোকচল্ল, ক্রাচল্ল ছাড়াও

তিন পঙ্‌ক্তির একটি ব্রাহ্মীলেখও ছিল যার দক্ষিণী ব্রাহ্মীর সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া করার ছিল। বলবাহাদুর এবার তার ঢিলেমির রহস্য ভাঙল, 'আমি দেড় টাকা রোজে থাকব না।' আগে যদি বলতো তাহলে সেই ঘোড়াটাকে বদ্রীনাথের জন্য নিয়ে নিতে পারতাম। খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম নিয়ে দুটোর সময় বেরোলাম। প্রায় সমতল পথ ছিল, দেড় ঘণ্টায় চামোলী পৌঁছে গেলাম। চামোলী থেকে বলবাহাদুরকে ছেড়ে দেওয়ার ছিল। ধর্মশালা ভর্তি ছিল, কোথাও জায়গা ছিল না, সেজন্য রাতে ওখানে থাকাও ছিল কষ্টকর। ভাবলাম, অনাবশ্যক জিনিস বয়ে বেড়াচ্ছি, তার দরকার নেই। ওগুলো এখানেই কারও কাছে ফেলে দিই এবং একটা কম্বল আর পোর্টফোলিওতে কিছু জিনিস নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। হাসপাতালের কম্পাউন্ডার শ্রীজীবানন্দ সুন্দরিয়ালের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি জিনিসপত্র নিজের কাছে রাখতে রাজি হলেন। বলবাহাদুরকে ১১ দিনের জন্য আমি ২৫ টাকা দিয়ে দিলাম। ভাবলাম সামনের চটি (মঠ)-তে মাথা গোঁজার কোনো জায়গা পেয়েই যাবো, সেজন্য লম্বা পা ফেলে চলতে শুরু করলাম। মঠে দোকানদারটি ভালমানুষ ছিল। সে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে আমার জন্য রুটি বানিয়ে দিতে রাজি হলো। এখানে বামা-র উদয়সিংহ পালকে পাওয়া গেল। শিক্ষিত যুবক এবং নীতী ঘাটার বাসিন্দা হওয়ায় তিব্বতের ব্যবসায়ীও ছিলেন। তিনি সম্ভবত আমার কোনো বইও পড়েছিলেন। সামনে রাস্তার ওপর তাঁর বন্ধুর বাড়ি ছিল। তিনি বললেন, 'সে অবশ্যই কোনো ঘোড়া ঠিক করে দেবে।' ভোরবেলা সাড়ে চারটের সময়ে আমি তাঁর বন্ধুর কাছে গেলাম। দেখলাম কালকের কথা সে পিঠ ফেরামাত্র ভুলে গেছে। এখন আমার পায়ের জড়তা কেটে গিয়েছিল, মালপত্র থেকেও মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই উলের চাদর কাঁধে ফেলে লাঠিতে পোর্টফোলিও আর কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনোবল হারাবো কেন? আমি বদ্রীনাথ পর্যন্ত যেতে পারব।

সামনে সীয়াসাই-এর চটি পেলাম। দোকানদারের উনুনে চা ফুটছিল। আমি চা খাওয়ার জন্য বসে পড়লাম। 'এই চা আপনার ভাল লাগবে না' বলে সে নতুন চা বানিয়ে খাওয়ালো। সে জানাল, সামনে হাট গ্রামের পুল আসবে, সেখানে কেদার দত্তের দোকান রয়েছে। তার কাছে ঘোড়া আছে। তা ভাড়ায় পাওয়া যাবে। চামোলী থেকে কাল আমি দু-মাইল এসেছিলাম আর সীয়াসাই থেকে আরও পাঁচ মাইল আসার পর কেদার দত্তকে পেলাম। ঘোড়াও ১৭ মাইল (জোশী মঠ)-এর জন্য ঠিক করে নিলাম। এখান থেকে রাস্তা এবার অলকনন্দার বাঁ দিকে। কেদার দত্তের ভাই বাচস্পতি ঘোড়ার সঙ্গে চললেন।

বাচস্পতি মুসৌরীতে পাচক ছিলেন। এত সুবিধে আর কোথায় পাওয়া যেত? আমি ভাবলাম, বদ্রীনাথ পর্যন্ত ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে এবং চামোলী ফিরে তবেই ওঁকে ছাড়ব। মঠ থেকে ১৫ মাইল আর ঘোড়া নেওয়ার জায়গা থেকে আরও ২০ মাইল গিয়ে পাতালগঙ্গা চটিতে পৌঁছলাম। এখানে একটা থেকে দুটো পর্যন্ত থেকে খাওয়া-দাওয়া সারলাম। বাচস্পতি বাক্যে পতি না হলেও রান্নার পতি অবশ্যই ছিলেন। একই জিনিস কারু হাতে পড়ে গোবর হয়ে যায় আবার কারু হাতে অমৃত। বাচস্পতিজী খাবার বানাতে লাগলেন আর আমি একটু এদিক-ওদিক ঘুরতে গেলাম। সেখানে নাগপুরের শ্রীহৃষীকেশ শর্মার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে নাগপুরের আরও আট-ন জন শিক্ষিত-মার্জিত স্ত্রী-পুরুষ ছিলেন। বাচস্পতি সুস্বাদু

খাবার খাইয়ে তৃপ্ত করে দিয়েছিলেন নইলে শর্মাজীর ইচ্ছে ছিল আমাকে তাঁর দলের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু আমি এক-এক দিনে কুড়ি-তিরিশ মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করছিলাম আর ঐ দলের সঙ্গে গেলে পিঁপড়ের চালে চলতে হতো। মুসৌরী থেকে যতটা সময় ঠিক করে এসেছিলাম তার চেয়ে বেশি সময় দিতে চাইছিলাম না।

জোশীমঠ—বেশির ভাগ পথ ছিল চড়াই। পায়ে হাঁটার ছিল না। ঘোড়া আর বাচস্পতি দুজনেই ছিল ফুর্তিবাজ। এদের দুজনের সঙ্গে তো ইচ্ছে করছিল, একবার হিমালয়ে লম্বা দৌড় লাগিয়ে দি। ছটার সময় জোশীমঠ পৌঁছলাম। বাচস্পতিজীকে খাবার বানানো আর ঘোড়ার ব্যবস্থা করার জন্য ছেড়ে দিলাম। আমি প্রাচীন মন্দিরগুলো—নরসিংহ, বাসুদেব, নবদুর্গা দেখতে গেলাম। জোশীমঠকে বলা হয় 'জ্যোতির্মঠ'-এর বিকৃত রূপ কিন্তু এই দুটি নাম থেকে ইতিহাসের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। এটুকু জানা যায় যে, জ্যোতির্মঠে শংকরাচার্য তাঁর একটি প্রধান মঠ স্থাপন করেছিলেন যেখানে গদিতে শংকরাচার্যও ছিলেন। সেই পরম্পরা অষ্টাদশ শতাব্দী অব্দি চলেছিল এবং শেষ সন্ন্যাসী না থাকায় মালাবারের ব্রাহ্মণ পাচককেই রাওল নাম দিয়ে মোহান্ত বানিয়ে দেওয়া হলো। এই প্রথা আজও চলে আসছে। জোশীমঠ ছিল প্রতাপশালী কত্যুরীদের রাজধানী, যারা একসময় সংযুক্ত গাড়োয়াল-কুমায়ুনের শাসক ছিল। রাজধানী আর রাজপ্রাসাদের কোনো অবশেষ পাওয়া যায় না। তবে মন্দির সেই সময়কার ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়।

রাত হয়ে যাওয়ায় আমি এখানে কোনো কাজ করতে পারলাম না। জানতে পারলাম আধিকারিক বদ্রীনাথ চলে গেছেন।

বদ্রীনাথ—পরের দিন (১৭ মে) সাড়ে চারটেতেই আমরা রওনা হলাম। দু-মাইল নীচে ধৌলি আর অলকনন্দার সংগমস্থলে হচ্ছে বিষ্ণুপ্রয়াগ। সেখান পর্যন্ত ঢল ছিল ফলে ঘোড়ায় চড়ার দরকার হয় নি। আরও দশ মাইল গিয়ে আমরা পাণ্ডুকেশরে এসে পড়লাম। পাণ্ডুকেশরের দুটি পাথরের মন্দির হচ্ছে কত্যুরী যুগের চিহ্ন। তারা তাদের মূর্তি এবং মন্দিরের নির্মাণ-শৈলীতে বিশেষত্ব বজায় রাখে। একটি মন্দির গম্বুজের মতো ছাতওলা। এটা বেশি প্রাচীন। এর মধ্যে পাথরের মূর্তি রয়েছে আর অন্যটিতে আছে ধাতুর বিষ্ণুমূর্তি। সমতলের মতো পাহাড়েও ভাঙা মূর্তি গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। সেজন্য না জানি কত মূর্তি অলকনন্দায় পড়ে ভাবী গবেষকদের প্রতীক্ষা করছে। এখানে গণেশেরও একটা ভাঙা মূর্তি দেখলাম। কোনো শৈব-চিহ্ন দেখলাম না। লক্ষণ দেখে মনে হয় পাশের খেতগুলোতেও প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া যাবে। পাণ্ডুকেশরে অনেক দোকান আছে। বিষ্ণু প্রয়াগের এদিকে এমন জায়গায় আমরা এসে পড়েছিলাম যাকে 'আলুর দেশ' বলা যায়। হতে পারে আজ থেকে মাত্র একশো বছর আগে শিকারী উইলসন এদিকে আলুর প্রচার করেছিলেন কিন্তু আলু স্বয়ং বলে 'এটি আমার পূর্বজন্মের মাতৃভূমি।' সেজন্য তা পরিমাণে প্রচুর আর আকারে বড় বড় হয় আর তাই সস্তাও খুব। দোকানে মশলা মাখানো গোটা গোটা হলুদ আলু সাজানো দেখে মুখে জল এসে যেত। বেশি উৎপন্ন হয় বলে আলুর এই অপমানকে আমার অপরাধ বলে মনে হয়। এখন সবে সকাল তাই মধ্যাহ্ন-ভোজন এখানে করলাম না কিন্তু আলু আমরা খেলাম। লামবগড় হয়ে বদ্রীনাথ

যেতে শেষ চটি হনুমান চটী পেলাম। গাছপালার জায়গা থেকে তা ছিল ওপরে তাই কাঠের দাম খুব বেশি' বোকারাই এখানে তিন টাকা সের পুরী ছেড়ে সওয়া দু টাকা সেরের আটা দিয়ে খাবার বানানোর চেষ্টা করবে। বাচস্পতিজীর খাবার বানানোর ছিল না। খেয়ে একটু সময় বিশ্রাম করলাম আর আড়াইটের সময় শেষ পাঁচ মাইল যাত্রার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এমন চড়াই ছিল কিন্তু আমি শক্তসামর্থ ঘোড়ার পিঠে ছিলাম। পাঞ্জাব-সিন্ধ ক্ষেত্রের ম্যানেজার খুব আগ্রহের সঙ্গে তাদের এখানকার শাখায় থাকার জন্য চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। বদ্রীনাথপুরী থেকে আগে আর অলকনন্দার বাঁদিকে রাস্তার ওপর ক্ষেত্র পেলাম। চিঠি পেয়েই কর্মচারীরা খুব অভ্যর্থনা করল। তারা থাকার একটি ভাল জায়গা করে দিয়ে চা আর গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিল। পাঞ্জাব-সিন্ধ ক্ষেত্র পশ্চিমের পাঞ্জাবী আর সিন্ধি ভক্ত-ধনীদের সম্মিলিত সংস্থা, যা স্থাপিত হয়েছিল এই শতাব্দী শুরু হওয়ার কিছু আগে। সময় যেতে যেতে এর দাতাদের সংখ্যা বাড়ল এবং হৃষিকেশে এদের ঘরগুলো নিয়ে একটি ছোটমতো পাড়া গড়ে উঠল। দেশবিভাগের পরে সেই দাতারা শুকনো পাতার মতো তাদের জন্মভূমি থেকে উড়ে গিয়ে ছড়িয়ে গেল। এখন তারা এমন অবস্থায় ছিল না যে, ক্ষেত্রকে আগের মতো উদারতা দিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু তবু যে টুকু পারে তারা করে। এখানকার ভক্তজীকে দেখলাম খুবই মধুর স্বভাবের।

বাচস্পতিকে রেখে আমি মাইল খানেক দূরে অবস্থিত নগরে গেলাম। এখনো দিনের দু-আড়াই ঘণ্টা বাকি ছিল। কোনো নতুন গাইড বই কিনতে চাইলাম। গোবিন্দপ্রসাদ নোটিয়ালের বই ও কয়লার দোকানে গেলাম। নাম শুনতেই বোঝা গেল, বহু বছর বিচ্ছেদের পর দেখা হলো আমাদের। তিনি তাঁর পথ-পঞ্জির নতুন সংস্করণ দিলেন। ওখান থেকে মন্দিরের সেক্রেটারি শ্রীপুরুষোত্তম বগওয়াড়ীর কাছে গেলাম। আমার নাম শুনেই তিনি তাড়াতাড়ি কোঠা থেকে নীচে নেমে এলেন আর বললেন, 'আপনি এক মাইল দূরে থাকতে পারবেন না। এখানে আমার অতিথি-ভবনে থাকতে হবে।' আমি বললাম, 'ঘোড়াকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' তিনি বললেন, 'ওকে ফিরিয়ে দেব, আমি অন্য ঘোড়া দিয়ে দেব।' বদ্রীনাথ থেকে এত তাড়াতাড়ি আমারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না।

অতিথিভবনটি ছিল খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নতুন বাড়ি। তার সবচেয়ে ভাল ঘরে আমাকে রাখা হলো। পরের দিন (১৮ ফেব্রুয়ারি) টাকা দিয়ে বাচস্পতিকে ছুটি দিয়ে দিলাম। খাবার আসত বদ্রীনাথের হোটেল থেকে। গঙ্গাসিংহ দুরিয়াল বদ্রীনাথের যে মহিমার কথা জানিয়ে ছিলেন তার প্রমাণ পেলাম যখন বাসমতী চালের ভাত সামনে এলো। বদ্রীনাথকে দর্শন করাটা দরকার ছিল, কেননা অনেক লোক লিখেছিলেন মূর্তিটি হচ্ছে বুদ্ধের। দর্শনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বলা হলো সকালবেলা, যখন মূর্তিকে নগ্ন করে স্নান করানো হয়।

বগওয়াড়ীজী গঙ্গাসিংহ দুরিয়ালকে আমার পথপ্রদর্শক করে দিলেন। দুরিয়ালরা বদ্রীনাথের চার মুখ্য মুরুব্বিদের মধ্যে পড়ে। বাকি তিন হচ্ছে মানা-র মারছা, জোশীমঠের জোশীয়াল আর ডিমরী পূজারী ব্রাহ্মণ। সবার ওপরে হচ্ছে মালাবারের নম্বুদরী রাওল।

সেদিন দুপুরের পর গঙ্গাসিংহকে নিয়ে আমি বসুধারার দিকে গেলাম। আসল লক্ষ্য ছিল মানা গ্রাম যাওয়া কিন্তু মানার সামনের ঝুলন্ত পুল কাঠের পাটা বসিয়ে ঠিক করা হয় নি।

জিজ্ঞেস করলে গঙ্গাসিংহ মারছা আর অন্য দুরিয়ালরা এই কথাই আওড়াত, 'বদ্রীনাথ ভুটানের থোলিঙ মঠের দেবতা ছিলেন। ভুটিয়াদের খাদ্য-অখাদ্য খাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি দেয়াল ফুটো করে বেরিয়ে পালান। ভুটিয়ারা ধাওয়া করে। মানাধুরার কাছে তাদের খুব কাছাকাছি আসতে দেখে বদ্রীনাথ অগ্নি-প্রাচীর তুলে দেন। লামা তাতেও পিছু হটে না, তাঁর গোঁফদাড়ি জ্বলে যায়। তখন থেকেই তিব্বতী লোকদের মুখে গোঁফ-দাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। হাতে ধরা পড়ে যাওয়া নিশ্চিত দেখে পাশেই চরতে থাকা চমরী গাইয়ের লেজে লুকিয়ে যান। এই উপকারের জন্য তিনি আশীর্বাদ দেন যে চমরীর লেজ আজ থেকে পবিত্র মনে করা হবে। তারপর তিনি এই জায়গায় আসেন। এখানে সে-সময় হর-পার্বতী থাকতেন। বদ্রীনাথের এই জায়গাটা পছন্দ হলো। তিনি দখল করার কথা ভাবতে লাগলেন। শিবের ত্রিশূলের সামনে তার কিসের ক্ষমতা? সেই জন্য বলের জায়গায় ছলের পথ গ্রহণ করলেন। দুরিয়ালদের গ্রাম বাওণী পাশেই ছিল। ওখানে এখনো সেই শিলা রয়েছে যার ওপর সদ্যোজাত শিশুর রূপ নিয়ে বদ্রীনাথ ট্যাঁ-ট্যাঁ করতে শুরু করেছিলেন। হর-পার্বতী বেড়াতে বেরিয়েছেন। বাচ্চাটিকে এককোণে পড়ে থাকতে দেখে পার্বতীর দয়া হলো। ওকে তুলে নিতে চাইলেন। অন্তর্যামী শংকর নিষেধ করলেন কিন্তু পার্বতী তাঁর বাৎসল্যের তাড়না সহ্য করতে রাজি হলেন না। তুলে নিয়ে এলেন। মন্দিরে রেখে দিলেন। দুজনে তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, তখন দরজা বন্ধ। কত খটখট করলেন কিন্তু ভেতর থেকে কেউ জবাব দিচ্ছিল না। পার্বতী চেঁচামেচি আর বকাবকি করতে লাগলেন। শংকর হেসে বললেন,'আমি বলেছি না, পৃথিবীতে অনেক ছল-প্রপঞ্চ আছে।' পার্বতীর কান লাল হয়ে গেল। শংকর তাকে শান্ত করতে করতে বললেন, 'শান্ত হও, শান্ত হও। পৃথিবী অনেক বড় জায়গা। ঝগড়া কোর না, চলো আমরা অন্য জায়গায় ঘর পাতব।' পার্বতী বললেন, 'আমি এর প্রতিশোধ না নিয়ে যেতে পারি না। তপ্তকুণ্ডের জল বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি যাতে ঠাণ্ডায় এই শয়তানের স্নান করার জন্য গরম জল না মেলে।' শংকর বললেন, 'তাতে এর ক্ষতি হবে না, খামোকা লোকে কষ্ট পাবে।' কিন্তু পার্বতী কিছু না করে যেতে রাজি হলেন না। তিনি শাপ দিলেন—এখন থেকে এই মাটিতে ধান হবে না। দশ হাজার ফুট ওপরে ধান? দুজনে নীচে নামতে নামতে যখন কাঞ্চনগঙ্গা নামের শুকনো নালার ওপর দিয়ে যাচ্ছেন, তখন দেখেন লোকে পিঠে করে বোঝা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পার্বতী শুধোলেন, 'কী নিয়ে যাচ্ছ?' লোকেরা জানাল,'ভগবানের জন্য বাসমতী চাল।' শংকর হেসে ফেললেন। পার্বতীর বুকে যেন ছুরি বিদ্ধ হলো। তাঁর শাপও ব্যর্থ গেল। এখানে চাল নেই কাজেই অন্য জায়গা থেকে বাসমতী চাল আসছে।

যেতে যেতে রাস্তার আশেপাশে দু-চারটি ঘর পেলাম। এরা ছিল মারছা। এরা নিজেদের খেতে ঘর বানিয়ে নিয়েছিল। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ছমাস এই জায়গা বরফে ঢাকা থাকে। এই সময় মারছারা তাদের পশুপ্রাণীদের নিয়ে নীচে বহু বছরের পরিচিত জায়গাগুলোতে চলে যায়। আবার এসে খেত প্রস্তুত করে। তবে শুধু যব অথবা আলুর চাষ করে। মানা পেরিয়ে মাতামূর্তি পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম। মাতামূর্তির ছোটমতো মঠ হালে কেউ বানিয়েছিল এবং তাতে একটি দরিদ্রের মতো মূর্তি বসিয়ে দিয়েছিল। এটিই বাবা বদ্রীনাথের মাতা। কলিযুগের ছেলে মায়ের কি সম্মান করবে, যখন তার দেবতাও তার মাকে জঙ্গলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তপস্যা

করতে বসাতে ছাড়ে না? ওখান থেকে ফিরে এলাম। সন্ধেয় পাণ্ডা-পঞ্চায়েত চা-পার্টির সঙ্গে রাহুল সাংকৃত্যায়নকে মানপত্র দিল। নাস্তিক রাহুল আর আস্তিক্যের অন্ন খাওয়া বদ্রীনাথের পাণ্ডা—কেমন বিরোধীদের সমাগম? তবে সংস্কৃতি হচ্ছে ধর্মের ওপরে, এটা ছিল তারই প্রমাণ। রেশন আর কন্ট্রোলের যুগ ছিল,ওখানে চা-পার্টিতে যত লোক জমা হয়েছিল তা কন্ট্রোলের সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল। তার ওপর শুধু চা-পার্টি নয়, সেই সঙ্গে এত বেশি খাবার ছিল যে এটাকে ভোজপার্টি বলা যায়। এটা আমাদের দেশের সীমান্তের শেষপ্রান্তের একটি অস্থায়ী নগরে ঘটছিল। এ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তরুণ পাণ্ডা-সন্তানরা কত এগিয়ে গেছে।

১৯ মে নির্বাণ-দর্শন করার ছিল। সকাল সাতটা নাগাদ আমি মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরে তিনটি অংশ আছে, সবার পিছনে গর্ভগৃহ, তারপর ছোটমতো মণ্ডপ, তারপর একটু বেশি বড় মণ্ডপ। গর্ভগৃহে নম্বুদরী রাওল আর তাঁর সাহায্যকারী ডিমরী পূজারী ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না, কেউ মূর্তিতেও হাত দিতে পারে না। আমি মধ্য-মণ্ডপের দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। মূর্তি সেখান থেকে তিন-চার ফুটের বেশি দূরে ছিল না। বগওয়াড়ীজীর নির্দেশ অনুসারে দীপের সলতেও খুব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি ওখান থেকে মূর্তিটি ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। স্নান করানোর জন্য মূর্তিকে নগ্ন করা হয়েছিল। একেই নির্বাণ-দর্শন বলে। মূর্তি ছিল কালো পাথরের। চোখ, নাক, মুখ নিয়ে একটি বড় মতো পাথরের খণ্ড। মনে হয়, কেউ যেন কেটে বের করেছে। কিন্তু এটিকে কাটা বলা ঠিক নয়, সম্ভবত হাতুড়ি দিয়ে জেনে-বুঝেই ভাঙা হয়েছে অথবা পাথরের মধ্যে ফেলাতে এই অংশটা বেরিয়ে গেছে। বাম হাতেরও পাথরের একটি আস্তরণ খসে গেছে। পদ্মাসনে বসা মূর্তির হাতের পাতা ছিল পায়ের ওপর। ডান হাত থেকেও অনেকটা পাথরে খসে গিয়েছিল যা ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ছিল মনে হয়। মূর্তিটি যে পদ্মাসনে বসা ভূমিস্পর্শ মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধ, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। রাওলজী পরে জানিয়েছিলেন যে, বুকের ওপর উপবীতের রেখা আছে। এর ফলে জৈন মূর্তি হওয়ার সন্দেহও দূর হয়ে গেল। কেননা তারা প্রায় দিগম্বর হয়। একাংশ চীরধারী বুদ্ধমূর্তির চীবরের রূপটি উপবীতের মতো মনে হয়, এ কথা সবাই জানে। পাশেই আরও অনেক মূর্তি ছিল যার মধ্যে নারদজীর ধাতুমূর্তিও বুদ্ধমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল। রাওল জানালেন যে. বেদির আসনে কিছু রেখা আছে যা ফুল, পাতা বা অক্ষর হতে পারে। পুরনো রাওল আরও সমর্থন করলেন। ২১ মে তিনি বললেন,'এই মূর্তি বুদ্ধমূর্তি হওয়ায় আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি সারনাথ আর অন্য জায়গাতে এই রকম মূর্তি দেখেছি।' তিনি এও বললেন—১· নীচে অলকনন্দার সঙ্গে সেঁটে থাকা নারদকুণ্ডে আরও মূর্তি আছে। শরতের মাসগুলোতে জলধারা ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার পর নারদকুণ্ড আলাদা হয়ে যায় কিন্তু তা চাটান পাথরে ঢাকা থেকে যায়, অতএব অন্ধকারাবৃত হয়ে থাকে। আমাকে লোকে বলেছিল যে, মুখে তেল ভরে কুলকুচো করলে ওখানে আলো বেশি হয়ে যায় আর তাতে মূর্তিগুলো দেখা যায়! আমি ওই রকম করলাম এবং জলে পড়া মূর্তিগুলো দেখলাম। ২· বদ্রীনাথের মূর্তিটি বুদ্ধের, তিনি পদ্মাসনে রয়েছেন, বাহু আর মুখের অনেক পাথর খসে গেছে। বুকের ওপর উপবীতের মতো রেখা, মাথার পিছনের অবশিষ্ট অংশে কেশ রয়েছে বলে মনে হয়। ৩· আমি মনে করি যে, প্রাচীন বদ্রীনাথ-মূর্তি নষ্ট হওয়ার পর পূর্বের আকারের বুদ্ধমূর্তি এনে তার জায়গায় রেখে দেওয়া হয়েছে। ৪· ভাস্কর্যের শিল্পকলার দৃষ্টিতে মনে হয়

অখণ্ড থাকার সময় মূর্তি খুব সুন্দর ছিল।

কল্পনা ছুটতে শুরু করে বলতে লাগল—হিমালয় থেকে তিব্বতী শাসন লোপ পাওয়ার সময় যে রক্তযুদ্ধ হয়েছিল তাতে তিব্বতীদের বিশেষ পক্ষপাত থাকায় বৌদ্ধ বিহার এবং মূর্তিও যবের সঙ্গে ঘুণের মতো পিষ্ট হয়ে গেছে। এইভাবে নবম বা দশম শতাব্দীতে এখানকার বিহারের এই বুদ্ধমূর্তি এবং আরও অন্য মূর্তিগুলি ভেঙে বা এমনিই অঙ্গ-ভঙ্গ হয়ে নারদকুণ্ডে চলে গেল। নারদকুণ্ড রূপকুণ্ডের মৃতদেহের মতো এরকম মূর্তিগুলোর সংগ্রহালয় হয়ে গেল। বুদ্ধমূর্তির ওপর ধাতু বা পাথরের বদ্রীনাথের মূর্তি স্থাপন করে দেওয়া হলো। ১৭৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা এলো। তারা মন্দিরের ধনসম্পত্তি লুটে নিল আর মূর্তিগুলো গলিয়ে দিল অথবা ভেঙে-চুরে জলে ফেলে দিল। আবার পুরনো মন্দির মেরামত করার ইচ্ছে হলো। স্থাপন করার জন্য নারদকুণ্ডের এই ভাঙা বুদ্ধমূর্তি হাতে পাওয়া গেল। তাকে কিছুদিন তপ্তকুণ্ডের ওপর রাখা হলো। তারপর গাড়োয়ালের রাজা তার জন্য বর্তমান মন্দির বানিয়ে দিল, সেখানে সেটি স্থাপিত হলো।

চা খেয়ে কলকাতার ডাক্তার হিমাংশু ঘোষ ও গঙ্গাসিংহ দুরিয়ালের সঙ্গে অলকনন্দা পার হয়ে ওপরের দিকে মানা গ্রামে চললাম। এখন নীচের থেকে খুব কম লোকই এসেছিল। কয়েকজন স্ত্রীলোক এ-সময় পিঠে মালপত্র বা বাচ্চা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরছিল। ভারতের এই প্রান্তিক গ্রাম মানা খুব বড়। আড়াই বছরের ওপর হয়ে গেছে ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের কোনো জিনিস যদি চোখে নতুন লাগে, তবে তা হলো পুলিস চৌকির জন্য দেওয়া গ্রামের কয়েকটা ঘর, যেগুলোতে আগে থেকেই কার্তুজ রাখা হতো। দারোগা সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি অস্বাভাবিক মোটা। পাহাড়ী জায়গার পক্ষে মোটেই এই শরীর উপযুক্ত নয়। মানার পরে দ্বিতীয় গ্রাম তিব্বতে অর্থাৎ চীন গণরাজ্যে পড়ত তাই এখানে ভারত সরকার সতর্ক থাকতে চাইত। সর্দার পানিক্কর তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে, চীনকে সমর্থন করার ব্যাপারে ভারত সরকার দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল—সর্দার প্যাটেল, রাজাজী এবং পুরনো আমলাতন্ত্র সমঝোতার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, এর ফলে আমেরিকা রেগে যাবে। কিন্তু নেহেরুজী পক্ষে ছিলেন। উত্তর-প্রদেশের মন্ত্রী, এখন মুখ্যমন্ত্রী, বাবু সম্পূর্ণানন্দ উত্তরের প্রতিবেশীদের নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। এই জন্য তিনিও সীমান্তকে শক্তিশালী করার পক্ষে ছিলেন। মানা গ্রামের আগে অলকনন্দায় একটি প্রাকৃতিক পুল আছে যাকে 'ভীমসেনের পুল' বলা হয়। লোকে বলে পরে আরও একটি এই রকম পুল আছে। সমস্ত মানাবাসীরা বদ্রীনাথকে তিব্বতীদের দেবতা মনে করে, যা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান বদ্রীনাথে কোনো সময়ে বেশ ভাল একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, যার সম্পর্ক ছিল তিব্বতের থোলিঙ মঠের সঙ্গে। এখনো দুটি মন্দিরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। তারা একে অন্যের কাছে উপহার পাঠায়। তিব্বতের এই পশ্চিম অংশ বহু শতাব্দী ধরে ডাকাতদের শিকারক্ষেত্র ছিল। কিন্তু মানাবাসীদের মতো আমাদের ব্যবসায়ীদের তার জন্য ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে হতো। কমিউনিস্টরা সদ্য এসেছিল বলে তখনই ডাকাতদের উচ্ছেদ করা যায় নি। এক-আধ বছর পর মানাবাসীদের বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে না, নিয়ে গেলেও তা সীমান্তে চীনা ফৌজের চৌকীতে রেখে দিতে হবে। কিন্তু তখন তো বন্দুক খুবই

দরকার ছিল। মানাবাসীরা পনেরটি বন্দুক চেয়েছিল কিন্তু আমাদের কাঠের তৈরি সরকারি যন্ত্রপাতি নিজের ঢঙেই চলে, অন্যের ধন-প্রাণের জন্য তার কিসের চিন্তা? কোনো রকম উদারতা দেখালে একটি বড় সিদ্ধান্তের অবহেলা করতে হয়—এখানকার সরকারের কাছে ভারতের জনতা আগে যেমন বিপজ্জনক ছিল, মনে হয়, বর্তমান সরকারও তাদের সেইরকমই মনে করে বলে জনতাকে নিরস্ত্র রাখতে চায় এবং ইংরেজদের তৈরি অস্ত্র-আইনে সরকার একটুও ঢিলে দিতে রাজি নয়।

মানা থেকে ফিরে আমি মধ্যাহ্ন-ভোজন করলাম সিন্ধু-পাঞ্জাব-ক্ষেত্রের ভগতজীর বাড়িতে। তিনি দুঃখ পেতেন যদি তাঁর আতিথ্য ছেড়ে অতিথিশালায় চলে আসতাম। এখানে সব জিনিসেরই খুব দাম ছিল। আটা আড়াই টাকা থেকে কত আর কম হবে? অন্যান্য জিনিসও, যা চামোলী থেকে মোটরে করে নামানো হতো বা গরুড় (আলমোড়া) থেকে খচ্চরের পিঠে এখানে আসত, ভাড়ার জন্য তার দাম খুব বেড়ে যেত। সদাব্রতের পক্ষে অবশ্যই এটা খুব কঠিন সময় ছিল। যে-টাকায় আগে তারা একশো লোককে খাওয়াতে পারত, তাতে এখন কুড়িজনকেও দিতে পারে না। তার ওপর সিন্ধ-পাঞ্জাব-ক্ষেত্র তো ছিল এমন দাতাদের যাদের নীড় ধ্বংস হয়ে গেছে।

ফিরে এসে বদ্রীনাথের পুরনো কাগজপত্র দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। জানা গেল অধিকাংশ কাগজপত্র জোশীমঠে আছে। বগওয়াড়ীজীর সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে, ওখানে কাগজের বেশ ডাঁই জমে আছে। এখানে আমি সপ্তদশ শতাব্দীর বইগুলো পেলাম। এতে জিনিসপত্রের দামই শুধু নয়, এমনকি কখনো কখনো কোনো মোকদ্দমায় রাওলের দেওয়া রায়ও নথিভুক্ত করা আছে। সে-সময় দাসপ্রথা ছিল, হতে পারে দাস-দাসীদের কেনাবেচার প্রসঙ্গও এতে আছে। গোর্খা শাসনের আগেকার এবং তাদের সময়েরও কাগজপত্র পাওয়া যাবে, যা থেকে গাড়োয়ালের ইতিহাসের ওপর আলো পড়তে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বছর ডক্টরেট বের করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই 'জ্ঞান নেই, আছে জ্ঞানীর চকচকে মোড়ক'[১] অনুসারে ঝটপট পি এইচ ডি বা ডি লিট হতে চায়। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে কি জোশীমঠের বিবরণী এবং কেদারনাথ-বদ্রীনাথের পাণ্ডাদের বইগুলোর অনুসন্ধানের কাজে লাগানো যেত না? আমি বগওয়াড়ীজীকে খুব করে বললাম যে, অক্টোবরে নারদকুণ্ডের ভেতরের মূর্তিগুলোর পরীক্ষা হওয়া দরকার। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে-ব্যাপারে কিছু হয় নি।

মন্দিরের ঘোড়াগুলোর অন্যান্য ঘোড়ার মতো কাজ না থাকায় ঘাস খাওয়ার জন্য তাদের নির্জনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানে ঘোড়ারা মাঝে মাঝে মাসের পর মাস জংলী ঘোড়ার জীবন যাপন করে। সন্ধেতেই গঙ্গাসিংহকে তাগিদ দেওয়া হয়েছিল তিনি যেন খুব সকালেই ঘোড়া নিয়ে আসেন।

২০ মে সকালে গঙ্গাসিংহ দুরিয়াল ঘোড়া আনতে গেলেন। আমি ভেবেছিলাম সাতটার সময়

---

[১] এই ভাবার্থে লেখক এখানে একটি আঞ্চলিক প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। প্রবাদটি হলো—*হলদী ন জানে ফিটকরী, রংগ চোখা আ এ।* —স· ম·

বেরিয়ে পড়ব, কিন্তু আমাদের বদ্রীনাথ থেকে বেরোতে খুব সময় লেগে গেল। বগওয়াড়ীজী সবরকম সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মাত্র দুদিনেই এখানে কত বন্ধু হয়ে গিয়েছিল যাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রভাব মনের ওপর পড়াটা অনিবার্য ছিল। সিন্ধ-পাঞ্জাব-ক্ষেত্রে খাবার খেয়ে আমরা এগারোটার সময় ওখান থেকে রওনা হলাম। শুধু উতরাই আর উতরাই ছিল, তবে তার জন্য পা-ও প্রস্তুত ছিল। শুকনো কাঞ্চনগঙ্গা পার হয়ে হনুমান চটি ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি শ্যামলিমা দেখার জন্য উতলা হয়ে বিনায়ক চটিতে পৌঁছলাম। গঙ্গাসিংহ পিছনে থেকে গিয়েছিলেন এজন্যও একটু প্রতীক্ষা করতে হলো। এখানে মানাবাসী কিছু লোক পেয়ে গেলাম। তারা বলতে লাগল, 'হাজার হাজার বছর ধরে ভেড়া-ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশু নিয়ে আমরা গরমের সময় নিজেদের গ্রামে আসি এবং শীতে সমতলে চামোলী বা চামোলী ছাড়িয়ে চলে যাই। আগে কখনো ওখানে হয়তো জঙ্গল ছিল যার ফলে আমাদের পশুগুলোর চরার সুবিধে ছিল। সে-সময় বোঝা বওয়ার জন্য মোটর আসে নি, এখন তো ওখানকার লোকদের গালি শোনা ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই। আমাদের পশু কারু খেতে চলে গেলে তো মাথা ফাটাফাটি হবে আর জঙ্গলে যদি যায় তো ঝগড়া।' আসলে দুরিয়াল লোকেরাও তো সমতলে যায় না। তারা বিনায়ক, পাণ্ডুকেশ্বরেই তাদের শীতের দিনগুলো কাটিয়ে দেয়। তারা বিনায়কের সামনের দেবদারু আর জঙ্গলগুলো দেখিয়ে বলল, 'সরকার এখানেই আমাদের জমি দিয়ে দিক। আমরা নিজেদের জন্য শীতের গ্রাম পত্তন করি।' এটি সম্পূর্ণ ন্যায্য দাবি ছিল। জনহিতের কথা মনে রাখে যে সরকারি প্রশাসন তার পক্ষে তো এটা করা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের সরকারি প্রশাসন-যন্ত্রে কাউকে বোঝার ক্ষমতা রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। পাঁচ বছর পরও আজ মানবাসীরা সেই চিন্তায় ঝুলছে।

পাণ্ডুকেশ্বরে অল্প সময় দাঁড়িয়ে কয়েকটা ফটো তুললাম, যার মধ্যে মানার এক মারছা-সুন্দরী কাপড় বুনছে এই ছবিও ছিল। নীতী এবং মানা দুটিই হচ্ছে মোন্ বা চিরাত জাতির লোকদের বসতি। এই লোকেরা তোলছা আর মারছা এই দুটি জাতিতে বিভক্ত। তোলছারা এক ধরনের গাড়োয়ালী ভাষা বলে আর মারছা হচ্ছে দোভাষী। তারা তোলছারও ভাষা বলে আবার নিজেদের ভাষাতেও বলে। মারছা-ভাষা হচ্ছে কিরাত-ভাষা। জলকে তারা 'তী' বলে। মানা থেকে এগিয়ে একটি নির্জন বিরতিস্থল তীপানী নামে বিখ্যাত। অর্থাৎ দুটি ভাষার একই অর্থের শব্দকে এতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জলের জন্য 'তী' শব্দটি চম্বার লাহুল থেকে শুরু করে আসামের নাগা লোকেদের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিরাত লোকেরা মঙ্গোল ছিল, যদিও চীনা ও তিব্বতী ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার সম্পর্ক খুব দূরের কিন্তু এদের মুখে মৃদু মঙ্গোলিয়ান ছাপ দেখে লোকে তাদের তিব্বতী মনে করে ভুল করে। এরা তিব্বতী নয়, এরা মারছাদের ভাষা বলে। মারছা মেয়েরা সাজার সময় পা পর্যন্ত ঝোলা একটি ওড়না লাগায় যার মাথার সামনের অংশ কিংখাব দিয়ে বা অন্যভাবে খুব অলংকৃত থাকে। জানা যায়, এটা তাদের বহু পুরনো পোশাক। সম্ভবত কত্যুরী অথবা তিব্বতের রানীরা চাদর নিয়ে এভাবে সাজত।

আমরা পৌনে পাঁচটায় ঘাট চটিতে পৌঁছে গেলাম। সামনে অনেকটা দূরে ভাল চটি পাওয়া যেত আর জোশীমঠ ছিল ছ-মাইল দূরে, সেখানে থাকার অসুবিধে ছিল। এজন্য রাতে ঘাটেই থেকে গেলাম। আজ কোথাও ঘোড়ায় চড়ার প্রয়োজন অনুভব করি নি। রাতে তাকে

খাওয়ানোর জন্য দশ-বারো টাকার ঘাস এলো, তাও সহজে পাওয়া যেত না যদি না গঙ্গাসিংহ কোনো জায়গা থেকে তা জোগাড় করে আনতেন। ঘাট চটি থেকে একটুই ওপরে অলকনন্দা,তা পার হওয়ার জন্য একটা পুল বানানো আছে। পেরনোর পর হেমকুণ্ড আর ফ্লাওয়ার ভ্যালি (পুষ্প-উপত্যকা)-র রাস্তা যাচ্ছে। ফ্লাওয়ার ভ্যালি বর্ষার দিনে হাজার রকমের ফুলের উদ্যান হয়ে যায়। এর খ্যাতি এখন ভারতের বাইরেও পৌঁছে গেছে। হেমকুণ্ড হচ্ছে খুবই রমণীয় জায়গায় একটি প্রাকৃতিক সরোবর। কোনো শিখ ভক্ত এটিকে দেখে গ্রন্থসাহিব থেকে বাণী বের করে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, দশমেশ গুরু গোবিন্দ সিং আগের জন্মে এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন। যাক, হিমালয়ে শিখদেরও একটি সুন্দর তীর্থ স্থাপিত হয়ে গেল, না হলে এই একটা মস্ত অভাব থেকে যেত। জৈনদেরও কোনো জায়গা খুঁজতে হবে। তীর্থযাত্রার ছলে লোকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি ভালবাসা জন্মে যায়, তাদের মধ্যে যাত্রার জন্য সাহসের উদ্রেক হয়। হেমকুণ্ড এখান থেকে ১২ মাইল বলা হচ্ছিল অর্থাৎ ততটাই দূরে যতটা দূরে বদ্রীনাথ।

জোশী মঠ—২১ মে ছিল সোমবার। জোশীমঠে কিছু কাজও ছিল, বিশেষ করে রাওল বাসুদেবের সঙ্গে দেখা করা এবং আজই সামনে এগিয়ে যাওয়ার ছিল। আমরা পাঁচটাতেই বেরিয়ে পড়লাম। বিষ্ণু প্রয়াগ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ধৌলী গঙ্গা পেরিয়ে জোশীমঠের চড়াই শুরু হলো। ঘোড়া কাজে লাগল। ধৌলীগঙ্গা নীতীঘুরা থেকে আসছে আর অলকনন্দা মানাঘুরা থেকে। 'ঘুরা' এখানে ডাঁড়াকে (জোত, গিরিপথ, কোতল) বলা হয় অর্থাৎ যেখানে সবচেয়ে নিচু কোনো পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ পার হওয়া যায়। এই দুটি ঘুরা পার হয়ে তিব্বত যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। দুটি নদীর স্রোতের দূরত্ব আর দুটির ধারাকে দেখে এটা বলা মুশকিল হয়ে পড়ে যে, এদের মধ্যে কে গঙ্গার প্রধান ধারা। আজকাল তো অলকনন্দাকেই বলা হয়। অলক 'কেশ'-এর নয়, কুবেরের অলকার সংক্ষিপ্ত রূপ। আর নন্দা 'ননন্দ' অর্থাৎ 'ননদ'-এর। পার্বতী-গৌরী তাঁর বাপের বাড়িতে নন্দা নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন, এজন্য তাঁকে নন্দাদেবী বলা হয়। এই নামে প্রসিদ্ধ গাড়োয়াল-কুমায়ুনের সীমায় অবস্থিত শিখর এখন ভারতের সর্বোচ্চ শিখর। কৈলাশের কাছে কোথাও কুবেরের অলকাপুরী ছিল। অলকনন্দার উপত্যকায় বদ্রীনাথের মন্দির রয়েছে যা আগে বৌদ্ধবিহার ছিল। এটি পাণ্ডুকেশ্বরেরও প্রাচীন মন্দির, যাকে বৌদ্ধ বলা যায় না। ধৌলীর উপত্যকায় জোশীমঠ থেকে মাত্র কয়েক মাইল ওপরে তপোবন। সেখানে গরম জলের কুণ্ড এবং পাঠানদের দ্বারা ধ্বস্ত কিছু পুরনো দিনের মন্দিরও আছে। কত্যুরীদের বিবরণীতে তপোবন আর বদ্রীনাথের উল্লেখ রয়েছে, তা এর জন্যেও হতে পারে। ভবিষ্যৎ-বদ্রীর কল্পনা সম্ভবত ভূত-বদ্রীর ভাবনা থেকেই এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই বদ্রী হচ্ছে ধৌলীর উপত্যকায়, সেজন্য প্রাচীন ঐতিহাসিক সামগ্রীর বিচারে ধৌলীর গুরুত্ব কম নয়।

জোশীমঠে আমি প্রথমে নরসিংহ ও পরে কত্যুরী যুগের মূর্তি আর মন্দিরগুলো দেখলাম। ৪১ বছর আগের যাত্রা থেকে মনে পড়ছিল, এখানে তখন আরও বেশি মূর্তি দেখেছিলাম। রাওল সাহেবও এই কথা সমর্থন করলেন। জানা যায়, পুরনো মূর্তিপ্রেমিক বা ব্যবসায়ীরা এখানে আসত আর অরক্ষিত মূর্তিগুলো চুপি চুপি সরিয়ে ফেলত। তিনি জানালেন, 'আমি এখানে সূর্যের একটি খণ্ডিত মূর্তি আগে দেখেছিলাম কিন্তু এখন সেটি পাওয়া যায় না।' মুসলমানদের

মূর্তিভাঙার ঘটনাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় চট্ করে বিশ্বাস করতে চায় না, কেননা তাতে দেবতার দিব্যশক্তির প্রতি অপবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু কোথাওই দেবতার মূর্তি ভাঙা থাকলে এই অপবাদ তো দেওয়া হবেই। সোমনাথের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। বিশ্বনাথের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। উজ্জয়িনী মহাকালেরও একই অবস্থা হয়েছে। তাহলে অপবাদ দেওয়া থেকে কাঁহাতক তাদের বাঁচানো যেতে পারে? হয়তো দেবতাদের নিজেদেরই এই ইচ্ছে ছিল। রাওলজী জানালেন যে, তপোবনের মূর্তি ভাঙা কিন্তু জোশীমঠে পাওয়া মূর্তিগুলির বেশির ভাগই ভাঙা নয়। এর ব্যাখ্যা এটাই হতে পারে যে, হয়তো পূজারীরা মুসলমানদের প্রচুর টাকা দিয়েছিল অথবা মূর্তিগুলো লুকিয়ে ফেলেছিল। রাওলজী এটাও জানালেন যে, থোলিঙ্ থেকে প্রতি বছর চিঠি আসে যাতে বদ্রীনাথ 'আমাদের দেবতা' লেখা থাকে।

জোশীমঠ অঞ্চলে সরকারের পক্ষ থেকে ফল সংগ্রহ করে রাখার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। লোকেরা নিজেরাই আপেল, কমলা আর অন্যান্য ফল ফলিয়েছে। তাদের স্বাদ এবং আকার দেখে বোঝা যায় এটি ফল চাষের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যতক্ষণ জোশীমঠ বা তার নীচ পর্যন্ত মোটরের জন্য রাস্তা না হচ্ছে ততক্ষণ এ ব্যাপারে কোনো প্রগতি সম্ভব নয়। রাস্তায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তিনি গত বছরের কয়েকটা আপেল খেতে দিয়ে বলেন, আমরা বেশিদিন এগুলোকে সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতি জানি না। যদি মাটির নীচে ঘর করে তার মধ্যে শীতের বরফ জমা করা যায় তাহলে ফল সুরক্ষিত রাখার কোনো সমস্যা থাকে না। কিন্তু এটা খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। সাধারণ গৃহস্থ কিভাবে তা বহন করবে? সবচেয়ে ভাল হয় এখানে মোটর আসুক আর সেই দিনই এই ফল কোটদ্বার এবং পরের দিন দিল্লী পৌঁছে যাক।

জোশীমঠে শংকরাচার্যের গদি দু-আড়াইশো বছর শূন্য ছিল। অনেক আগে কত্যুরীদের সময়ে এখানে শঙ্করাচার্য নয় বরং পাশুপতদের সন্ধান পাওয়া যায়। কত্যুরী-রাজা ছিলেন 'পরম মাহেশ্বর', সেজন্য শঙ্করাচার্যের সময় এখানে তাঁর কোনো বড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কি না, তা সন্দেহজনক। হ্যাঁ, কত্যুরীদের পরে পাশুপতদের প্রাধান্য শংকরাচার্যের মতানুগামীরা ছিনিয়ে নিল। সে-সময় তপোবন বা বদ্রীনাথের বদ্রীমন্দির এদের হাতে চলে আসে। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে গদিঘরের সন্ন্যাসীর মৃত্যুর পর গাড়োয়ালের রাজা নম্বুদরী ব্রাহ্মণকে গদিতে বসিয়ে দিলেন। এদিকে তিনদিকে শংকরাচার্যের তিনটি বড় বড় মঠ থাকাকালীন উত্তরদিকটা শূন্য দেখে বৈদান্তিকদের খারাপ লাগত। ভারত ধর্মমহামণ্ডলের স্বামী জ্ঞানানন্দ তা উদ্ধার করতে উদ্যোগী হলেন এবং নিজের শিষ্য স্বামী দয়ানন্দকে শংকরাচার্য বানাতে চাইলেন। কিন্তু শংকরাচার্যের সারদা, গোবর্ধন, শৃঙ্গেরী মঠের গদিঘরে বসেন দণ্ডী সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানানন্দ আর তাঁর শিষ্য হয়তো প্রথাগতভাবে অদণ্ডী সন্ন্যাসীও ছিলেন না, তাই বাকি তিনজনের শংকরাচার্যর সমর্থন পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাই হোক, প্রশ্ন তুলে ছিলেন স্বামী জ্ঞানানন্দই। যখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় এলো তখন উত্তরেরই এক দণ্ডীর পক্ষ দেখা গেল শক্তিশালী এবং গোরক্ষপুরের পঙ্ক্তিপাবন সরযুপারী কুলের একজন বিদ্বান এবং সদর্থে চালাক-চতুর মহাপুরুষ এই গদি পেলেন। শূন্যগদি ছিল, এজন্য সমস্ত ব্যবস্থা শংকরাচার্যর করার ছিল এবং এতে সন্দেহ নেই যে তিনি শূন্যগদি ভালভাবেই জনপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। জোশীমঠে পীঠ তৈরি হলো কিন্তু এখানে থেকে মঠের দেখাশোনা এবং উন্নতি করা সম্ভব ছিল না বলে জ্যোতিষ পীঠের

শংকরাচার্যকে বেশির ভাগ সময় বাইরে থাকতে হতো।

জোশীমঠ থেকে এগিয়ে আমি খনোটী চটিতে এলাম। এখানে দোকানদারের ঘরের কাছে টাটকা-টাটকা পেঁয়াজ দেখলাম। আমি বললাম, 'তোমার এখানে জিনিসপত্র নিয়ে আমি ভোজন করতে পারি, যদি তুমি পেঁয়াজগুলোর মধ্যে থেকে কিছু আমাকে দাও।' দিতে আপত্তির কি ছিল? আসলে সব ধর্মধ্বজাধারী নীচের যাত্রীরা বোধহয় পাশের পেঁয়াজ-খেতের বিষয়ে জানেই যে, এ নিজের খাওয়ার জন্য এগুলি লাগিয়ে রেখেছে। সত্যিসত্যিই যাত্রীদের ওপর উত্তরাখণ্ডের এত প্রভাব পড়েছে যে, কয়েক মাসের জন্য লোক মাছ-মাংস তো দূরের কথা, পেঁয়াজ-রসুনের সঙ্গেও নিজের সম্পর্ক ছেদ করে দেয়। যদিও ঋষিরা দুটি হাত তুলে বার বার ঘোষণা করেছেন—'উত্তরে মাংস ভোজনম্'। সে-সময় আর খুব দূরে নেই যখন শুধু পেঁয়াজ-রসুনই সুলভ হয়ে পড়বে না সেই সঙ্গে এই চটিগুলোতে ডিম আর ওমলেটও পাওয়া যাবে। রান্নাবান্না করা মাংস আর মাছও পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের প্রজন্মকে তো এখন সেই দিনগুলোকে বিষাদের দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। দোকানদার খুব ভাল চাল দিয়েছিল। বহুদিন পর গঙ্গাসিংহ পেঁয়াজ দিয়ে আলুর যে তরকারি বানিয়েছিলেন তা স্বর্গীয় ব্যঞ্জনের মতো মনে হচ্ছিল।

খাওয়া এবং বিশ্রামের পর আমরা গরুড় চটি পৌঁছলাম। এখন দিন ছিল তবু যাত্রীদের ভিড় ছিল। দেরি করে পৌঁছলে রাতে থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল হয় বলে এখানেই থেকে গেলাম। আজ ২১ মাইল হেঁটে এসেছিলাম। এখন চামোলী আর ১৩ মাইল।

২২ তারিখে সকাল সাড়ে চারটেতেই বেরিয়ে পড়লাম। ঘোড়ায় চড়ে হাটের পুল পার হলাম। হাট এধারের পাহাড়গুলোর মধ্যে রাজধানী বা বড় নগরের পর্যায়ে পড়ে। এখানকার কত্যুরী যুগের প্রাচীন মন্দির তা সমর্থন করছিল। হাট কোনো বড় গ্রাম নয়।

মঠে পৌঁছে আমরা চা খেলাম। সাড়ে নটার সময় চামোলীতে সোজা হাসপাতালে গেলাম। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সুন্দরিয়ালজীর চেয়ে ড· বিশ্বাস কম উৎসুক ছিলেন না। তিনি চেষ্টা করলেন যদি দ্রুতগামী বাস পাওয়া যায়। কিন্তু বাস পেলেও তাতে কোনো জায়গা খালি ছিল না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য ড· বিশ্বাস তাঁর বাংলোয় নিয়ে গেলেন। আমি সর্বভূক আর ড· বিশ্বাস ছিলেন মৎস-প্রেমিক। তিনি আফসোস করছিলেন যে এখানে ভাল কোনো খাবার জিনিস পাওয়া যায় না, যদিও এটা বাস স্ট্যান্ড। চামোলীতে মাছ দুর্লভ ছিল অথচ এখান থেকে কয়েক মাইল পরই গোহনার মহাসরোবরে লাখ-লাখ রুই খাদকের প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু ড· বিশ্বাসের খাবার কম সুস্বাদু ছিল না। আর যে ভালবাসা নিয়ে তা সামনে রাখা হয়েছিল তা তাকে আরও মিষ্টি করে তুলেছিল। ভাল চালের ভাত আর আলু-পেঁয়াজের তরকারি। খেয়ে বিশ্রাম করলাম। নিশ্চিত ছিলাম যে তিনটের বাসে জায়গা পেয়ে যাব।

এসময় বদ্রীনাথ থেকে ফেরা যাত্রীদের খুব ভিড় ছিল। আমি বাসে বসে গেলাম কিন্তু কতলোক তাতে জায়গা পেল না। নন্দপ্রয়াগ আর কর্ণপ্রয়াগ হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছলাম। সেখানে আমার চেনা বাস-রাস্তা পেয়ে গেলাম। রাস্তায় এক জায়গায় মোটর একটু খারাপ হলো তাও সাড়ে নটায় আমরা শ্রীনগর পৌঁছে গেলাম। খড়্‌গসিংহ স্ট্যান্ডে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বাড়িতে গরমাগরম খাবারও তৈরি ছিল কিন্তু যাঁদের সঙ্গে আমি বাসে চড়ে ছ ঘণ্টা এসেছি তাঁদেরও আমার ওপর অধিকার জন্মে গিয়েছিল। তাঁরা বললেন, 'চলুন, আজই কীর্তিনগর চলে যাই।'

তাঁদের কথাই মেনে নিতে হলো। মালপত্র বওয়ার জন্য লোক পাওয়া গেল। পুরো বাসের যাত্রীরা জ্যোৎস্না রাতে অলকনন্দার দিকে চলল। পুল পার হয়ে কীর্তিনগরে বাসস্ট্যাণ্ডে কোনো একটা গাছের নীচে আমরা শুয়ে পড়লাম।

২৩ তারিখ ভোর পাঁচটায় হৃষিকেশের টিকিট পাওয়া গেল। সূর্যোদয়ের আগেই বাস ছাড়ল। কীর্তিনগর থেকে হৃষিকেশ, আর চামোলী থেকে কোঠগড়ের রাস্তা প্রাইভেট বাস-মালিকদের হাতে রয়েছে। তাদের কাছে ভ্রমণকারীদের কোনো দাম নেই। এর ফলে যাত্রীদের খুব কষ্ট হয়। সারা ভারতবর্ষের যাত্রী যে-রাস্তায় যায় সেখানে সবার আগে সরকারি রোডওয়েজ-এর বাস চলা উচিত কিন্তু বাসের মালিকরা ওপর মহলকে প্রভাবিত করে এবং এই কাজ হয়ে ওঠে না। দুটো বাসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটি দ্রুত চলছিল না আবার রাস্তাও ছাড়ছিল না। অন্যটি তার চেয়ে আগে যাওয়ার জন্য কোমর বেঁধে ছিল। দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের কষ্টভোগ করতে হচ্ছিল। পথে ব্যাসী চটিতে দুদিকের বাসই দাঁড়াল। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম মিলল। এখানে রুটি-তরকারি, লুচি-তরকারি পাওয়া যায়। সময়টাও খাওয়ার উপযুক্ত ছিল বলে সবাই খেতে লাগল। আমাদের বাসে সব মহিলারা ধর্ম করতে যাচ্ছিল কিন্তু কি জানি দুদণ্ডের বন্ধুত্বে তাদের কোন স্বার্থে ঘা লাগল যে তারা সারাটা রাস্তা বাকযুদ্ধ করতে করতে এলো।

সাড়ে এগারোটায় হৃষিকেশ পৌঁছলাম। দেরাদুনের টিকিটও পাওয়া গেল, বাসও প্রস্তুত ছিল। দুপুরের রোদ মাথার ঘিলু গলিয়ে দিচ্ছিল। যত শিগ্‌গির পারি এখান থেকে পালাতে চাইছিলাম কিন্তু ড্রাইভারের সে-ব্যাপারে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে সাড়ে বারোটায় এখান থেকে বেরলো আর দু-ঘণ্টায় ২৭ মাইল গিয়ে দেরাদুন পৌঁছল।

পণ্ডিত গয়াপ্রসাদ শুক্লের ঘরে পৌঁছলাম।গরমের জ্বালায়খুব উত্যক্ত ছিলাম। সাহিত্যসংঘে ভাষণ দেবার কথা মেনে নিয়েছিলাম বলে দুটো দিন এখানে থাকা দরকার ছিল। নিজের বোকামির জন্য পস্তাচ্ছিলাম। শুক্লজীর কাছ থেকে শুনে খুব আনন্দ হলো যে, কমলা বিশারদ পাস করে গেছে।

২৪ তারিখে দিনের বেলা সামান্য বৃষ্টি হলো বলে তাপমাত্রা একটু নীচে নামল। ফিল্ম ধোয়ার জন্য দিয়েছিলাম, অধিকাংশ ভাল এসেছে।

২৪ মে সাথী মহমুদকে খুঁজতে বেরোলাম। তাঁর বাবার বাংলো একবার দেখেছিলাম, কিন্তু সে অনেক বছর আগের কথা। যাক, কোনো রকমে ১২ নং সারকুলার রোডে পৌঁছলাম। মহমুদের টাইফয়েড হয়েছিল। বেচারি রশিদা কয়েক বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন (পরে তাতেই তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল)। দুজনের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরা জানালেন, 'এখন আমরা এখানেই থাকতে চাই।' পৈতৃক গৃহে মহমুদের বোন চক্ষু-চিকিৎসার হাসপাতাল খুলতে যাচ্ছিলেন। তাঁর ঘর শরণার্থীরা দখল না করলেও তারা বাইরের ঘরে বসে গিয়েছিল। তাদের সরানো মুশকিল ছিল। আর মহমুদ তো ধন ও দ্রুত যশ অর্জন করার রাস্তা সেই সময়ই ছেড়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি কমিউনিস্ট হলেন। কোনো এক সময় তিনি জওহরলালের সেক্রেটারি ছিলেন। সেই পথ ধরে তিনি আজ অন্য কোনো জায়গায় পৌঁছে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন গরিবের দুঃখ দূর করার কাজে মিলিত হয়ে তাকে অপসারণের চেষ্টা করতে। ড· রশিদা জঁহাকেও তিনি উপযুক্ত স্ত্রী পেয়েছিলেন। এই যুগলের জীবনভর এক সঙ্গে থাকা

দরকার ছিল। ভারতে ক্যান্সার নিরাময় হচ্ছে না দেখে মহমুদ রশিদাকে মস্কো নিয়ে গেলেন কিন্তু হতাশ হয়ে তাঁকে একলা ফিরতে হলো। এইরকম তপস্বীর সঙ্গে দেখা করতে কার না ইচ্ছে হবে?

২৫ মে পণ্ডিত হরিনারায়ণ মিশ্রের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন হলো। মিশ্রজীকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৪৩ সালে। তখন তিনি এখানকার ডি এ ভি কলেজের অধ্যাপক। এখন অবসরপ্রাপ্ত ও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সারা জীবন কেটেছিল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা আর শিকার করে। অধ্যয়ন এখনও চলছিল। তাঁর গ্রন্থের অনেক সংগ্রহ ছিল। তিনি ও শুক্লজী দুজনেই কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। নিরালাজীর কথা অনুসারে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের বংশাবলীতে মাংসভোজন বিহিত বলে লেখা রয়েছে। শুক্লজী বংশাবলীর কথা মানতে অস্বীকার করেন। মিশ্রজী আবার নিজের জোরে এখনো কান্যকুব্জের ধ্বজা ওড়াচ্ছেন। দেরাদুন গেলে মিশ্রজী প্রতিবার পীড়াপীড়ি করতেন কান্যকুব্জ-ভোজনের জন্য। কিন্তু আমি শ্রীমতী শুক্লের খাওয়ার নিমন্ত্রণ কি করে প্রত্যাখান করব? নিরামিষ হলেও, সত্যি বলছি, স্বাদে তা কোনো অংশে কম ছিল না। যদি আমি বেশি খেয়ে প্রতিবার পেটে হাত বোলাতে বোলাতে ঘর থেকে বেরোই আহলে তাতে শুক্লজী বা শ্রীমতী শুক্লের কোনো দোষ নেই। স্বাদই হতো এমন যে দু-মুঠো কম খাবার জায়গায় বেশিই পেটে চলে যেত। আবার মিশ্রজীর আগ্রহেও আঘাত করতে পারি না। মাংস রান্নায় তিনি কায়স্থ বা মুসলমান ভাইদের কান কাটতে পারেন। বলেন, 'আমার বাপ-দাদুরাও তো শত শত প্রজন্ম ধরে এই খেয়েছেন।'

সন্ধেয় জুগমন্দর মিউনিসিপ্যাল হলে হিন্দি সাহিত্য সমিতির বৈঠকের সভাপতিত্ব করতে হলো। নগরের ২৫০ জন বাছা বাছা সাহিত্যানুরাগী পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ২৩ জন সাহিত্যিককে সমিতি 'সম্মানপত্র' দিল। আমিও তাঁদের অভিনন্দন জানালাম। সভা দেখে মনে হলো, দেরাদুনে সাহিত্যিকের সংখ্যা কম নয়। জেনে দুঃখ হলো যে, তাদের মিলন-সংস্থা সাহিত্য-সংসদ মৃতপ্রায়। অনুষ্ঠানের পর জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল।

মুসৌরী—২৫ তারিখে সওয়া আটটায় স্টেশন থেকে মুসৌরীর বাস ধরলাম। সিজিনের সময় ছিল, সেইজন্য বাসও প্রচুর চলছিল। কিন্তু মুসৌরীবাসীরা সন্তুষ্ট নয়। বলছিল, এই বছর যাত্রীর সংখ্যা কম। লোকে ছোট-বড় হোটেলে ওঠে, বাংলো খালি পড়ে আছে। এদের মধ্যে রাজা বা ধনী লোক নেই তাই আমাদের জিনিসপত্র বেশি বিক্রি হয় না। তাদের এই অভিযোগ যুক্তিযুক্ত ছিল।

২ মে আমরা মুসৌরী ছেড়েছিলাম আর ২৬ মে সেখানে পৌঁছচ্ছিলাম। পৌনে দশটায় বাস কিংক্রেগ পৌঁছল। মালপত্র ভারবাহকের পিঠে দিয়ে এগারোটায় বাড়ি পৌঁছলাম। কমলার বিশারদ পাস করার খবর আগেই পেয়েছিলাম। এদিকে অনেক দিন ধরে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। ভুক্তভোগীরা এর ভাল ভাল পরিচর্যার কথা বলেছিল। কমলা কখনোই সেগুলো করতে রাজি হতো না। যখন নাক থেকে রক্ত বেরোত তখন মনে পড়ত।

কমলার খুড়তুতো ভাই মঙ্গল ৮ মে এখানে পৌঁছে গেলেন। শুনলাম মহাদেব ভাইয়ের দ্বিতীয়বার অপারেশন হয়েছে। ২৬ দিনের ডাক এসে পড়েছিল,সেগুলো নিয়েও দুর্ভোগ ছিল।

—১৯৫১—

ভ্রমণের প্রথম মরশুম

রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির সাহিত্য-পরিকল্পনার কাজ চলছিল। ড· সত্যকেতু 'ফ্রেঞ্চ স্বয়ং শিক্ষক' লিখে ফেলেছিলেন। জিদ-এর একটি উপন্যাস (লা পোৎবা) 'সংকরা দ্বার' নাম দিয়ে শীলাজী অনুবাদ করেছিলেন। মরিশাসের মাধব বাজপেয়ী রোম্যাঁ রলাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'জন ক্রিস্টোফ' অনুবাদ করতে রাজি ছিলেন। মাধব মরিশাসে জন্মেছিলেন যেখানে ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চ দুটি কথ্যভাষা আছে। হিন্দিতেও তার পুরো দখল ছিল। আশা দানা বাঁধছিল যে আমরা দশ বছরে কুড়িটা ভাল ভাল গ্রন্থের অনুবাদ হিন্দি সাহিত্যকে দিতে পারব। কিন্তু সব ব্যাপার অনুকূল ছিল না। কয়েকজন সহকারী কুঁড়ে বলদ হয়ে গিয়েছিল। তবুও গাড়ি এগিয়ে যেতে পারত কিন্তু সাহিত্য-সম্মেলনের মতো এখানেও ছাপার অসুবিধে দেখা দিল। তাই দেখে শীলাজী তাঁর অনূদিত উপন্যাস নিজেই প্রকাশ করবেন ঠিক করলেন।

এই বছর কমলার দুটি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবার ছিল—সাহিত্য-রত্ন প্রথম বর্ষ এবং এফ এ। আমি এখন থেকেই তাকে বইপত্রগুলো দেখার জন্য জোর দিতে শুরু করলাম।

জুন মাস তো প্রায় পড়েই গিয়েছিল। মুসৌরী-দেহরাতে ২৬ জুনকে বর্ষার শুরু মনে করা হয়। আমি আমার কেয়ারিতে শসা, সিম, ফরাসবীন ইত্যাদি তরকারির বীজ লাগিয়ে দিলাম। আলুর আশা করেছিলাম কিন্তু আগের অভিজ্ঞতা তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ব্যাংকে ধারের ছশো টাকা শোধ করে দেওয়ার পর এখন ষোলশো টাকা থেকে গিয়েছিল। এটা চিন্তার ব্যাপার ছিল। ধার নেওয়া আমার জীবনের সিদ্ধান্তের বিরোধী।

এখন দেখা করার জন্য লোকেরা আসতে শুরু করেছিল। ২৯ তারিখে পণ্ডিত হরিনারায়ণ মিশ্র এলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রতি তাঁর আগ্রহ তো আছেই সেইসঙ্গে তিনি উর্দুর কবিও এবং তাঁর ফারসীর পড়াশুনাও খুব গভীর।

৩১ মে রাতে খুব বৃষ্টি হলো। সকালে মনে হচ্ছিল বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। এই বছর যদিও বর্ষা আগে শুরু হয়েছে তবু একে মরশুমের আরম্ভ বলা যায় না। অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে পত্র-পত্রিকাগুলোর চাহিদা পূরণ করার জন্য কিছু লেখা লিখে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, এ থেকে কিছু টাকাও পাওয়া যেত, যা শূন্য পকেটের পক্ষে কম আকর্ষণীয় ছিল না। কিন্তু লেখা বেশিরভাগ আমি এমনই লিখি যা কোনো বইয়ের অংশ হতে পারে। বদ্রীনাথ-কেদারনাথের ওপরে দুটি লেখা লিখলাম।

২ জুন শ্রীমুকুন্দীলালজী (ব্যারিস্টার) এলেন। তিনি সবসময় এখানে থাকতেন না কিন্তু তাঁর ইংরেজ-স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে পুরো গ্রীষ্ম-বর্ষা এখানে কাটানোর জন্য চলে আসতেন। সে-সময় তিনি বেরিলি থেকে দুতিনবার অবশ্যই ঘুরে আসেন এবং প্রতি যাত্রায় আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ না করে যেতেন না। স্বামী-স্ত্রীর কুকুরের খুব শখ ছিল। তাঁদের কাছে একটি গ্রেটডেন মাদি কুকুর ছিল। আরও নানা জাতের খুব সুন্দর কুকুর ছিল, তারাও গ্রীষ্ম কাটানোর জন্য এখানে আসত। আগের বার কুকুরের কথা উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমি কুকুরের বাচ্চা দিতে পারি।' কিন্তু এখন তো ভূতনাথ এই ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কমলার স্নেহও

সে পেয়ে গিয়েছিল। তিনি এলে ঘণ্টা-দুঘণ্টা ধরে সাহিত্য-শিল্প নিয়ে আলোচনা হতো। সময় কাটতে দেরি হতো না।

৩ জুন স্বামী সত্যস্বরূপজী এলেন। আমাদের পরিকল্পনায় সংস্কৃত-হিন্দি আর হিন্দি-হিন্দি শব্দকোষও ছিল। তাঁকে বলায় তিনি সহযোগিতা করতে রাজি হয়ে গেলেন। স্বামী সত্যস্বরূপজী পাঞ্জাব থেকে শাস্ত্রী আর বি এ হয়ে নিজের এই শিক্ষায় সন্তুষ্ট না হয়ে বেনারস গেলেন। এক যুগ ধরে ওখানে থেকে তিনি ন্যায়, বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শন অধ্যয়ন করলেন। জ্ঞানের পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে চিন্তার উদারতা রয়েছে। এই বিদ্যাকে নিয়ে তিনি কাজ করতে চাইতেন। আমিও এ ব্যাপারে আগ্রহী যে তাঁর জ্ঞান কিছুটা কাজে লাগানো দরকার। এমনিতে অধ্যাপক হিসেবে তিনি তা কাজে লাগাচ্ছেন কিন্তু জ্ঞান যদি লিখে কাগজে তোলা যায় তাহলে আরও বেশি উপকারে লাগতে পারে।

টাকার স্রোত এখন শুকিয়ে আসছে দেখে আমারও চিন্তা হয়, কেননা আত্মসম্মানকে আমি আমার সবচেয়ে বড় সম্পত্তি মনে করি, কিংবা বলা যায়, তাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করি। আমি কোনো রকমে মনকে প্রবোধ দিচ্ছি। কমলা এই রকম অবস্থায় ঘাবড়ে যেতে শুরু করেছে। তার ঘাবড়ানোই উচিত। ঘর এবং অতিথিদের দেখাশোনা তাকেই করতে হতো। কোন জিনিসটা দরকার, কী খরচ হচ্ছে এসব দেখার ফুরসতও আমার নেই। অনেকবার খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু মাসে পাঁচশোর চেয়ে তা কম করা যায় না। ভাবছিলাম, যখন প্রথমবার তিব্বত গিয়েছিলাম তখন মাসে কুড়ি টাকাতেই কাজ চালিয়ে নিতাম। পরে একশো টাকাও যথেষ্ট মনে হতো। কিন্তু আজকের পাঁচশো টাকাও তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার সওয়াশো টাকার সমান। তবে এরকম করে বুঝে নিলেই কি অভাব পূরণ হতে পারে?

কুমঠেকরজী এখন কাজ করছিলেন। কাজ করার লোকজন তো এসে গিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলাম যে, নাগার্জুনজী ওয়ার্ধা যাওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত মাত্র এক ফর্মা ছেপেছে তখন ভরসা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিলাম। নাগার্জুনজী লিখেছিলেন, একজন কম্পোজিটর আছে কিন্তু প্রুফরিডার তো নেই-ই। যদি রাষ্ট্রভাষার প্রেস নাগপুরে হতো তাহলে কোনো অসুবিধে হতো না। বেশি কাজ থাকলে অন্যান্য প্রেসেও দেওয়া যেত। প্রেসের কোনো মেশিন খারাপ হলে সেখানে মিস্ত্রি পাওয়া যেত। কম্পোজিটর আর প্রুফরিডার বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে তাদের পেতে খুব অসুবিধে হতো না। আমি আনন্দজীকে বলেওছিলাম, 'সমিতির অন্য বিভাগ হিন্দিনগরে থাক। প্রেসটা তুলে নাগপুরে নিয়ে যান।' কিন্তু মানুষের সব জিনিসই চোখের সামনে দেখার আকাঙ্ক্ষা হয়।

ওপরের বাড়িতে (হর্নহিল) অনেক ঘর খালি ছিল। যদি আরও কিছু সাহিত্য-অনুরাগী বন্ধুও এসে ওখানে থাকে তো ক্ষতি কি? বেনারসের উদয়প্রতাপ কলেজের অধ্যাপক শ্রীমোতিসিংহ এলেন। তারপর শ্রীকানহাইয়ালাল, প্রভাকরজীও চলে এলেন। এইভাবে আমাদের এই অঞ্চলটা যেন সাহিত্যিকদের অঞ্চল হয়ে উঠল।

'কুমায়ুঁ' আর 'গঢ়ওয়াল' আমি বেশিটাই হাতে লিখেছিলাম। কমলা আর মঙ্গল সেগুলো টাইপ করতে শুরু করল। কমলার আলিবেত্তী-তে হাত বসে গিয়েছিল কিন্তু বেশ কয়েক মাস ধরে অভ্যাস ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গল রেমিংটন-এর হিন্দি টাইপরাইটারে অভ্যস্ত নন, তবু

৬ জুন তিনি পাঁচ পৃষ্ঠা টাইপ করলেন।

ব্যাংক-হিসেব দেখে যে-চিন্তা হচ্ছিল তা এক বছরের জন্য দূর হলো যখন 'কিতাব মহল' মার্চ ১৯৫১ পর্যন্ত রয়্যালটি বাবদ ৪৩৬২ টাকার হিসেব পাঠাল।

আমি নিজে হিন্দির লেখক। সেই জন্যই আমি আমার প্রায় সমস্ত সময় দিয়ে দিচ্ছিলাম। রাজাগোপালাচারী মন্ত্রী হিসেবে বক্তব্য রেখেছিলেন যে, সরকারি চাকরিতে হিন্দির পরীক্ষা অনিবার্য নয়। মহাদেব ভাই এতে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন হিন্দিকেই কেন এই স্থান দেওয়া হবে? কিন্তু হিন্দি অনিবার্য না হওয়ার অর্থ ইংরেজিকে নিজের জায়গা থেকে একটুও না নড়ানো। ইংরেজি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কোনোরকম সমর্থন পাক আমি তা চাইছিলাম না। ইংরেজির এই অনিবার্যতার জন্য চাকরির ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় লোকের একাধিপত্য কায়েম হয়ে চলেছে, এটাও মেনে নেওয়ার কথা নয়। আমি মনে করতাম যে, কোনো রাজ্যেরই বিধানসভার স্বীকৃতি ছাড়া হিন্দিকে তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া ঠিক নয়। প্রদেশের ভেতর নিজের ভাষা ছেড়ে হিন্দির প্রবেশ একেবারেই হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আন্তর্প্রান্তীয়, কেন্দ্র আর প্রান্তীয় অঞ্চলে এবং দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায় হিন্দিকে কেন স্থান দেওয়া যায় না? সেখানে যাতে ইংরেজি টিকে থাকে?

১০ জুন শ্রীমতী সত্যবতী মল্লিক তাঁর ছেলে আর ভাগ্নের সঙ্গে এলেন। মুসৌরী তাঁর কাছে নতুন না হলেও হর্নক্লিফ অবশ্যই নতুন ছিল। সত্যবতীজী শিল্পী মহিলা। তিনি হিন্দি লেখিকা ও সুষমাময়ী কাশ্মীরের শহর শ্রীনগরের কন্যা। অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষরাও হর্নক্লিফের দরজায় দাঁড়িয়ে যখন সামনে হিমালয়ের ধবল শিখর-পঙ্‌ক্তি আর তার নীচের স্তরে স্তরে সাজানো পর্বতমালাগুলি দেখতেন তখন কবি হওয়ার চেষ্টা করতেন এবং আমার নির্বাচনের খুব প্রশংসা করতেন। যদিও নির্বাচন করার সময় আমি এটা খেয়াল করি নি।

খুবানি ফলেছিল। এখানে এটা জুন মাসে ফলে। আর সমতলের জায়গাগুলোতে মে মাসে। এখানে খুব সাধারণ জাতের খুবানির গাছ আছে যার ফলগুলোতে এক ধরনের কষা স্বাদ থাকে। ভাল জাতের খুবানি পুরোটাই মিষ্টি, খুব বড় আর দেখতেও কমনীয় চেহারার হয়ে থাকে। কিন্তু তাও লোকে বছরে দু-একদিনের বেশি খেতে পারে না, মন বিরক্ত হয়ে যায়। কোথায় আম, যাতে পেট ভরে কিন্তু মন ভরে না আর কোথায় তার উলটো খুবানি। ভূত খুবানি দেখে খুব গপগপ করে খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলল। তারপর প্রচণ্ড বমি করতে থাকল।

১১ জুন কিষাণ সিংহের বাড়িতে মোমো আর তিব্বতী চা খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল। চার মাইল যেতে হতো। কিন্তু ওখানে যেতে আমার মন কখনো ইতস্তত করত না। ওখানে গিয়ে তিব্বতী লোকদের মাঝে তাদের ভাষায় কথা বলার সুযোগ মিলত, তারপর তাদের কাছ থেকে তিব্বত সম্বন্ধে কত কথা জানতে পারা যেত। কমলাও আমার মতো মোমোর ভক্ত। কালিম্পঙে অনেক চীনা ও তিব্বতী রেস্তোরাঁ আছে যেখানে এটা অনেক রকমের তৈরি হয়। কমলা ছোটবেলা থেকেই তা খেয়েছিল। কিন্তু আমার এই ধারণাটা ভুল যে, মাংস পছন্দ করে এমন সব লোক অবশ্যই মোমোর অনুরাগী হবে। এখানে একজন সোগ্‌পো (মোঙ্গল) গেশে (পণ্ডিত)-কেও পেলাম, তিনিও কিছু কথা জানালেন।

বিনোদজীর এখন এখানে থাকতে ভাল লাগছিল না। প্রথমত, তাঁর স্বাস্থ্য ঠিক ছিল না।

দ্বিতীয়ত, তিনি হয়তো স্বভাব-নেতা ছিলেন। এই জঙ্গলে নির্বাসনদণ্ডেথাকতে কি করে ভাল লাগবে?

কানপুরের বন্ধু সন্তোষ কাপুর এলেন। তিনি জানালেন, 'পুরুষোত্তমজী তাঁর সাধনা প্রেসকে বাড়াতে চাইছেন। তাতে এক লাখ টাকা আগেই বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে। প্রকাশনার কাজও হাতে নিতে চাইছেন কিন্তু প্রেসের কোনো ম্যানেজার পাচ্ছেন না।' আমি বললাম, 'বিমলাজী এই কাজটার দায়িত্ব কেন নিচ্ছেন না? ডবল এম এ-এর বুদ্ধি শুধু শুধু পড়ে থেকে কী লাভ? কাজই কাজ শিখিয়ে দেয়, সামলে নেয়।' আসলে আখড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে পালোয়ানী-প্যাঁচ বাৎলে দেওয়া খুব সোজা। কিন্তু নিজের মাথায় পড়লে আমিও হয়তো এদিক-ওদিক উঁকি মারতাম।

১৩ জুন আবার কমলার নাক থেকে রক্ত পড়তে লাগল। রক্ত পড়ার জন্য চিন্তিত ছিলাম আর তার ওপর আমার বিরক্তি হতো। বলতাম, 'এরকম মানুষ দেখি নি। নিজের ভালর জন্যেও বুদ্ধি খাটিয়ে ভাবতে রাজি নয়। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে, সেটাও যেই রক্ত বন্ধ হলো অমনি ছেড়ে দিল।' ডাক্তার বলছেন, ক্যালসিয়াম আর ভিটামিনের অভাব রয়েছে কিন্তু তা নিতে চায় না। অবাক লাগে, দুঃখ হয়, সারা জীবনের জন্য অথর্ব হয়ে থাকার পথ এটি, কিন্তু কে বোঝাবে? ওজন আট পাউন্ড কমে একশো পাউন্ড হয়ে গিয়েছিল। মাথা ব্যথার কষ্ট সবসময় থাকে।

কমলা সেলাই ভাল জানে। ঘরে সেলাই মেশিন থাকলে অনেক সুবিধে হয়। সিঙ্গার মেশিন হালকা আর ভাল কিন্তু দাম দ্বিগুণ, সেজন্য আমি স্বদেশী 'উষা' ২২৪ টাকায় আনিয়ে নিলাম।

বৈদ্য রামরক্ষ পাঠক ছাপরা থেকে আমার পরিচিত ছিলেন। সে-সময় তিনি রোগা-পাতলা, স্কুল ছেড়ে অসহযোগে কাজ করা ১৬-১৭ বছরের ছেলে। অনেক দিন পর্যন্ত রাজনীতি করেছিলেন কিন্তু সুদীর্ঘ জীবনের জন্যও তো কোনো আশ্রয় খোঁজার দরকার ছিল। তাই আয়ুর্বেদ পড়ে বৈদ্য হলেন। নিজের পড়াশুনো চালিয়ে গেলেন, বইটই লিখলেন। এই সময় তিনি বেগুসরায় আয়ুর্বেদিক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এত উন্নতি দেখে আমার খুশি হওয়ারই কথা।

কমলা দুটো পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল না। বলছিল, 'এইবছর সাহিত্য-রত্ন প্রথম খণ্ডই দেব।' আমি ভাবছিলাম, সাহিত্য-রত্নের প্রথম হয়ে যাওয়ার পর আরও তিন মাস পাওয়া যাবে যখন এফ এ-এর প্রস্তুতি হয়ে যেতে পারে। পড়াশুনো তাড়াতাড়ি শেষ করা আমি জরুরি মনে করতাম, কারণ ভবিষ্যতের কি ভরসা?

ফল দেখতে গেলে মে মাসও খুব ভাল। বিহারে সেই সময় লিচু পাকে। কিন্তু জুন হচ্ছে মাসের রাজা। এই সময়ই ফলের রাজা আম উত্তর-ভারতে আসতে শুরু করে। ২২ জুন ভাইয়া অমৃতসর থেকে আমের টুকরি পাঠালেন। মুসৌরীতেও আম দুর্লভ নয়। সব রকমের আম আর ফল এখানে পৌঁছে যায় কিন্তু দাম এত আকাশ ছোঁওয়া হয় যে মনে হয় আম নয়, টাকা খাচ্ছি। কিনতেও হাত ওঠে সংকোচের সঙ্গে। যদি টুকরি বাইরে থেকে আসত তাহলে আমের ভোজ শুরু হয়ে যেত। এখন কয়েক মাস ধরে আম্র-উপাসনা চলবে, তার উৎসাহ মনে তৈরি হতে শুরু করেছিল।

আমি কমলাকে লেখার জন্য উৎসাহিত করলাম। সে দুটো গল্প লিখল। পত্রিকায় পাঠাল। সম্পাদকরা ফিরিয়ে দিল। অনেক চেষ্টা করার পর সে লিখতে রাজি হয়েছিল কিন্তু 'কাজের

শুরুতেই আঘাত'[১] পড়ল। তার উৎসাহে ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে দিল। আমি অনেক বোঝালাম যে প্রত্যেক লেখককেই এই রকম অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কিন্তু আমার বলায় কি হবে? কমলার মধ্যে প্রবন্ধ লেখারও প্রতিভা আছে। অথচ সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে আলস্য। কলম ধরতে গেলে গায়ে জ্বর আসে।

শ্রীরামরক্ষ পাঠক ছাপার ডাক্তার শিবদাস শূরের সঙ্গে মুসৌরী এসেছিলেন। একাধিকবার দেখা করতে এলেন। রামরক্ষকে আমি বাচ্চা দেখেছিলাম, তারপর যুবকও দেখেছিলাম। ডা· শূরের যৌবনের চেহারাই আমার মনে পড়ে। তিনি ছাপরায় এখনো ডাক্তারী প্র্যাকটিস করেন। তাঁর বাবা লক্ষ্মীবাবুর ওষুধের খুব বিখ্যাত দোকান ছিল ছাপরায়। বড়ভাই গুহাবাবু দেশসেবার কোনো কাজে পিছিয়ে থাকার লোক ছিলেন না। ডা· শূরের চেহারায় এখন বার্ধক্যের ছাপ ছিল। আর সবচেয়ে বেশি ডায়াবিটিসের প্রভাব দেখা যাচ্ছিল। তিনি এসময় আমার চেয়ে তিন বছরের বড় ছিলেন।

এখন রোজ আর বিশেষ করে রোববারে অতিথি আসতে শুরু করেছে। আমাদের মূলত চায়ের ব্যবস্থা করতে হতো। সাদর অভ্যর্থনা এবং চা ও খাবার খাওয়ানোয় কত আনন্দ হয় কিন্তু খাদ্যসামগ্রী দুর্লভ এবং দামি হয়ে গিয়েছিল। এই সময় কোনো অতিথি যদি বলত যে আমি চা খাই না তখন আমি খুব সংযত হয়ে এবং অন্যকে বিন্দুমাত্র আঘাত না করে বলতাম, 'আজকালকার অতিথিদের চা না খাওয়া মহাপাপ। এই যুগে যে কোনো গৃহস্থ এর দ্বারাই সহজে অতিথি সেবা করতে পারে। অতিথি সেবা আমাদের পুরনো পৈতৃক অধিকার তা থেকে বঞ্চিত করছে যে-লোক সে অবশ্যই পাপের ভাগী হবে। ঘরে চা পান করবেন না, চায়ের বদভ্যাস করাটাও ঠিক নয়, কিন্তু বাইরে গেলে কেউ যদি এক পেয়ালা চা দেয় তাহলে তা পান করতে আপত্তি করবেন না।' জানি না কতজনের ওপর এই ব্যাখ্যার প্রভাব পড়েছিল।

সমিতির সাহিত্যের কাজ এখন উৎসাহজনক ছিল না। জিদ-এর উপন্যাস 'লা পোৎবা' (সংকরা দ্বার) সম্বন্ধে কেউ আনন্দজীকে জানিয়েছিল যে সেটি অশ্লীল। কেলেঙ্কারি হয়ে গেল। যদিও এই লেখককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসিক বলে মানতে আপত্তি হয় নি, তাহলেও এই ছুতো বের করা হলো। আমি ভাবতে লাগলাম, কেন খামোকা এই বিপদ ঘাড়ে নিলাম? যত শিগ্‌গির তা সরে যায় ততই ভাল।

২৫ তারিখে যোধপুরের খৈরওয়ার জায়গীরদারের স্ত্রী ঠাকুরানী গুলাবকুমারীর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলাম। তিনি মাসিক ১৭৫ টাকায় ঘর নিয়ে স্টে পল্টনে থাকতেন। নিজের গাড়িতে এসেছিলেন। সঙ্গে মোসাহেব, তিন-চার জন চাকর-চাকরানী ছিল। খাবার ছিল আমিষ আর মারোয়াড়ের ঠাকুরদের মতো খুব সুস্বাদু। আমি ভাবছিলাম, দেশীয় রাজ্য চলে গেছে, এখন জায়গীরও চলে যাচ্ছে। আগেকার রোজগার এখন আর থাকবে না। তাহলে এই খরচ বহন করা কি দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনা নয়? কিন্তু মানুষ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পৌঁছে দ্রুত নিজেকে তার মতো করে তুলতে পারে না।

[১] এই ভাবার্থে লেখক এখানে একটি লোকোক্তি ব্যবহার করেছেন, যার আক্ষরিক অর্থ হলো, 'মাথা মুড়োতেই শিলাবৃষ্টি পড়ল' *(সর মুড়াতে হী ওলে পড়ে)*। —স·ম·

শুক্লজী বেনারস থেকে ল্যাংড়া আমের পার্শেল পাঠিয়েছিলেন। ২৭ জুন তা পেলাম। বেনারসের প্রতি আমার পক্ষপাত ছিলই আর ল্যাংড়াকে সকলেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে সেজন্য শুক্লজীকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম।

হিন্দির গল্পপত্রিকা 'মায়া' অনেকগুলো লেখা দেওয়ার জন্য লিখেছিল। আমি বললাম, মধ্য-এশিয়ার তাজিক ঔপন্যাসিক এনি-র 'অদীনা' দিতে পারি। তারা একটি সংখ্যায় ছবিসহ তা ছাপবে বলে কথা দিল। জুন সংখ্যায় তা ছাপাও হয়ে গেল। কয়েকটা ছবি তো মূল তাজিক ভাষার বইটির ছিল আর কিছু ছবি শিল্পী নিজের কল্পনা থেকে এঁকেছিলেন, এগুলো অনুরূপ ছিল না। 'অদীনা' তো প্রেসের মুখ দেখল কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ এখন (১৯৫৬-৫৭) আসছে।

২৯ জুন বিনোদজী চলে গেলেন। এখন মনে হচ্ছিল স্বামী সত্যস্বরূপজী, কুমঠেকরজী আর হরিশ্চন্দ্রজীই শুধু এখানে থেকে যাবেন।

মুসৌরীর অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। গত বছরের বহু দোকানদার চলে গেছে। কিছু দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাঁদে পা দেবার জন্য নতুন লোক এসে পড়ছিল। একজনকে ব্যর্থ হয়ে পালাতে দেখে অন্যজন ভাগ্য-পরীক্ষা থেকে কি করে নিজেকে বিরত রাখতে পারে?

২ জুলাই ঘুরতে ঘুরতে লণ্ঢৌর পর্যন্ত গেলাম। পুরুষোত্তমজীর দোকান দেখলাম বন্ধ। তাঁর জায়গায় হরপ্রসাদজী কাজ করছিলেন, যাঁর প্রতি মালিক সন্তুষ্ট ছিলেন না। এমনিতে পুরুষোত্তমজী খুব ভাল লোক ছিলেন। কলেজে পড়াশুনো করেছিলেন সেটা তো দোষের বলা যায় না। কিন্তু মুসৌরী আর দেরাদুন দু জায়গায় তাঁর লোহার দোকান ছিল। যুদ্ধের সময়ে আর তার পরে লোহা-ব্যবসায়ীরা দু-হাতে লাভ করে প্রচুর টাকা জমিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু পুরুষোত্তমজী ছিলেন এমন যে, সমুদ্রে থেকে শামুকও তাঁর হাতে আসেনি। এইসময় দোকান বন্ধ করাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু দু-এক বছর পরেই তাঁকে দোকান একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। তারপর ব্যবসা থেকেও সরে গেলেন এবং অন্য কোথাও চাকরি করতে হলো। অন্য দোকানদার মুন্সীরামজী বলছিলেন, 'আমরা তো নিজের পুঁজি খেয়েই বেঁচে আছি। নিজের মাংস গলিয়ে গলিয়ে খেয়ে মানুষ কতদিন জীবন ধারণ করবে?' ভাঙা-পুরাতন জিনিসপত্র বিক্রেতারা কাঁদছিলেন। আগের মতো এখন সাহেবদের বাংলোর জিনিস বিক্রির জন্য পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তার খদ্দের নেই। একজন ভাল কারিগর তথা ছুতোর ফলের টুকরি নিয়ে বসেছিল। বলছিল, 'কী করব? কোনো রকমে পেট তো চালাতে হবে। কাজ পাচ্ছিলাম না সেজন্য ফল বিক্রি করছি।' মুসৌরীর ওপর অন্ধকারের একটা গাঢ় আবরণ পড়তে দেখা যাচ্ছিল। ফেরার সময় পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের সঙ্গেও একটুক্ষণ কথাবার্তা হলো।

৩ জুলাই স্বামী সত্যস্বরূপজী সংস্কৃত-হিন্দি শব্দকোষের কাজ করছিলেন। কুমঠেকরজী কন্নড়ের একটি উপন্যাস অনুবাদ করছিলেন আর হরিশ্চন্দ্রজী টাইপ করছিলেন।

কিশোরী ভাই জেলে ছিলেন। ওখান থেকে শরীর খারাপ নিয়ে পাটনা হাসপাতালে পড়েছিলেন। এখানে একটু ভিড়ও ছিল, তবু আসার জন্য লিখে দিলাম। ৫ জুলাই তিনি এলেন। আশা করছিলাম, এখানে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি অবশ্যই হবে, কিন্তু ১৩ দিন থাকার পরও তিনি

ঐরকমই থাকলেন। তার শরীরে কখনো চর্বি বাড়েনি। যে-মানুষ দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্য, কসরৎ আর শারীরিক পরিশ্রম করে থাকতেন, তাঁর শরীরে চর্বি কি করে বাড়বে? তাঁর মনে যেমন সাহস ছিল, তেমনি উপযুক্ত সুস্থ শরীর ছিল। দেখলেই বোঝা যেত যে, প্রতিটি রোমকূপ যেন নাচছে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাহস আর নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পড়া ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। মুজঃফরপুরের সবচেয়ে কর্মঠ কংগ্রেসী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি আমাদের সামনে এসেছিলেন। যখন তিনি দেখলেন কংগ্রেসকে দিয়ে কাজের কাজ হবে না তখন মার্কসবাদ অধ্যয়ন করলেন, কমিউনিস্ট হলেন, একজন বড় নেতা থেকে তিনি সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক হতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। নিজের বংশ আর ঘরের লোকদের একেবারেই গ্রাহ্য না করে তিনি নিজের স্ত্রীকে সে-সময় পর্দার বাইরে এনেছিলেন, তখন বিহারে কোনো লোক তাঁর নাম পর্যন্ত মুখে আনত না। শুধু পর্দার বাইরেই আনেননি, উপরন্তু তাকে কাজ করার যোগ্য করে তুলেছিলেন। আফসোস হয়, যৌবনেই তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিশোরী ভাই তখন থেকে সর্বদা নিজের লক্ষ্যে লেগে রয়েছেন। তাঁর শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়বে তা আমি কখনই আশা করি নি। কিন্তু এখন শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনও নিজেকে দুর্বল প্রতিপন্ন করে তুলছিল। এবার জেলে থাকার সময়ে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যর ওপরে যে প্রবল আঘাত পড়েছিল তার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর মনও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পাহাড়ের কিনারায় চলতে তাঁর ভয় লাগত—আমি বুঝি পড়ে যাবে। মনের অবস্থা শরীরের ব্যাধির চেয়েও বেশি খারাপ হয়। ব্যাধির ওষুধের বিস্ময়কর গুণও দেখা যায় কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার চিকিৎসা সহজে করা যায় না। তাঁর মন যাতে ভাল থাকে সেজন্য 'ভাগো নহী দুনিয়া কো বদলো'-এর নতুন সংস্করণের কপি তৈরি করার সময় আমি তাঁকে শোনাতাম।

এক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু কোনো উন্নতি হলো না। ১৭ জুলাই স্বামী সত্যস্বরূপজীর সঙ্গে তিনি বেড়াতে বেরোলেন। এক জায়গায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। তাড়াতাড়ি রিকশোয় বসিয়ে তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর কিশোরী ভাই বললেন, 'বিহারে চলে যাওয়াই ভাল। ওখানে পার্টির কাজে হয়তো মন ভাল হয়ে যাবে।' ১৮ জুলাই মঙ্গলের সঙ্গে তাঁকে পাটনা পাঠিয়ে দিলাম।

১৬ জুলাই ভাইয়া (স্বামী হরিশরণানন্দ), ভাবী (জানকী দেবী) আর তাঁর ছোট বোনের সঙ্গে এলেন। এখন তাঁরা 'লক্সমোন্ট'-তে থাকা স্থির করেছিলেন। এমনিতে তাঁরা প্রথম সিজিন কাটিয়ে বর্ষার সময় আসতেন। সে-সময় আমাদের এখানেও ভিড় থাকত না কিন্তু তাঁদের কুলহড়ীতে থাকাতেই আরাম হতো। জিনিসপত্র কাছেই পাওয়া যেত। ভাইয়া এটাও বলতেন, 'এর ফলে আসা-যাওয়াও চলতে থাকবে।' তাঁর হেঁটে হেঁটে বেড়ানোর শখ। সত্যিসত্যি ৭০-এর কাছে পৌঁছে তাঁর চুল পুরো সাদা হয়ে গেছে কিন্তু চলেন ঝড়ের বেগে। কোনো কাজ করায় আলস্য তাঁকে ছুঁতে পারেনি।

গত বছর প্রেস দেরাদুনে করার কথা হয়েছিল। এক-আধটা ঘরও দেখা হয়েছিল। কিন্তু ভাইয়ার ব্যবহারিক বুদ্ধি জানিয়ে দিয়েছিল যে তার জন্য দেরাদুন নয় বরং দিল্লী উপযুক্ত জায়গা। যদি কোনো কারণে কাজ নাও চলে এবং তা বন্ধ করতে হয়, তাহলে টাকা ফেরৎ পেতে দেরি হবে না। ভাবীজী দেরাদুনই পছন্দ করতেন, আমিও এই ভেবে কাছে চাইতাম যে,

যদি আমার বই ছাপে তো প্রুফ দেখতে অসুবিধে হবে না। তিনি খুব উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন—প্রেস বড় করব, মোনোটাইপ আনাবো, বড় মেশিনও চলে আসবে।

বার্ধক্যে সাধারণত দাঁতের অসুখ শুরু হয়ে যায়। আমি তো মনে করি সে-সময় দাঁত না থাকলেই ভাল। প্রায়ই তাতে ব্যথা হতে থাকে। দাঁতের ফাঁকে খাবার জিনিস ঢুকে পোকার জন্ম দেয়, যা শেষকালে পায়োরিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পায়োরিয়া খুব খারাপ জিনিস। শুধু নিজে নয়, যার সঙ্গে কথা বলা হয় সেও তার দুর্গন্ধ পায়। আমার একজন বৃদ্ধের কথা জানা ছিল। ৭০ বছরের পরও তার বত্রিশটি দাঁত অক্ষত ছিল। এর জন্য তিনি গর্ব করতে পারতেন কিন্তু মুখ থেকে দু-হাত দূরেও এত গন্ধ আসত যে কথা বলা অসহ্য হয়ে উঠত। তিনি হয়ত এটা বুঝতে পারতেন না।

আমার মুখ থেকে একটু গন্ধ আসছিল। ভাইয়া বললেন, পায়োরিয়া। বৃদ্ধ বন্ধুর কথা মনে পড়ল। ভাইয়া বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই। কাঠিতে তুলো জড়িয়ে দাঁতের ফাঁকে ফিনাইল সপ্তাহে একবার লাগালে দু-তিন সপ্তাহে ঠিক হয়ে যাবে।' ভাইয়া বৈদ্য কিন্তু কূপমণ্ডুক বৈদ্য নন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে নতুন যা কিছু আবিষ্কার হয়, সে-সম্বন্ধে হিন্দি পত্রিকা বা বইয়ে যা দেখেন তা খুব মন দিয়ে পড়েন। প্রয়াগের 'বিজ্ঞান'-এর তিনি জন্ম থেকেই গ্রাহক আর সম্ভবত তার এমন কোনো সংখ্যা নেই যা তিনি মনোযোগ সহকারে পড়েননি। সেই কাগজের নৌকো যখন টলমল করছিল তখন অনেক বছর ভাইয়া তা নিজের খরচে চালিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আধুনিক আবিষ্কারগুলি বৈদ্যদের কাজে লাগাতে হবে এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি তথা ওষুধ নির্মাণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সায়েন্সকে সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে যে-রকম অ্যালোপ্যাথির ডাক্তাররা করেন। সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাতেও তিনি অতি আধুনিক। সমাজবাদ-সাম্যবাদে তাঁর অটল বিশ্বাস। কখনো-কখনো বলে দিতেন, 'চিন্তার কি দরকার, দশ বছরের মধ্যে তো সাম্যবাদ আসছেই।' আমিও প্রথম প্রথম যখন ঘোরার জন্য বেরোতাম তখন এই শ্লোকটি সবসময় জিভের ডগায় থাকত—'কা চিন্তা মম জীবনে যদি হরির্বিশ্বম্ভরো গীয়তে।'

এখন তিব্বত কমিউনিস্ট চীনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তিব্বত শান্তিপূর্ণভাবেই চীনের সঙ্গে তার সহস্র বছরের পুরনো সম্বন্ধ আবার স্থাপন করে নিয়েছিল। দিল্লীর কমিউনিস্ট-বিরোধীদের বিপক্ষে কিছু বলার দরকার পড়েনি কারণ সব কাজ শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছিল। আমিও মনে করতাম শান্তিপূর্ণভাবেই এটা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা তিব্বতে ভারতীয়, চীনা এবং নিজের দেশের হাজার হাজার অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষিত রয়েছে। লাসার মহান এবং তিব্বতের সর্বপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার 'জো-খঙ' সপ্তম শতাব্দির মাঝামাঝিতে তৈরি হয়েছিল। আজও সেখানে সেই প্রাচীন শতাব্দিগুলি জানতে পারা যায়, যা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওখানকার প্রায় চব্বিশখানা বিহার প্রাচীন সামগ্রীর অদ্ভুত সংগ্রহালয়। লড়াই হলে সেগুলির ক্ষতি হতো যে-ক্ষতির পূরণ কখনোই সম্ভব না। তারপর হাজার হাজার লোক গৃহহারা হতো, মানুষের প্রাণ যেত, দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণার সঞ্চার হতো এবং তা অনেক দিন ধরে চলতে থাকত। এই সব দেখে চীন ও তিব্বতের সম্বন্ধ শান্তিপূর্ণভাবে স্থাপিত হওয়া জরুরি ছিল। আমি 'স্বাগত নবীন চীন' নামে একটি লেখা আগে লিখেছিলাম আর এখন 'হমারা পড়োসী চীন' লিখে

আমার ভাইদের বলতে চেয়েছিলাম যে, চীন আমাদের চিরদিনের প্রতিবেশী। তাকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই বরং তার কাছে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে হবে। সৌভাগ্যবশত কমিউনিস্ট চীনের প্রতি বিরোধীদের শক্তি কমে গিয়েছিল আর আমাদের দুটি দেশের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল।

মহেন্দ্র আচার্য এখানকার সাহিত্য বিভাগের কাজ থেকে সরে যাবার পর মাদ্রাজ চলে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে তাঁর চিঠি এলো। ভুল-ক্রটির ব্যাপারে ক্ষমা চাওয়ার শিষ্টাচার দেখিয়ে তিনি কুমঠেকরজীকে ভণ্ড এবং আরও কী কী সব লিখেছিলেন। কুমঠেকরজী প্রকৃতপক্ষে একজন খুবই ভাল মনের মানুষ ছিলেন। আর সহিষ্ণুতাতে তিনি তো পৃথিবী মাৎ করেছেন, তা আমি আগেই লিখেছি। তাঁর হৃদয় আর পকেট সবার জন্য খোলা থাকে। এইরকম মানুষের পয়সার টানাটানি সবসময় থাকবে এবং পয়সা না থাকলেও তিনি চালিয়ে নেবেন এতে সন্দেহ নেই। এঁকে ভণ্ড কি করে বলা যায়? আসলে মহেন্দ্রজীর স্বভাব ছিল পুরনো সংস্কৃত পণ্ডিতদের মতো—যাঁদের মধ্যে কখনো কখনো শিশুর মতো সরলতা দেখা যায়। তিনি উদয়পুর থেকে নিজের সঙ্গে ক্যানে ভরে ঘি এনেছিলেন। আমি দেখতাম তাঁর বন্ধুরা তা খেয়ে উড়িয়ে দিতে উন্মুখ ছিল এবং মহেন্দ্রজী তা জমিয়ে রেখে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইছিলেন। মহেন্দ্রজীর এতে হার হলো। টাকা আমিও বুঝেশুনে খরচ করতাম। সত্যিসত্যিই আমরা সবাই অবাক হলাম যখন জানলাম তিনি কুমঠেকরকে একশো বা তারও বেশি টাকা ধার দিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করত, তাই এই কাজটি দুজনের মধ্যে নিঃশব্দে হয়ে গিয়েছিল। কুমঠেকরের অতিথি এসে পড়েছিল। আতিথ্যে তিনি উদারতা দেখিয়েছিলেন। তারপর টাকা কোথায়? মাসে পৌনে দুশো টাকা তো মাত্র রোজগার ছিল। যাবার সময় মহেন্দ্রজী তাঁর টাকা পেলেন না আর হয়তো দু-একবার চিঠি লিখলেন তবুও তাঁর টাকা ফেরৎ পেলেন না। এইজন্য বেচারা কুমঠেকর ঠক হয়ে গিয়েছিলেন। কুমঠেকরজী পরেও কয়েক মাস এখানে ছিলেন। সবজিওলারও টাকা বাকি ছিল, কাগজওলারও বাকি ছিল। যাবার সময় এদের মিটিয়ে দিতে পারেননি। এইরকম 'আত্মদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'[১] মনে করেন যে মস্ত মানুষটি, তিনি যদি 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' (অন্যের ধনকেও মাটির ডেলা) মনে করেন, তো তাঁকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, কাগজওলার জন্য আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। কেননা বেচারা অন্য এজেন্টের কাছ থেকে খবরের কাগজে নিয়ে রোজ কয়েক মাইল ঘুরে ঘরে ঘরে তা বিলি করত। তাকে এই টাকা দণ্ড দিতে হয়েছিল। কুমঠেকর খুব সাদাসিধে স্বভাবের লোক ছিলেন। পোশাকও সেইরকমই ছিল। আমাদের এখানে যারা কাজ করত তাদের মধ্যে বিনোদই চাপকান আর জওহর-পায়জামার পক্ষপাতী ছিলেন নইলে বাকিরা সে-সবের দিকে কোনো নজর দিত না। নিজের শরীরের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা তো এখানে ছিলই। কুমঠেকরজীকে পোশাক বানাতে হলো। তিনিও গরম চাপকান-পায়জামা বানিয়ে আনলেন। এখন তাঁকে নিঃসন্দেহে বেশি ভদ্র ও শিষ্ট মনে হচ্ছিল। জেলের অনশন আর মারধোর তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছিল। খুব পেটের গণ্ডগোল ছিল। মূলত পাঁউরুটি আর দুধ খেয়ে থাকতেন। দুধ গরম করার জন্য উনুন জ্বালানোর চেয়ে

[১] 'নিজের দ্রব্য মৃত্তিকাপিণ্ডের ন্যায়'। —স·ম·

হিটারে কাজ করা সহজ ছিল। তিনি সেটাই ব্যবহার করতেন। অন্য সাথী শুধু আলোর জন্য বিদ্যুৎ জ্বালাতেন। বিদ্যুতের বিলে সমান সমান টাকা দিতে হতো, সেজন্য এটা তাঁর পছন্দ ছিল না। তিনি বলতে পারতেন, কুমঠেকর কেন বৈদ্যুতিক উনুনের জন্য আলাদা পয়সা দেয় না? আমি বলেছি যে কুমঠেকর ধোঁকা দেওয়ার জন্য কারও টাকা নিয়ে বসে থাকতে চাইতেন না, এবং এটাও চাইতেন না যে তাঁর খরচ অন্যে বহন করুক। তা না হলে তাঁর মনের ঔদার্যের ওষুধ তিনি কোথা থেকে আনতেন?

হর্নক্লিফ ছিল মুসৌরীর একটি প্রান্তের সবচেয়ে শেষের বাংলো, এটা আমি বলেছি। এই প্রান্ত যমুনার দিকে ছিল। এদিকে এক-দেড় মাইল পর পাহাড়ী গ্রাম ছিল। সেজন্য ওখানকার জিনিসপত্র আমাদের কাছে সুলভ ছিল। যে-সময় গ্রামে শাকসবজি টাটকা থাকত তখন আমরা অর্ধেক দামে টাটকা সবজি পেয়ে যেতাম। ব্যবসায়ীরা চাষীদের চারগুণ দামেও দিতে রাজি হতো না। এই জন্য আমি খুব চাইতাম যে কালিম্পং, দার্জিলিং, নৈনিতালের মতো এখানেও সপ্তাহে দুদিন হাট বসুক, যাতে করে গ্রামবাসীদের জিনিস ক্রেতারা সরাসরি কিনতে পারে। নতুন পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর আশা হয়েছিল যে এই ব্যাপারে কিছু হবে। কিন্তু তাঁরা কিচ্ছু করলেন না। মাছও গ্রামবাসীরা প্রায়ই আনত। দুটাকা সেরের জায়গায় তা এক টাকা সেরে পাওয়া যেত। যদিও এখানকার বিখ্যাত মাছ 'মহাশির' কদাচিৎই আসত, তবে অন্যান্য মাছ ভাল ও বেশ বড় হতো। মাছ আমার কাছে মাংসের চেয়ে কম সুস্বাদু মনে হতো না কিন্তু কে জানে কেন এখানকার মাছে সেই স্বাদ পেতাম না যা ছেলেবেলায় ছোট ছোট মাছে পেতাম। শীতের দিনে গ্রামবাসীরা কখনো কখনো জংলী মুরগিও মেরে আনত। শাস্ত্রে গ্রামীণ কুক্কুট অভক্ষ্য আর অরণ্যের কুক্কুট ভক্ষ বলেছে। আমি গ্রামীণ কুক্কুটকে গ্রামীণ শুয়োরের মতোই ভক্ষ্য মনে করি, তবে ঋষিদের কথাও অমান্য করি না এবং অরণ্য কুক্কুট আর শুয়োরও পরম পবিত্র ভক্ষ্য মনে করি।

পণ্ডিত কানহাইয়ালাল মিশ্র প্রভাকরও এবারের গরমে এখানে 'হর্নহিল'-এ রয়েছেন। প্রভাকরজীর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ১৯৩৮ থেকে। আমি রাশিয়া থেকে ফেরার সময় সহারনপুরে এমনিই নেমে গিয়েছিলাম। শহরটি দেখা আর এখানকার কৌরবী ভাষা শোনার আনন্দ পেতে চাইছিলাম। হঠাৎ মিশ্রজীর সঙ্গে দেখা হলো। দু-একদিন তাঁর অতিথি হয়েও থেকে গেলাম। তাঁর লেখা আমার খুব প্রিয়। ছোট ছোট বাক্য আর ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে এত সুন্দর লেখেন যে মন ভরে যায়। কষ্ট হয় যে এত কম কেন লেখেন। 'নয়া জীবন' তিনি কয়েক বছর ধরে সম্পাদনা করছেন। কিভাবে তার ভার তিনি বহন করেন তা তিনিই জানেন, কারণ 'নয়া জীবন' একটি মফস্বল শহর থেকে বেরোয় এবং তার প্রচার খুব সীমিত। প্রভাকরজীর ভাষা শেখা ভাষা নয়। হিন্দির মূলভাষা হচ্ছে কৌরবী আর সেটাই প্রভাকরজীর মাতৃভাষা। তাঁকে এটুকুই শুধু করতে হয় যে, জনসভায় সেইসব উচ্চারণ আর শব্দ বর্জন করা যা হিন্দি সাহিত্যের ভাষা গ্রহণ করেনি। আমি মনে করি হিন্দি সাহিত্য-ভাষার এতটা অধিকার কখনোই থাকা উচিত নয় যে তা হিন্দিকে তার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মূল হিন্দি যার মাতৃভাষা, মনগড়া নিয়ম মানতে তাঁর অস্বীকার করা উচিত। মিশ্রজী, বিষ্ণুপ্রভাকরজী আর অন্যান্য কৌরবী-ক্ষেত্রের লেখকদের আমি সবসময় এই বলে এসেছি যে আপনারা নিজের গল্প,

উপন্যাস আর প্রবন্ধে আঞ্চলিক ভাষার আবরণ দিন যাতে আমাদের ভাষায় বেশি নমনীয়তা আসে। মিশ্রজীর সঙ্গে বিদ্যাবতী কৌশলও এসেছিলেন যাঁর কবিতা প্রায়ই 'নয়া জীবন'-এ ছাপা হতো। আমার জীবন তো ঘড়ির মতো চলে। মন খুলে সময় ব্যয় করায় যদি উদারতা দেখাই তাহলে কাজ থেমে যায়, তবু সন্ধের এক-আধ ঘণ্টা আর রোববারের সারা দিনটা আমি নিজের মনে করি না। সেই সময়টা এখানে আসা সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা হতো।

১৯৫০ সালে শ্রীপরমানন্দ পোদ্দার আমার অনেকগুলো বইয়ের একটি সংস্করণের জন্য ২৫ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছিল। আমি কি জানতাম এই অগ্রিম টাকা জীবনের জঞ্জাল হয়ে উঠবে? ইনকাম ট্যাক্স অফিসার এটাকেও প্রকৃত আয়ের সঙ্গে জুড়ে তা ২৯ হাজার করে দিল আর তারপর জবরদস্তি পাঁচ হাজার সুপার-ট্যাক্স বসিয়ে দিল। আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এটা রোজগারের ওপর সুদমুক্ত ঋণ, রোজগার নয়। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তা মানল না। শেষে এই ব্যাপারটা রেভিনিউ বোর্ডের কাছে গেল। এক-দেড় বছর তো মনে হচ্ছিল যে এ-নিয়ে ভুগতেই হবে। রয়্যালটির অগ্রিম নিয়ে অন্যদেরও এই রকম গণ্ডগোল ছিল। পরে এটাকে ঋণ হিসেবে মেনে নেবার পরে আমি ছাড়া পেলাম। অগ্রিমের জন্য আমাকে আফসোসই করতে হলো। ভাবছিলাম যদি অগ্রিম না দিত তাহলে বাড়িও নিতে পারতাম না আর মুসৌরীতে যেখানে চাইতাম সেখানে সস্তায় বাড়ি পাওয়াও মুশকিল ছিল না। যখন চাইতাম তখন মুসৌরী ছেড়ে অন্য কোনো জায়গাতেও যেতে পারতাম। বাড়ি নেওয়ায় এই লাভটি অবশ্যই হয়েছিল যে ধীরে ধীরে প্রায় চার হাজার বই জমা হয়ে গেল আর আমি তা থেকে উপকৃত হতে থাকলাম। কিন্তু এখন, যখন মুসৌরী ছাড়ার পরিকল্পনা হচ্ছে, তখন বাড়ির পিছনে লাগানো টাকার অর্ধেক দামও ফেরত পাওয়া আমি আশীর্বাদ মনে করি।

আমাদের বাড়ির মাত্র দু-হাত ওপরেই ভাল জাতের নাশপাতির দু-তিনটে গাছ আছে। ইংরেজরা তাদের জঙ্গল বানানোর সময় এখানে ফলের উৎপাদনের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিল। হর্নহিলে নাশপাতি, খুবানি, পিচ ইত্যাদি ফলের অনেক গাছ লাগানো আছে, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মুসৌরীর দিকে শনির দৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। অন্যান্য বিলাসপুরীগুলির চেয়ে মুসৌরীর বিশেষত্ব ছিল এই যে, এখানে ইংরেজরা স্বয়ং নিজেদের জন্য বাংলো বানিয়েছিল। নৈনিতালে তাদের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয়রা বাংলো বানিয়েছিল। নিজেদের জন্য বানানো বাংলোয় তারা সব দিকে পুরো নজর রাখত। সেজন্য ফল-ফুল উৎপাদনের ভাল ব্যবস্থা করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই আরও অনেক বাংলোর মতো হর্নহিলও ইংরেজদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে চলে গিয়েছিল। কিছুদিন এগুলো জিন্দের রাজার হাতে ছিল তারপর টেহরী নিয়ে নিয়েছিল। এখানকার বাগানের দিকে নজর দেওয়ার ফুরসত কারো ছিল না। উপেক্ষিত বৃক্ষ ধীরে ধীরে শুকোতে শুরু করল। আমি এখানে আসার সময় আমার আঙিনায় একটি নাশপাতি আর একটি পিচ গাছ থেকে গিয়েছিল। নাশপাতি ছিল কাঠ-নাশপাতি, যা চাটনির মতো করেই খাওয়া যায় যদি 'হনুমানজীর সেনা' তাদের ক্ষমা করে—একশোটি ভূত থাকলেও তারা ক্ষমা করতে রাজি ছিল না। একটু পলক ফেলতেই বহু সংখ্যায় এসে পড়ত আর এক পলকে ফল শেষ করে চলে যেত। এর জন্য আমার কোনো দুঃখ ছিল না কারণ নাশপাতি আমাদের কাজে লাগত না। কিন্তু আমাদের

সীমানার দু-হাত বাইরেই ভাল জাতের মিষ্টি নাশপাতি ছিল। কেউ তার না খোঁজ-খবর রাখত, না সার দিত। তবু এই গাছ প্রতিবছর ফলে ভরে উঠত। ফল নেবার কেউ ছিল না। ভূতের জন্য কখনো কখনো পাকার সময় অর্ধেক ফল থেকে যেত আর তারপর সেগুলো আশপাশের ছেলেদের কাজে লাগত।

পাঁচ-ছ বছর ধরে 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস' লেখার সংকল্প ছিল। বইটি বড় হবে বলে লেখার কাজ সহজে শুরু করা যাচ্ছিল না। ১ আগস্ট লেখায় হাত দিলাম। ১৯৫২ সালের মধ্যে পুরো বই শেষ করে ফেললাম। ১৯৫৩ সালের শুরুতে প্রেসে চলে গেল, কিন্তু ১৯৫৬ পর্যন্ত তার একটিই মাত্র খণ্ড বেরিয়েছিল।

বন্দুক এই ভেবে নিয়েছিলাম যে রাত-বিরেতে কোনো জংলী জানোয়ার যদি আসে তাহলে তাকে মারতে কাজে লাগাব এবং নির্জন দেখে চোরেরও যাতে আসতে সাহস না হয়। বানর-বাহিনী খুব বিরক্ত করলে গুলি চালাতাম কিন্তু শিকারে কখনো সফল হইনি।

মুসৌরীতে এসে আমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নির্জনতা-প্রিয় হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম পাহাড় থেকে নীচে নামবই না। এর কারণ ছিল ডায়াবেটিস আর তার জন্য নেওয়া ইঞ্জেকশনের কষ্ট। সামান্য ঘা দু-মাসের বেশি পুষে রাখতে হলো। এতে এটাই করা দরকার। এইজন্য কেন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয় পরিভাষার জন্য যে কমিটিগুলো তৈরি করেছিল তার সদস্যপদ থেকে আমি ইস্তফা দিয়ে দিলাম। সংসদও একটি কমিটি বানিয়েছিল, আমাকেও তার সদস্য করা হয়েছিল। ৭ আগস্ট সেখানে আমি অসম্মতি জানিয়ে দিলাম। এখান থেকে ইস্তফা দিতাম না কিন্তু আমাদের কমিটিতে যে-পরিভাষা তৈরি করা হতো তার চূড়ান্ত রূপ দেবেন যে-বিদ্বানরা, তাঁরা এমন লোক ছিলেন যাঁদের আমি এবং অন্য কেউই যোগ্য মনে করতাম না।

ভূতের এখন পাঁচ মাসেরও বেশি বয়স হয়ে গিয়েছিল। ভূত নিজে নিজেই তার শিক্ষা শিখছিল। সে পাথর মুখে করে তুলে আনত এবং সেটা ছুঁড়ে দিতে উৎসাহ দেখাত যাতে সে আবার তা তুলে আনতে পারে। যদি না ছুঁড়তাম তাহলে বাচ্চার মতো গোঁ ধরে চিৎকার করত। 'পাথর আনো' বললে সে পাথর আনতে চলেও যেত। অ্যালসেশিয়ান কুকুরের এটা স্বভাব, তারা পাথর মুখে ধরে ঘুরে বেড়ায়। পরে ভূত চার-পাঁচ সেরের পাথর নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরত আর কখনো কখনো একটি লম্বা পাথর নিয়ে এমনভাবে চলত যে মনে হতো মুখে সিগারেট নিয়ে যাচ্ছে।

বিহার সরকার পালি-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। তার সমিতিতে আমারও নাম ছিল। এটি ছিল নালন্দার পুনঃস্থাপনের প্রয়াস। বাড়ির অভাবে আগে রাজগীরে সেটি খোলা হয়েছিল, পরে নালন্দায় আনা হয়। নালন্দার পুনরুত্থানের স্বপ্ন আমি একবার খুব জোর দেখেছিলাম। আমার বন্ধু ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ এই প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ছিলেন। স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখে আমার আনন্দ অবশ্যই হচ্ছিল কিন্তু ততোটা নয়। কারণ এখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে কোনো গবেষণা বা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বড় সংস্থা জঙ্গলে বিকশিত হতে পারে না। জঙ্গলে তাকে শহরের স্তর পর্যন্ত উন্নীত করার জন্য কয়েক কোটি টাকা দরকার যা দিয়ে তার আশেপাশে নগর গড়ে ওঠে। তবুও তা থেকে স্বচ্ছল ও শিক্ষিত সমাজেরই সুবিধে হবে, গবেষণার জন্য যে-সব উপকরণের দরকার তা এখানে বহু বছরেও একত্রিত করা যাবে না। নালন্দার সেই অবস্থায়

পৌঁছনোর কল্পনাও এখন করা যায় না। পঞ্চাশ-একশো জন ছাত্র আর বিশ-পঞ্চাশ হাজার বইয়ে কি এমন কাজ হতে পারে? পাটনায় সংস্থাটি হলে প্রাচীন স্থানের গুরুত্ব যদিও সেটি পেত না কিন্তু সেখানে ভাল গ্রন্থালয়, ভাল মিউজিয়াম, প্রচুর সংখ্যায় কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক রয়েছে, সবকিছুরই সাহায্য পাওয়া যেত। নালন্দাকে নিয়ে তখনই সম্ভাবনা গড়ে উঠবে যখন সেখানে কৃষি কলেজ, ভেট্‌নরি কলেজের মতো অন্য অনেক বড় বড় শিক্ষাসংস্থাও গড়ে উঠবে এবং ছাত্র ও অধ্যাপকদের সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

শ্রীসদানন্দ মেহতা ভারতীয় সার্ভে বিভাগে কাজ করতেন। সে-সময় বিভাগের একটি অংশ মুসৌরীতে ছিল। পরে বুদ্ধির ঢেঁকিরা তা দেরাদুনে স্থানান্তরিত করেছিল। দু-একশো লোক থাকায় মুসৌরীবাসীদের যা একটু-আধটু লাভ হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। মুসৌরীর সমস্যা হচ্ছে—বছর বছর ধরে শূন্য থাকা এবং দ্রুত নষ্ট হওয়া বাংলোগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়? কী করলে এখানকার লোকেদের জীবিকার স্রোত শুকিয়ে যাবে না? এর জন্য দরকার ছিল, দিল্লীর কিছু বড় বড় দপ্তর এখানে পাঠিয়ে দেওয়া। প্রদেশের মন্ত্রীরাও জোর দিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও আশ্বাস দিল কিন্তু কোনো বিভাগ সেখান থেকে সরতে রাজি হলো না। আমাদের মন্ত্রীরা পুরনো আমলাতন্ত্রের হাতের পুতুলমাত্র ছিল। বেশিরভাগ মন্ত্রী পুতুল হওয়ারই যোগ্য, তাদের এমন যোগ্যতা নেই যে নিজেদের বিভাগের শাসন-সূত্র সামলাতে পারে বা তার খুঁটিনাটি জানতে পারে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্কই নেই তার হাতে সারা ভারতের শিক্ষার দায়িত্ব রয়েছে। যিনি জানেন না চিকিৎসা বিজ্ঞান কী জিনিস তাঁকে ৪০ কোটি লোকের স্বাস্থ্যের ভার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সব জায়গা বোবা-কালা লোকে ভরে রয়েছে। এরপর তারা কি আমলাতন্ত্রের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে? অন্ধের লাঠি তো তারাই। মন্ত্রী যদি কোনো বিভাগের কার্যালয়কে মুসৌরী বা সিমলা পাঠাতে চায় তাহলে সমতলের ধূর্ত আমলারা তার বিরোধিতা করছে। বিরোধিতা করবে না কেন, যখন তারা জানে যে, দিল্লীতে থাকলে আমরা মন্ত্রীদের দরবারে সেলাম ঠুকতে পারব, তাঁদেরকে প্রভাবিত করতে পারব এবং তাঁদের মাধ্যমে আমাদেরও দ্রুত পদোন্নতি ঘটাতে পারবো আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ভাল ভাল চাকরি দিতে পারব।

সদানন্দ মেহতা ইতিহাসে এম এ ছিলেন। সাংবাদিকতা ও রুশ ভাষাতেও ডিপ্লোমা করেছিলেন। আমি জানতাম, সার্ভে-বিভাগ গত শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে আমাদের বহু দেশ-ভ্রাতাদের তিব্বত এবং মধ্য-এশিয়ার দিকে পাঠিয়ে সেখান থেকে ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে। যারা নিজেদের জীবনকে বিপদে ফেলে সমস্ত কাজ করল তাদের কোনো কদর নেই—ইংরেজরা সবার কৃতিত্ব নিজেরাই নিতে। এভারেস্টের অনুসন্ধানকারী ছিলেন অদ্ভুত মেধাবী রাধানাথ সিকদার। যদি সেই শিখরের নতুন নাম রাখতেই হতো তাহলে তার নাম 'রাধানাথ শিখর' হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তা 'এভারেস্ট' নামে প্রসিদ্ধ হলো, যে-এভারেস্ট তার আগেই সার্ভে-বিভাগ থেকে পেনশন নিয়ে বিলেতে চলে গিয়েছিল। কিষাণ সিংহ, নৈনসিংহ, কিন থোব-এর মতো বাহাদুররা সেই সমস্ত সামগ্রী জড়ো করেছিল যা দিয়ে তিব্বত ও মধ্য-এশিয়ার নির্ভুল নকশা বানানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ তাঁদের ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভবঘুরে হওয়ায় এঁরা আমার আপন বন্ধু ছিলেন, তাই আমি চাইতাম যে,

তাঁদের কাজ বিশ্বের মানুষের সামনে আসুক এবং তাঁরা যে মূল ডায়েরি ও অন্যান্য জিনিস সার্ভে বিভাগকে দিয়েছিলেন তা পোকামাকড়ের খাদ্য হয়ে যাওয়ার আগেই প্রকাশিত হোক। এই জন্য আমি চাইছিলাম যে, মেহতাজী এই কাজটির দায়িত্ব নিন এবং এই গবেষণার ওপর পি এইচ ডি করুন। তিনি এই কাজটি করতে সম্মত হলেন। অনেক রকম অসুবিধে দেখা দিল। শেষে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় আমার অধীনে তাঁকে গবেষণা করার কাজটি সমর্পণ করল। কিন্তু সার্ভে-বিভাগ বা যেকোনো সরকারি বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসাররা কখনো কি চায় যে, তারা যে কাজ করতে পারল না তা অন্য কেউ করুক? তারা পদে পদে বাধা দিতে লাগল। আমি বুঝলাম কিষাণসিংহ-নৈনসিংহ ইত্যাদির ডায়েরিগুলো দপ্তরের কোনো কোণায় পড়ে আছে। আমি এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে লিখলাম। তিনি বিভাগকে লিখলেন। ড· শান্তিস্বরূপ ভাটনগর জ্বলে উঠলেন। তিনি হয়তো কখনো সেই ডায়েরি সম্বন্ধে কিছু শোনেনও নি কিন্তু তিনি এবং সমতলের আমলারা কি পছন্দ করবেন যে কোথাকার কে এক হরিদাস পাল তাঁদের কর্তব্যের দিকে আঙুল তুলে দেখাক? ভাটনগরের চিঠির কড়া জবাব দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি নি কিন্তু এটা জেনে আমি খুশি হয়েছিলাম যে, সেই ডায়েরিগুলো দেরাদুন থেকে আনিয়ে দিল্লীর কেন্দ্রীয় মহাফেজখানা (আর্কাইভ্‌স)-তে রেখে দেওয়া হয়েছে।

১৩ আগস্ট (১৯৫১) মাধবজী 'জঁা ক্রিস্তোফ'-এর একটি অধ্যায়ের ফ্রেঞ্চ থেকে হিন্দি অনুবাদ করে পাঠালেন। অনুবাদটা খুব ভাল ছিল এবং মাধব এই কাজের জন্য উপযুক্ত তরুণ ছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষে দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া আর কী বা করার ছিল? রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির পরিকল্পনার কাজ যে ঢিলেমি নিয়ে চলছিল তাতে আমি নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। যদি সমিতির সাহায্য এবং তৎপরতা পাওয়া যেত, তাহলে রম্যাঁ রোলাঁর এই অমর রচনাই নয় উপরন্তু আরও বহু রচনা হিন্দিতে অনূদিত হয়ে যেত।

১৪ আগস্ট শ্রীমুকুন্দীলালজী এলেন। তিনি শিল্প-সমালোচক, ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ এবং লেখক তো বটেনই সেই সঙ্গে তিনি সিদ্ধহস্ত শিকারীও। বয়স ৬০-এর ওপর হলেও তাঁর হাত কখনো কখনো বন্দুক ধরার জন্য নিশপিশ করে ওঠে। শিকারী হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার কখনো হয় নি কিন্তু শিকারযাত্রার লেখা আমি সবসময় খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। সে-সময় মন নেচেও উঠত—কিছু না হলেও কারু সঙ্গে একটা রাত অন্তত মাচার ওপরে গিয়ে বসি। এরকম সুযোগ এসেও ছিল কিন্তু আমি তা গ্রহণ করে উঠতে পারি নি। শিকারের বই পড়ে যে আনন্দ পায়, তা যদি শিকারীর মুখ থেকে শোনার সুযোগ মেলে তো সেটাও পছন্দসই হয়। মুকুন্দীলালজী তাঁর গাড়োয়ালের একটি শিকারের কথা শোনাচ্ছিলেন। তিনি আর তাঁর এক সঙ্গী নেকড়ের পিছনে গিয়েছিলেন। মুকুন্দীলালজীর গুলিতে আহত হয়ে নেকড়েটা একটি ঝোপে ঢুকে গিয়েছিল। খালি বন্দুকটা নিয়ে ঝোপের কাছে পৌঁছলেন। ভেবেছিলেন যে তাঁর সঙ্গীর বন্দুকে গুলি ভর্তি আছে। ইতিমধ্যে ভীষণভাবে আহত নেকড়েটি ঝাঁপ দিয়ে তাঁর পা ধরে ফেলল। সঙ্গী প্রাণ নিয়ে পালাল। আহত নেকড়ে আর নিরস্ত্র মানুষের যুদ্ধ শুরু হলো। তিনি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাকে মারছেন আর সে তাঁর পা চিবোতে শুরু করেছে। মানুষ জেতে না শ্বাপদ? কয়েক মিনিট ধরে দুজনের অনিশ্চিত লড়াই হতে লাগল। নেকড়েটা খুব বেশি আহত ছিল বলে কুঁদোর মারেই সে শেষ হয়ে গেল। যতক্ষণ প্রাণ সংকটে ছিল ততক্ষণ ঠিক জ্ঞান ছিল।

নেকড়ে তার মাংস আর হাড় চিবোচ্ছিল কিন্তু সেদিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। তিনি শুধু ভাবছিলেন যে জীবন সবচেয়ে বেশি মূল্যবান, তাকে যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে। নেকড়ে মরে যাওয়ার পর তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। পায়ের অনেক হাড় ভেঙে গিয়েছিল। হাসপাতালে বহুদিন ধরে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে পড়েছিলেন। শেষে প্রাণে বেঁচে গেলেন। পায়ে নেকড়ের চিবোনোর দাগ এখনো সম্পূর্ণ দেখা যায়। কিন্তু খোঁড়া হওয়ার অবস্থা হয়নি।

১৫ আগস্ট, ১৯৫১। ইংরেজদের চলে যাওয়া চার বছর হলো। সেদিন বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। গান্ধীচকে আমার পতাকা উত্তোলন করার ছিল। আগস্ট হচ্ছে বর্ষার সময়। এই সময় ভালভাবে কোনো সমারোহ করা মুশকিল। এ বছর সেদিন বৃষ্টি হয়নি। প্রচুর লোক এসেছিল। টাউন হলেও সভা হলো।

প্রকাশকদের সম্পর্ক লেখকদের অভিযোগ নির্ভুল হয় না আর সম্ভবত প্রকাশকদের অভিযোগও সবসময় নির্ভুল বলা যায় না। কিন্তু লেখক ভিক্ষুক না হলেও নিজের মজুরি পাওয়ার জন্য হাতের নীচে হাত রাখতে বাধ্য হয় এবং প্রকাশক হাতের ওপরে হাত। তারা নানাভাবে এর অপপ্রয়োগও করে।

দেরাদুনে হিন্দি সাহিত্য-সম্মেলনের পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল। এ বছর কমলা 'সাহিত্যরত্ন প্রথম খণ্ড', হরিশচন্দ্র 'বিশারদ' আর মঙ্গল 'প্রথমা'র ফর্ম পূরণ করতে ওখানে গেল। তিনজনই পরীক্ষা দিল। হিন্দিতে কাঁচা হওয়ায় মঙ্গল উত্তীর্ণ হতে পারলেন না, বাকি সবাই সফল হলো।

একদিন এমনিই আমি আমার পাসপোর্ট খুঁজতে শুরু করলাম। আমি ভাল করে জানতাম যে চামড়ার থলিতে ঢুকিয়ে সেটা সুটকেসে সযত্নে রাখা আছে। একটা বাক্স খুঁজলাম, দুটো বাক্স খুঁজলাম কিন্তু কোথাও তা পেলাম না। তবু আমার অন্য ভাবনা আসে নি এবং আমি ভাবছিলাম কোথাও বোধ হয় পড়ে আছে। কিন্তু পড়ে থাকলে তবেই না পাওয়া যাবে? তারপর যুদ্ধের সময় পাসপোর্ট গুম হওয়ার কথা মনে পড়ল। ইংরেজরা তাদের গোয়েন্দাদের ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল যে, যেভাবে হোক তারা তাদের কাজ হাসিল করুক। তাদের হাতে বিকিয়ে যাওয়া লোকেরা খারাপ থেকে অতি খারাপ কাজ করতে পারত। বিশ্বাসঘাতকতা তো তাদের পেশা ছিল। একজন তরুণ, যে এখন গোয়েন্দাদের স্থায়ী লোকও হয়ে উঠতে পারেনি, সে আমার ঘরে আসতে শুরু করেছিল, যে-ঘরে আমার পাসপোর্ট আর কিছু জিনিস বাক্সতে থাকত। সেখান থেকে সে ওটা বের করে নিয়ে গেছে। তার অন্য জিনিস বের করার কথা যদি না জানতে পারতাম তাহলে হয়তো বুঝতেই পারতাম না যে, এটা ঐ লোকটির কৌশল ছিল। এখন আমার সেই কথা মনে পড়ল। ইংরেজ চলে গেছে। তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছে আমি আগের মতোই বিপজ্জনক ছিলাম। কালিম্পঙেও গোয়েন্দা পিছনে লেগেছিল, সব চিঠি সেন্সর হতো। আমাদের রান্নার লোককে কিনে নিয়ে তাকে আমার প্রতি দৃষ্টি রাখার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মনে হয় সেই লোকটিই ওখানে কোনো সময় পাসপোর্ট গুম করে দিয়েছিল। মুসৌরীতেও গোয়েন্দাদের লক্ষ্য ছিল সেই রকম। যখন কৃপলানী পর্যন্ত গোয়েন্দাদের প্রতি অভিযোগ করেন এবং সরকারের প্রিয়পাত্ররা তাদের মহাপ্রভুদের এই বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকেও ছেড়ে দিতে রাজি নয় তখন আমার অভিযোগ করার কি অধিকার রয়েছে?

দেরাদুনে ফর্ম পূরণ করতে তিনজন গেল। দুজন অভিজ্ঞতার তাড়নায় পায়ে হেঁটে

পর্বত-যাত্রা করে একদিন আগেই মুসৌরী পৌঁছে গেল। তারা জানত যে পাহাড়ের মোটরে উঠলে কমলার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, খালি পেটে থাকলে পিত্ত উঠতে শুরু করে, তবু তাকে একলা ফেলে চলে এলো। পরের দিন দুপুরে কমলা হয়রান হয়ে বাস স্ট্যান্ডে নামল। এগারোটার সময় বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি পৌঁছল।

২৪ আগস্ট ওয়ার্ধা থেকে খারাপ খবর আসতে লাগল। আনন্দজী কয়েক বছর আগেই সমিতি ছাড়ার কথা বলছিলেন, তাঁকে ধরে রাখার ব্যাপারে আমার বড় ভূমিকা ছিল। এখন ওখানে দুটি দল হয়ে গেছে। এক পক্ষ কোমর বেঁধে তাঁর পিছনে লেগেছে। আমার মনে হতে লাগল, কেন আমি তাঁকে আগেই সমিতি থেকে সরে যেতে দিই নি। আমি ভেবেছিলাম, সমিতিকে এত বড় করে তোলার পিছনে যাঁর হাত রয়েছে তাঁর দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টিতেও বড় কাজ হতে পারে, সেইজন্য ওরকম করতে দিই নি। এখন অনুতাপ হচ্ছিল। অন্য কাজে লেগে থাকলেও আনন্দজী তাঁর কলম তাকে তুলে রাখেননি। এটা বোঝা যায় এ থেকে যে, তিনি জাতকের মতো মহান গ্রন্থের পালি থেকে হিন্দিতে সাতটি খণ্ড অনুবাদ করে হিন্দি সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি সময়ে-সময়ে আরও বই লিখে যাচ্ছিলেন। সমিতিতে না থাকলে তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরেও বড় কাজ করতে পারতেন (সমিতি থেকে সরে যাওয়ার পর তিনি যা করছেন)। প্রশ্নটা লোকসানের নয়। দুপক্ষেই আমার বন্ধু-বান্ধব ছিল। কারু পক্ষ নিয়ে এই সংঘর্ষে আমি একদিকে কি করে যেতে পারতাম? আমার এই নিরপেক্ষতাকে কয়েকজন বন্ধু পছন্দ করতেন না। আসলে এই সংঘর্ষ এত উগ্র হতো না যদি আনন্দজী সমিতি থেকে কিছু লোককে বের করে দেওয়ার চেষ্টা না করতেন। যিনি দশ বছর ধরে সমিতি চালিয়ে আসছেন এবং সমিতিতে একত্রিত হওয়া ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাভাবনার দলগুলির কাছ থেকে কাজ আদায় করার অভিজ্ঞতা যাঁর আছে, তাঁর সামনে আমি নিজের কী মতামত দিতাম? আমি মনে করতাম, দোষ-গুণ কার মধ্যে নেই? কিন্তু তার জন্য কাউকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ রোজগার থেকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়।

এদিকে সম্মেলনেও সংঘর্ষ তীব্র হয়ে উঠেছিল। যেখানে ৪০-৫০ হাজার ছাত্র পরীক্ষায় বসে সেখানে পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে নিজের বই ঢুকিয়ে দেওয়া বেশ লাভের ব্যাপার। কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ টাকার বন্দোবস্ত। সরকারি টেক্সট বুক কমিটিগুলোতে ঘুসের বাজার যে গরম দেখা যায় তার কারণও এই লাভ। যেখানে গুড় সেখানে পিঁপড়ে অবশ্যই আসে। এই জন্য সম্মেলনের পরীক্ষাগুলোর ওপর প্রকাশকরা ভনভন করতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা সম্মেলনের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে এবং এখন তো তারা নগ্ননৃত্য করতে চাইছিল। অন্যেরা তাদের বিরোধিতায় নেমে পড়েছিল। সম্মেলনের নিয়মাবলী এই জন্যও সংশোধন করা জরুরি ছিল যাতে ব্যবসায়ীরা তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে না পারে এবং বিদ্বান সাহিত্যিকরাই তার ভাগ্য-নির্ধারক হয়। কিন্তু ট্যান্ডনজীর আলসেমির কথা কি বলব? যখন সময় ছিল, তখন তিনি ঢিলেমি করলেন। এখন মোকদ্দমা শুরু হয়ে গেল। সম্মেলন ডুবে যাওয়ার ভয় ছিল না, তবে কাজের ক্ষতি হওয়ার ভয় তো অবশ্যই হলো। গত পাঁচটা বছর এমন ছিল যখন হিন্দির পরিভাষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রচনার বড় কাজও করা যেত কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা তা নষ্ট করে দিল এবং রিসিভার বসে বসে ছাইয়ের নীচে আগুনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

২৫ আগস্ট মন খানিকটা আকাশের দিকে উড়তে লাগল, বলতে লাগল, 'হৃদয়-তরঙ্গ তো সবসময় উড়তেই থাকে। কখনো তার গতি তীব্র হয়, কখনো মন্থর। আজ ধীরগতি রয়েছে—না বেশি ওপরে উঠেছে, না বেশি নীচে নেমেছে। এই তরঙ্গ ব্যক্তিগত কারণেও হয়, আবার সমষ্টিগত কারণেও হয়।'

২৬ আগস্ট একজন মঙ্গোল প্রৌঢ় এলেন যিনি আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে তিব্বত চলে এসেছিলেন। কয়েক বছর সেখানে থেকে তিব্বতী সাহিত্য পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর একটি বাচ্চা মেয়েও ছিল। বাহির-মঙ্গোলিয়ার এক ছোটখাটো রাজার মন্ত্রীপুত্র ছিলেন তিনি। রাশিয়ার বিপ্লবের পর তার প্রভাব পড়ল মঙ্গোলিয়ার ওপর। সুখে বাতির (সুখবাহাদুর)-এর নেতৃত্বে মঙ্গোল জনতা তাদের স্বেচ্ছাচারী সামন্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। এই সময় তিনি তাঁর রাজার সঙ্গে মঙ্গোলিয়া থেকে পালিয়ে যান। দুজনে ঘোড়ায় চড়ে খুব কষ্টে সিংকিয়াং পৌঁছন এবং তারপর কয়েক মাস বাদে লাসা আসেন। কিছুদিন তাঁরা তান্ত্রিক শাস্ত্র ও বিধি অধ্যয়ন করেন। তারপর ভারতে চলে আসেন। ভারতে তিব্বতী লামা-তান্ত্রিকদের খুব খ্যাতি রয়েছে। ধীরে ধীরে তিনি পাতিয়ালার রাজার কাছে পৌঁছে যান। সেখানে তান্ত্রিক রাজগুরু হয়ে যান। রাজার নারী এবং কুকুরের যেমন শখ ছিল, তেমনিই শখ ছিল তন্ত্রমন্ত্রেরও। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে পরিণামে চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। সেই চিন্তা দূর করার জন্য রাজা মন্ত্রতন্ত্রের শরণ নিতে চাইলেন। আমাদের বন্ধু সেখানে রাজগুরু হয়ে বহু বছর থাকলেন। ভাল বাংলো পেয়েছিলেন, ঝি-চাকরও ছিল এবং মাসিক বেতনও নির্দিষ্ট ছিল। যখন মহারাজা মারা গেলেন তখন তাঁর উত্তরাধিকারী পিতার সমস্ত শখের জিনিস দূর করল। মঙ্গোল তান্ত্রিক লামাও গৃহহারা এবং বেকার হয়ে গেলেন। ১৫-২০ হাজার টাকা তাঁর কাছে ছিল। মুসৌরীর লণ্ঢৌর বাজারের তিব্বতী লোকদের তিনি জানতেন। এখানেই চলে এলেন। সাদাসিধে লোকরা তাঁকে দিয়ে পূজাপাঠও করিয়ে নিত। সেই টাকা দিয়ে তিনি কোনো স্থায়ী কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হয় নি। এক তরুণী হৃদয় হরণ করল। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সি', তিনি প্রেমে পাগল ছিলেন। কিন্তু তরুণী বৃদ্ধের প্রেমে পাগল কেন হবে? অন্য এক তরুণ মাঝে এলো আর খেয়ে উড়িয়ে দেবার পর যা অবশিষ্ট ছিল তা নিয়ে স্ত্রী পালিয়ে গেল। মেয়েও ছেড়ে চলে গেল। নুন-তেল-কাঠের জোগাড় করারও অবস্থা থাকল না। দু-আনা চার আনার সূঁচ, সুতো, ছুরি-কাঁচির মতো জিনিস নিয়ে রাস্তায় বসে পড়তেন এবং তা থেকে যা রোজগার হতো তাই দিয়ে চালাতেন। শীতে দিল্লী চলে যেতেন, সেখানেও ওই কাজই করতেন। আমি তাঁকে বললাম, 'তিব্বত চলে যান। সেখানে গ্রামে নতুন স্কুল খুলছে, আপনি পড়ানোর কাজ পেয়ে যাবেন।' কিন্তু ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়। তিনি মনে করতেন—'কমিউনিস্টদের জাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আমি মঙ্গোলিয়া থেকে পালিয়েছিলাম। তারপর তিব্বতের কমিউনিস্টদের কাছে গেলে ওরা আবার সুদে-আসলে প্রতিশোধ না নিয়ে নেয়।' এখানে থেকে তিনি কাজ চালানোর মতো হিন্দিও শিখে গিয়েছিলেন, সামান্য পড়তেও পারতেন। কিন্তু তা দিয়ে সাহিত্যের কাজে সাহায্য করতে পারেন এমন জ্ঞান ছিল না। পাটনা, নালন্দা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে বন্ধুরা আমাকে একজন তিব্বতী অধ্যাপক পাঠানোর জন্য বলেছিল। আমি চাইছিলাম যে তিনি ওখানে কাজে লেগে যান। কিন্তু তিনি অর্ধেক মন নিয়েই চেষ্টা করলেন।

৩১ আগস্ট কমলার প্রথম গল্প 'নয়া সমাজ'-এ ছাপা হলো। এতে লেখিকার অপার আনন্দ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? 'নয়া সমাজ' হিন্দির সর্বোচ্চ মানের পত্রিকাগুলির মধ্যে পড়ে। আমার ভালো লাগল যে এবার কমলার লেখার হাত খুলবে এবং লেখার জন্য সে প্রস্তুত হবে। হাত খুলল। এখন পর্যন্ত আট-নটা গল্প সে লিখে ছাপিয়েছে। তার ভাষা আর লেখার শৈলীতে সংশোধন করার সুযোগ খুবই কম থাকে কিন্তু তার আলস্যের কোনো চিকিৎসা পেলাম না।

বর্ষার সময় আমাদের বাংলোর সামনের বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী সবুজে ঢেকে যেত, যা শীত শুরু হতেই নগ্ন হয়ে তিব্বতের ছোট পাহাড়গুলোর মতো হয়ে যেত। ডানদিকে পর্বত পার্শ্ববৃক্ষে ঢাকা পড়ে যেত। পাহাড়ে যেদিকে রোদ বেশি সময় থাকে সেদিকে আর্দ্রতার অভাবের জন্য জঙ্গল জন্মাতে পারে না আর অন্যদিকে আর্দ্রতার কারণে ছায়াঘন জঙ্গল থাকে। এই নিয়ম বেশি বৃষ্টি হয় এমন পাহাড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ঘড়ির কাঁটার মতো জীবন চলুক এটা মনে হয় ভাল নয়। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট করে রাখা কাজে এভাবে সময় কেটে যায় তো সেটা মানসিক প্রশান্তি দেয়। আমার ঘণ্টাগুলো নিজে-নিজেই কাজের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে যেত। সপ্তাহে শুধু রোববারের আসাটি বুঝতে পারতাম, কেননা সেদিন কাজ স্থগিত রেখে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। বাকি ছদিনের কেটে যাওয়া টেরই পেতাম না। দিন কাটতে কাটতে সপ্তাহ, সপ্তাহ কাটতে কাটতে মাস, মাস কাটতে কাটতে বছর, এইভাবে সময় চলে যায়। কাল যে আমার চোখে তরুণ ছিল আজ তাকে বৃদ্ধ রূপেও দেখা যায় না, তার স্মৃতি-মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু এটা তো জীবনের নিয়ম।

১৫ সেপ্টেম্বর আমার সাথী মহমুদ জাফর এবং ড· রশীদা জহাঁ এলেন। আমি ভেবেছিলাম তাঁরা থাকবেন। রশীদার আমার প্রতি অনেক অভিযোগ ছিল। বলতেন, 'আমি এসে ঝগড়া করব।' কিন্তু আধঘণ্টা থেকেই চলে গেলেন। ঝগড়া এটাই ছিল যে তিনি আমাকে উর্দুর বিরোধী মনে করেছিলেন। রশীদা নিজে উর্দুর একজন ভাল লেখিকা। হিন্দির বিরোধিতা করলে আমার যেমন ক্ষোভ হবে সেই রকম ক্ষোভ প্রকাশ করার অধিকার ওঁরও ছিল, কিন্তু আমি নিজেকে উর্দু-বিরোধী মনে করতাম না। ইতিহাস হিন্দিকে একটি ভিন্ন রূপ দিয়েছে যাতে দেশী ভাষাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে আরবী, ফারসী শব্দ ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু এখন তো সেটা ইতিহাসের কথা। ভাষা তৈরি হয়েছে এবং তাতে গালিবের মতো প্রতিভা অমূল্য শিল্পরচনা করেছেন। এই সম্পদ আমাদের। তা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমি চাই না যে পুরনো, নতুন বা ভবিষ্যতের উর্দু রচনা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। তা রক্ষা করা দরকার। উর্দুর উন্নতি এবং বিকাশের সুযোগ পাওয়া দরকার। তবে হ্যাঁ, এটা আমি অবশ্যই চাইতাম যে, উর্দুর নির্বিবাদ প্রচারের জন্য যত বেশি সম্ভব লোকের কাছে পৌঁছতে তা দেবনাগরী অক্ষরেও ছাপাটা জরুরি। রাজ্যের ভাষা, তাও ফারসী অক্ষরে, তৈরি করার আগ্রহ সেখানেই দেখানো যায় যে এলাকা বা প্রদেশের অধিকাংশ লোক তাকে চায়, তা না হলে শুধু শুধু মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে যা উর্দুর পক্ষেও হবে ক্ষতিকর। রশীদা জহাঁর কত কথা মনে পড়ে। সময়ের আগেই এই প্রতিভাশালী মহিলার মৃত্যুর কথা যখন ভাবি তখন খুব দুঃখ হয়। সে ঝগড়া করার জন্য আর আসে নি।

মুসৌরীতে দুটো সিজিন (ভ্রমণের মরশুম)। একটা হচ্ছে মে-জুনে বর্ষা শুরু হওয়া পর্যন্ত এক বা দেড় মাস, কখনো তারও আগে শেষ হয়ে যায়। অন্যটা অক্টোবরের বর্ষার পরে প্রায়

একমাস। নিজেদের নগরের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হতে দেখে মুসৌরীবাসীরা চিন্তিত। তারা অক্টোবরের মরশুমে বেশি ভিড় বাড়ানোর জন্য মহোৎসব (ফেস্টিভ্যাল) করার রেওয়াজ শুরু করেছিল। তাতে দশ-বিশ হাজার টাকা ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোনো লাভ হতো না। এবারের ফেস্টিভ্যাল উদ্বোধন করার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্ত এলেন। স্বাগত জানানোর জন্য চার-পাঁচটি তোরণ তৈরি করা হয়েছিল। ভাষণ হলো। এ দিয়ে মুসৌরীর সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তার একটাই রাস্তা আছে—চার-পাঁচ হাজার কর্মচারী রয়েছে দিল্লীর এরকম কিছু দপ্তর এখানে আনা। দিল্লীতে এমন সব দপ্তর আছে যা ওখানে থাকার কোনো দরকার নেই। সন্ধেবেলায় মালরোডে কিতাবঘর থেকে কুলড়ী পর্যন্ত অবশ্যই একটু জমজমাট মনে হতো। বেশির ভাগ ভ্রমণকারী পাঞ্জাবী। মাঝে মাঝে কিছু বিহারী, বাঙালীও দেখা যেত।

৩০ সেপ্টেম্বর রোববার। প্রথম সিজিনে তো কম লোকই আসে কিন্তু দ্বিতীয় সিজনে কখনো কখনো দেরাদুনের লোকেরাও পিকনিকের জন্য মুসৌরী চলে আসে। আজ পণ্ডিত গয়াপ্রসাদ শুক্লের সঙ্গে ডি এ ভি কলেজের ২৭ জন ছাত্র এলো। কোম্পানি বাগে সওয়া নটায় কয়েকটি ছেলে তাদের কবিতা পড়ল, একজন বাদ দিয়ে বাকিদের ছন্দে লেখা নিকৃষ্ট মানের কবিতা। এর জন্যও তো একটু ছন্দ আর অন্যান্য কিছু জিনিস শেখার দরকার হয়, যা আমাদের তরুণরা শেখা প্রয়োজন মনে করে নি। যদি সাহিত্য তাদের বিষয় হয় তাহলে তো পড়ার জন্য কিছু পায়, নইলে স্বয়ম্ভু কবি আপন খেয়ালে যে গানই করুক না কেন তার সাফল্য আশা করা যায় না। তারপর আমাকে ছেলেদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। দুপুর পর্যন্ত সভা খুব আনন্দে চলল। তারপর আমরা ঘরে ফিরে এলাম। সঙ্গে ভাইয়া, ভাবী আর শুক্লজীর সঙ্গে আরও কজন তরুণও ছিল।

মুসৌরীর দিকে লোককে টানার জন্য ঘোড়দৌড়ও এই বছর আরম্ভ হয়েছিল। মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে আর আমাদের বাড়ির নীচে আধমাইল দূরে ইংরেজরা পোলোর জন্য লম্বা-চওড়া ময়দান বানিয়েছিল। সেটা খালি পড়েছিল। সেখানেই ঘোড়দৌড় হলো। ভাবল, কি জানি, এই করে যদি মুসৌরীর ভাগ্য ফেরে। সেই বছরটা প্রথম ছিল বলে ভাল ঘোড়া পাওয়া যায় নি। এখানকারই ভাড়া করা ভারবাহী ঘোড়াকে দৌড় করানো হলো। ঘোড়দৌড়ে টাকা ধরার লোকও বেরিয়ে এলো। যদিও তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল না যে তারা ঘোড়দৌড়ের অবলম্বন হয়ে উঠবে। আমাদের ওপরের খালি হর্নহিল কুঠি থেকে পোলো ময়দান দেখা যেত, তাই আমরা ওখান থেকে তা দেখতে পারতাম কিন্তু আওয়াজ এখান পর্যন্ত পৌঁছত না। ঘোড়দৌড় হতে চলেছে, জুয়া হবে—এর বিরুদ্ধে আজ সকালে নগরে মিছিলও বেরোল। এর ফলে একটা লাভ তো হয়েছিল—যারা জানত না তারাও ঘোড়দৌড়ের খবর পেয়ে গেল। কিন্তু মিছিলে না উদ্যম দেখা যাচ্ছিল, আর না তাতে লোক ছিল বেশি। ইংরেজদের শাসনকালেও মুসৌরী কয়েক বছর ধরে মিউনিসিপ্যাল কমিটি থেকে বঞ্চিত ছিল, তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ব্যবস্থা করত সরকার দ্বারা নিযুক্ত আধিকারিক। দেরাদুনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সর্বেসর্বা। ইংরেজদের সময় থেকেই আমলাদের এমন ঐতিহ্য রয়েছে যে তারা জনতার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে না। এই ঐতিহ্য কংগ্রেসী সরকারও কায়েম রাখল।

দ্বিতীয় শীত

ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর প্রথম নির্বাচন হওয়ার সময় এলো। সংবিধান বানানোর আগে এমন কথা বলা হয়েছিল যাতে মনে হয়েছিল যে, আমাদের শাসন-ব্যবস্থা নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত গণতান্ত্রিক হবে। বহু বছর ধরে কংগ্রেসও ঘোষণা করেছিল যে, আমাদের প্রদেশ ভাষা-ভিত্তিক হবে। কিন্তু শাসন তাদের হাতে আসার পর এবং কংগ্রেসের সংগঠন চূড়ান্ত ভ্রষ্টাচারে ডুবে যাওয়ার পর নেতারা বুঝতে পারছিল যে, এতটা গণতন্ত্র আমাদের পক্ষে ভাল হবে না। প্রথমে প্রদেশের রাজ্যপালদের জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু সংবিধান বানানোর সময় তা সরিয়ে রাজ্যপালকে কেন্দ্রীয় সরকারের পুত্র বানিয়ে দেওয়া হলো। এখন সংসদ (পার্লামেন্ট)-এর একটি ভবন (রাজ্যসভা)-কেও নির্বাচন থেকে বঞ্চিত করা হলো। সে-জায়গায় সংসদের লোকসভার সদস্যদের তাকে নির্বাচিত করার অধিকার দেওয়া হলো। জনতার রায়কে সংসদ বা বিধানসভা ঠিকভাবে প্রকাশ করছে তখনই বলা যাবে যখন পার্টিগুলির মিলিত ভোট অনুসারে তাকে সদস্য বলে স্বীকার করা হবে। এরকম হলে কংগ্রেস অবশ্যই সর্বেসর্বা হতে পারত না। সেই জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সিদ্ধান্ত মানা হয় নি।

মুসৌরীতেও নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হচ্ছিল। কয়েকজন বন্ধু আমাকে বলল, 'আমরা আপনাকে পার্লামেন্টে পাঠাতে চাই।' আমি বললাম, 'আমি দাঁড়াতে চাই না।' আমি তো ভোটারও নই। ভোটার হতে গেলে সেই জায়গায় ছমাস থাকার শর্ত ছিল আর মুসৌরীতে আমার এখন তিনমাস আসা হয়েছিল। ৩ অক্টোবর এটাও জানা গেল যে, এবার সোস্যালিস্ট পার্টি তার গান্ধীটুপিকে কালো রঙে রাঙিয়ে নিয়েছে। সোস্যালিস্ট পার্টি ভোটের ময়দানে এলো। কংগ্রেস সব জায়গায় তাদের প্রার্থী দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। সোস্যালিস্টও চাইছিল না কোনো নির্বাচন-ক্ষেত্রে তাদের প্রার্থী না থাকুক। যদি সোস্যালিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে নিত, তাহলে নিঃসন্দেহে পূর্ব-উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ নির্বাচন-ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পরাজয় হতো। কিন্তু জেনে হোক বা না জেনে হোক, সোস্যালিস্ট পার্টি যেন সমাজবাদ ভারতে আসতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিল।

হেরে যাওয়ায় যখন আর কোনো সন্দেহ থাকল না তখন জার্মানি অস্ত্র সমর্পণ করল, জাপানও বিনা শর্তে তা করতে রাজি ছিল। সেই সময় আমেরিকা জাপানের দুটি শহরের ওপর পরমাণু বোমা ফেলে পুঁজিবাদের আততায়ী সুলভ আচরণের প্রমাণ দিল। নিরীহ মানুষগুলিকে এই ভাবে মারার প্রয়োজন শুধু এই জন্য ছিল যে, রাশিয়া যাতে পৃথিবীতে আমেরিকার পুঁজিবাদের একাধিপত্য বিস্তারে বাধা না দেয়। এতদিন সে তাকে নিয়েই বড় বড় কথা বলত, এখন পুরো রাশিয়ার সীমায় পৌঁছে যুদ্ধের জন্য তাল ঠুকছিল। এসব হওয়া সত্ত্বেও ৬০ কোটি জনসংখ্যার চীন দেখতে দেখতে আমেরিকার হাত থেকে বেরিয়ে গেল। সোভিয়েতের নেতারা এর আগেই বলে দিয়েছিল যে, পরমাণু বোমার ওপর এখন আমেরিকার ইজারাদারি নেই। কিন্তু আমেরিকা তা মানতে রাজি হবে কেন? দুনিয়ার সমস্ত শোষকরা আমেরিকার পরমাণু বোমার ওপর তীব্র দৃষ্ট রেখেছিল। তারা মনে করছিল যে, এর জন্যই আমেরিকা আজ পৃথিবীর সবচেয়ে

শক্তিশালী দেশ। যদি তারা জেনে যেত যে, রাশিয়াও এই অস্ত্রে পিছিয়ে নেই তাহলে তাদের সাহস দমে যেত। আমেরিকা এতদিন পর্যন্ত অস্বীকার করছিল। কিন্তু অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে রাশিয়া নয়, আমেরিকা ঘোষণা করল যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় দ্বিতীয় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ হয়েছে।

হিন্দি—৭ অক্টোবর খুরজা ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রী পি ডি গুপ্ত এলেন। তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী স্তম্ভ এবং যোগ্য প্রিন্সিপ্যালদের মধ্যে একজন। কোনো হিন্দিভাষী যখন ইংরেজিতে কথা বলায় উৎসাহ দেখায় তখন আমার কি জানি কী রকম মনে হয়। তিনি বলছিলেন,'বিদ্যার্থীদের অনুশাসন ভঙ্গের জন্য শুধু বিদ্যার্থীরাই দোষী নয়।' যে কোনো যোগ্য অধ্যাপক এটাই বলবেন। তাঁরা যদি তাঁদের ছাত্রদের দুগ্ধপোষ্য শিশু মনে না করেন এবং ছাত্রদের ভাবনা-চিন্তাকেও সম্মান করতে জানেন তাহলে ছাত্রদের অনুশাসন ভাঙতে দেখার অবকাশ তাঁরা পাবেন না। তিনি বলছিলেন, বিদ্যার্থীদের মধ্যে শিক্ষার যোগ্যতা কমে যাচ্ছে।' সেই সঙ্গে এটাও বলছিলেন যে, ইংরেজি-জ্ঞানের যোগ্যতার অভাব যেভাবে দ্রুত নেমে যাচ্ছে তাতে খুব ক্ষতি হবে। হিন্দির উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হওয়াটা গুপ্ত সাহেব দূরের ভাবনা বা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন। অধ্যাপক এবং ছাত্র এখন হিন্দি বই ও হিন্দি ভাষার ব্যবহার বেশি বেশি করছে। তা বন্ধ করা এখন সম্ভব ছিল না। তাঁর আফসোস ছিল যে, শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় সারা ভারতে উচ্চশিক্ষার যে একতা দেখা যাচ্ছে, তা হিন্দির জন্য ভেঙে যাবে।

সম্ভবত ফেস্টিভ্যালের কারণেই মুসৌরীতে কবি-সম্মেলনও করা হলো। কিন্তু যাদের কাছে টাকা ছিল তারা এই সম্মেলন পছন্দ করত না। অন্যেরা বলেছিল—কবিদের ডাকো। অনেক কবি এখানে এসে পড়লেন। কিন্তু এখানে সম্মেলনের না কোনো জায়গার ব্যবস্থা ছিল, না ছিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। বেচারা কবিদের টাকা-পয়সা ছাড়াই ফিরে যেতে হলো। শ্রীসত্যেন্দ্রজী (বদ্রীপুর) এই নিয়ে বলছিলেন।

হিন্দির ব্যাপারে নেহেরুজী বলেন—তা কঠিন হওয়া উচিত নয়। আসল কথা হলো, তিনি চান পড়াশোনা না করে শুধু কথাবার্তা থেকে তাঁর যতটুকু জ্ঞান হয়েছে, তাকেই হিন্দি ভাষার মান বলে ধরে নেওয়া হোক। ৭ অক্টোবর রেড়িওতে তিনি বলছিলেন। তাতে তিনি নীচের শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন—বাকয়াত, দিমাগ, বাকয়া, হাদসা, য়কীনন, সদমা, মৌকে, গায়ব, ইন্সানিয়ত, জজবা, কশমকশ, খতরনাক, গলত তরীকে, নতীজে, জলসে, ইজহার, খয়ালাত ইত্যাদি।[1] হিন্দিভাষীরা এই শব্দগুলি ব্যবহার করে না এবং এই শব্দগুলি নিশ্চিতরূপে জনসাধারণের বোঝার বাইরে। হিন্দি যারা পড়েছে তারাও এগুলি বুঝতে অসমর্থ হয়। এতে নেহেরুজীর ফতেয়া হলো—হিন্দি ভুল পথে যাচ্ছে। আগে তিনি মৌলানার সঙ্গে উর্দুর পক্ষ নিয়েছিলেন, এখন হিন্দি মঞ্জুর হয়ে যাওয়ার পর চাইছেন যে হিন্দি উর্দুর রূপ ধারণ করুক।

সেই দিনই জানতে পারলাম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলিকে কেউ গুলি করেছে।

[1] উল্লিখিত শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে—অবশিষ্ট জিনিস, বুদ্ধি, বৃত্তান্ত, দুর্ঘটনা, নিশ্চিতরূপে, আঘাত, সুযোগ, অন্তর্হিত, মনুষ্যত্ব, মনোবৃত্তি, টানাটানি, ভয়ানক, ভুল পদ্ধতি, অনুচিত ফল, উৎসব, সাক্ষ্য, বিচারধারা।—স·ম·

মারা যাওয়ার সময় তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল—'খুদা পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন।' জিন্না এবং লিয়াকত আলি পাকিস্তানের সর্বেসর্বা ছিলেন। দুজনই ছিলেন বিদেশী। পাকিস্তানের সরকারে শরণার্থী-মুসলমানে ছেয়ে গিয়েছিল, পূর্ব-পাকিস্তানে পাঞ্জাবীরা সুযোগ পেয়েছিল। এর ফলে লোকের মনে ঈর্ষা হতেই পারে। এই সময় খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। গভর্নর জেনারেলের হাতে ক্ষমতা থাকে না, থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। এটা বুঝে নাজিমুদ্দিন নিজের গদি থেকে নীচে গড়িয়ে নেমে এলেন এবং রাতারাতি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। পাকিস্তানে সবসময় ডামাডোলের অবস্থা ছিল আর তা ছাড়াও আমেরিকার হাত তার ওপর শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ভারতেও ভ্রষ্টাচার এবং দুর্বলতা আছে কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করলে তা নগণ্য।

১২ অক্টোবর কিষাণ সিংহ মোমোর ভোজ দিলেন। আমরা দুজন নিজেদের কথা চিন্তা করে ভাবতাম যে মাংস খায় এমন প্রতিটি লোকই এটা পছন্দ করবে। ভাইয়াকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁর পছন্দ হলো না। ওখান থেকে মলিঙ্গার গেলাম। মলিঙ্গার মুসৌরীর সর্বপ্রথম পাকাবাড়ি, যদিও এটা বলা ঠিক নয়, কেননা সওয়াশো বছর আগে যে প্রাচীরগুলি বানানো হয়েছিল তা এখনো বর্তমান আছে। এতে কয়েক ডজন ঘর আছে আর স্থানটি এমন জায়গায় যেখান থেকে দূর-দূরান্তের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সার্ভে-বিভাগের একটি দপ্তর মুসৌরীতে ছিল, যার কর্মীরা এখানে ছিল। মেহতাজী এখানে সপরিবারে ছিলেন। তাঁর বাড়ি আমরা চা খেতে গিয়েছিলাম। চা খাওয়ার সময় ছিল না তবু তিনি তৈরি করে রেখেছিলেন। এখান থেকে পাঁচটায় ফিরে ভাইয়ার বাড়িতে দ্বিতীয়বার চা খেলাম।

২১ অক্টোবর (রোববার) অতিথিদের আসার দিন ছিল। প্রথমে একজন তিব্বতী গেশে (পণ্ডিত) এলেন। তিনি নামমাত্র হিন্দি জানতেন। তারপর ভাইয়া-ভাবী আর মেহতাজী এলেন। পরে মীরাটবাসী শকুন্তলাজীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় মুরাদাবাদের এক তরুণ ব্যবসায়ী এলো। আমি আমার জীবনীতে মুরাদাবাদ যাওয়া এবং সেখানে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে থাকার কথা উল্লেখ করে লিখেছিলাম যে, তিনি দশটি জলের কমণ্ডলু রেখে দিয়েছিলেন আর চাইতেন যে আরও নজন সাধু পেয়ে গেলে দশম জন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন। এই সংখ্যা দুইয়ের চেয়ে বেশি কখনো হয় নি। অন্য কোনো ভবঘুরের আসার প্রতীক্ষায় মাস বা বছর ধরে তাঁর কাছে কে থাকতো? শেষে আমি যেমন কয়েক সপ্তাহ থেকে কেটে পড়লাম। তরুণটি জানাল, 'তিনি আমারই খুড়তুতো প্রপিতামহ ছিলেন।' আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ব্যবসায়ী-ভদ্রলোকের মা আর ছোটভাই সরে পড়ার জন্য আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। তরুণটি এটাও জানাল যে, তাঁরা এখন জীবিত নেই কিন্তু তার প্রপিতামহ এখনও আছেন, বৃন্দাবন-বাস করছেন।

২২ অক্টোবর ভাইয়া আর ভাবীজীর বিদায় উপলক্ষে চা-পান ছিল। সেদিন আমরা লান্ধৌর্মোন্ট গেলাম। বর্ষার মাসগুলো আমাদের বেশ হাসিখুশিতে কেটে যেত, কেননা জুন বা জুলাই-এ এসে ভাইয়া-ভাবী অক্টোবরে এখান থেকে ফিরে যেতেন। এখন আবার সামনের বছর তাঁদের সঙ্গে দেখা হবার কথা।

২৮ অক্টোবর রোববার তরুণ শিবশর্মা একজন ব্রজবাসী সঙ্গীতজ্ঞ তরুণকে নিয়ে এলেন। সঙ্গীতজ্ঞের সাদাসিধে চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল কোনো গ্রাম্য লোক হবে। কিন্তু বাইরেটা দেখে

ভুল করা উচিত নয়। এ অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর হয়েছিল। তরুণটি এফ এ পর্যন্ত পড়াশুনো করেছিল। সংগীত তার বংশগত বিদ্যা ছিল, তাই সে তা মন'দিয়ে শিখেছিল। এখানকার ব্রজবাসী ডাক্তার ভাদুড়ীর সঙ্গে সে এবারের গরম কাটাতে এসেছিল এবং সংগীতের বিষয়ে কিছু কথা বলে খরচ চালিয়ে নিত। সংগীতে আমার বিরাগ নেই, যদিও চিরাচরিত সংগীত আমি পছন্দ করতাম না। আমি এটাও চাই যে আমাদের সংগীতের স্বরলিপি আন্তর্জাতিক হওয়া উচিত। ইউরোপীয় নোটেশন (স্বরলিপি) আজ সারা বিশ্বে চলছে। সারা ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার সব দেশ এবং জাপানও তাকে গ্রহণ করেছে। আমাদের সংগীত বাইরের লোকেরা এই নোটেশন দিয়ে সহজে বুঝতে পারবে। যেমন সারা পৃথিবীতে এক সংখ্যা, এক পরিমাপ ও ওজন হওয়ায় সকলের সুবিধে হয়েছে। নিজের দেড়খানা ইঁট দিয়ে আলাদা মসজিদ বানানো যেমন ক্ষতিকারক, তেমনি আন্তর্জাতিক নোটেশনকে বয়কট করার কথা ভাবাটাও ক্ষতিকারক এবং নিরর্থক, তার কারণ শেষে তাকে গ্রহণ করতেই হবে। ইউরোপীয় নোটেশনে এটাও লাভ যে, তা হচ্ছে গ্রাফ বা ফটোর মতো। দেখামাত্র যে কোনো রাগ অন্য কোনো রাগের কতখানি সদৃশ বা অসদৃশ তা বোঝা যায়। শিক্ষিত তরুণটিকে দেখে আমি বললাম, 'সংগীতের তুলনামূলক অধ্যয়ন করো এবং লোকগীতিগুলিও সংগ্রহ করে সেগুলো আন্তর্জাতিক স্বরলিপিতে আবদ্ধ করো।' সংগীত যে ভবঘুরের পক্ষে সাবলম্বী হওয়ার একটি বড় উপায় তার উদাহরণ ছিল এই তরুণটি নিজে। সে ভারতের বহু জায়গায় ঘুরেছে এবং তা সংগীতের ভরসাতেই।

টাকা সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। যা অগ্রিম নিয়েছিলাম তার মধ্যে ২০ হাজার বাড়ি আর ফ্ল্যাটেই ব্যয় হয়েছিল, বাকিটাও খরচ হয়ে গিয়েছিল। খরচ কমানোর জন্য ভাবতাম—রান্নার ঠাকুরকে ছাড়িয়ে দিই, নিজের হাতে রান্না করি। কিন্তু বাসন মাজা? তার জন্য সমতলের মতো কয়েক ঘণ্টা কাজ করার ঝি-চাকর এখানে পাওয়া যেত না।

৩০ অক্টোবর দেওয়ালি ছিল। আমি তো মুসৌরীতে কোনো দেওয়ালি দেখি নি। ঘর পাহারা দেবার জন্যও একজন লোকের দরকার ছিল। কমলা অন্যদের সঙ্গে অবশ্যই চলে যেত। মানুষের উৎসবের বড় প্রয়োজন। দুঃখী জীবনেও তার ফলে অল্প সময়ের জন্য হলেও সরসতা এসে যায়। মুসৌরীর দোকানদার বেচারারা নিজেদের ব্যবসার পুঁজি খেয়েই বেঁচেছিল, তবু তারাও তাদের দোকান সাজিয়েছিল। আমাদের আশেপাশেও পাঁচ-ছজন দোকানদার আছে তারাও লক্ষ্মীকে আবাহন করার চেষ্টা করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দর এলাহাবাদের 'লা জার্নাল' প্রেসের প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন। তিনিই একটি ছোটমতো প্রেসকে খুব বড় প্রেসের রূপ দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় যে কাজ করেছিলেন তা ছিল ছাপা—লা জার্নাল প্রেসকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসে পরিণত করা। ১৯৩৩ সাল থেকেই আমার বই ওখানে ছাপা শুরু হয়েছিল। যে তৎপরতার সঙ্গে তিনি ছাপার কাজ করতেন, তার জন্যই আমি তাঁর খুবই প্রশংসা করতাম। যে কোনো বর্ধিষ্ণু ব্যবসাতে খুব বেশ মোটা পুঁজির দরকার। ব্যবসায়িক উন্নতির দিকেই শুধু একমাত্র দৃষ্টি থাকে যে-পুরুষের সে অন্য দিকটা দেখে না। লা জার্নাল প্রেসে মেশিন আর কাজ বাড়ার ফলে তা পয়সাওলা লোকেদের হাতে চলে গেল। তবু তারা দর সাহেবের যোগ্যতা দেখে তাঁকে ম্যানেজারের পদে রাখল। প্রেস নিজের প্রকাশনাও শুরু করতে চাইল। দর সাহেব আমাকে বই দিতে লিখলেন।

অগ্রিম টাকাও দিলেন। আমি 'গঢ়ওয়াল' 'কুমায়ুঁ' 'দক্ষিণী হিন্দি কাব্যধারা'—এই তিনটে বই দিতে রাজি হলাম। 'গঢ়ওয়াল' তিনি ছাপতে পেরেছিলেন। 'কুমায়ুঁ' মোনোটাইপে কম্পোজ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় দর সাহেবকে মালিকদের আর প্রয়োজন থাকল না। তারা তাঁকে সরিয়ে দিল।

নভেম্বরে ভূত সাতমাসে পা দিয়েছিল। রোজ এক সের আটা আর সপ্তাহে দুদিন আধসের করে মাংস সে পেত। এখন সে লম্বা ও ক্ষিপ্র ছিল। এদিকে-ওদিকে খুব দৌড়ত। সে কি করে জানবে যে দেশে শস্যের কি কষ্ট?

৩ নভেম্বর নাগাদ শীত পড়ল। শুধু দুপুর টুকুতেই তা টের পাওয়া যেত না। চাকর চলে গিয়েছিল। কমলাকে কেবল রান্না নয়, বাসনও মাজতে হতো। কমলা তার পরীক্ষার জন্যও তৈরি হচ্ছিল।

শ্রীমতী মোহিনী জুত্শী—মোহিনীজী খুবই সুসংস্কৃত ও সাহিত্যিক মহিলা। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পরিবারে অমৃতসরে জন্ম। বিয়ে হয়েছিল লক্ষ্ণৌর ইঞ্জিনিয়ার মুনীশ্বরনাথ জুত্শীর সঙ্গে। মোহিনীজীর পিতামহ-প্রপিতামহ আফগানিস্তানে অত্যন্ত উঁচু পদে ছিলেন। যখন তাঁদের ধনীর যুগ বিপর্যস্ত হলো তখন তাঁরাও এসে অমৃতসরে থাকতে লাগলেন। তাঁর প্রপিতামহী ফারসী বলতেন। ভারতবর্ষে ইংরেজরা উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে চলে এসেছিল। যারা রাজসেবা নিজেদের বংশগত পেশা বলে মনে করত, তারা আগে থেকেই নিজেদের বাচ্চাদের ইংরেজি পড়াতে লাগল। যদিও মেয়েদের জন্য ইংরেজির প্রয়োজন ততটা ছিল না কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে জন্ম হওয়া মোহিনীজীর ইংরেজিতে ম্যাট্রিক পাস করার সুযোগ হয়েছিল এবং তারপর অধ্যয়ন তাঁর কাছে ব্যসন হয়ে উঠেছিল। ইংরেজির সঙ্গে উর্দুর প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি উর্দু কবিতা বলতে লাগলেন। তাঁর কাব্যগুরু ছিলেন পণ্ডিত ব্রজমোহন দত্তাত্রেয় 'কৈফী'। তাঁর কবিতা আমি টাউন হলের সভায় সভাপতি থাকাকালীন শুনে ছিলাম। ৪ নভেম্বর তা আরও শোনার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

জুত্শী সাহেব অনেক দিন ধরে গোরখপুরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। স্বামী-স্ত্রী দুজনের রুচি একরকম ছিল না কিন্তু সৌহার্দ্য খুব ছিল। জুত্শী সাহেব প্রত্যেক ব্যাপারেই খুব উদারপন্থী ছিলেন। দুজনের তিনটে মেয়ে ও তিনটে ছেলে। এই দম্পতির ব্যবহারিক জ্ঞান কত বেশি তা এই থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য শিল্পের দিকে না এগিয়ে, বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। এক ছেলে ডাক্তার হয়ে ইংলন্ডে পড়তে গেছে আর প্র্যাকটিশ করার সময় সেখানেই বিয়ে করে বসবাস করছে। ইংরেজ বধূর প্রতি শাশুড়ির তেমনিই স্নেহ ছিল যেমন কোনো কাশ্মীরী মেয়ের প্রতি থাকত। আরেকটি ছেলে বাবার মতো ইঞ্জিনিয়ার। তৃতীয় ছেলেটি রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমেরিকায় সাত-আট বছর বসবাস করেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল যে, আমেরিকা থেকে সে ফিরবে না। এজন্য মোহিনীজীর খুব চিন্তা ছিল। তিনটে মেয়েকেই তাঁরা ডাক্তার করেছিলেন। দুজন, কাশ্মীরী নয় এমন ছেলেকে নিজেরা বিয়ে করেছিল, বাবা-মায়ের আশীর্বাদ তারা পুরোপুরি পেয়েছিল। এরকম সংস্কৃতিবান দম্পতির সঙ্গে পরিচয় এবং সম্পর্ক হওয়া যে খুবই আনন্দের কথা তা বলার

দরকার নেই। এক বছর সিজিনের সময় তাঁরা আসেন নি, তার জন্য প্রতি রোববার তাঁদের অভাব খোঁচা দিত।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও ৭ নভেম্বর রুশ-বিপ্লবের মহোৎসব এলো। রেডিওর মাধ্যমে আমিও সেই মহোৎসবে সামিল হলাম। এই মহোৎসব কেবল রুশ আর সোভিয়েত দেশের অন্যান্য জাতিদের জন্য নয়, সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষদের তা এক মহান উৎসব। পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়াতেই সর্বপ্রথম সাম্যবাদ বাস্তব রূপ পেয়েছিল। আজ তা পৃথিবীতে একলা নয়। পূর্ব-ইউরোপ মার্কস নির্দেশিত পথে চলে সুখ ও সমৃদ্ধির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েক যুগ ধরে পিছিয়ে থাকা মহান চীনও এখন তার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলছে। চার বছর হলো ভারত ইংরেজের হাত থেকে শাসনভার নিয়েছে। এখানে কংগ্রেস তার তরুণী ভ্রষ্টাচারের কাদাতে ফাঁসিয়ে মানুষকে হয়রান করে রেখেছে, অথচ মাত্র দু বছরে চীন কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে!

কুলু-লাহুলের সীমান্তে জাঁস্কর হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীরের একটি অংশ। সেখানকার লোকেরা লাদাখের মতো তিব্বতী ভাষা বলে। তারা বৌদ্ধধর্মের অনুগামী। জোমা দেকোরো হাঙ্গেরি থেকে এসে এখানে কয়েক বছর ধরে তিব্বতী পড়েছিলেন। তিব্বতীভাষীদের সঙ্গে আমার বিশেষ আত্মীয়তা রয়েছে। লাহুলের ঠাকুর মঙ্গলচন্দ এবং ড· ভগবান সিংহ চিঠিতে লিখেছিলেন যে, জাঁস্করের লোকেরা ঘাস খাচ্ছে। পাকিস্তানীরা একবার তার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল, সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু জাঁস্করবাসীদের খোঁজ-খবর নেবার কেউ নেই। আমার পুরনো সম্পর্কের সূত্রে রাষ্ট্রপতি হয়ে যাওয়ার পরও রাজেন্দ্রবাবুর কাছে এরকম কষ্টের কথা চিঠি লিখে জানাতে আমার কোনো দ্বিধা ছিল না। আমি তাঁকে লিখলাম। জবাবে জানলাম যে সাহায্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারি সাহায্য মাঝপথে উড়িয়ে দেয়ার লোকের অভাব হয় না।

রাশিয়া থেকে আসা এখন চার বছর হয়ে গিয়েছিল। কতবার আমার মনে হয়েছিল এবং বন্ধুরাও বলেছিল সেই যাত্রার কথা লিখে ফেলতে। শেষে ১২ নভেম্বর আমি 'রুস মে পচ্চিস মাস' লিখতে শুরু করলাম। এটা ১৯৪৪ সালের শেষ থেকে ১৯৪৭-এর শেষ পর্যন্ত যাত্রা ছিল। তা লিখে ফেলার পর আমার ইচ্ছে হলো না যে তৃতীয় 'জীবন-যাত্রা'য় সেই সময়টিকেও রাখি।

অনেকদিন নিজের হাতে রান্না করা আর বাসন ধোয়ার পর আমি বলাতে প্রতিবেশী বরেঠিন (ধোপানী) রান্না করে দিতে রাজি হলো। মাতবর সিংহের চেয়ে সে ভাল রান্না করত। এর ফলে কমলা পড়ার সময় পেল।

নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ সবেদা গাছের পাতা ঝরে গিয়েছিল। শুকনো গাছে ফল দেখা যাচ্ছিল। চেস্টনাট এবং নাশপাতির পাতা হলুদ হয়ে গিয়েছিল। অন্য কয়েকটি গাছের পাতার রঙ হয়েছিল কলজের মতো। একটি গন্ধহীন সাদা ফুল ছিল যাকে আমি 'বেহায়া ফুল' নাম দিয়েছিলাম, কেননা কোথাও ফেলে দিলে সেখান থেকে সে সরে যাওয়ার নামটি করত না। আমরা একটা জায়গা তার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলাম। কেওড়ার মতো পাতাওলা এই গাছ প্রতি বছর এখানে ঝাড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। শীতে সবার আগে এই গাছটি শুকোত এবং বসন্তে সবার আগে সবুজ হয়ে উঠত। এমনিতে এর সাদা ছাড়াও অন্য রঙের ফুলগুলো সুগন্ধী না হলেও

ফুলের তোড়ার শোভা বাড়ায়।

১৮ নভেম্বর শ্রীসত্যপ্রকাশ রতুড়ী এলেন। অনেক বছর ধরে তিনি মুসৌরী থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিমাচল' বের করে চলছেন। এমনিতে মুসৌরী থেকে তিনটে ইংরেজি কাগজ না-জানি কত দিন থেকে বেরোচ্ছে। তার কোনো ক্রেতা আছে কি না তাও জানি না। তবে মুসৌরীর স্টোর এবং ইংরেজি ঢঙের দোকানদারদের নিজেদের অস্তিত্বের খবর প্রতিটি বাংলোতে পৌঁছে দেওয়াটা জরুরি, এই কাজটি করে ঐ ইংরেজি কাগজটি, যার জন্য সে বিজ্ঞাপন পেয়ে যায়। এখানকার বেশির ভাগ ভ্রমণকারী হচ্ছে কালো চামড়াওলা ইংরেজ। ইংরেজরা চলে যাওয়ার ন বছর পরে আজ মুসৌরীর পথে যত ইংরেজি বলতে শোনা যায় সম্ভবত ইংরেজদের সময়েও ততটা বলা হতো না। আজ লিপস্টিক আর পাউডারে এখানে যত খরচ হয়, ইংরেজদের সময়েও তা হতো না। তার ওপর কাজলও আমাদের সুন্দরীদের চায়। এই রকম ভ্রমণকারীদের ভারতীয় 'হিমাচল'-এর কি দরকার? আমি বুঝতে পারতাম না যে রতুড়ীজী কি করে এই পত্রিকাটি চালাচ্ছেন। এক সময় তিনি কারো কাছে চাকরি করতেন এবং খাওয়ার পয়সা বাঁচিয়ে আট পাতার 'হিমাচল' বের করতেন। অধ্যাপক থেকেও তিনি এরকমটা করেছেন। এই রকম মানুষ যখন জুটে গেছে তখন 'হিমাচল' কেন বেরোবে না? কখনো কখনো কয়েকদিনের জন্য তা অস্তও যেত কিন্তু আবার অবশ্যই প্রকাশিত হতো। তাতে মুসৌরীরই শুধু নয় উপরন্তু টেহ্‌রী-গাড়োয়ালের খবরও থাকত বলে বাইরে তার কিছু গ্রাহক ছিল। যখন এখানে সেটা চালানো মুশকিল হয়ে পড়ল তখন রতুড়ীজী তাকে হৃষিকেশ নিয়ে গেলেন। সেখানে হয়তো বেশি অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। এখনও সেটি বেরোচ্ছে।

রাজেন্দ্রবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীচক্রধর শরণের চিঠি থেকে জানলাম যে, রাষ্ট্রপতি জাস্কর সম্বন্ধে আমার চিঠিটি তাঁর নিজের চিঠির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। চক্রধর শরণ তখন থেকে রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ছায়ার মতো রয়েছেন যখন তিনি বিহারে অর্ধনগ্ন ফকিরের মতো কংগ্রেসের কাজে দিনরাত লেগে থাকতেন। সবাই যদিও জানত যে রাজেন্দ্রবাবুর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা আর ত্যাগ রয়েছে তবু তিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হবেন এটা কে জানত? রাজেন্দ্রবাবু একবার যাকে অন্তরে গ্রহণ করে নিয়েছেন সে চিরদিনের জন্য তাঁর হয়ে গেছে। এই সময় আমার মথুরাবাবুর কথা মনে পড়ত যিনি অসহযোগের সময়ে ওকালতি ছেড়ে রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং চক্রধরবাবুর মতো সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু মথুরাবাবু না ভারতকে স্বাধীন দেখতে পেলেন, আর না তাঁর 'বাবু'কে এই মহান পদে আসীন হতে দেখলেন। সে-সময় যখন রাজেন্দ্রবাবুর প্রথম রাষ্ট্রপতি হওয়া স্থির হয়ে গিয়েছিল তখন একদিন পার্লামেন্ট-ভবনে হঠাৎ রাজেন্দ্রবাবুসহ চক্রধর বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি আগের মতোই পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলেন। আমি এটা পছন্দ করতাম না কিন্তু কারও হাত কি করে আটকাব? ভাবী রাষ্ট্রপতির প্রাইভেট সেক্রেটারি হওয়ার পরও তাঁর সারল্য আর সৌজন্যবোধ এই ব্যাপারটি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। চক্রধরবাবুর সম্বন্ধে এত কথা বলার দরকার এইজন্যেও ছিল যে, তিনি অল্প সময়ই রাষ্ট্রপতির সহায়ক থাকতে পেরেছিলেন। তারপর তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। এখন তিনি কাঁকে (রাঁচী)-র পাগলাগারদে রয়েছেন। সেখানে ছাড়া ভালভাবে থাকার অন্য কোনো জায়গা তো ছিল না। মানুষের মস্তিষ্ক তার জীবনের পক্ষে

কি মূল্যবান সম্পদ।

'রুস মে পচ্চিস মাস' লেখার সময় মনে হলো যে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত বহু যাত্রা না লেখা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেগুলোও লিখে ফেলা উচিত। 'মেরী জীবন-যাত্রা'র তিনটি খণ্ডে আমি জন্ম থেকে আমার ৬৩ বছর পূর্ণ হওয়া অব্দি কথা লিখেছি। ভবঘুরেমি করার সময়ের যাত্রাগুলিকে আমি ছেড়ে দিতে পারছিলাম না। তার মধ্যে কয়েকটি সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি। 'রুস মে পচ্চীস মাস' বাদ দিয়ে বাকি যাত্রাগুলিকে সংক্ষেপে আমি এই গ্রন্থে দিয়ে দিচ্ছি যে-কারণে পুনরুক্তিও হচ্ছে।

২২ নভেম্বর ডায়েরিতে আমি লিখেছি—'২০৫০ টাকা ব্যাঙ্কে রয়ে গেছে যার থেকে ৫০০ উদয়নারায়ণ পাণ্ডেকে পাঠাতে হবে, তাহলে মাত্র ১৫৫০ টাকা থেকে যায়।' এতদিন আমি অন্যের মন দিয়ে আর্থিক কষ্ট অনুভব করতাম, কারণ আমার কোনো চাকরি ছিল না—না ছিল নিজের কোনো ঘর, না ছিল নিজের পরিবার। আমাকে অতিথি করার জন্য দেশে-বিদেশে বহু গৃহস্বামী তৈরি ছিল বলে তেল-নুন-কাঠের চিন্তা করতে হতো না। যাত্রা এবং গবেষণার কাজের জন্য টাকার দরকার অবশ্যই ছিল কিন্তু তার অভাবে কাজে অসুবিধে হলে কয়েকদিনের জন্য তাকে ছেড়ে দিতেও কোনো আপত্তি ছিল না। তবে এখন সেরকম ব্যাপার ছিল না। আমি ছিলাম গৃহস্বামী। গৃহস্বামীর প্রতিটি কর্তব্যই আমি পালন করতে চেয়েছিলাম। বিশেষ করে অতিথি সেবায় তো আমার খুব আনন্দ আর তৃপ্তি হতো। ভাবতাম, আমি সারা জীবন ধরে যে আতিথ্য পেয়েছি তার সামান্য এই ভাবে শোধ করছি—অতিথি-ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার এটাই পথ। সবচেয়ে বেশি চিন্তা হতো এজন্য যে, গরমের সময় এরকম অবস্থা না হয়ে পড়ে যে 'তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী' সৎকারের উপায় আমার কাছে থেকে যায়।

২৫ নভেম্বর সারাদিন মেঘ থাকল। কাল রাতের ও আজকের বৃষ্টি মাটিকে ওপর-ওপর শুধু ভিজিয়ে দিল। নাশপাতির পাতা অরুণবর্ণ হয়ে গেল। অন্যান্য শাকপাতা বেশ শুকিয়ে গেল। ওলকপি, রাই, বাঁধাকপি, পাহাড়ী মটরের ওপর শীতের কোনো জোর খাটে না। এরা বরফে ঢেকে গিয়েও আবার সবুজ হয়ে বেরিয়ে আসে। লঙ্কার পাতা কম তাপমাত্রায় শুকিয়ে যায়, টমেটো তার চেয়েও দুর্বল। এই দুটি গাছের মূলকে যদি হিমীভূত হতে না দেওয়া যায়, তাহলে পরবর্তী বসন্তে তাতে আবার সবুজ পাতা বেরিয়ে আসে।

'রুস মে পচ্চিস মাস' ২৬ নভেম্বর শেষ হয়ে গেল। বিকানিরের এক প্রকাশনার কাছে তার কিছু অংশ ছাপার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। আমার বইয়ের দাম বেশি হওয়ার অভিযোগ অনেক পাঠকের আছে, তবু বিকানিরের প্রকাশনা চূড়ান্ত দাম করল। বইয়ের দাম পাঁচ টাকার বেশি কিছুতেই হওয়া উচিত ছিল না কিন্তু তারা আট টাকা করল। অসহায় লেখক বেচারা কী করবে? দাম কম রাখার জন্য নিজে প্রকাশক হওয়ার অর্থ আরও বিপদ ডেকে আনা। তিনটি বই নিজে প্রকাশ করে তা আমি দেখে নিয়েছি।

২৭ নভেম্বর জানতে পারলাম যে ভাইয়া (স্বামী হরিশরণানন্দ) ৪৯ হাজার টাকা দিয়ে দিল্লীর ফৈজবাজার (দরিয়াগঞ্জ)-এ জমি কিনে নিয়েছেন, তার মানে জমি পেতে হয়তো ৫৫ হাজার অব্দি লেগে গেছে। তারপর জমি কিনেই তো কাজ হলো না, বাড়ি বানানোর জন্য তার চেয়েও বেশি টাকা চাই। দিল্লীতে এবং এই রকম একটা সময়ে বাড়ি বানানোটা কখনো লোকসানের

ব্যবসা হতে পারে না, ভাইয়ার এই দূরদর্শিতা আমি যুক্তি দিয়ে বোঝানোর পরে বুঝেছিলাম।

পাহাড়ী দেওয়ালি—পাহাড়ে বিশেষ করে গাড়োয়াল আর তার পশ্চিম দিকের হিমালয়ে দেওয়ালি সেদিন হয় না—যেদিন সারা ভারত তা পালন করে। আমাদের দেওয়ালি ছিল ৩০ অক্টোবর, পাহাড়ে দেওয়ালি হলো ২৯ নভেম্বর। আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্রাম কণ্ডী, এখান থেকে প্রায় দু-মাইল দূরে। সেদিন খেয়ে-দেয়ে আমরা কণ্ডী গ্রামের দিকে চললাম। পুরো পথটা উতরাই ছিল। হরির ঘর গ্রাম থেকে অনেকটা আগেই ছিল। সে আমাদের বাড়িতে দুধ আর শাক-সবজি দিত। তার বাড়ি পৌঁছে দেখলাম সে মদ খেয়ে ভূত হয়ে গেছে। ঘরের অন্যরা অতটা মাতাল হয় নি। তারা হয়তো ভেবেছে—সন্ধে হয়ে এলে তখন পানের সময়। কিন্তু হরি ভেবেছে—শুভস্য শীঘ্রম্। তবু সে তার জড়িয়ে যাওয়া জিভ আর লটপট করা হাত দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল। এখান থেকে আরও অনেকটা নীচে নেমে আমরা সেই ছোট নদীর তীরে পৌঁছলাম যা কোম্পানিবাগ আর চণ্ডালগড়ীর এক পাশের জল সঙ্গে নিয়ে গিয়ে শেষে কেম্পটি-ফল রূপে ঝরে পড়তে পড়তে যমুনার শাখায় গিয়ে মিশেছে। জল পেরিয়ে সামান্য চড়াইয়ে খেতের মাঝখানে কিন্তু পাহাড়ের বাহুতে কণ্ডী গ্রাম এলো। ৫০-৬০টি ঘর ছিল যার মধ্যে প্রায় কুড়িটি ব্রাহ্মণদের আর ততোগুলোই খশ এবং হরিজনদের ছিল। আজ দেওয়ালির দিন। কণ্ডী গ্রামের কথা কী বলব? 'মধু বাতা ঋতায়তে'-এর কথা চরিতার্থ হচ্ছিল। হাওয়াতেও মদের সুগন্ধ ভাসছিল। গ্রামে এক জায়গায় লোক ঢোলের সঙ্গে নাচছিল। আমাদের ধোপা নন্দু ঢোল বাজানোয় দক্ষ ছিল, এটা দেখে আমারও গর্ব হলো। আজ সব ঘরের দরজা খুলে রাখা ছিল, যেখানেই যান মধু (মদ)-র পাত্র সামনে হাজির ছিল। আমি নিজেকে অভাগা মনে করতাম। নন্দু প্রচুর মদ খেয়ে সুর-তাল ঠিক রেখে ঢোল বাজাচ্ছিল। নাচের জন্য বাদ্য অত্যাবশ্যক কিন্তু সবাই তা বাজাতে পারে না, এই জন্য নন্দুর সেদিন খুব কদর ছিল। পাহাড়ে খশ আর ময়দানী দুই ধরনের সংস্কৃতি আছে। যাদের উঁচু নাক তারা নিজেদের বড় মনে করে ময়দানী সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। তাদের দেখাদেখি খশরাও তাকে মানতে বাধ্য হয় কিন্তু কণ্ডী গ্রাম আর মুসৌরীর এই পাহাড়গুলোর অন্যান্য গ্রাম জৌনপুর এলাকায় পড়ে—যমুনার এই পার জৌনপুর আর ঐ পারে জৌনসার। দুটির ওপরেই যমুনার দুই তীর খাই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। খাই থেকে একটি বড় পর্বতমালা পেরিয়ে কনৌর (কিন্নর দেশ)-এ যাওয়া যেতে পারে। কিন্নরের সীমা তিব্বতে মিশেছে। জৌনপুর-জৌনসার-কনৌর-তিব্বত এই সবই পাণ্ডব-বিবাহের দেশ। এর মধ্যে জৌনপুর আর জৌনসার সমতলের সবচেয়ে কাছে। পঞ্চপাণ্ডব তাদের এক পত্নী দ্রৌপদীকে নিয়ে কেমন করে কাটাতেন তা এখানে চোখের সামনে দেখা যায়। পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী ছাড়া আরও পত্নী গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীন ছিলেন, এখানে যা খুব কমই সম্ভব। যেখানে পাণ্ডব-বিবাহ চলছে সেখানে খশদের পুরনো রীতি-রেওয়াজ যে বেশি সুরক্ষিত থাকবে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। গ্রামের বাইরের খেতে হোলি জ্বলে। লোকে কি করে জানবে সমতলে হোলি আর দেওয়ালির মধ্যে চার মাসের ব্যবধান রয়েছে। এরা হোলি-দেওয়ালি দুটো একই সঙ্গে করে নেয়। আমাদের দেওয়ালির সময় পাহাড়ে ফসল কাটার খুব ধুম লেগে থাকে, তাই সেই সময় লোকে নিশ্চিন্তে উৎসব পালন করতে পারে না। সম্ভবত এই জন্য এখানকার

লোকেরা ঐ দিনে দেওয়ালি করে না।

হোলিও জ্বলল রাতে নয়, দিন-দুপুরে। তার জন্য লোকে ঘাস আর কাঠ আগে থেকেই জমা করে রেখে দিয়েছিল। জ্বালিয়ে দিয়ে লোকে বাজনা বাজিয়ে গাইতে-গাইতে নাচতে-নাচতে গ্রামের দিকে ফিরল। গ্রামের মাঝখানে রাখা খড়ের গাদা থেকে খড় নিয়ে লোকেরা দড়ি পাকাতে ব্যস্ত ছিল। আজ আর কাল এখানে দড়ি-টানাটানি হবে, যাতে একদিকে স্ত্রীলোকরা থাকবে অন্যদিকে পুরুষ। এমন নয় যে প্রতিবার পুরুষই জেতে। স্ত্রীলোকদের সাহায্য করার জন্য তাদের মেয়েরা এবং সম্ভবত জামাইরাও যোগ দেয়। তারা বলছিল যে, দু-বছর ধরে পুরুষরা বিজয়ী হচ্ছে। দড়ি-টানাটানি রাতে হওয়ার ছিল। ততক্ষণ আমরা থাকতে পারতাম না। পরের দিনও আসতে পারতাম না। এখানকার সব লোকই ছিল লম্বা-পাতলা নাকওলা আর ফর্সা। শুদ্ধ খশমুদ্রা এখানে দেখা যেত। কখনো কখনো গোঁফওলা লোকও চোখে পড়ে যেত। সওয়া তিনটে বেজে গেল, দেখলাম ফসল কেটে নেওয়া একটি খেতে ১০-১২ জন তরুণী নাচ করছে। নাচ অনেকটা কিন্নরদের মতোই। সূর্যাস্তের সময় আমরা থাকতে থাকতে সংখ্যা আরও একটু বেড়ে গেল কিন্তু পুরো উৎসাহের সঙ্গে নাচ এখনো শুরু হয় নি। মেয়েরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মিলিয়ে নাচছিল। যে কোনো জাতের খশ স্ত্রী-পুরুষ হোক, ব্রাহ্মণও হোক—সবাই মদ খেয়ে নাচ-গানের আনন্দ উপভোগ করে। কণ্ডী গ্রাম পার্বত্য দ্রোণীর নীচে যার চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিনের আলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায় নীরবতা ছেয়ে আসছিল আর তার মধ্যে গাইয়েদের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত গানের প্রতিধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে সমতলেও হয়তো এমনি ছিল। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে সপ্তসিন্ধুর আর্যরা সোম (ভাঙ) খেয়ে এইভাবে বোধহয় নিজেদের চিত্তবিনোদন করত। কত প্রাচীন স্মৃতি এই নৃত্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

১ ডিসেম্বর সাহিত্য-সম্মেলন দ্বারা প্রকাশিত তিরিশটি বই এলো। কয়েকটা তো খুবই খারাপ। আনাড়ি লোকেদের ভারতের ইতিহাস আর ভূগোল লেখার শখ হয়েছে, কাজেই তারা পচা আবর্জনা ছাড়া আর কী লিখতে পারে?

ডিসেম্বর শুরু হতেই শীত খুব বেড়ে গেল। দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৫০ ডিগ্রি অর্থাৎ আমাদের শরীরের তাপমাত্রা থেকে ৪৪-৪৫ ডিগ্রি নীচে। কিন্তু এখনও বরফ হওয়ার জন্য আরো ১৭ ডিগ্রি নীচে নামার দরকার ছিল, যা রাতের কোনো সময়ে হয়ে যেত। মিস পুসঙ্গ তাঁর বাড়ি 'কিলডের' বিক্রি করার কথা ভাবছিলেন, কোনো ক্রেতা পাচ্ছিলেন না। কোনো এক সময়ে এই বাড়ির দাম ৬০ হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছিল। সে-সময় তিনি কি করে জানতেন যে মুসৌরীকে আজকের এই অবস্থা দেখতে হবে। বড় বোনের বয়স ৭০-এর কাছাকাছি, শরীর খুব দুর্বল আর মনের দিক দিয়ে আরও দুর্বল বলে খুব চিন্তা ছিল।

চৌধুরী দুটো বেশ বড় খেতে কয়েক বছর থেকে চাষ করতে শুরু করেছিলেন। তা খালি পড়েছিল। আমাদের পাশের খেত 'অরান হাউস'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল, যার মালিক মিসেস কিদবাই ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। সেখানে কিছু ফলের গাছ আর কিছু শৌখিন গাছ লাগানো ছিল। চৌধুরীর চাষ করা অনেক বছর হয়ে যাবার পর মিসেস কিদবাই তা বেদখল করতে চাইলেন। কিন্তু এখন তো চৌধুরীর তাতে আইনগত অধিকার জন্মে গেছে। তিনি মূলত

মটর আর বাঁধাকপি চাষ করেন। এই জিনিসগুলি এমন সময় হয় যখন সমতলে তার অভাব থাকে, সেজন্য ভাল দামে বিক্রি হয়ে যায়। এখন তিনি বাঁধাকপি বিক্রি করছিলেন।

আমাদের হ্যাপিভ্যালির পুলিস চৌকির দেওয়ান (রাইটর কনস্টেবল) শ্রীকুঞ্জজী সাহিত্যে রুচিবান এবং গাড়োয়ালী ভাষার কবি ছিলেন। তিনি প্রায়ই আমার বাড়িতে এসে পড়ার জন্য বই আর কাগজ নিয়ে যেতেন। সেদিন বলছিলেন, 'এখন ভোটের ধুম লেগেছে। টেহরী রাজার নমিনেশন পেপার বাতিল হয়ে গেছে কিন্তু মা শ্রীকমলেন্দুমতীর তা হয় নি, তাই তিনিই ছেলের জায়গায় দাঁড়িয়েছেন। ছোট ছেলে এবং আরও অনেক পুরনো দরবারীও কংগ্রেসের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়েছে।' শেষ পর্যন্ত টেহরী জেলার ভোটে কংগ্রেসের একজন লোকও নির্বাচিত হলো না। রাজকুমার, রাজমাতা আর তাদের দরবারীরাই বাজিমাৎ করল।

এটা কেন হলো? সাধারণ মানুষ কংগ্রেসী শাসনে কী ভালটা দেখেছিল যে তারা তাদের প্রার্থীদের ভোট দেবে? ছাপরায় একমার নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে শ্রীঅখিলানন্দ সিংহ নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষে আমার পুরনো সহকারী লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ লড়ছিলেন। অখিলা ভেবেছিলেন নির্বাচন-কেন্দ্রটি ছোট, সাইকেলে করে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একদিনেই তিন চক্কর লাগানো যায়, কংগ্রেসের বদনাম রয়েছে, কাজেই আমি নির্বাচিত হয়ে যাব। কিন্তু হেরে গেলেন।

৪ ডিসেম্বর লাসা থেকে শ্রীত্রিরত্নমান সাহুর চিঠি এলো। পড়ে আমার মনে জোর ধাক্কা লাগল—এক মাস আগে গেশে গেন্দোন ছোম্‌ফেল (সংঘধর্মবর্ধন) মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে বেরোল—'সেই কুঁড়িটির জন্য দুঃখ হয়, যে না ফুটেই শুকিয়ে গেল!' প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর, প্রথম শ্রেণীর তিব্বতী ভাষার কবি ও বৌদ্ধদর্শনের সুপণ্ডিত ধর্মবর্ধন তখনই হয়ে গিয়েছিলেন, যখন ১৯৩৪ সালে তিনি আমার সঙ্গে প্রথমবার তিব্বত থেকে ভারতে আসেন। এরপর তিনি দশ-বারো বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকেন। ইংরেজিতে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ইতিহাস ও সামাজিক-আর্থিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক তথা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছিল। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়ার ফলে তিনি মার্কসবাদ-সমাজবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। তাঁর কবিতায় এই ভাবনাগুলি প্রকাশ করেছিলেন। দু-তিন বছর আগে তিনি নিজের দেশে ফেরার জন্য তিব্বত গিয়েছিলেন। তিব্বতের সবচেয়ে উত্তরের অংশ অম্‌দোর বাসিন্দা ছিলেন তিনি। বিদ্যার প্রতি অনুরাগ তাঁর সুখ ও সম্মানের জীবন কেড়ে নিয়েছিল। শৈশবেই তাঁকে অবতারী লামা মেনে নিয়ে একটি মঠের মোহান্ত বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলেন যে তা বিদ্যার্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন সব ছেড়েছুড়ে লাসাতে এসে সেখানকার ডেপুঙ্ বিহারে সবচেয়ে বড় এবং তিব্বতেরও মহোত্তম বিদ্বান গেশে শেরব-এর ছাত্র হয়ে গেলেন। গেশে শেরব চিয়াং কাই-শেক-এর দরবারে সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু সবার আগে তিনি কমিউনিস্টদের পক্ষের লোক ছিলেন। এখন এই তরুণ বিদ্যার্থীর কাজ করার সময় এলো যখন চীন ও তিব্বত লাল হয়ে গেছে। এখন গেশের কলম এবং মস্তিষ্ক তাদের চমৎকারিত্ব দেখানোর জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি মারা গেলেন।

মুসৌরীতে দাবি উঠেছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু অফিস এখানে স্থানান্তরিত করা

হোক। মন্ত্রীরাও এতে অন্তত মৌখিক সহানুভূতি দেখাচ্ছিল। কিন্তু কাজ হচ্ছিল উল্টো। সার্ভে-বিভাগের দু-একশো লোক যারা তাদের অফিস নিয়ে এখানে থাকছিল, এখন তাদেরও দেরাদুনে পাঠানো হচ্ছিল। শ্রীসদানন্দ মেহতা ৬ ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এসে এই খবর দিলেন। মুসৌরীর ঠাণ্ডা কিছু ছেলের পক্ষে ভাল নাও হতে পারে, কিন্তু যদি পাহাড়ের এলাউন্স দেওয়া হতো তাহলে তারাও এখানে থাকতে রাজি হয়ে যেত। তা না হয়ে অফিস দেরাদুনে চলে গিয়ে লণ্ডৌর বাজারের দোকানদারদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

মেঘই বৃষ্টিপাত ঘটায়। সেই মেঘ আবার তাপমাত্রা বেশি নীচে নেমে গেলে হিম-বর্ষা শুরু করে। দেখতে দেখতে মেঘের গতিবিধির বিশেষ পরিণাম আমি বুঝতে পারছিলাম। আমাদের নীচের দিকে যমুনার অন্য শাখা বইত, যার পথ ধরে কখনো কখনো মেঘ উপরে উঠত। যোধপুরের ঠাকুরানীর চাকর দুর্গা দে এই মেঘ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করত—'সব জায়গায় মেঘ ওপর থেকে আসে আর এখানে আসে নীচ থেকে।' সে জানত না যে, সে নিজে সাড়ে ৬ হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে। ওপরে কোম্পানিবাগের সঙ্গে চণ্ডালগড়ীর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, যা পার হলে দেরাদুনের উপত্যকা। নীচে নলগর থেকে আরও ওপরে আসা মেঘ চণ্ডালগড়ীতে ধাক্কা খেলে অবশ্যই বৃষ্টি হতো। মেঘ এখন খুব কমই দেখা যাচ্ছিল। রাতে ঠাণ্ডা খুব বেড়ে যাচ্ছিল। এটা দেখা যাচ্ছিল সকালে চৌধুরীর ঘরের ছাদ বরফে সাদা হয়ে রয়েছে দেখে।

ডিসেম্বরে মুসৌরীতে ভ্রমণার্থীদের কোনো নামগন্ধ ছিল না। এখানকার অনেক দোকানদারও নিজের দোকান বন্ধ করে নীচে চলে গিয়েছিল, সেজন্য রোববারে এখানে স্থায়ীভাবে থাকা বন্ধুদের মধ্যেই কেউ আসত। ৯ ডিসেম্বর ড· সত্যকেতু আর শ্রীলাজী এলেন। প্রফেসর ভারতভূষণও তাঁর ধনানন্দ কলেজের অন্য অধ্যাপক জোশীজীর সঙ্গে এলেন। কমলা অভ্যর্থনার জন্য হালুয়া আর বিশেষভাবে বানিয়েছিল ফলাহারী-কাবাব। বিস্কুট তো সবসময়ই থাকত। ভ্রমণার্থীদের মরশুম নয় বলে ধোপানীর কাপড় কাচার কাজ ছিল না। সে রান্নার লোক হয়ে গিয়েছিল। ভারতভূষণজী কমলাকে ইংরেজি পড়িয়ে দিতেন। তাঁর পরীক্ষার অভিজ্ঞতা ছিল, এজন্য তাঁর পড়ানো আমার চেয়ে অনেক ভাল হতো। ইংরেজি কবিতা তো আমার কাছে নীরস মনে হতো।

'যাত্রা কে পন্নে' নামে আমার ছেড়ে যাওয়া যাত্রাগুলি এ সময় লেখা হচ্ছিল। রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতিতে কাজ করা বন্ধুরা এখনও এখানে ছিলেন। জানা গেল, সম্মেলনের সভাপতি মোকদ্দমা করে দিয়েছেন। সমিতি ব্যাংক থেকে টাকা বের করতে পারবে না। সঙ্গীদের চিন্তা হচ্ছিল। তাদের বেতন আসে নি এবং পরেও তাদের টাকার দরকার ছিল। নিজেদের ভেতরকার ঝগড়ার কারণে হওয়া-কাজ নষ্ট করে দেওয়া কখনো উচিত নয়।

'গঢ়ওয়াল','কুমায়ুঁ' লিখে ফেলার পর আমার খেয়াল হলো যে, দার্জিলিং আর কুমায়ুনের মাঝে নেপালে নিয়েও লিখে ফেলা উচিত। সেটা শুরু করতে করতে আমি আমার কয়েকজন নেপালী বন্ধুদের বললাম যে, নূতন তথ্য সংগ্রহ করতে আমি এই শীতে নেপাল আসছি। শ্রীধর্মরত্ন যমি-র পিতা মহিলা সাহু লাসায় ছুশিংসার প্রধান কর্মী ছিলেন। এক ধনবান পিতার সন্তান হয়ে, পিতার উদারতার জন্য দারিদ্রের দিন তাঁকে দেখতে হয়েছিল এবং এখানে এসে মুনিম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভাবনা-চিন্তা খুবই উদার ছিল। আমাকে তো সব সময় সব রকম

সাহায্য করার জন্য তিনি তৈরি থাকতেন। একবার আত্মসম্মানে ঘা লাগল, তিনি পিস্তল দিয়ে নিজের জীবন শেষ করে দিলেন। তাঁর পুত্র ধর্মরত্নকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি। কোনো লোক বয়স্ক হয়ে গেলেও 'ধঁরে পাছিলো নাও' অনুচিত। ধর্মরত্নজীকে বাচ্চা বয়স থেকেই সংঘর্ষ করতে হয়েছে। লেখাপড়ার অবসর পান নি। যেটুকু পড়েছিলেন তাই নিয়ে এবং নিজের অভিজ্ঞতার জোরে তিনি নেপালের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েক বছর জেলে ছিলেন। এ সময় তিনি এক উচ্চশিক্ষিত সঙ্গী পেয়ে গেলেন এবং তাঁর ছাত্র হয়ে পড়লেন। নিজের জ্ঞান তিনি অনেক বাড়িয়েছিলেন। এখন তিনি নেপালের উপমন্ত্রী (অর্থদপ্তর)। তিনি লিখলেন, 'নেপালে অবশ্যই আসুন। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য করব।'

১৯ ডিসেম্বর জম্মু-কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আগের সময় হলে আমি খুশি হয়ে তা গ্রহণ করতাম কিন্তু এখন তো মুসৌরীতে আমি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস নিয়ে রেখেছি এবং শুধু অনিবার্য কারণেই এখান থেকে বেরোতে পারি, সেজন্য প্রত্যাখ্যান করতে হলো।

২০ ডিসেম্বর আমাদের সামনে একটা নতুন পরিস্থিতি দেখা দিল। এক সাথী অনশন করতে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে নিজের রান্নাঘরে কয়েক মাস খাইয়েছিলেন। খাবার জিনিসের দাম তিনি পেয়ে যেতেন। বন্ধু তাঁর পড়াশুনোয় পূর্ণ সাহায্য করছিলেন। কোনো কারণে দুজনের মধ্যে মন-কষাকষি হলো। একজন বলল, 'রান্না করার জন্য মাসিক পনের টাকা, বাসনের ভাড়া মাসিক দেড় টাকা ইত্যাদি করে ৩৫ টাকা আমার পাওনা।' তাঁর বন্ধু টাকার ব্যাপারে হাড়কিপটে ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদার। নিজের টাকায় তিনি একজন ছাত্রকে কলেজে পড়াচ্ছিলেন। কিন্তু যখন সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি বেঁকে বসলেন। অনশন করা তরুণের কথা বলতে বলতে চোখে জল আর গলা বুঁজে আসতে দেখে আমার খুব দুঃখ হলো। অন্য বন্ধুরাও এটা কি করে বরদাস্ত করে? যাক্‌গে, ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গেল।

বেতনের অনিশ্চয়তা ছিল কিন্তু ২০ ডিসেম্বরই সেই মাসের বেতন চলে এলো। সবাই আনন্দে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ডিসেম্বর থেকেই এখানকার সাহিত্য-নির্মাণ কার্যালয় বন্ধ করা স্থির হয়ে গেল। অভিজ্ঞতা ভাল হলো না। তার কারণ ছিল। কয়েকটি হাত কাজ করার চেয়ে কথা বলা বেশি পছন্দ করত। ২৮ ডিসেম্বর হর্নহিলের উপরতলা খালি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

মনে হচ্ছিল কয়েক যুগ পরে ভগবতী ভাইয়ের চিঠি এলো। শ্রীভগবতীপ্রসাদ আগ্রায় মুসাফির বিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিলেন। আমরা একসঙ্গে স্বপ্ন দেখতাম। বৈদিক ধর্মের প্রচারের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা বানাতাম। মুসাফির বিদ্যালয়ের পর একটি উপদেশক বিদ্যালয় খোলার জন্য আমাকে জালৌন জেলায় যেতে হয়েছিল। তার জন্য ভগবতী ভাই আগেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এখন আমরা দু-বছর ধরে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। আমাদের পথেও বিভেদ এসে গিয়েছিল। কিন্তু আন্তরিকতা আর পুরনো স্মৃতি আগের মতোই মধুর ছিল। তিনি এখন জানতে পেরেছেন যে আমি মুসৌরীতে থাকি।

সময়ে সময়ে মানুষের স্বভাব অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে, যদিও তার জন্য দায়ী মূলত বাহ্য কারণগুলিই। 'মানসিক জগতেরও ঝোঁক থাকে, যা কখনো হর্ষ বাড়ায়, কখনো অবসাদ। যেমন

কোনো অত্যন্ত শান্ত সমুদ্র দুর্লভ তেমনই বিবেকবান পুরুষ হৃদয়-বৃত্তিহীন হতে পারে না। মানব আজব পশু। পশু হয়েও তাদের থেকে ভিন্ন। ভিন্ন হওয়ার কারণই হলো তার হর্ষ বা বিষাদের অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র।'

২৪ ডিসেম্বর বিকেলে সূর্যাস্তের সময় আনন্দজী খুব তাড়াহুড়ো করে এলেন। পরের দিনই তাঁর চলে যাওয়ার ছিল। সমিতির ঝগড়ায় কার্যনির্বাহী সমিতি আনন্দজীকেই সমর্থন করেছিল কিন্তু এখন তিনি স্থির করে ফেলেছেন যে, সচিবের পদ ছেড়ে দেবেন। পরের দিন একটার সময় তিনি চলেও গেলেন।

সেই দিনই জামিয়া মিলিয়ার প্রফেসর ফারুকীর সঙ্গে আমাদের গত বছরের তরুণ বন্ধু চৌহান এলেন। তিনি বিলেত থেকে ফিরে এখানে বাচ্চাদের স্কুল খুলেছিলেন। এখন তিনি জামিয়ায় ইংরেজি পড়াচ্ছেন। বলছিলেন, 'গত বছর আমাদের বহুদিন খাবারও জুটত না—এক রাতে খেলে পরের রাত অভুক্ত থাকতে হতো।' ইংলন্ডে আরামে অধ্যাপনা করছিলেন। স্বাধীন ভারতে বড় বড় আশা নিয়ে এসেছিলেন। যাক্, এখন তাঁর কাজ জুটে গিয়েছিল।

তাঁর তরুণ বন্ধু মুসলমান হলেও জামিয়া এবং আধুনিক সময়ের ব্যাপারে আমার তাঁকে নতুন চিন্তার মানুষ বলে মনে হলো। উর্দুলিপি ও উর্দু ভাষার পক্ষপাত করা আমার দৃষ্টিতে খারাপ কিছু নয়। কিছু উপহার দেওয়ার কথা উঠলে আমি আমার 'ভোলগা সে গঙ্গা'-র উর্দু অনুবাদের এক কপি তাঁকে দিলাম। দেওয়ার আগে বা লেখার সময়েও আমি এই বইটির কথা ভাবিনি। পরের বছর খবর পেলাম, সেই তরুণ অধ্যাপক আমার আকবরের সময়ের গল্প 'সুরৈয়া' যখন পড়েন, তখন তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন—এক মুসলমান মেয়ের সঙ্গে হিন্দুর বিয়ে? ক্ষমাহীন অপরাধ। তিনি তাঁর ক্রোধ শান্ত করেন বইটিকে ছিঁড়ে ফেলে। সত্যিই এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমি ইসলামকে ছোট করে দেখানোর জন্য এটা লিখিনি। মুসলমানরা তো আগে থেকেই লাখ লাখ হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করে এসেছে। কিন্তু তাতে আমাদের সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়নি। সে-সমাধান সম্ভব হতো যদি হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পরস্পরকে বিয়ে করত এবং আকবরের বেগমদের মতো স্ত্রীর নিজের ধর্ম নিয়ে থাকার পুরো স্বাধীনতা থাকত।

খবর শোনার জন্য ভারত ও পাকিস্তান দুই কেন্দ্রের রেডিও কত বছর ধরে শুনে আসছি। অন্য প্রোগ্রাম শোনার সময় বের করা মুশকিল, কিন্তু কখনো কখনো সময় পেয়ে গেলে লোকগীত বা লোকভাষার প্রোগ্রাম শুনতে ভাল লাগে। লোকগীতগুলোতে অদ্ভুত হইচই শোনা যায়। জানি না রেডিওর প্রোগ্রাম বানায় কারা। না ভাষার শুদ্ধতার দিকে খেয়াল রাখে, না লোকগীতির সঙ্গে যে বাজনা লোকে ব্যবহার করে তার দিকে মনোযোগ দেয়। সেতার, এসরাজ, সারেঙ্গী, তবলা সবরকম বাজনা তার সঙ্গে বাজতে থাকায় শ্রোতার মাথার মধ্যে পীড়া হতে থাকে। এরকম কেন হয়? পৃথিবীতে কোথাও এরকম অন্যায় করা হয় না। লোকগীতি লোকবাদ্যের সঙ্গেই গাওয়া হয়। রাশিয়া, চীন বা অন্য যেকোনো দেশে এটাই দেখা যায়। মাঝে-মধ্যে তো কোনো আধুনিক নবদীক্ষিত কবি নকল লোকগীতি বানিয়ে দিয়ে দেয়। একবার 'স্টেটসম্যান'-এ একজন সমালোচক লক্ষ্ণৌর এরকম প্রোগ্রামের তীব্র সমালোচনা করেছিল।

৩০ ডিসেম্বর কমলা মঙ্গলজীর সঙ্গে পরীক্ষা দিতে দেরাদুন গেল। 'সাহিত্য-রত্ন' পাস করার সম্ভাবনা ছিল। এফ এ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তার তিনটি মাস ছিল।

৩১ ডিসেম্বরে শেষ হওয়া বছর ১৯৫১-এর কাজ বলতে ছিল নীচের লেখাগুলি :
(১) 'গড়ওয়াল' (২) 'কুমায়ুঁ' (৩) 'অদীনা' (৪) 'রুস মে পচ্চিস মাস' (৫) 'যাত্রা কে পন্নে' (৬) 'সুদখোর কী মৌত' (৭) 'তিব্বত মে তিসরী বার'। এগুলি লিখে শেষ করলাম। সব মিলিয়ে ২৫০০ পাতা হলো। পরের বছরেও এত পাতা লেখার সংকল্প করলাম।

১৯৫২ সালের আরম্ভ

১ জানুয়ারি রোদ ছিল। দিনে ঠাণ্ডা ছিল না কিন্তু সন্ধেতে তা খুব বেড়ে গেল। কে জানে কেন মুসৌরীতে সন্ধেবেলায় ঠাণ্ডা বেশি লাগে আর সকালবেলায় কম। যদিও সমতলে এর উল্টোটা দেখা যায়। সেদিন কমলার সঙ্গে বাজার গেলাম। কুল্‌হড়ি থেকে বাজার করলেও চলত কিন্তু লণ্ঢৌরের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার লোভ সামলানো গেল না। গিয়ে জানলাম কিষাণ সিংহ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পেটে ভীষণ ব্যথা ছিল। দু-তিনদিন আগেই এখান থেকে দিল্লী গেছে। লণ্ঢৌরের দোকান বেশি বন্ধ ছিল না কিন্তু লাইব্রেরি আর কুল্‌হড়ির দোকান খুব কম খোলা ছিল। গুড় আট আনা সের শুনে মন বিশ্বাস করতে চাইছিল না। কয়েকদিন আগেই ১২-১৪ আনায় নিয়ে গিয়েছিলাম। কফির জন্য গুড়ের সিরাপ আমার ভাল লাগে।
বাজারে বেরলে রাত সাতটা-আটটার আগে প্রায় কখনোই ঘরে ফিরতে পারতাম না।
২ জানুয়ারি সকালে উঠে দেখি বরফের ছোট ছোট টুকরোগুলো সমস্ত ভূপৃষ্ঠ ঢেকে রয়েছে। এই টুকরোগুলো বজ্রের মতো কঠিন নয়, বরং নরম। যখন তাপমাত্রা খুব বেশি নীচে নামে না তখন জল ছোট ছোট গোলার মতো জমে মাটিতে পড়ে। সারাদিন আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। হাওয়া ছিল তীব্র। কতবার শিলও পড়ল। বারান্দায় তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি। বাইরে তা নিশ্চয়ই হিমাঙ্কের কাছে ছিল। আজ লেখাপড়ার ছুটি ছিল। বাড়িতে কাঠ জ্বালিয়ে স্বামী সত্যস্বরূপজীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। সুন্দর সাজ-পোশাক রয়েছে অথচ নাচার লোক যদি না নাচে তাহলে সেটা সাজের অপব্যয়। তেমনি কাঠের আগুন জ্বলছে আর তাতে আলু বা শাঁক আলু পুড়িয়ে যদি খাওয়া না যায় তাহলে মনে হয় সেই আগুন বৃথা। কখনো নিজের সাধু-জীবনের কথা মনে পড়ত। প্রশংসা করতে ইচ্ছে করত। সাধু-জীবন যদি ভবঘুরের জীবন হয় তাহলে তা খুবই মধুর এবং আকর্ষণীয়। কিন্তু এখন তার পক্ষে পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে উঠছে। আমাদের সময়ে সাধুর কোনো জিনিসপত্রের দরকার ছিল না। ভারতের যে কোনো জায়গায় সে ঘুরে বেড়াতে পারত। আমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ছিল না তবু বুঝতে পারতাম তাতে অসুবিধে সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভবঘুরে প্রতিটি পরিস্থিতিতে নিজের পথ বের করে নিতে পারে। আমার নব তারুণ্যে দেখা পাওয়া বৃদ্ধ ভবঘুরে সাধু যখন নিজের সময়ের বর্ণনা করত তখন মনে হতো সে-সময় আরও স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতা ছিল।

কমলার এফ এ পরীক্ষা দেওয়ার ছিল। পরীক্ষার তিন মাসও বাকি ছিল না। তাকে যখন তার পরীক্ষার বইয়ের প্রতি বিমুখ দেখতাম তখন আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। তার অস্থিরচিত্ততার জন্য দুঃখ হতো—'সে না জানে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করতে, না অন্যদের কথা শোনে।' এটা সেই 'মুদ্দঈ সুস্ত গবাহ চুস্ত'[১]-এর মতো ব্যাপার। কমলার নিজের এ নিয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল। এই ধরনের দুঃখ করায় আমি বহু বছর পর তার ফল পেলাম যখন দেখলাম সে কোনো পরীক্ষাতেই ফেল করছে না। পরীক্ষার দিন যখন কাছে এসে পড়ে তখন সে প্রতিটি মিনিট কাজে লাগায়। কলেজের ছাত্ররাও তো এইরকমই করে—পরীক্ষা আসার শেষ মুহূর্তে বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।

জীবনের রহস্যের দিকে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে ভাবছিলাম—'জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মধুর হওয়ার জন্য অনেকগুলি জিনিস দরকার, যার সবগুলি একত্রিত হওয়া মুশকিল। এই জন্যই জীবন তিক্ত-মধুর হয়। পার্থিব সামগ্রী তো কর্মসাধনায়-প্রতিবন্ধক হয়ই, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কও এর বড় কারণ।'

আমার কাছে একটি রাইফেল আর একটি পিস্তলের লাইসেন্স ছিল, সেইসঙ্গে রেডিওর লাইসেন্সও ছিল। বছরের শেষে পাল্টাতে হতো। রেডিওর লাইসেন্সে কোনো অসুবিধে হতো না। ডাকঘরে গেলাম, পুরনো লাইসেন্স দেখালাম, ১৫ টাকা জমা দিলাম আর নতুন লাইসেন্স নিয়ে এলাম। কিন্তু অস্ত্রের লাইসেন্স বদলানোয় বেশ মাথার ঘাম ছুটিয়ে দিত। সেটা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট বদলাতে পারতেন। অফিসে চালান লেখাও, তারপর সরকারি ব্যাংকে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে টাকা দাও, তারপর এই রসিদ নিয়ে নিয়মমাফিক দরখাস্ত লিখে এস ডি এম সাহেবের কাছে জমা করে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করো। আর কখনো এস ডি এম এমন হন যিনি সপ্তাহে একটা দিনও মুসৌরীর জন্য দেওয়াটা খারাপ বলে মনে করেন। প্রতি শনিবার ওখানে পৌঁছে অপেক্ষা করলে টেলিফোনে খবর দিয়ে দেন যে, এই শনিবার সাহেব আসবেন না। তখন মেজাজটা যে কী রকম হয় তা কী বলব? রেডিওর লাইসেন্সের মতো এর লাইসেন্সটাও কী সহজে করা যায় না? মানছি সরকারের কাছে এটা তার চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক ব্যাপার এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু টাকা নিয়ে এস ডি এম সাহেবই তো এটা সহজে করে দিতে পারতেন, তিন জায়গায় দৌড়ানোর কী দরকার? ৪ ফেব্রুয়ারি আমি স্বামী সত্যস্বরূপজীকে দিয়ে অস্ত্র পাঠালাম। জানলাম অন্যের হাতে অস্ত্র পাঠানো আইন-বিরুদ্ধ কাজ। নিজে গেলাম। দরখাস্ততে স্ট্যাম্প লাগানো দরকার ছিল কিন্তু স্ট্যাম্প বিক্রেতার কাছে স্ট্যাম্পই ছিল না। যাই হোক, সেটা লাগানোর দায়িত্ব ক্লার্ক নিল।

শ্রীভরতসিংহ উপাধ্যায় লিখিত 'পালি সাহিত্য কা ইতিহাস' (সম্মেলন থেকে প্রকাশিত) আমার কাছে এলো। পরবর্তী প্রজন্ম যে নিজেদের অযোগ্য প্রমাণিত করছে না, এটাই ছিল তার উদাহরণ। হিন্দিভাষীদের মধ্যে পালির দিকে মনোযোগ দেবার আমিই ছিলাম প্রথম লোক। আমাকে কত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, এই জীবনযাত্রার দ্বিতীয় খণ্ড যাঁরা

[১] ব্যবহৃত লোকোক্তিটির আক্ষরিক অর্থ— *বাদী নির্বিকার, সাক্ষী তৎপর।* —স·ম·

পড়েছেন তাঁরা ভালভাবে জানতে পেরেছেন। আমার আরম্ভ করার সময় পালির বিশাল সাহিত্য প্রায় একেবারে অপরিচিত ছিল। 'ধম্মপদ' ছাড়া আর কোনো বই হিন্দিতে অনুবাদ হয় নি, আর এই বিশাল সাহিত্যে কী কী রয়েছে তা হিন্দিতে জানার কোনো উপায় ছিল না। আমি, তারপর আনন্দজী এবং পরে ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ পালি সাহিত্যের অনুবাদ দিয়ে হিন্দিকে সমৃদ্ধ করে ছিলাম। কিন্তু এখনো সেই কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। ভরতসিংহ উপাধ্যায় এই বইটি লিখে হিন্দির লোকদের সামনে তুলে ধরলেন যে পালি সাহিত্যে কী কী রয়েছে এবং কেন আমাদের তাতে অবগাহন করা উচিত। ভরতজী আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তার পি এইচ ডি-র থিসিস হিসেবে লিখেছিলেন, যার মধ্যে তিনি পালি ত্রিপিটক আর তার অট্‌ঠকথাগুলোতে আসা ভৌগোলিক ও সামাজিক বিষয়ের পূর্ণ বিশ্লেষণ করেছিলেন। আমাদের ইতিহাস এবং প্রাচীন ভূগোলের ওপর পালি অনেক জায়গায় মৌলিকভাবে আলোকপাত করে, তা না জানলে পণ্ডিতও ভুল করে বসেন।

জানুয়ারিতে আমার দিনচর্যা ছিল—সওয়া সাতটায় উঠে শৌচাদি থেকে মুক্ত হওয়া, সামান্য কাজ, তারপর চা খাওয়া। এরপর এগারোটা পর্যন্ত কমলাকে লেখানো-পড়ানো, তারপর নিজের অধ্যয়ন বা সংশোধন। মধ্যাহ্ন ভোজন একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত, তারপর চিঠিপত্র এবং পত্র-পত্রিকা পড়া, সাড়ে চারটে-পাঁচটায় সন্ধের চা খাওয়া এবং তারপর লিখে ফেলা কয়েকটা বই আবার দেখা। রাত স্যাড়ে আটটায় খাওয়া এবং তারপর কিছুটা পড়া-পড়ানো বা লেখা। নটায় রেডিওতে খবর শোনা, ফের দু-এক ঘণ্টা পড়ে এগারোটার কাছাকাছি শুয়ে পড়া।

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই দেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল বেরোতে আরম্ভ করল। এখন পর্যন্ত বেরোন ফলাফল থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, কংগ্রেস সব জায়গাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাংকুর এবং মাদ্রাজের মতো কয়েকটি প্রদেশে বামপন্থী, বিশেষ করে কমিউনিস্টও, যথেষ্ট সংখ্যায় এসেছে। প্রথমে দক্ষিণেরই নির্বাচন-ফলাফল বেরোল। ফেব্রুয়ারিতে উত্তর-ভারতেরও ফলাফল বেরোল। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কংগ্রেসের ভাল জয় হলো। দুটি প্রদেশ থেকে একজনও কমিউনিস্ট নির্বাচিত হলো না। পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ থেকে তো কোনো কংগ্রেসীরই নির্বাচিত হওয়া সন্দেহ ছিল যদি কমিউনিস্ট আর সোস্যালিস্টরা এক হয়ে যেত। কিন্তু সোস্যালিস্টরা তো দিব্যি খেয়েছিল যে, যা-ই হোক না কেন আমরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলে কাজ করব না। আমার নিজের জেলার একটি নির্বাচনক্ষেত্র থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্বামী সত্যানন্দ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজয়ী হয়েছেন কিন্তু তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট তিনি পেয়েছিলেন বলে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু মোট প্রদত্ত ভোটের যত শতাংশ তার পাওয়া দরকার ছিল তা তিনি পান নি ফলে জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হলো। আজমগড় থেকে শ্রীঝারখণ্ডে রায় নির্বাচিত হলেন। তিনি এখন সেখানকার কমিউনিস্ট নেতা। দক্ষিণে কমিউনিস্টরা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে তা তাদের নির্বাচনের সাফল্য থেকে বোঝা যায় কিন্তু উত্তরে তাদের প্রভাব এত কম-কেন? এটা তাদের এবং দেশের অন্য হিতৈষীদেরও ভাববার কথা। এটা নিশ্চিতই যে ভারতের সুখী ভবিষ্যৎ কমিউনিজমের ওপর নির্ভর করছে, চীনের কমিউনিস্ট হওয়া তাই বলছে। যখন আমরা নিজের দেশের ছোট থেকে বড় প্রতিটি সমস্যা

আর ভ্রষ্টাচার ও পচনকে দেখি, তখনো এটা মানতেই হয় যে কমিউনিজমই এর একমাত্র ওষুধ। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল জনতার মনোভাব দেখলে দেখা যায় সকলেই কোনো না কোনো সময়ে কমিউনিজমের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এজন্য কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়ার ব্যাপারে সকলেরই আগ্রহ আছে। উত্তরে শুধু নগরকেন্দ্রিক হয়ে থাকা আর এক-আধটি জেলা ছাড়া সব গ্রামে কমিউনিস্টদের নিষ্ক্রিয় থাকা কিভাবে দূর হবে? বস্তুত তাদের মধ্যে এক ধরনের পন্থাগত সংকীর্ণতা দেখা যায়। তারা তাদের ভাবনা-চিন্তা ও বন্ধুদলের একটি আবরণ তৈরি করে তার ভেতরে থেকে সন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে এবং গ্রামে তাদের প্রবেশ করতে হবে, যেভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলন প্রবেশ করেছিল। পন্থাচার্য বা পন্থশিষ্য হয়ে থাকলে এই সফলতা পাওয়া যাবে না। হাড় যেভাবে মাংসের ভেতর নিজেকে গোপন করে অভিন্ন হয়ে যায়, সেইভাবে তাদের জনসাধারণের থেকে অভিন্ন হতে হবে। হ্যাঁ, হাড়ের মতোই। মাংস হয়ে জনসাধারণের কাঠামো সে রক্ষা করতে পারবে না। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধেও গভীরভাবে,সঠিক পদ্ধতিতে তারা ভাবনা-চিন্তা করে না, যেমন রুশ বা চীনে করা হয়েছে। এজন্য বিরোধীরা তাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির শত্রু বলে লোকের মধ্যে ভ্রম ও সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। দক্ষিণে কমিউনিস্টরা উত্তরের চেয়ে অনেক বেশি জনসাধারণের মধ্যে মিলেমিশে গেছে। জনতার ভাষা, তাদের লোকশিল্প, তাদের সুখ-দুঃখ সবের মধ্যে অভিন্ন হয়ে সামিল হয়ে গেছে। উত্তরে এখনো জনতার নিজস্ব ভাষা—মৈথিলী, ভোজপুরী, মাগধী, ছত্তিশগড়ী, বুন্দেলখণ্ডী, মালবী, রাজস্থানী, ব্রজ, কৌরবী, গাড়োয়ালী, কুমায়ুনী, অবধী—এইগুলির সাহায্যে লোকের হৃদয়ের ভেতর প্রবেশ করার চেষ্টা করা হয় নি। তারা এই লোক-ভাষাগুলিতে নিজেদের সাহিত্যরচনা করে নি। যতক্ষণ লোকের মধ্যে এই ধরনের সাহিত্যের পাঠ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ এখানকার লোকশিল্প আর লোকগীত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যাবে না, ততক্ষণ লোকের আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা তাদের ওপর নিজেদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ফেলতে পারবে না।

নির্বাচনে আসলে বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যেকার ঝগড়া আর ঘুমন্ত ভোটাররা কংগ্রেসকে জিতিয়ে দিল। খুব কম জায়গাতেই অন্তত অর্ধেক ভোটার ভোট দিতে গিয়েছিল। অধিকাংশই 'কোউ নৃপ হোউ'[১] অনুসরণ করেছিল আর কংগ্রেস সরকারের পোষা লোকরা তাদের সমস্ত অনুগামীদের নিয়ে ভোট দিতে পৌঁছে গিয়েছিল।

২৩ জানুয়ারি নেপালে আবার একটি বিপ্লবের খবর এলো। রাজতন্ত্রকে সরিয়ে অন্য এক স্বৈরতন্ত্র তার স্থান দখল করেছিল। জনসাধারণের মঙ্গল হচ্ছে না দেখে ড· কে আই সিংহ অস্ত্র রাখতে অস্বীকার করে দিলেন। সমঝোতার ছুতোয় তাঁকে ধরে কাঠমাণ্ডুর জেলে পুরে দেওয়া হলো। জেলের রক্ষী তো আর মন্ত্রী বা অধিরাজ হয় না, সাধারণ গরিবের ছেলেরাই বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়, যাদের প্রভাবিত করাটা অসুবিধের নয়। কে আই সিংহ তাদের প্রভাবিত করলেন আর রক্ষীরা নিজেরাই তাঁকে জেলের বাইরে আসতে সাহায্য করল। তিনি রানাদের বাদ দিয়ে

[১] লেখক এখানে একটি প্রচলিত পঙ্‌ক্তিটির আংশিক ব্যবহার করেছেন। সম্পূর্ণ পঙ্‌ক্তিটি হলো-'কোউ নৃপ হউ হমে কা হানি' *(যে-ই রাজা হোক আমার কী আসে-যায়)।*—স·ম·

সর্বদলীয় সরকার চালু করার দাবি করলেন। অল্প কয়েকজন লোক নিয়ে তিনি চাইলে কাঠমাণ্ডুতে নিজের প্রভুত্ব কয়েক দিন বা কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু অযথা খুনোখুনি তিনি পছন্দ করলেন না। তিনি নিজের কয়েকজন সাথীর সঙ্গে তিব্বতের দিকে চলে গেলেন। এবার নেপাল সরকার প্রকাশ্যে বামপন্থীদের দাবিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেল। কোইরালা মন্ত্রিসভা ২৫ জানুয়ারি নেপাল কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে দিল। নেপালী মন্ত্রীসভা নেহেরুকে তাদের আদর্শ মনে করে। ছোট কোইরালা তো নেহেরুর মতো নিজের চাপকানে লাল গোলাপও লাগায়।

রান্নার লোকের সমস্যা আমাদের থেকেই যাচ্ছিল। ড· সত্যকেতুর বাড়িতে টেহরীর এক মুসলমান ছেলে রান্না করত। সে আসতে রাজি ছিল কিন্তু কমলা পছন্দ করছিল না। বলছিল, 'ভাবীজী (জানকী দেবী) এলে, তাঁর জন্য রান্না হবে কি করে?' পরেও একবার একজন মুসলমান পাচক কম বেতনে পাওয়া যাচ্ছিল। তার নাম কোনো সিংহ করে দেওয়া হবে—এতে সে রাজি ছিল। অতিথিরা সেটা জানতে পারত কি করে? তাছাড়া আমার অতিথিরা ভাল করেই জানে যে আমি সবার হাতে খাই। যে আমার হাতে জল খেতে চায় সে এটা জেনেই খায় যে এর দ্বারা আমি ধর্মভ্রষ্ট হব না। তাহলে এরকম চাকর রাখতে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন?

শীতে মুসৌরী আসাটা ভাবীজীর পক্ষে অসাধারণ ঘটনা ছিল। তাঁর চিঠি আগেই এসেছিল। মঙ্গলজী এখন বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার জন্যই তৈরি হচ্ছিলেন, এমন সময় (৩১ জানুয়ারি) ভাবীজী এসে পৌছলেন। রান্নার লোক ছিল না বলে অতিথি হয়ে আসা ভাবীজীকে কমলার রান্নাঘরে ঢুকতে হলো। ভাবীজীর এই যাত্রা থেকে লাভ এটাই হলো যে, তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি জীবনে প্রথমবার চারদিকে বরফের সাদা চাদর পড়ে থাকতে দেখলেন। পাতায় পাতায় বরফ মোড়া ছিল। বরফ খুব পুরু ছিল না বলে দুপুর নাগাদ অনেকটা গলে গেল। খুব ঠাণ্ডা ছিল। আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে সময় কাটাতে হতো। নয়দিন থেকে ভাবীজী ৮ তারিখে এখান থেকে গেলেন।

এখন আমার ওজন ১৬৪ পাউন্ড দেখে একটু খুশি হলাম, কেননা আমার অনেক দিনের সাধ ছিল ১৬০ পাউন্ডে পৌছনোর। ওজন কমিয়ে দিতে ডায়াবিটিস যে সাহায্য করেছিল তাতে সন্দেহ নেই আর সেজন্য তা থেকে ততটা আনন্দও হতো না। আগের বছরের ঘা থেকে শিক্ষা পেয়ে আমি এখন ইনসুলিনের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। নিজে ইনসুলিন নিলে তা উরুতেই নিতে হতো, সেখানে পিণ্ডও হয়ে যেত। কাজেই আমাকে ইনসুলিন দেওয়ার কাজটি কমলার নিজের হাতে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

গাজিয়াবাদের রাধামোহন ভাটনগর এক বিচিত্র খেয়ালের মানুষ। ঘরে স্বামী-স্ত্রী দুজনই আছেন, কয়েকটি বৈদ্যুতিক আটাকল আছে যা থেকে সংসার খরচের যথেষ্ট টাকা আসে। তাঁর স্ত্রী রামভজনা নিয়ে থাকেন। তিনি স্বামীর শখ পছন্দ করেন না। স্বামীর শখ হলো দর্শন সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থ খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করা। কোথাও ছাপা কোনো বইয়ের কথা বলুন, তিনি টাকা খরচ করে তা আনাতে প্রস্তুত। আমার কাছ থেকেও তিনি বইয়ের নাম চেয়েছেন, আমি কয়েকটা নামও জানিয়েছি। বিগত পনের-কুড়ি বছর ধরে তিনি এই কাজে লেগে রয়েছেন। দর্শন সম্বন্ধীয় সংস্কৃত আর তার অনুবাদ এবং মৌলিক হাজার হাজার গ্রন্থ তাঁর কাছে জমা হয়ে গিয়েছিল। যে

গ্রন্থগুলি তিনি জমা করছেন তাতে কী লেখা আছে তা জানার কোনো আগ্রহ তাঁর নেই। তিনি চাইতেনও যে, দর্শন অধ্যয়ন করা হোক। তার জন্য লোক সুখ-সুবিধে নিয়ে কোথাও থাকুক এবং তাঁর গ্রন্থগুলি কাজে লাগাক। তিনি দেরাদুনে জমি কিনেছিলেন, পরে সেই জমিতে একটি বাড়িও বানিয়েছেন যাতে বই রাখার ঘর ছাড়া থাকার জন্যেও কয়েকটা ঘর আছে। বাড়ি যখন হয় নি তখন আমি বলেছিলাম, 'জমি বেচে দিন। মুসৌরীতে সস্তায় অনেক ভাল তৈরি-বাংলো আপনি পাবেন। সেখানে গ্রন্থাগার খুলুন। দর্শনের বই পড়ার বেশি লোক আপনি পাবেন না। সামান্য যে কটি লোক পাবেন তাদের জন্য থাকার ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেলে মুসৌরীও অনুকূল হবে।' কিন্তু ভাটনগরজীর এই কথা পছন্দ হলো না। তাঁর খেয়ালের আমি প্রশংসা করি।

২৫ ফেব্রুয়ারি একজন তরুণ জ্যোতিষাচার্যের (হরিহর পাণ্ডে) দীর্ঘ চিঠি পেলাম। তিনি আমার সগোত্র এবং এক জেলারই শুধু নন, উপরন্তু আমার নিজের পিসির ননদের ছেলে। তাঁর মাকে আমি বাচ্চা বয়সে দেখেছিলাম। তরুণটি সেই চিঠিতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা এবং জীবন সম্বন্ধে লিখেছিলেন। তাঁদের খানদানে পুরোহিতগিরি নয়, গুরুগিরি চলে এসেছে—লোকে তাঁদের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিত। তাঁর কাকা একজন সার্থক জ্যোতিষী ছিলেন অর্থাৎ তাঁর ভবিষ্যৎবাণীতে লোকের বিশ্বাস ছিল। এ কারণে হরিহর পাণ্ডেও বেনারস সংস্কৃত কলেজ থেকে জ্যোতিষাচার্য হলেন। ফলিত ভাষণের জন্য আচার্য হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। বুদ্ধিজীবী হওয়ায় ফলিত জ্যোতিষের ওপর থেকে তাঁর বিশ্বাস চলে গিয়েছিল। হয়তো আমি তাঁর সগোত্র এবং আত্মীয় বলে আমার বইগুলিও তিনি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। এখন তিনি গুরুগিরি আর জ্যোতিষীগিরি অনিচ্ছা নিয়ে করতেন। ১৯১৪ সালে জন্মেছিলেন। এখন তাঁর ৩৮ বছর বয়স হয়ে গিয়েছিল। উত্তর-ভারতে খুব ঘুরেছিলেন। দীর্ঘ চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মধ্যে লেখার ক্ষমতা ও প্রতিভা আছে। আমার কাছে একটু পথ-নির্দেশ চেয়েছিলেন। আমি লিখলাম, 'ভারতীয় জ্যোতিষ-গণিত শাস্ত্রের একটি নবীন ইতিহাস লিখে ফেল।' তিনি বাংলা আর মারাঠীতেও এই বিষয়ের গ্রন্থ পড়েছিলেন বলে এই কাজের তিনি যোগ্যও ছিলেন। কিন্তু জ্ঞান আর যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়। কারুর কাঠের হাতকে কোনো কাজে জুড়ে দেওয়া যায় না। যখন নিজের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে তখন মানুষ কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ করার কষ্ট সহ্য করে নেয়। হরিহর পাণ্ডের আরও দু-তিনটে চিঠি এলো, তারপর চুপ হয়ে গেলেন। দর্শনের দু-একজন বিদ্বানকে, যাঁদের ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ দুটি দর্শনেরই জ্ঞান আছে, সাগ্রহে তিব্বতী ভাষা পড়ে তাতে অনূদিত বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করে নিজেদের জন্য নতুন কার্যক্ষেত্র বানানোর জন্য আমি বলেছিলাম, কিন্তু তার কোনো ফল হয় নি।

পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লিগের নেতা পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলাকে দাবিয়ে রেখে উর্দু চাপিয়ে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ছিলেন। চার-সাড়ে চার বছর পর্যন্ত আগুন ভেতরে ভেতরে জ্বলতে লাগল। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে তা দাউ দাউ করে উঠল। মুসলমানরা তাদের বাংলা ভাষাকে নিজেরই মাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া দেখতে চাইছিল না। আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল। সরকার গুলিবর্ষণ করে তাকে দমন করতে চাইল। ঢাকায় আটজন লোক নিজের মাতৃভাষার জন্য বলি হলো। মুসলিম লিগের শাসকরা নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারল। হালে সংবিধান রচনা করার সময় কারুর এ-প্রশ্ন করারও সাহস হলো না যে, বাংলাকে

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর সমকক্ষ কেন বানাতে যাচ্ছে? সেদিনের বলিদান নিষ্ফল হয় নি। আজ শহীদদিবসে সেখানে সরকারি ছুটি থাকে। লোকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই বীরদের স্মরণ করে।

চেষ্টা করতে করতে ৫ মার্চ দেখা গেল যে, কমলা ইঞ্জেকশন দিতে পুরোপুরি শিখে গেছে। আগে তার হাত কাঁপতো, সাহস হতো না। বর্তমান যুগে ইঞ্জেকশন দেওয়া প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের শিখে নেওয়া দরকার। অনেক ওষুধ আছে যা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দিলে তাড়াতাড়ি কাজ করে আর যার ব্যবহার ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেছে। প্রতিটি ইঞ্জেকশনের জন্য ডাক্তারের ওপর নির্ভর করা খরচসাপেক্ষ এবং অর্থহীন ব্যাপার।

বোম্বাই থেকে ড· জগদীশচন্দ্র জৈন-এর চিঠি এলো—'আমি ২৩ মার্চ চীনের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি।' আমি সাধুবাদ দিয়ে ও সমর্থন করে বললাম, 'ওখানে গিয়ে বৃহৎ সংস্কৃত-চীনা, চীনা-সংস্কৃত শব্দকোষ তৈরি করুন।' দু-বছর থেকে ড· জৈন ভারতে ফিরলেন। বেশি বয়সে চীনা লোকেদের মধ্যে থেকে ভাষা তো শেখা যায় কিন্তু প্রতিটি শব্দের জন্য নির্দিষ্ট অক্ষর থাকায় হাজার হাজার অক্ষর শিখে নেওয়াটা সম্ভব না। ড· জৈনের মেয়ে চক্রেশ বাবার চেয়ে বেশি ভাষা ও অক্ষর শিখে সেখান থেকে ফিরল। ড· জৈনের চীন যাওয়ার সংবাদ শোনার পরই ১২ মার্চ ড· আল্‌তেকর-এর চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছিলেন, 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য হিন্দু-ইউনিভার্সিটি প্রেসে ছাপানোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে।' আমি আমার জীবদ্দশায় ভাষ্য প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম বলে এই খবরটা আমার খুশি হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ছেপে 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য' ১৯৫৪ সালে বেরিয়েও গেল।

১৫ তারিখে খুব পুরনো এক বন্ধুর চিঠি পেয়ে বেশ আনন্দ হলো। ১৯১৫-তে আমি মির্জাপুর জেলার অহরৌরা মফস্বল শহরে শ্রীরামখেলাবন সিংহের ঘরে একমাস একেবারে নিজের ঘরে থাকার মতো ছিলাম। সে-সময় রামখেলাবনজী আর্যসমাজের একজন কর্মঠ সদস্য তথা অধ্যয়নশীল যুবক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে থাকার সময় আমি 'চন্দ্রকান্তা' আর 'জাসুস' পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। রামখেলাবনজী আদর্শবাদী ছিলেন। তাঁর বাবা তাঁর সমস্ত অসহায় আত্মীয়দের নিজের কাছে রেখেছিলেন। তামাক এবং অন্যান্য ব্যবসাতে রোজগার বেশ ভাল ছিল তাই তারা বোঝা হয়ে ছিল না। কিন্তু ১৯১৫ সালে রোজগার খুব কমে গিয়েছিল। শুধু কুলের সঙ্গে পচা ময়দার গাঁজলা দিয়ে বানানো তামাকের ব্যবসা একমাত্র অবলম্বন ছিল। এত ভার বহন করা তাঁর সামর্থে কুলোচ্ছিল না। রামখেলাবনজী বলছিলেন, 'যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ওদের নিরাশ্রয় করব না।' তাঁর অনেক টাকা ধারে ফেঁসে ছিল, লোকে যা দেবার নাম করত না। আজ ৩৭ বছর পর সেই 'শ্রীরামখেলাবন সিংহ মৌনসপ্রহরি ইন্দ্রকবি'র চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হলো। এখন তিনি বৃদ্ধ। আমি আমার জীবন-যাত্রার প্রথম খণ্ডে তাঁর সম্বন্ধে নিজের যে মনোভাব প্রকাশ করে ছিলাম তা তাঁর চোখের সামনেই কেটেছিল। সে-সময় আমি কেদারনাথে ছিলাম। এজন্য এটা বুঝতে হয়তো তাঁর বেশ সমস্যা হয়েছিল যে সেই ব্যক্তির নাম এখন রাহুল। কিন্তু অহরৌরার নাম এবং কাল আমার জীবন-যাত্রায় স্পষ্ট ছিল। অনেক দিন হয়ে যাওয়ায় আমি তাঁর নাম ভুলে গিয়েছিলাম।

১৬ মার্চ সকাল থেকে দুটো পর্যন্ত শিল পড়তে লাগল। দুপুর নাগাদ দেড় দু-ইঞ্চি পুরু চাদর বিছিয়ে গেল। এই সময় মেঘ কেটে গেল এবং সূর্যের প্রখর,কিরণ শিলগুলোকে গলাতে শুরু করল। রাতেও খানিকটা বৃষ্টি আর বরফ পড়তে লাগল। ১৭ তারিখে সামনের খোলা জায়গায় বরফ পড়েছিল। দক্ষিণ দিক থেকে পাহাড়ের ওপর গাছের সাদা সাদা পাতাও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সন্ধে বা পরের দিন পর্যন্ত বরফ থাকতে গেলে খুব পুরু আস্তরণ দরকার, তা ছিল না। মার্চ মাসে তো শীতের আবহাওয়াও থাকে না। তাই এই শীতের এটাই ছিল শেষ হিমপাত।

'কমলার এফ এ-র পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল এখানেই। ধনানন্দ ইন্টার কলেজে। সেখানে সকালে পৌছনো দরকার ছিল। বাড়ি থেকে গেলে দু-আড়াই মাইল হতো, এজন্য ১৮ এপ্রিল সে পরবর্তী তিন দিনের জন্য শীলাজীর বাড়িতে চলে গেল। আমিও সঙ্গে গেলাম। এখন সামান্য চড়াইয়ে উঠতেও ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল, বিশেষ করে যদি কথাবার্তায় মন ভুলে না থাকত। মার্চ মাসে লোকে নিজের জন্য বাংলো বা কামরা রিজার্ভ করতে শুরু করে। হ্যাপি-ভ্যালি ক্লাব সম্বন্ধে মিসেস মেকলৌড বলছিলেন যে, এখনো পর্যন্ত একটা কামরার জন্যেও আবেদন আসে নি।

সাম্প্রতিক নির্বাচন সম্বন্ধে আমি নীচের সিদ্ধান্তে পৌছে ছিলাম—

১· অধিকাংশ জনগণ অলস, যার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের লাভ হয়েছে।

২· প্রগতিশীল দলগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে সচেতন জনতার 'ভোট ভাগ করে দিয়েছে।

৩· হিন্দি বলয়ে বামপন্থী দল শুধু শিক্ষিত ও শহুরেদের মধ্যে রয়েছে।

৪· উত্তর-প্রদেশ, বিশেষ করে তার পূর্বভাগ, বামপন্থীদের পক্ষে বেশি অনুকূল ছিল।

৫· সোস্যালিস্ট নিজেকে প্রগতিশীলতা এবং সমাজবাদের ঠিকাদার মনে করে। তাদের কথায় পুঁজিপতিরা কত বিশ্বাস করে সেটা এর থেকে বোঝা যায় যে, স্বার্থ এবং ভাবনাচিন্তায় পুঁজিপতিরাও তাদের আঁচল ধরে এবং টাকা দিয়ে ভোট কেনাতেও বাধা আসে নি।

৬· সোস্যালিস্টদের যদি এইরকম কমিউনিস্টবিরোধী নীতি হয় তাহলে তারা সমাজবাদের নয় বরঞ্চ শোষকদের সমর্থক হয়ে থাকবে।

৭· নেহেরুর প্রতিশ্রুতিগুলো ফাঁপা। দেশে সমাজবাদের ব্যাপারে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল-দের মুখিয়া ছাড়া আর কিছু নন।

৮· আজকের যুগে চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রগতিশীলতার লক্ষণ।

৯· আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের জনতা এবং তার প্রগতির সবচেয়ে বড় শত্রু। হিরোশিমায় আনবিক বোমা, কোরিয়া আর চীনে বীজাণু বোমা এবং ইরানের জনতার তুদে পার্টিকে খুনীর মতো ধ্বংস করে এটা সে দেখিয়ে দিয়েছে।

১০· নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলা এবং সমস্ত প্রগতিশীল তথা বামপন্থীদের সংযুক্ত মোর্চা—এটাই আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা।

২১ মার্চ পরীক্ষা দিয়ে কমলা বাড়ি চলে এলো। তিনটি প্রশ্নপত্রেই ভাল পরীক্ষা দিয়েছিল। আমার আপসোস হচ্ছিল যে বিশারদ পরীক্ষার সুযোগ নিয়ে কেন একটি বিষয় ছেড়ে দিল। সব

বিষয়গুলো নিয়ে সহজেই সে পাস করে যেত। কিন্তু তখন পরীক্ষায় বসার তার সাহস ছিল না।

সেইদিনই আদালতের সমন পেলাম। সাহিত্য-সম্মেলনের বিরুদ্ধে পণ্ডিত জয়চন্দ্রজী মোকদ্দমা করে দিয়েছেন। আমিও তার স্থায়ী সমিতির মেম্বার ছিলাম, এইজন্যই এই সমন। আমার দৃষ্টিতে যে কোনো সাহিত্যকর্মীর পক্ষেই এই কাজ সম্পূর্ণ অনুচিত। তাঁর কি আর কোনো কাজ ছিল না যে সম্মেলনকে মামলাবাজির আখড়া বানাতে তিনি নেতা হয়ে উঠলেন?

শিবকুমার শর্মা একজন সাহসী তরুণ। পড়াশুনোতেও ভাল। সেটা 'সাহিত্যরত্ন' পরীক্ষা থেকে বোঝা গিয়েছিল। লেখার ক্ষমতাও প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু বেশি আবেগ মানুষের চিন্তার গভীরতা কিছুটা কমিয়ে দেয়। এখন যাত্রায় বেরোবেন। চাইছিলেন প্রধান প্রধান হিন্দি পত্রিকাগুলোতে এটা জানিয়ে দেওয়া হোক যে শিবকুমার শর্মা যাত্রায় বেরোচ্ছেন। আমি বোঝালাম, এই রকম পত্রিকার স্থান হবে সম্পাদকের নোংরা ফেলার ঝুড়িতে। পত্রিকার সুপারিশ দিয়ে পরিচয় অর্জন করা ঠিক নয়। তা করা যায় না। নিজের লেখনী দিয়েই পরিচয় অর্জন করার মানসিকতা থাকা উচিত। দু-চারটে লেখা যদি পত্রিকার আবর্জনা ফেলার ঝুড়িতে যায় তাহলে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লেখার একটি কপি নিজের কাছে রেখে অন্যটি পত্রিকায় পাঠিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা উচিত। অনেক পত্রিকার দপ্তরে তার যদি সেই গতি হয়ে থাকে তবে তার জন্য সম্পাদককে নয় নিজেকে দোষ দেওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত।

ভাইয়া আর ভাবীজীর ক্রমাগত তাগিদ আসছিল যে অমৃতসর চলে এসো। কমলার সঙ্গে আমার যাওয়ার অর্থ কাজের ক্ষতি। সৌভাগ্যক্রমে ভাইয়ার অমৃতসরের বন্ধু মাস্টার জ্ঞানীরাম এসে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেই কমলা দেরাদুন থেকে ২৬ তারিখে অমৃতসর গেল। মার্চের শেষ সমতলের পক্ষে কোনো সুখকর মরশুম নয়।

বন্ধু বা যে কোনো নিকট সম্পর্কের লোককে কর্জ দেওয়া আমার নীতির বিরুদ্ধ। যদি দিতেই হয় তো পাওয়ার জন্য দেওয়া উচিত নয়। ৩১ মার্চ একজন পরিচিত ব্যক্তি কিছু টাকা ধার চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যে, এতে সম্পর্ক নষ্ট হবে। যদিও এই সময় মালকিনই ঘরে ছিল না যে তাকে টাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করব।

৩ এপ্রিল মুঙ্গের কলেজের ইতিহাসের প্রফেসর রাধাকৃষ্ণ চৌধুরীর চিঠির সঙ্গে একটি পুরনো শিলালেখের ফটো এলো। এটা ছিল শঙ্খ-লিপিতে, যা উত্তর-ভারত ছাড়া জাভাতেও দেখা যায়। আমি লিখলাম, 'এখনো পর্যন্ত এর বর্ণমালা পড়া যায় নি। এর একটি কারণ এটাও ছিল যে অভিলেখটি ছিল কয়েকটি অক্ষর মিলে, এই অভিলেখটি বড়, সেজন্য চেষ্টা করলে আপনি হয়তো পড়তে পারবেন। এই লিপিতে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত মাত্রা এবং সেই সঙ্গে শঙ্খাকৃতি অক্ষর থাকে। আমাদের দেশে বিগত একশো বছর ধরে পুরাতত্ত্বের গবেষণার কাজ হয়ে আসছে। গত অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত তো তা খুব তৎপরতার সঙ্গে হয়েছে। কিন্তু এখনো দেশের পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর এক শতাংশও আবিষ্কৃত হয় নি। যে দেশের সংস্কৃতি আর ইতিহাস যত পুরনো হয় তার পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীও সেই অনুযায়ী বেশি এবং মাটির বেশি ভেতর অব্দি লুকিয়ে থাকে। পূর্বসূরীরা পুরাতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের শুধু পথপ্রদর্শন করেছিলেন। এখন অনেক রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করা বাকি আছে। আমাদের তরুণ বিদ্বানদের এর প্রতি আগ্রহ আছে জেনে

আনন্দ হলো। উপকরণের জন্য অভিযোগ করে হাতের ওপর হাত রেখে বসে থাকা তাদের উচিত নয়। এক-একটি বিন্দু দিয়েই পুকুর ভরে ওঠে তারপর পুকুর তার ভক্তদের নিজে-নিজেই খুঁজে নেয়।'

৮ এপ্রিল কমলার সঙ্গে বাজার গেলাম। সে গতকালই অমৃতসর থেকে ফিরেছে। লন্টোরে কিষাণ সিংহের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অসুখ হওয়ায় দিল্লী গিয়েছিলেন, সেখানে অসুখ আরও বাড়ল। এখনও দুর্বল ছিলেন। গেলে পরে 'কী করব, কোথায় বসাব' করতেন। চা খাওয়ার অনুরোধ তো বহুবার মানতে হয়েছে। চার হাত চওড়া আর দশ-বারো হাত লম্বা জায়গা ছিল, যাকে তিনি তিনটে কুঠরীতে ভাগ করে রেখেছিলেন। বাইরের কুঠরীটা (বারান্দা) দোকান হিসেবে ব্যবহৃত হতো, মাঝেরটা গুদাম আর পিছনেরটা রান্নাঘর। স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলে—এই তিনটে প্রাণী এর মধ্যেই কাটাচ্ছিলেন। জীবিকার সংস্থান করতে দুজনকে সমানে দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়। স্ত্রী তিব্বত ও চীনের কিছু কিউরিও-র জিনিস নিয়ে বড় বড় হোটেলে ঘুরতেন।কিষাণ সিংহ চলাফেরায় অক্ষম ছিলেন। এজন্য দোকানে বসে থাকতেন। ছেলেকে পড়ানোর খুব চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে না তার আগ্রহ ছিল, না ছিল বুদ্ধি।

ষষ্ঠদশ বর্ষপূর্তি—৯ এপ্রিল, ১৮৯৩ (বৈশাখ, অষ্টমী, রোববার, সংবত ১৯৫০) আমার জন্মদিন ছিল। আজ (৯ এপ্রিল, ১৯৫২) আমার ষাটতম জন্মদিন। কত জন্মদিন পেরিয়ে গেছে যখন আমার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হওয়া এবং আত্মনির্ভর হওয়ার পরে আমার মনে হয় নি যে জন্মদিনের কোনো গুরুত্ব আছে। কোনো বন্ধুও একথা মনে করিয়ে দেয় নি। আমাদের মতো বংশে, যার ওপর লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর বরদহস্ত নেই, তাদের এটার প্রয়োজন পড়ে না। এটা যে বড়লোকদের বিলাসিতা তা আমি জানি। কমলা যখন এই প্রসঙ্গটা তুলল, তখন আমি বললাম, '৫৯ সালের জন্মদিন যেভাবে কেটেছে ৬০-এর জন্মদিনও সেইভাবেই কেটে যেতে দাও।' কিন্তু সে কিছুতেই শুনল না এবং ৯ এপ্রিল (বুধবার) তা পালন করা স্থির করল। আমি রোববারটা ছুটি হিসেবে রাখতাম, সেদিন কাজেরও ছুটি পালন করা হলো। দুপুরের পর একটি ছোটমতো পার্টি হলো যাতে শ্রীসদানন্দ মেহতা ও শ্রীশিবশর্মা ছাড়া শীলাজী, ড· সত্যকেতু আর তাঁর দুটি ছোট বাচ্চা এলো। প্রথমবার জন্মদিন পালন করাটা কেমন বিচিত্র লাগল।

এপ্রিল মাসটা সমতলে গরমের সময়, এখানে তাকে শীতের শেষ বলা যেতে পারে। শিবকুমারের এখান থেকেই ভবঘুরের যাত্রায় বেরোনোর কথা ছিল।

এদিকে ইনসুলিন খুব নিয়ম করে নিতে শুরু করলাম, তার ফলে ওজন বেড়ে যাওয়া আমার মনঃপূত ছিল না। কিন্তু তৃষ্ণা আর প্রস্রাব কম হওয়া এবং মস্তিষ্কের ক্লান্তি কেটে যাওয়া আনন্দের ব্যাপার ছিল। কমলার পড়াশোনায় ভাল বুদ্ধি আছে, লেখার ক্ষমতাও তার আছে। দুটো কাজেই আলস্য রয়েছে এরকম বলাটা ঠিক হবে না। বলা যায় যে, এখনো তার ভেতরে যথেষ্ট প্রেরণা জাগে নি। আমিও লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলাম কিন্তু কারও কথায় পরিশ্রম করতে রাজি ছিলাম না। যখন কৌতূহল প্রবল হলো তখন নিজে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে লেগে পড়লাম। বই পড়তে বা লিখতে গিয়ে এমন অনেকবার হয়েছে যে, বুঝতেও পারি নি ভোর হয়ে আসছে। লেখাপড়া ছাড়াও সেলাই ও রান্নার কাজেও কমলার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। অবসর

সময়টা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে না লাগিয়ে সে ওইসব করত। তার তৃতীয় গুণ হচ্ছে সঙ্গীতের পক্ষে খুব সুন্দর কণ্ঠ এবং দ্রুত যে কোনো গান নিজের গলায় তুলে ফেলতে পারা। তার খুব ইচ্ছে ছিল কোনো বাজনা বাজাতে শেখার। আমাদের বাড়ি যদি শহরের কাছে হতো তাহলে মাসিক দশ-পনেরো টাকায় কোনো উৎসাহী ব্যক্তিকে শেখানোর জন্য পাওয়া যেত। যে শ্রেণীর মানুষদের জন্য মুসৌরী,তাদের মেয়েদের কাছে গায়ন, বাদন, নৃত্য আজ অনিবার্য জিনিস মনে করা হয়। উপযুক্ত অথবা ধনী বর পেতে এই গুণগুলো সহায়ক হয়। বহু শতাব্দী ধরে এই ললিত কলাগুলি উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীতে উপেক্ষিত ছিল। এখন পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর লোকের সেদিকে মনোযোগ গেছে। পশ্চিমের সঙ্গে যে যত আগে সম্পর্কিত হয়েছে সে তত আগে এটাকে গ্রহণ করছে। হিন্দি-ক্ষেত্রের বাসিন্দারা এ ব্যাপারে সবচেয়ে পিছনে থেকেছে। তবে হ্যাঁ, সামন্ত শ্রেণী একে পুরোপুরি বয়কট করে নি। মুসৌরীতে এজন্য সঙ্গীতের কয়েকজন ওস্তাদ থাকেন। অন্য লোকদের মতো আজ তাঁদেরও বেশ আক্ষেপ ছিল যে, এখন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক কেউ রইলেন না। বেশির ভাগ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নিম্ন ও মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষিতরা, যাঁরা আর্থিক সংকটের শিকার হচ্ছিলেন। আমরা রোজ রোজ তিনচার মাইল দূরে ওস্তাদকে ডেকে আনতে পারছিলাম না, সেজন্য মাসিক ৪০ টাকায় মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবারে তিনি শেখাতে শুরু করলেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ভায়োলিন পছন্দ করা হলো। দেশী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সেতার বা বীণা যেমন বেশি সম্মানীয় আর শিল্পমণ্ডিত বলে গণ্য করা হয়, বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সেরকম হচ্ছে এই হালকা বাজনাটি। এতে ইউরোপীয় আর ভারতীয় দুইয়েরই সংগীত তোলা যায়। এটিও এর একটি গুণ বলে ধরা হয়। এই শিল্প থেকে আমি আনন্দ পাই না, এমন নয়। তবে সংগীতের কণ্ঠ আমার ছিল না, হয়তো সে-কারণেই গানের প্রতি আকর্ষণ আমার তৈরি হয় নি। সংগীতের রাগ-রাগিনী চেনার ব্যাপারটাও ছিল উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।[১] কিন্তু বাড়িতে যখন সংগীত শেখানো শুরু হলো তখন তা শুনতে হতো। ওস্তাদ চাইতেন নিজের ঢঙে শেখাতে, তার মানে জঙ্গলে টো টো করার জন্য ছেড়ে দেওয়া। আমরা জানতাম যে, বেশিদিন আমরা খরচ চালাতে পারব না। তাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। এর জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হলো। বাংলা আর হিন্দিতে ছাপা সংগীত-শিক্ষার কয়েকটি বই আনালাম। তা থেকে জানতে পারা গেল যে, দশটি ঠাট হচ্ছে মূল, বাকি রাগ-রাগিণীগুলি তাদেরই বিস্তার। দু-চারটি বৈঠকের পর আমি বললাম, 'আগে এই দশটি ঠাট শিখিয়ে দিন।' ওস্তাদ অনিচ্ছার সঙ্গে তা মেনে নিলেন। দু-চার দিন পরে ওস্তাদ বললেন, 'গান গাওয়ার ইচ্ছে তো যে কোনো লোকেরই হতে পারে, তার মধ্যে কিছু লোকের তা পালন করার শক্তিও থাকতে পারে। কিন্তু মধুর কণ্ঠ আর প্রতিটি টিউন দ্রুত ধরে নেওয়া সহজ নয়।' কমলাকে এই সার্টিফিকেট ওস্তাদ দিলেন এবং যে কেউ শুনলে তা মেনে নেয়। সংগীতের গভীর পার্থক্যগুলি সে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাল করে চিনতে পারে কিন্তু এখানেও তার ভেতর থেকে তাগিদ থাকা দরকার। সে দুমাস ধরে ভায়োলিন আর সংগীত শিখতে লাগল।

---

[১]এই ভাবার্থে লেখক এখানে একটি লোককথা ব্যবহার করেছেন, যার আক্ষরিক অর্থ হলো—মোষের সামনে বীণা বাজানো *(ভৈঁস কে আগে বীন বজানা)*।—স· ম·

কুড়ি-বাইশটি ঠাট ছাড়া আরও কুড়ি-বাইশটি রাগ-রাগিণী শিখল। ভায়োলিনেও হাত বসে গেল। ইচ্ছে থাকলে নিজেই তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু ভায়োলিন তো সে প্রায় বন্ধ করে রেখে দিল। গুনগুন করার শখ অনেক দিনের, তাই মাঝে-মধ্যে গাইত, তাও বেশিরভাগ সিনেমার গান। এখনও তার ইচ্ছে যে আরও একটু সময় দিয়ে বাদ্য ও সংগীতের কিছু শেখে। এই জঙ্গলে বসবাস সত্যিসত্যিই এ ব্যাপারে প্রতিকূল প্রমাণিত হলো।

১২ এপ্রিল আমাদের এলাকায় একটি পাগল কুকুর এসে পড়ল। সে দু-তিনজন লোক ছাড়াও আমাদের প্রতিবেশী ল্যাডলি সাহেবের মোষকেও কামড়ে দিল। এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতের কুকুর হচ্ছে আমাদের ভূতনাথ, কিন্তু শক্তি এবং শরীর দুদিক দিয়ে চৌধুরীর টাইগার হচ্ছে বড়। হ্যাপি-ভ্যালির বাঘ হলো রতিলালার কুকুর গাব্বু। তার সারা শরীরে শুধু নয়, মুখেও বড় বড় লোম আছে। টাইগার বা ভূতের সঙ্গে লড়বার জন্য সে সবসময় তৈরি থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখলেই পিছনের পা দিয়ে মাটি ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাঁক ছাড়ে—'সাহস থাকে তো চলে এসো।' তাকে কখনো রণক্ষেত্র থেকে পালাতে দেখা যায় নি। ভূতনাথ লড়ে যায়, কিন্তু বড় বড় পাথর বয়ে বয়ে তার চোয়াল ভোঁতা হয়ে গেছে। গাব্বুর তাতে সূঁচের মতো ধার। এজন্য লড়াইয়ে সে যে-কাউকে রক্তাক্ত করে দিতে পারে। পাগলা কুকুরের সঙ্গেও সে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভয় হলো, গাব্বুও তার মতো না হয়ে যায়। লম্বা লোমের জন্য দাঁত ভেতরে ঢুকতে পারে নি। তাকে ওষুধ দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হলো। আমাদের প্রতিবেশি নন্দ ধোপার হাতে পাগল কুকুর কামড়ে দিয়েছিল, কিন্তু দাঁত বসায় নি। তাকে স্পিরিট লাগিয়ে দিলাম। গোটা এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ল। গুজব শোনা যেতে লাগল যে সে শহরের অনেক লোককে কামড়েছে। ১৩ এপ্রিল সকাল সাড়ে সাতটায় তাকে আমাদের ফটকের পাশ দিয়ে ওপরের দিকে যেতে দেখা গেল। তাকে এভাবে ছেড়ে রাখা ঠিক না। তরুণ জন ল্যাডলি তার বন্দুক আর মঙ্গলকে নিয়ে পেছনে তাড়া করল। কুকুরটি জঙ্গলের রাস্তার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। এক জায়গায় জন বন্দুক চালাল কিন্তু কার্তুজে আগুন লাগল না। কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে ঘুরল। সরু পাকদণ্ডী ছিল, সে ল্যাডলির পায়ে দাঁত বসিয়ে দিল, তিনজনই সরু রাস্তা বেয়ে নীচে দশ-পনের পা গড়িয়ে ঝোপে গিয়ে আটকে গেল। কুকুরটা আবার দৌড়ল আর এরা দুজনও পিছনে পিছনে গেল। পাগল কুকুরে কামড়ানো ভয়ংকর ব্যাপার। জঙ্গলে কোথায় কোথায় ঘুরে তারপর সে যখন চার্লবিল হোটেলের ফটকে পৌঁছল, তখন লোকে তাকে মেরে ফেলল। জানা গেল, লণ্ডৌরের আর একটা পাগলা কুকুরও অনেককে কামড়েছিল। তাকেও আজ মারা হলো।

ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি জানালেন, ল্যাডলির মোষের বাঁচার আশা নেই তবু তাকে অনেকগুলো ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো। জনকে কামড়ানোর জন্য আমার খুব আফসোস হলো। সে খুবই মিশুকে আর উদার তরুণ, সেই সঙ্গে সে তার বুড়ো বাবার একমাত্র সন্তান। ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো, মাসখানেক পর যখন ঘা শুকিয়ে গেল এবং অন্য কোনো লক্ষ্মণ প্রকাশ পেল না তখন বর্ষার সময় কী হবে এই নিয়ে সামান্য আশংকা থাকলেও সকলে নিশ্চিন্ত হলো। পাগল শেয়ালকে কামড়ালেও কুকুর পাগল হয়ে যায়। আমারও ভূতের জন্য চিন্তা হতে লাগল। আসলে সে কি করে জানবে কোন কুকুর-শেয়াল পাগল আর কোনটা পাগল নয়। বাঁচোয়া এটাই

যে নেকড়ের ভয়ে আমরা সূর্যাস্তের পর ভূতকে বাইরে থাকতে দিতাম না, আর শেয়াল বেশিরভাগ রাতেই বেরোয়।

শ্রীত্রিরত্নমান সাহুর (নেপাল) পুত্র প্রত্যেকমান লাসায় অনেক বছর ধরে বাস করছিলেন। যখন-তখন তাঁর চিঠি এসে পড়ত। তাঁর বাবা তাঁকে পড়ানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার জন্য খরচ করতে পারতেন কিন্তু সেই সঙ্গে পড়াশোনারও পরম্পরা থাকা দরকার, উপরন্তু পরিবারের পরিবেশ শিক্ষার বিরোধী হওয়া উচিত নয়। নেপালের প্রতিবেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে শিক্ষাকে অনাবশ্যক মনে করা হয়। লিখতে, পড়তে আর হিসেব করতে পারা, এটুকুই মাত্র তাদের প্রয়োজন। তিব্বতের ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে দরকারী ব্যাপার যা তা হলো এই যে তিব্বতের সঙ্গে সজীব সম্পর্ক স্থাপন করে ওখানকার ভাষা আর রীতি-রেওয়াজগুলি বোঝা। এজন্য ওখানে এদের ছেলেদের বেশি দেখা যায়। পড়ার সময় যখন পেরিয়ে যায় তারপর পড়াশুনোয় শ্রম ও সময় দেওয়া সম্ভব হয় না।

২২ এপ্রিল লাসা থেকে প্রত্যেকমানজীর চিঠি এলো। বোঝা গেল, ওখানকার নিহিত প্রাচীন স্বার্থ কমিউনিস্টদের আগমনকে লঘু মনে গ্রহণ করছে এবং কমিউনিস্টদের নরম ব্যবহারকে তাদের দুর্বলতা মনে করে আশা করছে যে, বিরক্তি বোধ করলে তারা তিব্বত ছেড়ে চলে যাবে। এটাও বোঝা যাচ্ছিল যে, ভূমি-সংস্কারের জন্য ওখানে কিছু করা হচ্ছে না। বহুমানুষকে নিজেদের দিকে টেনে আনার জন্য সবার আগে দরকার ছিল অর্ধদাস কৃষকদের দিকে নজর দেওয়া। আপাত দৃষ্টিতে এই শিথিলতা বা দেরি অবাঞ্ছনীয় মনে হয় কিন্তু কমিউনিস্ট তার এবং তার শক্তির ওপর আস্থা রাখে। তারা যে রকম শান্তিপূর্ণভাবে তিব্বতে প্রবিষ্ট হয়েছে, সে রকমভাবেই ওখানকার লোকদের সঙ্গে নিয়ে এগোতে চায়। তারা সবার আগে নজর দিয়েছে দুটো জিনিসের প্রতি। যাতায়াতের জন্য মোটর-সড়ক দিয়ে তিব্বতকে চীনের সঙ্গে যুক্ত করা এবং কৃষি-খামার দ্বারা কৃষকদের দেখিয়ে দেওয়া যে নূতন পদ্ধতিতে ফসল এবং ভিন্ন ভিন্ন শাক-সবজি ও শস্য কত বেশি উৎপন্ন করা যায়।

জাগ্রত অবস্থায় মানুষ বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। স্বপ্নাবস্থার জন্য বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক জরুরি নয়। তার জন্য মনের ওপর সারা জীবনের যে সব অভিজ্ঞতা চিত্রিত রয়েছে তাই বহির্জগতের স্থান নেয়। স্বপ্ন দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীর কথায় আমার বিশ্বাস নেই। অন্যভাবেও তাকে গুরুত্ব দিই না। স্বপ্নেও তা কখনো কখনো বিনোদন ও মনতুষ্টির কাজ করে। অনেক বছর আগে তিব্বতে আমি একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, দিঙ্‌নাগ আর ধর্মকীর্তির নষ্ট হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া মূল সংস্কৃত গ্রন্থ আমি স্বপ্নে পেয়ে গেছি। তখন সেই কথাই আমার সবসময় মনে হতো।

২৭ এপ্রিল রাতে আমি স্বপ্নে জয়সওয়ালজীকে দেখলাম। তিনি চেয়ারের ওপর সেই টেবিলে হেলান দিয়ে বসেছিলেন যাতে তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন। টেবিলটা ছিল ঘরের ভেতরে এবং একটু খোলামতো জায়গায়। আমি পৌঁছতেই তিনি আমাকে দেখে হাসলেন। কিন্তু কথা হলো না। মনে হচ্ছিল তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন, তিনি ডাকায় আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। পুরনো মধুর স্মৃতি যে রূপেই আসুক, আনন্দদায়ক হয়। স্বপ্ন, সম্ভবত মনীষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সেটা এর থেকেই বোঝা যায় যে, আমরা কখনো কখনো ভূতকে ঘুমের মধ্যে ডেকে উঠতে দেখতাম, তার মানে সেও স্বপ্ন দেখছিল।

২৮ এপ্রিল কমলার পক্ষে খুব আনন্দের দিন ছিল। 'নয়া সমাজ' তার গল্প 'বেচারী সরস' ছাপতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। এই প্রথম গল্প ছাপা হওয়ায় তার অপার আনন্দ হলো।

প্রকাশকরা সবচেয়ে চলতি বই বের করার জন্য লালায়িত হয়ে থাকে, লেখকেরও সেদিকে ঝোঁক থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি কখনো কারো ফরমায়েশে বই লেখায় অভ্যস্ত নই। আমার একজন প্রকাশক রসায়নের ওপর বই লেখার জন্য বলল। সে সম্ভবত টেক্সট-বুক হিসেবে সেটা লেখাতে চেয়েছিল। আমার মনে আগেই প্রতিক্রিয়া হলো। রসায়ন তো আমার বিষয় নয়। সে দেখেছিল আমি আমার 'বিশ্ব কী রূপরেখা'-তে রসায়নের কথা বলেছি, কাজেই সেই বিষয়ে লিখতেও পারি। আমি তাকে নিরাশ করলাম। অন্য একজন প্রকাশক সেই ভাবনা নিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর বই লেখার জন্য বলল, কিন্তু নিজের বিষয় হলেও পাঠ্যপুস্তকের কথা মনে হতেই কলম এগোতে চাইল না।

শ্রীজগদীশচন্দ্র শাস্ত্রী আমার অনেকদিনের পরিচিত ছিলেন। তখন তিনি কালিম্পঙের মিশন হাই স্কুলে পড়াতেন। কিশোরী ভাই-এর ভায়রাভাই বলেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। বোম্বেতেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং এখন বিকানিরে শার্দুল পাবলিক স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাজপুতানা ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি-র জন্য গবেষণা করায় আমাকে সুপারভাইজার হতে বলেন। আমি রাজি হয়ে যাই। তিনি কিছুটা সময় তাতে দিয়েছিলেন কিন্তু এর জন্য যতখানি নিষ্ঠা দরকার তা দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। যে-কারণে কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। ৬ মে সে-কাজে তিনি মুসৌরী এলেন।

মে মাসে বন্ধুদের আসার প্রসঙ্গে চিঠি পাওয়া শুরু হয়। ধূপনাথজী না আসার ব্যাপারে লিখতে গিয়ে জানিয়েছিলেন—এখন অতরসন গ্রামে রেশন দোকান খুলে গেছে। শস্যের ব্যাপারে ছাপরা অনেকদিন থেকেই স্বাবলম্বী নয়। ভারত যেখানে এত ভাল একটা কৃষির দেশ, সেখানে এরকম জেলা নেই বললেই চলে। ছাপরার প্রচুর লোক দেশের অন্য শহরে গিয়ে রোজগার করে। হাজার হাজার লোক বিহারের কম আবাদ হয় এমন জেলায় গিয়ে চাষবাস শুরু করে দিয়েছে।

১৫ মে ঠাকুরানী গুলাবকুমারী এলেন। গত বছর তিনি পুরো রাজকীয় কায়দায় এসে স্টেপল্টন হোটেলে উঠেছিলেন। নিজের বাড়ি ছিল, সঙ্গে প্রায় আধ ডজন ঝি-চাকর আর মোসাহেব ছিল। এবার শুধু একজন চাকর এবং একটি মেয়ের সঙ্গে এসেছিলেন। নতুন ভারতে দেশীয় রাজ্য আর সেখানকার জায়গীরদারদের ওপর যে প্রভাব পড়ছিল তারই উদাহরণ ছিল এটা। যে সামন্ত 'তে তে পাঁও পসারিয়ে, জেতী লাঁবী সৌর'[১] এই বাক্যটি তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে সে তত ভাল থাকবে।

নির্বাচনের আগে পিছিয়ে থাকা জাতিদের মধ্যে কিছুটা ক্রোধ দেখা দিয়েছিল, বিশেষ করে বিহার আর উত্তর-প্রদেশে তারা বড় জাতদের শাসনে বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহ করার কথা বলছিল। ছুৎ-অছুৎ দু-রকমের পশ্চাৎপদ জাতি নিয়ে লোকসংখ্যার ৭০-৮০ শতাংশ। তারা সচেতন হয়ে গেলে এটা নিশ্চিত যে গণতন্ত্রে 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়'-র প্রভুত্ব থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু

[১] 'ততটাই পা ছড়াও যতটা লম্বা চাদর।'—স.ম.

উচু জাতি বা তার মধ্যেও মুষ্টিমেয় কিছু সামন্ত তাদের সংখ্যার বলে হাজার বছর ধরে দেশের সমস্ত বৈভবের প্রভু হয়ে, এই শোষিত ও পীড়িতদের হাতিয়ার করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে এসেছে। কংগ্রেসের 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় -লালা'রা পঞ্চায়েতের নির্বাচন হওয়ার সময় ঘাবড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সে-সময় তারা ভুলে গিয়েছিল যে, শত্রুর শক্তির মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দিয়ে শত্রুকে বিতাড়িত করা যায়। ভোটের সময় তারা এই রকমই করল। শোষিত নেতাদের মধ্যে যাকে দেখল বেশি প্রভাবশালী তাকে কংগ্রেসের টিকিট দিয়ে দিল। তারা জোড়াবলদের জয়ধ্বনি দিতে লাগল। ভোটের পর দু-চারজনকে পার্লামেন্টের সেক্রেটারি করে দেওয়াতেই তাদের কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল।

তৃতীয় সপ্তাহে শ্রীধূপনাথ সিংহ এসে পড়লেন। এখন আমাদের বাড়িতে বেশ উৎফুল্লতা ছিল। ধূপনাথজীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তিরিশ বছরের বেশি সময়ের, যার উল্লেখ জীবন-যাত্রার জায়গায় জায়গায় রয়েছে। তাঁর সততার সঙ্গে সরলতা তো সোনায় সোহাগা।

আমি মনে করতাম যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোক বুদ্ধির কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয় কিন্তু অভিজ্ঞতা জানাল দুর্যোধনের নামে বিখ্যাত বাক্যই ঠিক—'জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম ন চ মে নিবৃত্তিঃ।' বুদ্ধির মূল্য জানার পরও যদি তার অভিমতকে মানুষ অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত হয় তাহলে এই সার কথায় পৌঁছে যেতে হয়। বুদ্ধি যখন চুপি চুপি কানে কিছু বলতে যায় তখনই মাথায় ঝটকা লাগে আর মানুষ বুদ্ধিকে নিরাশ করে অন্যদিকে দৌড়ে যায়। পৃথিবীতে সকল মানুষের মধ্যে শুধু গুণ থাকতে পারে না। কিছু দোষও থাকে। যদি তার দোষই শুধু দেখা হয় তাহলে মানুষের জীবন-যাত্রা কঠিন হয়ে পড়বে। নিজের বন্ধুর সংখ্যা বাড়ানোটা দরকার। যদি অল্প-স্বল্প দোষের জন্য 'অয়ং ন অয়ং ন' বলে সবাইকে প্রত্যাখান করে দেওয়া হয় তাহলে মানুষ একলা হয়ে যাবে। কিন্তু কাউকে তো হাত ধরে রাস্তায় হাঁটানো যায় না। সমাজের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মানুষের অনেক ব্যাপার তার নিজের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধাক্কা খেয়ে সে নিজেই নিজেকে সামলে নেয়।

দেশীয় রাজ্যগুলো মিশে গেল। ওখানকার রাজা আর সামন্তদের কয়েকশো বছর নয়—কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসা জীবনের সমাপ্তি আসন্ন। তাদের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদেরই নয়, সেই সঙ্গে অন্য পাঠকদের কাছেও সামন্ত-যুগ সম্বন্ধে জানার সমস্ত উপায় বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কতদিন থেকে মনে হচ্ছিল যে সামন্ত-জীবন নিয়ে লেখা দরকার। আমার বন্ধুদের কয়েক বছর ধরে বলে আসছিলাম। প্রেরণা দেবার লোক তো পেলাম কিন্তু করার লোক কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি ভাবলাম, এটা আমাকেই করতে হবে। ২৬ মে 'রাজস্থানী রনিবাস' লেখায় হাত দিলাম, যা আসলে আমাদের সামনে সদ্য শেষ হয়ে যাওয়া সমাজের কাল্পনিক চিত্র নয়, বাস্তব চিত্র।

৩০ মে সাহিত্যাচার্য শ্রীবলভদ্র ঠাকুর এলেন। চা খাওয়ার সময় দোকানে তাঁর পোর্টফোলিও ফেলে এসেছিলেন, ফিরে যাওয়ায় তা পাওয়া গেল। পাহাড়ের বিশ্বস্ততার ওপর তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। কোনো সময় পাহাড়ে অবশ্যই বিশ্বস্ততার রাজ্য ছিল কিন্তু যেদিন থেকে জীবন-সংঘর্ষ বাড়ল, উপযুক্ত শ্রম করার পর উদরপূর্তির কোনো নিশ্চয়তা থাকল না, সেদিন থেকে পাহাড়ীরাও সমতলের পথ ধরল।

৩১ মে পরীক্ষার ফল বেরোল। কমলা এফ এ পাস করে গেল। একটা বিষয় ছেড়ে দেওয়ার জন্য এখন অনুতাপ করছিল।

এবার প্রচুর ভ্রমণার্থী দেখা যাচ্ছিল। আমাদের দেশে আধুনিকতা এখন অসূর্যম্পশ্যাদের কাছ অব্দি ছড়িয়ে পড়েছে। বরং বলা ভাল, ভোগের সমস্ত উপায় সুলভ হওয়ায় তাদের মধ্যে আধুনিকতা জোরদারভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি ছিল। রাজস্থানের রানী আর রাজকুমারীরা নিজেদের রাজধানীতে যতই অসূর্যম্পশ্যা হোক, যতই কালো কাঁচ লাগানো বন্ধ মোটরে তাঁদের বাইরে যেতে হোক কিন্তু মুসৌরীর ম্যালে তাদের দেখে কেউ বলতে পারবে না যে তারা পর্দানশীন রানী। এক যুবতী রানী, যার চুল কাটা হয়ে গেছে, তাকে কখনো কখনো খালি মাথায় পাতলুন-প্যান্ট পরে ঘুরতে দেখা যেত, আবার কখনো ঘাঘরা, লুঙ্গি পরে দেখা যেত। তার নিজের রাজস্থানী মামাবাড়ির ও ইউরোপিয়ান সাজসজ্জার অহংকার রয়েছে।

২ জুন পৃথ্বীরাজ ও রাজকাপুরের নাম শুনে আমি 'আওয়ারা' ফিল্ম দেখতে গেলাম। এখনো বিদেশে তার খ্যাতি হয় নি, তবু আমি লিখেছিলাম—এতদিন অব্দি দেখা ভারতীয় ফিল্মের মধ্যে নিঃসন্দেহে ভাল। সব দিক দিয়েই ভাল বলতে হবে।' বেশির ভাগ ফিল্ম দেখে আমাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়, এই জন্যেও 'আওয়ারা' দেখে তৃপ্তি হলো। ফেরার সময় বৃষ্টি আর শিল পড়ছিল। বৃষ্টির চোটে আমরা ভিজে গেলাম। স্ট্যান্ডার্ডের কাছে রিক্সা নিলাম। গান্ধীচক আসতে আসতে রিকশাওলাও সপসপে হয়ে গেল। তার পক্ষে যাওয়া আর সম্ভব হলো না। মিত্তলজীর স্টোরে পৌছলাম। চা খাইয়েই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, রাতের খাবারও খাওয়ালেন। সাড়ে দশটার সময় ওখান থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। এগারোটার পর ঘরে পৌছলাম।

জুন মাসে বিকানির থেকে 'রুস মেঁ পচ্চীস মাস'-এর প্রুফ আসতে শুরু করল। বই লিখতে আমার যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ হয় তার প্রুফ দেখতে। বই লেখাকে ধরা যায় গর্ভে আসা আর প্রকাশিত হওয়াটা জন্ম নেওয়া। মানুষ এর থেকে তার পরিশ্রম বুঝতে পারে।

৯ জুন স্বামী সত্যস্বরূপজী এলেন। আমাদের কাছে এখন থাকার জায়গার সমস্যা ছিল। আসলে একটাই তো লম্বা মতো ঘর যাকে ভাগ করে আমরা দুটো বানিয়ে নিয়েছিলাম। অতিথিদের তাতে থাকার জন্য বলতে সংকোচবোধ হতো কিন্তু স্বামীজী আর বলভদ্রজী সেটা পছন্দ করলেন।

অতিথিতে ভরা সাধুদের মঠ আমি বহু বছর দেখেছি। তাদের সহজীবন এবং সাধুসেবা আমার সবসময় খুব ভাল লাগত। অতিথিদের সমাগম আর তাদের সেবা আমার কাছে লোভনীয় ব্যাপার। কিন্তু এখানে দেখছিলাম নিজে বাড়ি নেওয়া সত্ত্বেও তাদের থাকার জন্য স্থান দেওয়া সম্ভব ছিল না। ধুপনাথজী এক মাস থাকার পর ১০ জুন গেলেন। গরমে তার কাজের ছুটি থাকে কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হতেই চাষের কাজ দেখতে হয়। তিনি ছাপরায় নিজের গ্রাম অতরসনে না থেকে ভাগলপুরে চাষবাস করেন। কাজে তাঁর মনও বসে যায় আর সেই সঙ্গে জীবিকার চিন্তাও থাকে না।

ড· কিরণকুমারী গুপ্ত তাঁর ভাইপো প্রফেসর প্রতাপের সঙ্গে এলেন। তিনি এবং আমিও ভেবেছিলাম যে সাহিত্য সংক্রান্ত কিছু কাজ হবে। বিশেষ করে তিনি 'অগ্রবাল বিবাহ-প্রথা'

লেখার যে-কাজটি হাতে নিয়েছিলেন এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় কয়েকশো গীত সংগ্রহ করেছিলেন সেজন্য আজ আমি সহযোগিতা করতে উৎসুক ছিলাম কিন্তু আসার দিনই প্রফেসর প্রতাপের ভীষণ জ্বর এলো। যদি পাহাড়ে এসে নিজের বা নিজের সাথীর অসুস্থতার মুখোমুখি হতে হয় তাহলে সমস্ত মজা নষ্ট হয়ে যায়। তখন আবার নীচে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয়। কেননা সেখানে চিকিৎসা আর শুশ্রুষার বেশি সুবিধে রয়েছে।

১১ জুন শ্রীগয়াপ্রসাদ শুক্লজী, প্রিন্সিপ্যাল কালীপ্রসাদ ভাটনগরের স্ত্রীর সঙ্গে এলেন। প্রিন্সিপ্যাল ভাটনগর আমাদের প্রদেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ তথা এখানকার সবচেয়ে বড় কানপুর ডি এ ভি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন (এই পঙ্ক্তিগুলো লেখার সময় তিনি আগ্রা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর)। প্রিন্সিপ্যাল ভাটনগর উদার চিন্তাধারার আর্যসমাজী, যার অর্থ হলো, ধর্মের অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে মাথা ঘামান থেকে মস্তিষ্ককে পৃথক রাখা। কিন্তু তাঁর এই অভাবকে তাঁর স্ত্রী পূরণ করে দেন। তিনি যোগ ও আত্মবাদ নিয়ে পড়ে থাকা মীরা। সতিাই তিনি মীরা, কারণ মাঝে মাঝেই তিনি কীর্তনে তন্ময় হয়ে যান। গুরুর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। ভাটনগর সাহেব সৌভাগ্যবশত এমন একটি সিদ্ধা নারী পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জানা যায়, 'ঘর কা জোগী জোগিড়া আন গাঁও কা সিদ্ধ' কথাটি চরিতার্থ হয়েছে। হাতে কিছু পেলে শ্রীমতী ভাটনগরের আরো বেশি পাওয়ার ইচ্ছে হয়। কানপুরে থাকাকালীন শিশু-শিক্ষার জন্য কিছুটা সময় দিতেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় বহু বছর ধরে পাহাড়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে-মধ্যে মুসৌরী চলে আসতেন। কলেজের ছুটির অধিকাংশ সময় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবও এখানেই কাটাতেন। ভাড়ার বাংলোতে থাকা তাঁর বারো বছরেরও বেশি হয়ে গেছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এদিকে শ্রীমতি ভাটনগর ভাবছিলেন যে নিজস্ব বাংলো থাকা দরকার, যেটাকে নিজের মনের মতো ফুল দিয়ে সাজানো যাবে, নিজের মনের মতো করে গড়ে তোলা যাবে। আমি আমাদের প্রতিবেশি বাংলো কিলডের দেখালাম। তাঁর খুব পছন্দ হলো। এমন বাংলো কানপুরে থাকলে শুধু মুখ দেখার জন্যই ২৫ হাজার টাকা দিতে হতো। অনেক সময় মনে হতো যে, কিলডের-এর মালকিন বোধ হয় তিনিই হবেন। ঝোঁকের মাথায় ভাল বা মন্দ যে কাজ-ই হোক, হয়ে যায়, পরে জিনিসের গুণই নয় দোষও চোখে পড়তে শুরু করে, তারপর সেই কাজ আর হয়ে ওঠে না। আমি ভেবেচিন্তেই বলছি, বাড়িটা না নিয়ে শ্রীমতী ভাটনগর ভালই করেছেন।

শ্রীভারতভূষণজীর এবছর বিয়ে হয়েছে। সে-সময় মাস্টার বিশ্বম্ভরদয়ালজীও এখানেই ছিলেন। বিয়ে হয়ে সদ্য-সদ্য বউ এসেছিল। ১২ জুন আমরাও সেখানে গেলাম। মুসৌরীতে উপস্থিত অনেক বন্ধু-বান্ধব চা-পার্টিতে এসেছিলেন। বৌ গ্র্যাজুয়েট ছিল, যা আজকালকার যুগে কোনো অসাধারণ ব্যাপার নয়। মাস্টার বিশ্বম্ভরদয়ালও খুশি।

নতুন দেখা করতে আসা লোকের মধ্যে ১৩ জুন প্রয়াগের ঠাকুর কপিলদেব ব্যাস এলেন। তিনি মুসৌরীতে নতুন ছিলেন না। আমি আসার আগে অনেক বছর পর্যন্ত তো আমাদের ওপরের বাড়ির পাশে '**হর্নলি**' তে তিনি থাকতেন। তিনি প্রয়াগের মালব্য হওয়ায় ডাক্তার হোন

[1] *উল্লিখিত লোকোক্তিটির আক্ষরিক অর্থ---ঘরের যোগী যোগী নয়, অন্য গ্রামের যোগীই সিদ্ধ যোগী। —স.ম.*

বা উকিল হোন, সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে তাঁর কিছুটা আগ্রহ থাকে। ব্যাসজী প্রতিবছর আসতেন। হর্নলি-তে উঠতেন না। তবে যেখানেই উঠুন আমার এখানে দর্শন দেওয়ার অনুগ্রহ অবশ্যই করতেন।

১৫ জুন স্বামী সত্যস্বরূপজীর সঙ্গে পেটলাদ (গুজরাট)-এর ৭০ বছরের এক শেঠ এলেন। তিনি তীর্থব্রত এবং পরোপকারে অনেক অর্থ খরচ করেন। বিদ্যার প্রতিও তাঁর অনুরাগ রয়েছে। কথাবার্তা হওয়ায় আমি পরামর্শ দিলাম যে, দান-পুণ্যের ক্ষেত্রে সাধুদের আশ্রমই শুধু নয় উপরন্তু সাহিত্যিকদের আশ্রমের কথাও মনে রাখা উচিত। আমার মনে হচ্ছিল কিলডের কিনে তাকে সাহিত্যিকদের আশ্রম বানিয়ে দেওয়া হোক। এটা বলতে আমার ক্ষতি কি ছিল, যদিও আমি জানতাম যে, কানে কথা ফেলা আর তাতে হুঁ-হুঁ করার মানে এই নয় যে সেই কাজটা হবেই।

এখান থেকে ১০ এপ্রিলই শিবকুমার ঘুরতে বেরোলেন। আড়াই মাস পরে ২০ জুন তিনি যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারবদ্রী হয়ে ফিরে এলেন। তাঁর যাত্রার বিবরণ তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে শোনাচ্ছিলেন। যদিও সেগুলো সরু সরু পাকদণ্ডী তবু ভবঘুরে জীবনের অ আ ক খ শেখার জন্য সমতলের রেলযাত্রার চেয়ে তা অনেক বেশি উপযুক্ত। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, এমন সময় আমাদের দার্শনিক শ্রীরামচন্দ্র সিংহ এলেন। তিনি ভারতীয় দর্শন আর ধর্মনিরপেক্ষ দিব্য জীবনের প্রচারের খেয়াল নিয়ে ছিলেন। সমস্ত পরিকল্পনা, এমনকি সংস্থাও তাঁর টাকায় চলে। তা বাস্তবসম্মত না হোক কিন্তু শুদ্ধ, সরল আর অদ্ভুত ভ্রাম্যমাণ প্রতিভার হৃদয় থেকে যেভাবে কথা বেরিয়ে আসছিল তা কে না শুনতে চাইবে? সন্ধেয় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রজীও (বদরিপুর) এলেন। সত্যেন্দ্রজী আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তাঁরা এমন দম্পতি যাঁদের শ্রদ্ধা ও স্নেহ পাওয়ার ব্যাপারে আমরা দুজন একমত। এত বন্ধুর আগমনে আজকের শুক্রবার মহোৎসবের দিন মনে হচ্ছিল। শিবকুমারজী এবার মানস সরোবর যাওয়ার সংকল্প করছিলেন। বলভদ্রজীও সঙ্গ দেওয়ার কথা বলছিলেন।

ড· সত্যকেতুর বড়ছেলে শ্রীবিশ্বরঞ্জন এম এ ছেড়ে এল এল বি নিয়ে পড়ল। এই বছরে সে প্রথম শ্রেণীতে পাস করল। কিন্তু ওকালতি পরীক্ষা আসলে ইউনিভার্সিটিতে নয় কাছারিতে হয়, সেখানেই সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা এবং বড় জোর ১০ শতাংশ উকিল নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে সফল হয়।

পণ্ডিত হরনারায়ণ মিশ্র দেরাদুন থেকে এলেন। বৃদ্ধ সাহিত্যানুরাগী। পড়েছেন অনেক, মৌখিকভাবে তা ব্যবহারও করেছেন যথেষ্ট কিন্তু তাঁর কলম সবসময় আড়ষ্ট থেকেছে। তাঁর ফারসী জ্ঞান দেখে আমি বললাম, 'আপনি একটি 'পারসী কাব্যধারা' লিখে ফেলুন।' প্রথমে ইতস্তত করলেন। কিন্তু আমি যখন বললাম, 'আমিও আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত,' তখন তিনি সেই কাজটি হাতে নিলেন। কয়েক মাস পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছিল যে হিন্দির এই অভাব পূর্ণ হয়ে যাবে, বিশ্বের এক উন্নত সাহিত্যকীর্তি হিন্দিতে আসবে। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে মূলটিও দেবনাগরী অক্ষরে বাঁ পৃষ্ঠায় রাখুন আর হিন্দি অনুবাদ তার পাশে ডান পৃষ্ঠায়। মিশ্রজী ডায়াবিটিসের পুরনো রোগী ছিলেন। এখন চোখেও তেমন দেখতে পাচ্ছিলেন না। মানুষজনকে দেখতে পেতেন। বই পড়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল, ফলে 'পারসী কাব্যধারা'-র চিন্তা

ছাড়তে হলো। কখনও কখনও মনে হতো ওটাও কি আমাকে করতে হবে? আমি 'সংস্কৃত কাব্যধারা' লেখার জন্য অন্য বন্ধুদের বলেছিলাম। যখন কেউ এগিয়ে এলো না তখন নিজেকেই তা করতে হলো। 'পালি কাব্যধারা' আর 'প্রাকৃত কাব্যধারা' সম্বন্ধেও অন্য বন্ধুদের বহু বছর ধরে বলে রেখেছি, এখনও কেউ সাড়া দিচ্ছে না। আগে ওই দুটো হয়ে যাক, তারপর 'পারসী কাব্যধারা'র দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে। জীবন চাই, কাজের অভাব নেই।

জুন মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ভাল ভাল আম আসতে লাগল। মুসৌরীতে সেগুলি দামী হলেও অত্যন্ত সুলভ। ২৫ জুন শ্রীপুরুষোত্তম কাপুর (কানপুর)-এর লক্ষ্ণৌ থেকে পাঠানো দশেরা আমের পার্শেল এলো। এই ঋতুতে অতিথিদের সঙ্গে আমের ভোজনোৎসব হওয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। অত্যন্ত ভালবাসা নিয়ে অ.গ্রসেবা করার পক্ষে সকাল দশটা আমার বেশি অনুকূল মনে হতো।

২৬ জুন গুজরাটের রানী বেরিয়া এলেন। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অবস্থায় সামন্তদের ধর্মের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখা দেয়। স্বামী সত্যস্বরূপ আর তাঁর গুরু স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ধর্মের প্রতি আমার নিরপেক্ষতাও ধর্মাচার্য ও ধার্মিকদের কাছে উপেক্ষার পাত্র হয় নি। রানী সাহেবার সামান্য পরিচয় পেয়ে ছিলাম। তাঁর নাতনি আমাদের বিহারের ডুমরাঁও-এর মহারাজার কন্যা ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই পঙ্গু, সব রকমের ওষুধ ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। এখন মহাত্মারা ভরসা। বৃদ্ধা শিক্ষিতা। গুজরাটের রাজবংশের রাজস্থানের রাজবংশের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, দুটির ভাষাও খুব কাছাকাছি। এজন্য গুজরাটের অন্তঃপুরে হিন্দির প্রবেশ কোনো অসাধারণ ঘটনা নয়। তিনি চা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস আমাদের এখানে কফি ছিল।

ঠাকুরানী গুলাবকুমারীও এখন আমাদের বাংলোতেই উঠেছিলেন। ল্যাডলির 'অর্টেন' সম্বন্ধেও কথাবার্তা হলো। বুড়ো ল্যাডলি এখনকার ভাড়া থেকে এক পয়সাও কম করতে রাজি হতেন না কিন্তু ভাড়াটে না প্যাওয়ার জন্য তিনি অর্টেন-এর অর্ধেকটা সাড়ে তিনশো টাকায় এক বছরের জন্য দিয়ে দিলেন। মুসৌরীর বাড়ি এক বছরের জন্যই দেওয়া হয়—সে আপনি বারো মাস থাকুন কিংবা দু মাস থাকুন।

৩০ জুন মাসের শেষ। সেই দিনই আমাদের দুই ভবঘুরে শিবশর্মা আর বলভদ্রজী পাণ্ডবদের পথে পা বাড়ানোর জন্য বেরিয়ে পড়লেন। পাণ্ডবরা অবশ্য তুষারশ্রেণীর পারে পৌঁছান নি, সেখানে আমাদের দুই তরুণ ভবঘুরে তার ওপারে কৈলাস-মানস সরোবর ধাওয়া করতে যাচ্ছিলেন। বুড়ো পালোয়ান আখড়ার ধারে বসে যেভাবে মার-প্যাঁচ শেখায় আমার কাছ থেকেও সেই রকমই প্রত্যাশা ছিল। আমি এ ব্যাপারে 'ঘুমক্কড় শাস্ত্র' লিখে ফেলেছি। আমার কথা অনুসারে দুই ভবঘুরে কোনো কুলির সাহায্য না নিয়ে নিজের শরীরের ভরসায় যাত্রা করা স্থির করেছিলেন। প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁরা ঝুলিতে ভরে নিজের পিঠে নিয়েছিলেন। শিবকুমারের পিঠে বোধ হয় ৩০ সেরের চেয়ে কম বোঝা ছিল না। ঠাকুর মশায়ের পক্ষে তার দুই-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট ছিল। যাত্রার প্রগতির জন্য পরে যাতে অপেক্ষা করতে না হয় সেজন্য এখানেই লিখে দিচ্ছি। দুজনে এখান থেকে পাহাড়ের পর পাহাড় পায়ে হেঁটে ধরাসু গিয়েছিলেন, যেটা তাঁরা হৃষিকেশ হয়ে মোটরেও যেতে পারতেন। উত্তর-কাশী, হর্সিল হয়ে ভারতের শেষ

গ্রাম নেলঙ্ পৌঁছলেন। কোনো এক সময়ে নেলঙ্কে তিব্বতের শেষ গ্রাম মনে করা হতো। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে আরও ২০-২৫ মাইল এদিকে যে জঙ্গল, তাতেও তিব্বতবাসীদের অধিকার ছিল। যেরকম শান্তিপূর্ণ রীতিতে কমিউনিস্টরা তিব্বতে চলে এসেছিল তেমনি শান্তিপূর্ণ রীতিতে আমাদের সীমাও নেলঙ এবং তার পরের উপত্যকা অব্দি পৌঁছে গিয়েছিল। কমিউনিজমের পোকা ওইদিক থেকে যাতে ভারতের দিকে না আসে সেজন্য সরকার ওখানে পুলিস বসিয়ে দিয়েছিল। দুই ভবঘুরেকে সেখানে আটকে দেওয়া হলো এবং বেতারে কথাবার্তা হতে লাগল, এই ভেবে যে, যদি কর্মকর্তাদের অনুকূল সম্মতি পাওয়া যায় তাহলে সামনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে। তাঁরা সম্ভবত এক সপ্তাহ ওখানেই থেমে থাকলেন, কোনো জবাব এলো না। যদি চাইতেন তাহলে দুজনই কোনো মিনিস্টারের চিঠি নিতে পারতেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকমটা হতে দেখা যায় নি। নিরাশ হয়ে শিবকুমার ঠিক করলেন—এরা আমাদের বেড়ি-হাতকড়া দিয়ে তো বন্দী করে রাখে নি, কাজেই রাত্রে আমরা পালিয়ে যাব। এটা সমতল বা আমাদের পাহাড়ী এলাকা ছিল না, যেখানে পাকদণ্ডী ধরে কয়েক মাইল গেলেই অন্য কোনো গ্রাম পাওয়া যাবে। কুড়ি মাইল ধরে এখানে না কোনো গ্রাম ছিল, না ছিল পাহাড়ের ওপর বৃক্ষ-বনস্পতি। ঘুরতে ঘুরতে লোক যে কোথায় গিয়ে পড়বে তারও ঠিক ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে মানসসরোবর হয়ে আসা এক তরুণ সাধুকে তারা পেয়ে গেল, তারও পুলিসের কারণে গতিরুদ্ধ হয়েছিল। সে যে সঠিকভাবে পথ-প্রদর্শন করবে এরও কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কেননা একবার ঘুরে আসা লোক বড়জোর বিরতি-স্থল রয়েছে এমন গোলিঙ বা অন্য কোনো গ্রামের ঠিকানা জানতে পারেন, কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর আগে নির্জন জায়গায় অন্য পাকদণ্ডী পেয়ে যেতে পারেন যা গ্রামের দিকে নয়—তাদের নিয়ে যাবে কোনো চারণক্ষেত্রের দিকে। পথে লোকের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। আর পেলেও দুজনের মধ্যে কারুরই তিব্বতী ভাষা জানা থাকত না। তবু তাঁরা সাহস করে, অর্ধেক রাতের পর একদিম বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন। এটা জানাই ছিল যে কনস্টেবল যদি আসতে চাইতও তবু ততক্ষণে তাঁরা ১৫-১৬ মাইল দূরে চলে যেতেন। সেরকমই হলো। শিবকুমার থোলিঙ গেলেন, কৈলাশ দেখলেন, মানসসরোবরও পরিক্রমা করলেন। পুরঙ্ (তকলাখর) পৌঁছলেন, তারপর তাঁরা কমিউনিস্ট সৈনিক দেখতে পেলেন। বলছিলেন যে ওখানে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ ছিল না। কমিউনিস্ট সৈনিকরা খুব খাতির করে তাঁদের চা খাওয়াল এবং তাঁরা রীতিমত প্রভাবিত হয়ে সেখান থেকে ফিরলেন।

দু-বছর থাকার পর এখন হর্নক্লিফ-এর দোষও বোঝা যেতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম খামোকা আমি এই বাংলোর পিছনে ২০ হাজারের বেশি টাকা খরচ করেছি। অর্টেন-এর মতো কোনো বাংলো বছরে চার-পাঁচশো টাকায় পেয়ে যেতাম। মন বলল, যদি বিক্রি হয়ে যায়, তো তাই করি। বাড়ির থামে বাঁধা পড়ায় এই প্রথম খুব দুশ্চিন্তা হলো।

২ জুলাই দিল্লীর জামিয়া মিলিয়ার কয়েকটি ছোট ছেলে তাদের দুজন শিক্ষকের সঙ্গে এলো। কয়েকটি ছেলে ছিল লাসার মুসলমান। সেখানকার আমার পরিচিতদের তারা জানত। তিব্বতী ভাষা বলাতে তারা বেশি ঘনিষ্ঠতা অনুভব করল। লাসার মুসলমানরা সব জায়গায় প্রাচীন মতাবলম্বী মুসলমানদের মতো ধর্মের ব্যাপারে খুব কট্টর। বৌদ্ধ মেয়েকে বিয়ে করার জন্য সর্বদা

উৎসুক থাকে, কিন্তু সাধ্য কি যে কোনো বৌদ্ধ তাদের মেয়েকে নিয়ে যায়? তাদের কাছে বৌদ্ধধর্ম ও বিহার এবং তার সাহিত্য বিধর্মীদের জিনিস কিন্তু ওখানে তাদের সংখ্যা খুব সামান্য। তারা চায়, আমাদের ছেলে খাঁটি মুসলমান হোক, এর জন্য উপযুক্ত সংস্থা হতে পারত দেববন্দ। সেখানে আরবী ভাষা আর ইসলামী দর্শনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হয়। কিন্তু লাসার মুসলমানরা ব্যবসায়ী, তাদের ভারতে আসতে-যেতে হতো। ইংরেজির গুরুত্ব বোঝে, সেজন্য তাদের ছেলেদের তারা জামিয়া মিলিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিল। ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন এখন বোঝার ক্ষমতাও রাখত। একটি ছেলে নিবিষ্টচিত্তে সামনে টাঙানো মাও-সে-তুং-এর ছবি দেখছিল। মার্কস এবং লেনিনের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। কিন্তু এটা জানত যে এখন লাসার রাস্তায় অধ্যক্ষ মাও-এর জয়ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে। আমি বললাম, 'আরবী শিক্ষা তোমাদের কাছে ধর্মীয় ব্যবহারের জিনিস, কিন্তু নতুন তিব্বতে উর্দু আর ইংরেজির ততটা ব্যবহার নেই যতটা রয়েছে তিব্বতী ভাষার।' সেখানকার সমস্ত কাজ হচ্ছে তিব্বতী ভাষাতে এটা তারা জানত। কিন্তু এখনো তাদের বাবারা ছিল পুরনো যুগের লোক।

'রাজস্থানী রনিবাস'-এর বিষয়ে আমার কলম নিয়মিত চলছিল। সে সম্বন্ধে যা লিখছিলাম তা আবার দেখেও নিচ্ছিলাম।

বাড়ি নেওয়ার সময় আমি একটা ভুল করেছিলাম।বাড়িটাআমি নিজের নামে নিয়েছিলাম। যদিও আমি জানতাম যে, বাড়ির মালিক কমলা। এখন সেই ভুল সংশোধন করা দরকাব ছিল। ৩১ জুলাই আমার খুব আনন্দ হলো যখন শ্রীবিশ্বরঞ্জনজীর সহযোগিতায় কমলার নামে দানপত্র রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। দু-তিনশো টাকা বরবাদ হলো। বাংলোর পিছনে তো কত হাজার টাকা বরবাদ করেছি।

রেজিস্ট্রির পরে আমি বাজার থেকে ফিরছিলাম। পথে কমলাকে দেখলাম দেরাদুন থেকে ফিরছে। বলছিল, গরমের চোটে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। খুব কষ্টে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত নিজেকে সামলে আনল, সেখানে বমি হয়ে গেল।

'নেপাল' লেখার জন্য মন ছটফট করছিল। কমলা তার সঙ্গে পার্সিবেল লেন্ডন-এর 'নেপাল'-এর দুটি খণ্ড নিয়ে এসেছিল। আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম এবার 'নেপাল'-এ হাত দিতেই হবে এবং সেই সঙ্গে জানুয়ারি ১৯৫৩-তে নেপাল-যাত্রাও করতে হবে।

৫ জুলাই 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য'-র প্রথম প্রুফ এলো। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—' 'কুফ্র টুটা খুদা খুদা করকে।'[১] ১৬-১৭ বছর পর এই গ্রন্থের এবং আমার ভাগ্য খুলে গেল।

বোধহয় সেদিনই বেনারস থেকে এক তরুণ গল্পকারের একটি দুঃখজনক চিঠি পেলাম। তার খান পঞ্চাশ গল্প পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেছে। পাঠক তাকে পছন্দ করতো। তার নিজের এবং তার আত্মীয়দের ছোটমতো পরিবার চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ যদি আধপেটা খেত তাহলে কালকের খাওয়ার চিন্তা মনকে নীরস করে তুলতো। ভদ্রবাড়ির ছেলে বলে তার সঙ্গেই 'সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির মরণাদতিরিচ্যতে'। অসম্মানের জীবন নিয়ে বাঁচা সে কী ভাবে মেনে নেয়? গল্পের জন্য কোনো প্রকাশক টাকা দিতে রাজি ছিল না। প্রকাশক তখনই কোনো

---

[১] *এই প্রবাদটির ভাবার্থ—অকূলে কূল পেলাম। —স·ম·*

বই প্রকাশ করতে রাজি হবে যখন সে বিশ্বাস করবে যে, এই বই বিক্রি হবে। নতুন লেখকের ওপর তারা কি করে বিশ্বাস রাখবে? আমার সুপারিশ যে প্রকাশ আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দেবে এটা আমি জানতামই, তবু তরুণ স্বধর্মীকে হতাশাপূর্ণ চিঠি লেখা ঠিক নয়।

৯ জুলাই পাটনা থেকে বীরেন্দ্রজী আমের পার্শেল পাঠালেন। মাত্র চার-পাঁচটা আম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবে আমগুলো ততটা মিষ্টি ছিল না। সেদিন উত্তরকাশী থেকে ৪ জুলাই লেখা বলভদ্রজীর চিঠিও পেলাম, যা থেকে জানতে পারলাম যে তাঁরা গঙ্গোত্রীর দিকে রওনা হবেন। তাতে শিবকুমারজীর কথা না থাকায় আমি এটাই ধরে নিলাম যে তাঁদের দুজনের বোধহয় মনের মিল হয় নি। পরের দিন শিবকুমারজীর চিঠি এলো। তিনি একদিন আগে লিখেছিলেন। জানতে পারলাম, ধরাসু পৌঁছতে তাঁর চারদিন লেগেছে। সময়টা সত্যিই বেশি লেগেছিল। আমি একদিন আর দু-ঘণ্টায় উত্তরকাশী থেকে মুসৌরী পৌঁছেছিলাম, শিবকুমার বোঝাও বেশি বইতে পারতেন এবং হাঁটার ব্যাপারেও তাঁর পা ছিল সতেজ। মৈথিলী পণ্ডিত পিঠে কখনো বোঝা ওঠান নি। শিবকুমারও অভ্যস্ত ছিলেন না। দুজনের শরীরে ফারাক ছিল। একটি জোয়ালে একটি তেজী আর একটি মন্থর-বলদ বেঁধে দেওয়া হলে তেজী বলদের যে হাল হয়, শিবকুমারেরও তাই হয়েছিল। তিনি হয়তো বিরক্ত হচ্ছিলেন যে, ঠাকুর মশায়ও আমার পায়ে পা মিলিয়ে কেন চলছেন না?

গত বছর থেকে বর্ষার দিনে পায়ের তলায় লাল লাল দাগের মতো বেরোচ্ছিল। আমার খেতে কাজ করার রোজকার নিয়ম চলে আসছিল। বর্ষার দিনে অনেক ছোট ছোট পোকা হতো যেগুলো কামড়ালে এই লাল দাগ বেরিয়ে যেত। যদি চুলকোতাম তাহলে পেকে যেত, আমি তা করতাম না। ভয় হতো, এগুলো খুব বেড়ে না যায়। চুলকোতোও খুব। এর জন্য ৩১ জুলাই পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন নিলাম।

স্বামী সত্যস্বরূপজীও একবার দুই তরুণ ভবঘুরের পাল্লায় পড়ে ভেবেছিলেন, আমিও যাই। কিন্তু তাঁর মনোবাসনা বেশি জোরালো হয় নি। আগেই বলেছি যে তিনি ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে ন্যায়শাস্ত্রের বড় পণ্ডিত, সেই সঙ্গে গ্র্যাজুয়েট হওয়ায় আধুনিক বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। যে কোনো মানুষের অর্জিত শিক্ষার জ্ঞানের ফল পরবর্তী প্রজন্মকে দেওয়াটা আমি অনিবার্য বলে মনে করি। এটাকে প্রাচীন যুগে ঋষিঋণ থেকে ঋণমুক্ত হওয়া বলা হতো। আমি এদিকে সবসময় স্বামীজীকে জোর তাগাদা দিতে লাগলাম, 'আপনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি' হিন্দিতে অনুবাদ করুন। টীকা নয়, এমন অনুবাদ যাতে সেটাকে কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলে মনে হয়।' 'তত্ত্বচিন্তামণি' ন্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্য-ন্যায়ের বিধাতা। তাঁর চিহ্নিত পথেই আজকের বিদ্বানরা চলতে বাধ্য। 'তত্ত্বচিন্তামণি' দু-আড়াইশো পাতার গ্রন্থ, কিন্তু তার এক-একটি পঙ্‌ক্তিতে এক-এক পৃষ্ঠা নয়, এক-একটি পুস্তিকা সন্নিবিষ্ট আছে। সমগ্র গ্রন্থের দু-এক ডজন পাতা পড়ে লোকে আজ মহান নৈয়ামিক হয়ে যাচ্ছেন। সেই পাতাগুলি ছাড়া অনেকে পুরো গ্রন্থটি কখনো চোখেও দেখে নি। এই গ্রন্থে উক্ত মহান দার্শনিক দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনকে তার অবদানের সঙ্গে রেখে দিয়েছিলেন। এটা না জেনে আমাদের দর্শনের বিকাশ বোঝা যাবে না। আমিও এর কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়েছি। কঠিন গ্রন্থ, তা আমি জানি। কিন্তু ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ যদি অনুবাদ করতে যায়, তাহলে এই কাজ অসাধ্য নয়।

স্বামী সত্যস্বরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন, কাজটি করতে কয়েক বছর সময় লাগবে আর সেই সঙ্গে দেশের ন্যায়শাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিতদের কাছ থেকেও সাহায্য নিতে হবে। স্বামীজীর কাছে ভারতের চারপাশটা ঘুরে আসাটা মামুলি ব্যাপার। আমি বললাম, 'আগে প্রকরণ, উপপ্রকরণ ইত্যাদির সঙ্গে মূলের একটি শুদ্ধ কপি তৈরি করুন। আরও ভাল হবে যদি এই মূলটি ছাপা হয়। 'তত্ত্বচিন্তামণি' ছাপা এবং গ্রন্থ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া অনেক বছর হয়ে গেছে। তারপর সাধারণভাবে এর একটি অনুবাদ করুন। যেখানে বোঝার অসুবিধে রয়েছে সেখানে মূলই রেখে দিন। পুরোটা আরেকবার দেখে যতটা পরিষ্কার করা সম্ভব তা করুন। তারপর পণ্ডিতদের সাহায্যও নিন।' স্বামীজী চেষ্টা করে দেখলেন। অনেক মুদ্রিত বা অমুদ্রিত টীকা, অনুটীকা পাওয়া গেল যার মধ্যে কিছু হচ্ছে মূলের অনুসারী। যদি এই সবের সাহায্য নেওয়া যায় এবং পাঁচ-ছ বছর সময় ব্যয় করা যায়, তাহলে 'তত্ত্বচিন্তামণি'র অনুবাদ কেন হবে না? তবে হ্যাঁ, এর জন্য নিজের ওপর আর সেই সঙ্গে হিন্দির ওপরও বিশ্বাস থাকা দরকার। যদি কারুর মনে হয় যে, দর্শনের উচ্চগ্রন্থ সব সময় সংস্কৃতেই লোকে পড়তে থাকবে তাহলে সে এই কাজ করতে পারবে না। কিন্তু একটু ভাবলেই এই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে যে, সায়েন্সের উচ্চশিক্ষা, পাশ্চাত্যের হেগেল আর কান্টের উচ্চ দর্শন যদি হিন্দির মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয় তাহলে 'তত্ত্বচিন্তামণি' কেন লোকে হিন্দিতে পড়তে চাইবে না? কাউকে না কাউকে এই মহান গ্রন্থের অনুবাদ করতে হবে, তাহলে স্বামীজীই বা কেন করবেন না?

মজদুর সংঘে

লোকে শুধু শুধু কেন মিথ্যা বলে? একদিন একটি লোক মদ খেয়ে এল। মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছিল, চলন-বলনেও তার ছাপ ছিল। আমি কখনো মদ খাই নি আর এই রেকর্ড রাখতে চাই বলে তাতে কখনো হাত দিই নি। কিন্তু মদ খাওয়াকে আমি পাপ বলে মনে করি না, বা যে খায় তাকে কদাচারী ভাবি না। আসলে আমি ভাঙ তো আগে কখনো খেয়েছি, তাতেও নেশা হয়। বেশি খেলে লোকে বোধবুদ্ধিও হারিয়ে ফেলে। আমার চোখে মদ আর ভাঙে কোনো পার্থক্য নেই। যদি মাত্রার কথা বলা হয় তো দুটিরই একরকম। যদি কেউ সংযমী না হয় তাহলে তাকে করুণার পাত্র মনে করা উচিত, ঘৃণার পাত্র নয়। কিন্তু সেদিন সেই ব্যক্তি যখন দিব্যি গেলে বলতে শুরু করল, 'আমি মদ খাই নি', তখন আমার অবশ্যই খারাপ লাগল। আসলে গন্ধই তো পরিষ্কার পার্থক্য প্রকাশ করে দিচ্ছিল।

ভদন্ত বোধানন্দ মহাস্থবির ছিলেন প্রথম মানুষ যিনি কিছু কথা বলতে গিয়ে বৌদ্ধগ্রন্থের প্রাপ্তি-স্থানের খবর দিয়েছিলেন। তখন থেকে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে চলেছে। সে-সময় (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি) একমাত্র 'ধম্মপদ' ছাড়া আর কোনো বৌদ্ধগ্রন্থের হিন্দি অনুবাদ

ছিল না। হতে পারে স্বাধীনভাবে এমন কোনো গ্রন্থ লেখা হয় নি যাতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হতে পারে। বাংলাভাষী ও বৌদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁর কিছু সুবিধে ছিল। তিনি একটি বাংলা বৌদ্ধ মাসিক পত্রিকার ঠিকানাও আমাকে দিয়েছিলেন। বলা যায়, তিনিই আমাকে বৌদ্ধ-সাহিত্য ভাণ্ডারের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি 'নয়া-সমাজ'-এ তাঁর জীবনী সম্পর্কিত ছোটমতো একটি লেখা লিখেছি। লক্ষ্ণৌতে তাঁর নির্মিত বৌদ্ধ-বিহার (রিসালদার বাগ) আর তাঁর সংগৃহীত হাজার হাজার পুস্তক, আমি যখনই লক্ষ্ণৌ যাই দেখি। তখন তাঁর স্নেহময় মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর শিষ্য ভিক্ষু প্রজ্ঞানন্দ নিজের গুরুর বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের ভারই শুধু নেন নি, উপরন্তু তিনি সেখান থেকে বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনারও কাজ করছেন।

কিদবাই-পিল্লে—মিস্টার কিদবাই আই সি এস আমাদের প্রদেশের জেলা-জজ ছিলেন। তিনি হর্নক্লিফের কাছেই একটি বড় বাংলো (আরাম-হাউস) কিনেছেন, যা এখানকার অসাধারণ বাংলোগুলোর একটি। শুধু বাংলো আর তার কামরাগুলোই খুব বিশাল নয়, তাতে বাগান ছাড়াও সামনে-পিছনে যথেষ্ট লম্বা-চওড়া সমতল জমি আছে। এটা দেখে আমার মনে হয় যে, যখন আমাদের এখানে কমিউনিস্ট দেশের মতো বাচ্চাদের প্রতিপালনের দিকে নজর দেওয়া শুরু হবে তখন এটা তাদের পক্ষে উপযুক্ত স্থান হবে। এখানে তাদের ফুটবল, হকি, কাবাডি খেলার প্রচুর জায়গা আছে আর বাংলোর আশেপাশে এত বাগান আছে যা ফুল-ফলের খুব বড় খেত হতে পারে। যাক্ গে, সেটা তো ভবিষ্যৎ ভারতের কথা।

কিদবাই পেনসন পেয়ে বা হয়তো না পেয়েই মারা গেলেন। তিনি এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন যিনি গ্রীষ্ম-বর্ষায় সবসময় এখানে এসে থাকতেন। বাংলো মেরামত করা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে ছিল। তাঁর জামাইরাও বাংলোর দাবি নিয়ে আদালতে মামলা করেছিল। মোকদ্দমা চলল। এর জন্যেও তিনি টাকা খরচ করতে সংকোচ করতেন। কিদবাই সম্ভবত কোনো বড় সম্পত্তি রেখে যান নি। কিদবাই-এর এক মেয়ে পাকিস্তানে এবং এক ছেলে আসামে সরকারি চাকুরে ছিল। কেরলের শ্রীপিল্লে ছিলেন বড় ইঞ্জিনিয়ার। তিনিও এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর এক মেয়ের কিদবাই-এর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। দুজনই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তাই তারা একে অন্যকে বুঝতে পারত। দুই বেয়াই একবারই এ বছর এখানে এসেছিলেন। তার দু-এক বছর পর বেচারা মিসেস কিদবাই শীতে বেয়াই-এর কাছে প্রয়াগে গেলেন আর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হলো। ছেলে খরচ করে আসাম থেকে মুসৌরী আসার ফুরসৎ পেল না। ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার পিল্লে মালাবারের নায়ার অর্থাৎ ব্রহ্মক্ষত্র ছিলেন যাদের কাছে সংস্কৃত পড়াটা সাধারণ ব্যাপার। ওখানকার নাম্বুদরী ব্রাহ্মণরা শতকরা একশো জনই শিক্ষিত আর প্রায় সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ। বহু নায়ার নাম্বুদরীদের সন্তান হওয়ায় বাবার রক্তের সঙ্গে তাঁরা সংস্কৃত হজমের বড়ি পেয়ে যায়, এটা অতিশয়োক্তি নয়। পেনসনের পর পিল্লে সাহেব ইতিহাস-চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল যে, ভারতে কোল আর দ্রাবিড়দের সংমিশ্রণে আর্য সৃষ্টি হয়েছে। এখান থেকেই তারা পশ্চিম-ইউরোপের দিকে গেছে। মহেঞ্জোদড়োর 'মূক-লিপি' পড়ার চেষ্টা অনেক মহাপুরুষ করছেন, তাঁরা এর ওপরে লিখেওছেন কিন্তু পিল্লে

সাহেব এখনও লেখার ভাবনাই করে যাচ্ছেন। তিনিও লিপির পাঠোদ্ধারের কথা বলছিলেন আর এও বলছিলেন যে, মহেঞ্জোদড়ো থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের অখণ্ড পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হয় নি। তিনি তিন খণ্ডে বইটি লিখবেন মনস্থ করেছেন। যার মধ্যে একটি খণ্ড আমেরিকায় কোনো প্রকাশকের কাছে চলেও গেছে।

এই পাগলামির জন্য কিছু বলাটা আমাদের পক্ষে অর্থহীন ছিল। আমি বললাম, 'আপনি ইঞ্জিনিয়ার। পাশ্চাত্য বাস্তুকলার পণ্ডিত হয়ে আমাদের বাস্তুকলার ওপর কোনো বই কেন লেখেন না?' তিনি তাঁর লেখা একটি বই আমাকে দিলেন। কিন্তু শিশির লেহন করে কি জলের তৃষ্ণা মিটে?

নেলং থেকে শিবশর্মার চিঠি এলো। তাতে লিখেছিলেন যে 'পুলিস আমাদের আটকে রেখেছে।' এও জানা গেল যে, সেখানে তাঁরা বলেছেন, 'আমরা রাহুলজীর স্ত্রীকে দেখতে তিব্বত যাচ্ছি।' এটা শুধু মিথ্যাই ছিল না। উপরন্তু পুলিস যদি জানতে পেরে যায় যে আমার সঙ্গে হজরতের সম্পর্ক আছে তাহলে তাঁরা কখনোই সীমান্ত লঙ্ঘন করতে পারবেন না। বলভদ্রজীর চিঠি পরের দিন এলো। তিনি নেলং থেকে বাগৌরী ফিরে এসেছিলেন। ভাবছিলেন যে যদি কৈলাস না যেতে পারেন তাহলে কেদার-বদ্রী হয়ে ফিরে আসবেন। মুসৌরীতে আমাদের দিকে বৃষ্টি হয় ৮০ ইঞ্চির বেশি আর দেরাদুনের দিকে এক জায়গায় হয় ১২০ ইঞ্চি পর্যন্ত, যা সাধারণ বৃষ্টিপাত নয়। এই রকম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়াটা সাধারণ ব্যাপার।

২২ জুলাই রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। এই সময় খুব জোরে বিদ্যুৎ চমকাল। মনে হলো আমাদের ছাদটা মাটিতে ঢুকে যাবে। সেই সঙ্গে ঘরের আলোও নিভে গেল। পরের দিন জানা গেল, চার্লবিলের কাছে একটি দেবদারু গাছে বাজ পড়েছে। আমাদের বাংলো থেকেও সেই দেবদারু গাছ দেখা যেত। মনে হচ্ছিল পাণ্ডুবর্ণের কোনো দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে, যার মুণ্ডহীন লম্বা গলা, সামনে ছড়ানো দুই হাত হিটলারী সেলাম করছে।

২৪ জুলাই ভাইয়া এলেন। তিনি সেটা দেখে এসেছিলেন। বলছিলেন, তার টুকরো দূর-দূর অব্দি ছড়িয়ে রয়েছে।

২৯ তারিখে আমিও কৌতূহল মেটানোর জন্য সেখানে উপস্থিত হলাম। চার্লবিলের পিছনে এক বাংলোর কাছে দেবদারু গাছটি। একদা ইন্দ্র বৃত্রকে যেমন করেছিলেন তার মাথা তেমনি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনদিক দিয়ে তা ফেটে গিয়েছিল। আগুন কোথাও লাগে নি কিন্তু বাজ তারএকদিকের ছাল ছাড়িয়েমাটিতে ঢুকে গিয়েছিল। দেবদারু খুব লম্বা গাছ আর বাজ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু স্থানে ভূ-বিদ্যুতের সঙ্গে মিলন ঘটাতে চায়। পাহাড়ে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, বাজ সব সময় দেবদারুর ওপর পড়ে।

১৩ জুলাই ভাবীজী হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। দুটো বর্ষা তিনি সবসময় আনন্দে মাতিয়ে রেখেছিলেন। কথায়-কথায় ব্যঙ্গ করে মুষড়ে পড়া মনকেও আনন্দিত করে তোলার গুণ তাঁর ছিল। তাঁর তারুণ্য আরো নবতারুণ্যে পরিণত হতো যখন তিনি হাস্য-পরিহাস করতেন। হার্টের অসুখ তাঁর সমস্ত খুশি নিয়ে নিল। পরের দুটো গরমে তো মনেই হচ্ছিল না যে, ইনিই সেই জানকী দেবী। মুখ সবসময় বিবর্ণ হয়ে থাকত। কোনো জিনিস ভাল লাগত না। সিনেমা দেখা তাঁর খুব আগ্রহের ব্যাপার ছিল, এখন তার নাম শুনলেও ভয় পেতেন। কারু মৃত্যুর খবর

শোনানো মানে তাঁর হার্টের অসুখ তৈরি করা। মানুষের শরীর-যন্ত্র কি ভঙ্গুর এবং কোমল!

ড· সত্যকেতুর ছোট ছেলে অমিতাভর, যাকে আমি বাবা বলি, জন্মদিন ছিল ৩১ জুলাই। আমরা প্রায়ই এই বাবা আর তার বোন উষার জন্মদিনের পার্টিতে উপস্থিত থাকতাম। বাচ্চাদের একবার নিজের জন্মদিনের অভ্যেস হয়ে গেলে তার অভাব তাদের মনকে নাড়া দেয়, খুব আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকে। সে-সময় তারা তাদের শিশুবন্ধুদেরও ডাকে। বাবার পার্টি থেকে আমরা ড· কে এন গৈরোলার বাড়ি গেলাম।

১৯৪২-এর আন্দোলনে ড· গৈরোলা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সংঘর্ষের প্রধান নেতাদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। সংঘর্ষের সময়েই আমি তাঁর সম্বন্ধে জেনেছিলাম। এখানে এসে সাক্ষাৎ হলো। বাবার পার্টি থেকে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি মুসৌরীর মজদুর সংগঠনের একজন নেতা ছিলেন। আমি এখানে থাকতে শুরু করেছিলাম, তিনি গরমে কিছুদিনের জন্য আসতেন। তিনি জোর করলেন, 'আপনি শ্রমিক সভার সভাপতি হোন।' আমি এখন লেখার কাজ ছেড়ে অন্য কোনো কাজে হাত দিতে চাইছিলাম না, বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠনে লঘু মনে যুক্ত হওয়াটা আমি পছন্দ করতাম না। কিন্তু তিনি আমাকে বাধ্য করলেন।

৩ আগস্ট আমাকে শ্রমিকসভার সভাপতি নির্বাচিত করা হলো। খবরটি জানাতে সেদিনই সচিব আর সহসচিব আমার কাছে এলেন। সভায় ভারবাহক ও রিকশা-শ্রমিকরা ছিল। তারা কেউই এখানে বারোমাসের বাসিন্দা ছিল না। ভারবাহকরা অধিকাংশ ছিল নেপালী আর রিকশাওলারা গাড়োয়ালী। গাড়োয়ালী ভারবাহক এক মণের বেশি বোঝা তুলতে পারে না, সেখানে নেপালীদের কাছে দুমণ ভার-তোলাটা মামুলি ব্যাপার। অনেকে তিন মণেরও বেশি উঠিয়ে নিয়ে যায়। নেপালীরা মজুরি কম নিতেও রাজি ছিল, সেখানে গাড়োয়ালীরা তাদের কম বোঝা কম মজুরিতে নিয়ে যেতে পারত না। অনেক বছর ধরে প্রতিযোগিতা চলার পর ভারবহনের কাজ নেপালীদের হাতে চলে গেল এবং কাজ ভাগ হয়ে গেল। ভার বলতে শুধু ভ্রমণার্থীদের জিনিসপত্রই ছিল না, সেই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া আর ব্যবসার অন্যান্য জিনিসও তার মধ্যে ছিল। নেপালীদের মধ্যে অনেকে শীতেও এখানে থেকে যায়। শ্রমিকদের আসল নেতা তাদের মধ্যে সংগঠন তৈরি করার জন্য কখনো আসে নি। শ্রমিকদের সংগঠন একটি শক্তি, তাকে হস্তগত করতে অন্যেরা ছাড়বে কেন? আমার আগে তাদের সভার সভাপতি ছিলেন এখানকার এক লক্ষপতি হোটেল মালিক আর সচিব ছিলেন কয়েক লাখ লোকের প্রভু, তিনি এখানকার সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী। যাক্‌গে, আমি এক বছর দেখব ঠিক করেছি।

শ্রীটীকারাম কুঞ্জ হ্যাপিভ্যালি থানাতে পুলিসের রাইটার কনস্টেবল ছিলেন। তিনি যে সাহিত্য-অনুরাগী ছিলেন তা আমি আগেই বলেছি। সেই সঙ্গে তিনি খুব সরল ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। রোববারে তিনি বই আর পত্রিকা নিতে বা ফেরৎ দিতে অবশ্যই আসতেন। অন্যান্য দিনেও তার আগমন ঘটত।

১৭ আগস্ট জানতে পারলাম, এখান থেকে দেরাদুনে তাঁর বদলি হয়ে গেছে। চাকুরিজীবী লোক এক জায়গাতে কি করে থাকতে পারেন? তবু প্রিয় মানুষের বিচ্ছেদ তো খারাপ লাগেই। একবার চলে গেলে তারপর দৈবাৎ দেখা হওয়ার নদী-নৌকোর মতো সংযোগ কি আর ঘটে?

হৃষিকেশ থেকে একবার কুঞ্জজী এখানে দেখা করতে এলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দরের জন্য লা জার্নাল প্রেস 'গঢ়ওয়াল' প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। 'কুমায়ুঁ'ও তাঁর কাছে চলে গিয়েছিল। আমি মনে করছিলাম, এবার হিমালয়-সম্পর্কিত বইগুলোর প্রকাশনার জন্য চিন্তা থাকল না। এবং তারা বেশ পরিচ্ছন্নভাবে ছাপবে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জানতে পারলাম, দর সাহেব লা জার্নাল প্রেস থেকে সরে গেছেন। আমাদের এখানে পুঁজিবাদ শুরু হয়েছে ইউরোপের পরে। এইজন্য তাতে অনেক অপরিপক্কতা রয়েছে। সাধারণ যেসব ব্যবসায়িক সততা আর উদারতা ইউরোপীয়ানদের মধ্যে দেখা যায় এখানে তারও অভাব রয়েছে। লা জার্নালকে একটি ছোট প্রেস থেকে খুব বড় ও শিল্পগুণসম্পন্ন ছাপাখানায় পরিণত করার কৃতিত্ব হচ্ছে কৃষ্ণপ্রসাদজীর। যখন সেটা লাভের না হয়ে ক্ষতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং খুব নিষ্ঠা থাকলে তবেই তাকে চালান সম্ভব ছিল, তখন এই সমস্ত কাজ কৃষ্ণপ্রসাদজী করেছেন। প্রেসকে খুব বড় দেখার স্বপ্ন তাঁকে এটা বোঝার অবকাশ দেয় নি. যে, কোটিপতি-কুমীরদের হাতে একবার পড়লে আর রক্ষে নেই। এখন শেঠরা মনে করছে দর সাহেবকে রেখে লাভ নেই, যদিও পরে এটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কেননা দর সাহেব সরে যাওয়ার কিছুদিন পরই প্রেস তার পুরনো অর্জিত সুনাম হারিয়ে ফেলল। এটাই একমাত্র উদাহরণ নয়। মুরলীবাবু পাটনার ইংরেজি দৈনিক 'সার্চলাইট' রক্ত জল করে শুরু করেছিলেন এবং তাকে বড় করে ছিলেন। পরে পুঁজিপতি মালিকরা তাঁরও এই অবস্থা করেছে। আমার কাছে তো এটা আরও দুশ্চিন্তার ব্যাপার ছিল। 'কুমায়ুঁ'-কে মনোতে পাঞ্চ করে নতুন ব্যবস্থাপকরা ফিরিয়ে দিয়েছে। চিঠিতেও এত অভদ্রতার পরিচয় কোনো প্রকাশকের কাছ থেকে কখনো আমি পাই নি। দর সাহেব যদি থাকতেন তাহলে দার্জিলিং থেকে জম্মু-কাশ্মীরের সীমানা পর্যন্ত হিমালয়-সম্বন্ধীয় আমার লেখা বইগুলো এর আগেই প্রকাশিত হয়ে যেত। সে-সময় জম্মু-কাশ্মীর আর ভুটান-আসাম অংশের হিমালয়ের বিষয়ে আমার বই লিখে পুরো হিমালয়ের পরিচয় হিন্দি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা সত্যিই সম্ভব ছিল।

বইয়ের প্রকাশনার অসুবিধে দেখে মাথায় খেয়াল চাপল যে নিজেই প্রকাশক হয়ে যাই না কেন? অন্তত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে অসুবিধে কি?

১২ সেপ্টেম্বর শিবকুমার এসে পৌঁছলেন। তিনি নেলং-এর পথে থোলিং, কৈলাস-মানসসরোবর হয়ে গরব্যাঙ আর আলমোড়ার পথে তাঁর দিল্লী যাওয়ার সমস্ত কথা জানালেন। কিছুটা গুরুত্বের অভাব অবশ্যই ছিল কিন্তু এই তরুণের সাহসের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তিনি আরও কোনো যাত্রার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। আমি বললাম, 'আলমোড়া জেলার সীমানা দিয়ে ঢুকে সারা নেপাল হয়ে দার্জিলিঙে বেরিয়ে যাও।'

সেপ্টেম্বরের শেষে দ্বিতীয়বার ভ্রমণের মরশুম শুরু হয়ে যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর স্বামী সত্যদেবজী আর শ্রীমুকুন্দীলালজীর সঙ্গে দেখা হলো। স্বামীজীকে দেখলে আমার সবসময় তাঁর বেনারসের রূপ আর সরস্বতীতে প্রকাশিত তাঁর আনন্দদায়ক যাত্রা সম্বন্ধীয় লেখা মনে পড়ে। তাঁর যাত্রা সম্বন্ধীয় লেখা অজ্ঞাতসারে আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, এটা বললে অনুচিত হবে না। এইভাবে আমি তাঁর কাছে নিজেকে ঋণী মনে করি। কখনো দেখা হলে তাঁর কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হয়। বহু বছর ধরে তিনি দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত, কিন্তু গলার স্বরে এখনো সেই তেজ

আছে।

লেখা যদিও শুরু হয় ধীরে ধীরে কিন্তু তা হয় অভাব থেকেই। এর উদাহরণ আমার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিস্মৃত যাত্রী', যা এই বছরই (১৯৫৬) প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে আমি নরেন্দ্র যশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তারপর আমার মনে হতে লাগল যে এই রকম মহান ভবঘুরেকে নিয়ে কোনো উপন্যাস লেখা দরকার। উপন্যাস লেখার আগে ৩০ সেপ্টেম্বর আমি ভবঘুরে নরেন্দ্রকে নিয়ে একটি লেখা লিখলাম। আরও দুবছর লাগল তাকে উপন্যাসরূপে লিখে ফেলতে। 'রাজস্থানী রনিবাস'[১]-ও শুরু হয়েছে এইরকম অভাব থেকে। মুসৌরী আসার আগে কেউ যদি বলত যে আপনি এই বিষয়ের ওপর কখনো বই লিখবেন তাহলে আমি তা মানতে রাজি হতাম না। এখন সে-গ্রন্থ তৈরি হয়ে গিয়েছিল আর দিল্লীর 'হিন্দুস্তান' সাপ্তাহিক সেটি ধারাবাহিকভাবে বের করার জন্য লিখেছিল।

শ্রমিকসভার সভাপতি হয়েছি, তাই তার জন্য কিছু করাটাও দরকার ছিল। মজুরদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল যে, তাদের বর্ষায়-বৃষ্টিতে ভিজতে হয় এবং রিকশা রাখার জন্য কোনো জায়গা নেই। কয়েক জায়গায় টিনের ঘর বানানো দরকার ছিল। আমি দু-তিনজন লোককে নিয়ে তৎকালীন পৌরসভার মুখ্য অধিকর্তা তিওয়ারীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সরকার এখন মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে ভেঙে দিয়ে নিজের হাতে কর্তৃত্ব নিয়ে রেখেছিল, আর দেখাশোনার ভার দিয়েছিল একজন যোগ্য ডেপুটি কালেক্টারের হাতে। এমনিতে সর্বেসর্বা ছিলেন দেরাদুনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। মজুরদের অভিযোগ আমি পেশ করলাম। এও জানালাম যে, অমুক-অমুক জায়গায় রিকশা-শেড বানাতে হবে। আমাদের সচিব আর সহসচিবরাও কথার মাঝে মাঝে ব্যাপারগুলি জানাচ্ছিলেন। আমাকে সম্মান দেখাতে তাঁরা রাজি ছিলেন কেননা আমি ছিলাম বিখ্যাত লোক। কিন্তু যখন আমাদের সচিব আর সহসচিবদের তাঁরা মূর্খ বলে ফেললেন তখন আমার খুব খারাপ লাগল। আমার ভয় হলো যে, আমার সঙ্গীরাও কিছু জবাব না দিয়ে বসে। কিন্তু তারা খুব সংযমী আচরণ করল। আমলাতন্ত্রে এটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার যে সেখানে দাস আর প্রভু এই দুটিই শ্রেণী রয়েছে। নিজের ওপরের অফিসার বা সচিব হচ্ছে প্রভু। তার চরণধুলি নিজের মাথায় রাখাটা আমলারা নিজের ধর্ম বলে মনে করে। ইংরেজরা যখন থেকে চলে গেছে তখন থেকে তো সত্যিসত্যিই চরণধুলি নেওয়া শুরু হয়েছে। যারা প্রভু নয় এবং সমান শ্রেণীর লোকও নয় তারা সব দাস, তাদের সঙ্গে সেই রকমই ব্যবহার করা দরকার। এইসব মানুষরা সাধারণের সঙ্গে কিভাবে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে? বুঝতে পারছি এই সমস্ত পচা কাঠামো উপড়ে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

সাধারণত ভাইয়াজী অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত থাকতেন কিন্তু এবছর ভাবীজীর মানসিক অবস্থার জন্য থাকতে ইচ্ছে হলো না। তিনি ২৩ সেপ্টেম্বরই এখান থেকে অমৃতসর চলে গেলেন। সেদিন আমি বিদায় দিতে গিয়েছিলাম। শংকরাচার্যর শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। জোশীমঠের শংকরাচার্য এবারের বর্ষাবাসে এখানেই থেকেছেন। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শুধু জ্ঞানই নয় অজ্ঞানেরও বিস্তার ঘটে, আলোর নয় মূঢ়তারও প্রসার ঘটে। শিক্ষার স্তর উচু হওয়ার

[১] মূলগ্রন্থে ভুলবশত এই বইটির নাম 'রাজস্থানী নিবাস' ছাপা হয়েছে।—স·ম·

সঙ্গে সঙ্গে এটা দরকার হয়ে পড়ে। আমার জানা আছে, যখন আমি প্রথমবার ভবঘুরে হয়ে বেরিয়ে মুরাদাবাদ পৌঁছেছিলাম তখন সেখানে পাঠকজীর ছেলে আমার সঙ্গী দেহাতী. অশিক্ষিত সাধুকে খুব তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেছিল আর তাকে শাসিয়ে-ধমকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ সে-ই আবাব কোনো আধুনিক শিক্ষিত সাধুর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে প্রস্তুত ছিল। শংকরাচার্য ইংরেজিতে পণ্ডিত নন কিন্তু সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত ছিলেন আর চলন-বলনের কায়দাও তিনি জানতেন। লোকে দিল্লী থেকে গাড়ি নিয়ে তাঁর কাছে আসত। আই সি এস ব্যক্তি সম্বন্ধে জানি না কিন্তু আই সি এস-এর স্ত্রীদের আসার ব্যাপারে জানি। এমন ব্রহ্মলীন পুরুষ বিলাসপুরীতে কেন আসেন, তাঁর পক্ষে তো তপোভূমি আর তপোপুরী হচ্ছে উপযুক্ত। কিন্তু ভক্তই শুধু ভগবানকে খোঁজেন না, ভগবানও ভক্তকে খোঁজেন। তিনি প্রথমে হ্যাপিভ্যালিরই একটি বড় বাংলোয় থাকতেন। ভাড়াটে এসে পড়ার পর মালিক তাঁকে বাইরের ঘরে রেখে দিলেন। এটি অপমানজনক ব্যাপার কিন্তু টাকার প্রশ্ন ছিল। তারপর তিনি কুল্‌হড়ীতে এক রাজাসাহেবের বাংলোয় চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে বার-চোদ্দ জনের দল থাকত। বক্তৃতার জন্য লাউড স্পিকার লাগান হতো। কিছু প্রণামী দিতে গেলে প্রত্যাখ্যান করলে লোকে ভাবত যে তিনি কারো কাছ থেকে কিছু নেন না। কিন্তু এর অর্থ এই যে তিনি দশ-বিশ টাকা নেওয়াটা প্রয়োজন মনে করতেন না। এখান থেকে যাওয়ার পর সাহারানপুরে তাঁর বাড়ি থেকে সত্তর-আশি হাজার টাকা চুরি হয়ে গেল। ধাইয়ের কাছে কি পেট লুকনো যায়? চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা ভক্তরা হয়তো ভেবেছে—এত টাকা তাঁর কাছে থাকার দরকার নেই, সেজন্য তারা তা হালকা করে দিয়ে চলে গেছে। পুলিস কাউকে ধরেছে কি না জানি না। তবে হ্যাঁ, এটা জানা গেল যে, দিল্লী গেলে কোনো এক ভক্ত মহীশূর থেকে চন্দনের সিংহাসন বানিয়ে তাঁকে অর্পণ করেছিল। জগৎগুরুর চৌমাসা[1] শেষ হচ্ছিল আর সেই বিদায়ের জন্যই এই শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। জায়গায় জায়গায় তোরণ করা হয়েছিল। ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। লোকে আরতি করছিল।

পুরো সিজিনটা আমাদের এখানে বাচ্চু কাজ করল। আগে যাদের কাছে কাজ করত তাদের সুপারিশ করা চিঠি তার কাছে ছিল আর আমাদের কিলডের-এর প্রতিবেশীও তার প্রশংসা করে জানিয়েছিলেন যে, সে তাঁদের চাকরের আত্মীয়। রাঁধুনে যদি হরিজন হয় তাহলে বিশেষ একরকম আনন্দ হয়। আমি তাকে রেখে নিলাম। রান্না ভাল করত, চটপটেও ছিল। কমলা ভাঁড়ারও তার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল।

২৪ সেপ্টেম্বর জানা গেল, সে পালিয়ে গেছে। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল যে, টিনের দুধ আর সব খাবার জিনিস হাওয়া হয়ে গেছে। কিছু বাসনপত্রও নেই। একবার দুটো ভাল ভাল বাটি গায়েব হয়ে গিয়েছিল, তখন সে লণ্ডৌর থেকে আসা এক তিব্বতী বন্ধুর মেয়েকে অপবাদ দিয়েছিল। কী কী জিনিস সে নিয়ে গেছে তা সেই দিনই বোঝা গেল না। আশপাশের প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করলে জানা গেল যে, সে সবসময় এখান থেকে আটা-চাল-আলু নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। রেজাই-শতরঞ্জি আমাদের এখান থেকে খোয়া গিয়েছিল। চৌকিদার কল্যাণ

[1] আষাঢ় থেকে শুরু করে চারটি মাস।—স·ম·

সিংহের কাছ থেকে জানা গেল যে তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে গেছে। আর রাত্তিলালাও টাকা ধার দিয়েছে বলে জানাল। ভিক্খু লালার কাছ থেকে জানা গেল, রাত দশটায় সে এখানে এসেছিল। শেষে এটাও জানা গেল যে, সে 'হোলিউড'-এর চৌকিদারের বৌকেও নিয়ে পালিয়েছে। চৌকিদার খুব দৌড়ঝাঁপ করল কিন্তু বাচ্চুকে কোথা থেকে পাবে?

ড· কিরণকুমারী গুপ্তের স্বামী শ্রীবাবুলাল গুপ্ত শুধু এম এ ছিলেন। সত্যিই স্বামীর পক্ষে শিক্ষায় স্ত্রীর চেয়ে এক ধাপ নীচে থাকাটা অপমানজনক ব্যাপার ছিল, যদিও গুপ্তজী বুদ্ধিতে স্ত্রীর চেয়ে দুর্বল ছিলেন না। তিনি তার পি এইচ ডি-র বিষয় নিলেন, 'লংকায় ভারতীয়রা'। তিনি হালকা মনে তাঁর নিবন্ধের কাজ করেন নি, যেমনটি আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। বেশি করে জানার জন্য তিনি লংকাও গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম। এবার তিনি তাঁর থিসিস পেশ করবেন, তার আগে আমাকেও একবার দেখিয়ে সংশোধন করাতে চাইছিলেন। আমিও একজন পরীক্ষক ছিলাম। ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি এলেন। আমি তাঁর নিবন্ধ দেখে কিছু পরামর্শ দিলাম।

এবার ছোট সিজিনে যাঁদের সঙ্গে দেখা হলো তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড· হেমচন্দ্র যোশী আর ছাপরার উকিলবাবু শিবপ্রতাপজী। শিবপ্রতাপ বাবু অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তরুণ ছিলেন এবং তিনি আন্দোলনে কাজ করেছিলেন। দেশভক্ত মজরুল হকের গ্রামের কাছাকাছি থাকায় তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রতি তাঁর খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। বিহারে খুব কম লোক উর্দু পড়ে। শিবপ্রতাপবাবুর তাও জানা ছিল। তাঁর কাছ থেকে বিহারের ব্যাপার-স্যাপার জানা গেল। সেই তরুণ চেহারা আমার মনে পড়ছিল যা বৃদ্ধ বয়সে পাল্টে গিয়েছিল।

কিলডের বিক্রি করার জন্য পুসঙ্গ বোনেরা খুব চিন্তিত ছিল। শীত কাছে এসে পড়ছিল। ঠাণ্ডা বড় বোনের পক্ষে খুব ভয়ের ছিল। শ্রীমতী মোহিনী জুত্‌শী ৫ অক্টোবর এলে আমি তার সঙ্গেও কথা বললাম। আমি কিলডের-এর অনারারি এজেন্ট হয়ে গিয়েছিলাম। তাতে স্বার্থ ছিল এটুকুই যে, কোনো ভাল প্রতিবেশী এসে থাকুক। পঁচিশ হাজারে তা পাওয়া যেত। জুত্‌শী দম্পতি সেটা দেখলেন, তাদেরও পছন্দ হলো। আমি বললাম, ওপর-নীচে চারটি পরিবারের জন্য আলাদা আলাদা স্যুট আছে, যদি চারজন সাড়ে ছ হাজার করে দিতে রাজি থাকে তাহলে তা বিনা পয়সায় বলেই মনে করা যায়। কিন্তু আংশিক মালিকানা এখনো আমাদের এখানে পছন্দ করা হয় না। অংশীদার হয়ে থাকলে অন্যের প্রতি যে সহিষ্ণুতা দেখানো উচিত তা আমরা দেখাতে শিখি নি।

৯ অক্টোবর শ্রীমতী ভাটনাগর কথাবার্তা বলে চব্বিশ হাজারে কিলডের কেনা স্থির করে ফেললেন। আমি ভাবলাম, শ্রীমতী ভাটনাগর আর প্রিন্সিপ্যাল কালিকাপ্রসাদ এবার আমাদের প্রতিবেশী হয়ে যাবেন, কিন্তু স্থির করেও বিষয়টি পূর্ণতা পেল না। সেই সিজিনে প্রায় পুরো সময়টা জুত্‌শী পরিবার এখানে থাকলেন। রোববারে অবশ্যই তাঁদের দেখা পাওয়া যেত। মোহিনীজী শুধু মহিলা কবিই নন, তিনি গল্পও লিখেছেন। তিনি তাঁর অনেক গল্প শোনালেন। তাঁর ভাবনা ছিল আধুনিক আর অত্যন্ত উদার। গল্পগুলো সবই মেয়েদের সমস্যা নিয়ে। তাঁর সবসময় চেষ্টা ছিল যাতে তাঁর নায়িকার প্রতি পাঠকের করুণা আকৃষ্ট করা না হয়—আত্মগৌরব

এবং সেই সঙ্গে আত্মাবলম্বনের জন্য যে চেষ্টা করা হয়েছে পাঠক তাকে প্রশংসা করুক। জুত্শীজী ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বলছিলেন, 'আমি সামান্য একটু জমি পেয়ে গেলে পাঁচ-ছ হাজার টাকায় তারই ওপর ছোটমতো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাংলো দাঁড় করিয়ে দেব।' দেবদারু গাছের আধিক্য নিয়ে গড়ে ওঠা বাংলোর আমি খুব প্রশংসাকারী। শিল্পী রোইরিকের নগর আশ্রমে এমনই একটি বাংলোয় থেকে ছিলাম যেখানে দেবদারুর মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ তার চারপাশ থেকে এসে মনকে প্রসন্ন করে রাখতো।

১৫ অক্টোবর প্রভা বোন এলেন। সর্দার পৃথিবী সিংহের খবরাখবর জানালেন। আম্বেরী (বোম্বাই)-তে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সেখান থেকে বেশ কিছু মেয়েদের ভ্রমণ করানোর জন্য এনেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল যে, সর্দার চীন গিয়েছেন। সেইদিনই তাঁর মুসৌরী দেখে ফিরে যাওয়ার ছিল। আমিও তাঁর সঙ্গে লণ্ডৌরের শেষ বাড়ি মলিঙ্গার পর্যন্ত গেলাম, তারপর বল্লভ হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম।

১৭ অক্টোবর মধু, শরদ, বাবা আর টুনার সঙ্গে মাচবেজী এলেন। বাবা (অসঙ্গ) কখনো কখনো নিজের নাম বলত অচিঙ্গা। এখন সে ঠিক ঠিক কথা বলতে শুরু করেছিল। মারাঠী আর হিন্দি দুটোতেই দখল ছিল। অচিঙ্গা বলে ডাকলে তার সম্মানে ঘা লাগত। তার জায়গা নেওয়ার জন্য বোন টুনা প্রস্তুত ছিল। মধু মাচবেজীর ভাইপো। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে সায়েন্সের ভাল ছাত্র ছিলেন। এখন তিনি দিল্লীর গবেষণাগারে কাজ করছেন। তাঁরা অল্প কয়েকদিনের জন্যই মুসৌরী এসেছিলেন। আমাদের বাড়ি বাচ্চাদের নিয়ে জমজমাট হয়ে উঠেছিল।

প্রকাশনা আমি 'রাজস্থানী রনিবাস' দিয়ে শুরু করব ঠিক করলাম। শ্রীবিশ্বরঞ্জন তাঁর প্রকাশনার কাজে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছিলেন। তাঁকে আটশো টাকার ড্রাফট ন্যাশন্যাল হেরল্ড প্রেসের জন্য দিয়ে দিলাম। দুহাজারের বেশি লেগেছে এই বইয়ের জন্য। তারপর 'ভোল্গা সে গঙ্গা'-র ইংরেজি অনুবাদও আমি ছাপালাম, শেষে তৃতীয় বই 'বহুরঙ্গী মধুপুরী' প্রকাশিত হলো। প্রকাশনার কাজে আমার পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না কারণ তার জন্য আমি পুরো সময় দিতে পারতাম না। প্রকাশনার চাইতেও বিক্রির ব্যবস্থা করার দরকার ছিল। যতক্ষণ এক ডজন বই না হচ্ছে ততক্ষণ নিজের ভ্রাম্যমান এজেন্ট রাখা মুশকিল। ভ্রাম্যমান এজেন্ট আমি রাখলাম, তাঁকে কিছু অগ্রিম দিলাম আর দুঃখের কথা এই যে ড· সত্যকেতুর কাছে থেকেও আমার বিশ্বাসে অগ্রিম দেওয়ালাম। তিনি টাকা-পয়সা খেয়ে বসে পড়লেন।

১৯ অক্টোবর রোববার মোহিনীজীর সঙ্গে তাঁর সহপাঠিনী সত্যা গুপ্ত এলেন। তিনি তিন-চার বছর আগে এম এ করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। বললেন, 'আমাকে কোনো কাজ বলুন।' তিনি সাহারানপুরের তীতরো গ্রামের বাসিন্দা। ঠাকুর্দার সময় থেকে পরিবারটি ছিল আর্যসমাজী, যা লোকশিল্পের পক্ষে ছিল ক্ষতিকারক। তবু আমি বললাম, 'আপনি কৌরবী লোকগীত আর লোককথা সংগ্রহ করুন। যদি এক হাজার সংগ্রহ করে আনতে পারেন তাহলে আমি অন্য কিছু বলব।' আমি এইরকম পরামর্শ কতজনকে তো দিয়েছি। তাই আমি কি করে বিশ্বাস করতাম যে সত্যাজী সেই কথাটি গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন?

২০ অক্টোবর পিকিং থেকে ড· জগদীশচন্দ্র জৈনের চিঠি এলো। তিনি সেখানে ইউনিভার্সিটিতে হিন্দি পড়াতে গিয়েছিলেন। এখন চীনের সমস্ত মনোযোগটা ছিল অর্থনৈতিক

সমস্যার সমাধানে। এই সময় সাংস্কৃতিক আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা-সম্বন্ধীয় কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবার ফুরসৎ তাদের কোথায়? তিনি লিখেছিলেন, এখানে এখন গবেষণার পরিবেশ নেই। তিনি এই ভেবে গিয়েছিলেন যে, যদি পরিবেশ অনুকূল হয় তাহলে পুরো পরিবারকে সেখানে ডেকে নেবেন। এখন শুধু বড় মেয়েকেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এবার ১৭ নভেম্বর নাগাদ ঠাণ্ডা বেড়ে গিয়েছিল। ঋতু-পরিবর্তনের প্রভাব পড়ল। মনে হচ্ছিল নাক সর্দিতে যেন পেকে উঠেছে। সামান্য ঘা অথবা ফোঁড়া সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে নজর দেওয়া দরকার—এটা আমি শিখে গিয়েছিলাম। পেনিসিলিন নিলাম, নাক ছুঁলেও ব্যথা হচ্ছিল। চিবুকেও এক জায়গায় ঘা ছিল। পেনিসিলিন আর ইন্‌সুলিন নিয়ে খাটে শুয়ে থাকা দরকার। ২০ তারিখ থেকে কিছুটা আরাম বোধ হতে লাগল।

শ্রীভাটনাগর মুসৌরীতে নায়েব-তহসিলদার ছিলেন। খুব ভাল মানুষ। নায়েব-তহশীলদার হয়েই ঢুকে ছিলেন আর এখন এক-আধ বছরের মধ্যে নায়েব-তহসিলদারের পদে থেকেই পেনসন পাবেন। তাঁর মেয়ে শকুন্তলা একটি স্কুলে পড়াতেন। ভাটনাগরজী পরবর্তী সময়ের জন্য কোনো কাজ খুঁজছিলেন। বার্ধক্যে জীবনের নিশ্চিন্ততা আমাদের দেশে এমন কি কোনো পুঁজিবাদী দেশেও অসম্ভব। পেনসনের পর তিনি কখনো কোনো এজেন্টের কাছে চাকরি করেছেন আবার কখনো কারও প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে থেকেছেন। চিন্তার ভারী বোঝা মৃত্যু এসে এক-আধ বছর পরই নামিয়ে দিল। তাঁর স্ত্রী-কন্যা অসহায় হয়ে পড়ল।

এক ধনী তরুণী বিধবা সম্বন্ধে জানতে পারলাম, সে তার স্বজাতি এক ডাক্তারকে বিয়ে করতে চায়, যার বাচ্চা এবং বউ রয়েছে। এত বড় সিদ্ধান্ত সে মাত্র তিন-চার বছরের পরিচয়েই নিয়েছিল। আমার এর জন্য খুব দুঃখ হলো। আজ লাখ লাখ টাকার সম্পত্তির মালকিন সে। নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠলে তার উত্তরাধিকারীরা, যারা তাকে একেবারেই পছন্দ করে না—তারা সুযোগ পেয়ে যাবে। তার এক ঘনিষ্ঠ পরিচিতাও এটা বুঝতে পেরেছে আর আমিও তাকে জোর দিয়ে বললাম, 'ওকে বোঝাও, অন্তত ছমাস দাঁড়াক।' আরও একটি উদাহরণ আমাদের সামনে ছিল যেখানে একজন মহিলা ডাক্তার এই রকমই একজন ডাক্তারকে বিয়ে করেছিল। এখন সারাজীবন তাকে পস্তাতে হচ্ছে। আজকের সমাজে তো মেয়েদের হাত-পা বেঁধে পুরুষদের সামনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। খুব আনন্দ হলো যখন শুনলাম, উক্ত তরুণী তার মত পাল্টেছে। এখন সে তার সমাজের সেবায় নিযুক্ত।

চার্লবিল হোটেল আমাদের বাংলো থেকে মাত্র দেড়-দু ফার্লং। সওয়াই আর চার্লবিল দুটোই এখানকার খুব বড় হোটেল যাতে শতখানেক করে ঘর আছে। চার্লবিলের এটাও গর্বের ব্যাপার যে, পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে গদিতে বসার সময় তাঁর রানী এখানে কিছুদিন থেকে ছিলেন। ইংরেজদের শাসনকালে সেই কামরাটি খালি রাখা হতো এবং সেখানে রাজা-রানীর ছবি বিরাজ করত। এইরকম হোটেলে ডাকঘর থাকাটা জরুরি ছিল। আগে চার্লবিলের ডাকঘর বারোমাস খোলা থাকত কিন্তু এখন বহু বছর ধরে তা ১ এপ্রিল খুলে ৩০ অক্টোবর বন্ধ করে দেওয়া হতো। আমি ডাকঘরের কর্মকর্তাদের লেখালেখি করলাম। ওপর থেকে জবাব এলো, 'আপনি যদি ঘাটতি পূরণ করতে রাজি থাকেন তাহলে আমরা খুলতে পারি।' এর অর্থ হলো, 'আমরা খুলতে চাই না।'

—১৯৫২—

বই-এর প্রুফ সবসময় আসত। 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য'-র অনেকগুলো ফর্মা প্রুফ এলো, যা আমি আমার রাঁধুনে খুশহালের হাতে পোস্ট করতে পাঠিয়ে দিলাম। সে চার্লবিলের ডাকঘরের লেটার-বক্সে ফেলে এলো। প্রেসের লোকেরা বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে থাকল, তারপর লিখল। আমি খুশহালকে জিজ্ঞেস করলে জানা গেল যে, সে এখানকার লেটার-বক্সে ফেলে এসেছে যা ১ এপ্রিল, ১৯৫৩-তে খুলবে। বড় পোস্টমাস্টারকে বললাম। তিনি লোক পাঠিয়ে তা বের করালেন।

৩ ডিসেম্বর জানতে পারলাম, পণ্ডিত রামদহীন মিশ্র আর নেই। ১ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ৬৮ বছর বয়সের মৃত্যু অকাল মৃত্যু নয় কিন্তু তিনি এখনও সক্ষম ছিলেন। সংস্কৃতের পণ্ডিত তথা হাইস্কুলের শিক্ষকের কাছে এটা আশা করা যেত না যে, তিনি ব্যবসা নিয়ে খুব চিন্তা করবেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি বই লেখা আর তারপর প্রকাশনার কাজ হাতে নিয়ে ছিলেন। আজ তিনি পাটনার সবচেয়ে বড় প্রকাশক। তিনি তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের গভীর জ্ঞান হিন্দির লোকেদের দেওয়ার জন্য অনেক বই লিখেছেন যা চিরদিন মনে থাকবে। আমারও দুটো বইয়ের একটি সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর ছেলে দেবকুমার মিশ্রর সঙ্গে চিরদিন আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। এক এক করে পাকা আমগুলো খসে পড়েই কিন্তু খালি ডালগুলো কিছুদিন পর্যন্ত অবশ্যই মনকে ধাক্কা দেয়।

৮ ডিসেম্বর ফিজির জ্ঞানীদাসের চিঠি এলো। সেটা ১ ডিসেম্বর ফেলা হয়েছিল। উপনিবেশে বসবাস করা ভারতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছে আমার সবসময় রয়েছে, যা কখনোই পূরণ হলো না আর এখন তো বোধহয় সেটা তামাদিও হয়ে গেছে' তবু কখনো যদি এইরকম সুযোগ আসে তো সম্পর্ক স্থাপন করতে আমি পিছপা হই না। তাঁর কাছে আমি আমার কয়েকটি বই পাঠিয়েছি, আর তিনিও সেখানকার প্রকাশিত কিছু কিছু বই পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারতাম, ফিজিতে আমাদের লোকেরা নিজেদের বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। সেখানকার লোকসংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি হলো তারা। কুলি হয়ে যাওয়া আমাদের ভোজপুর ও অযোধ্যার ভাইরা তাদের তৃতীয় প্রজন্মে সভ্য ও সংস্কৃতিবান হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে বেশি সজীব সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। এমনিতে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের সরকারের প্রতিনিধিরা এই দিকে কিছু কাজ করছে। ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা তাদের প্রারম্ভিক জীবনের ওপর খুব সুন্দর উপন্যাস ও গল্প লিখেছে। আমাদের লোকেরাও সেই রকম কেন করছেন না? ড· বাবুলাল গুপ্ত লংকায় ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বইটি লিখেছেন। আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, 'আপনি ডি লিটের জন্য 'উপনিবেশে ভারতীয়রা' বিষয়টি নিন এবং এর ওপর একটি বড় বই লিখুন।' এমনিতেই আমাদের লোকেদের মনোযোগ এই দিকে অবশ্যই যাবে, কিন্তু সেটা দ্রুত যাওয়া দরকার যাতে এখনও প্রাপ্য অনেক জিনিস নষ্ট না হয়ে যায়।

১২ ডিসেম্বর সীবানের (ছাপরা) বাবু বৈজনাথ প্রসাদ কোনো বিয়ের ব্যাপারে দেরাদুনে এসে আমার কাছেও এলেন। তাঁর ৭০ বছর বয়স হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমার তো সেইরকমই মনে হচ্ছিল যেমন তাঁকে কুড়ি বছর আগে দেখেছিলাম। আর্যসমাজের বিহারে তিনি অগ্রদূত ছিলেন আর সীবানে তিনি ডি এ ভি স্কুল খুলে তাকে ডিগ্রি কলেজ অব্দি পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর

জীবন হচ্ছে ত্যাগের। সকলে তাঁকে সম্মান করে। প্রৌঢ় আর্য সমাজীদের দাড়ি রাখার রোগ শুরু হয়েছিল পাঞ্জাব থেকে, তা বিহারে বৈজনাথবাবু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দাড়ি পুরো সাদা। তিনি সবসময়েই রোগা কিন্তু শরীরে গোলমাল কখনোই নেই। অনেকক্ষণ ধরে ছাপরা আর সীবান সম্বন্ধে কথাবার্তা হতে লাগল। জানা গেল, ছাপরা জেলায় এটা দ্বিতীয় ডিগ্রি কলেজ যা দুবছর ধরে চলছে। তিনশোর বেশি ছেলে আছে। এখনও মাসিক দুহাজার টাকার ঘাটতি রয়েছে। তিনি বলছিলেন, আর্থিক সংকট ভয়ংকরভাবে লোককে আক্রান্ত করছে। খুন আর ডাকাতি জলভাত হয়ে গেছে। যে-কারণে সম্পন্ন লোকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে।

লোকভাষা ও লোক-সাহিত্যর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকায় কোথাও যদি এই বিষয়ে কোনো কাজ হয় তাহলে আমি তাতে শুধু খুশি হই না, উপরন্তু যথাসাধ্য উৎসাহ দিতে এবং সাহায্য করতেও চাই। হিন্দি-এলাকার সমস্ত লোকভাষা-অনুরাগীরা এটা জানে। তারা সবসময় তাদের কাজ আর সমস্যাগুলো আমার কাছে পাঠায়। শ্রীরামনারায়ণ উপাধ্যায় নীমাড়ী লোকগীতির একটি সংগ্রহ ১৭ ডিসেম্বর আমার কাছে পাঠালেন। এখন ভাল প্রকাশকরা এইরকম কাজ ছাপতে রাজি নয়, তাই ছাপা ভাল না হওয়ার অভিযোগ করলে চলবে না। উপাধ্যায়জীর সংগৃহীত গীতগুলি ছিল খুব সুন্দর। আমি সেগুলি পড়ে গেলাম। দেখলাম মারু (পতি প্রিয়তম), বন্নাবন্নী (বর-কনে) ইত্যাদি অনেক শব্দ কৌরবী, হরিয়ানী আর মারোয়াড়ী শব্দের সঙ্গে মেলে। পাঞ্চালী বা মধ্যদেশীয় ভাষা যেরকম নৈনিতালের তরাই অঞ্চল থেকে শুরু করে মধ্যদেশের মারাঠী আর ছত্তিশগড়ীর সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে, সেই রকমই তার পশ্চিমের প্রতিবেশী কৌরবী স্থানীয় পরিবর্তনগুলির সঙ্গে রাজস্থানী-মালবী হয়ে নীমাড়ী পর্যন্ত চলে গেছে। এর প্রমাণ এই সংগ্রহের নিম্নোক্ত বাক্য থেকে পাওয়া যায় ঃ

'বনী ম্হারো দেশ মালবো, মুলুক নেমাড গাবড়া কো ছে রিনবাস।' এই বাক্যটি কৌরবী। হরিয়ানীতে 'সে' শব্দটি মারোয়াড়ী-মালদী-নিমাড়ীতে 'ছে' হয়ে গেছে।

১৮ ডিসেম্বর নাগরী প্রচারিণী সভার সচিব জানালেন যে সভা আমাকে 'বাচস্পত্যসদস্য' নির্বাচিত করেছে। লিখলাম, 'শিরোধার্য করছি।'

কমলা এ বছর সাহিত্যরত্নর পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করেছিল। পরীক্ষা দিতে ২৫ ডিসেম্বর সে দেরাদুন গেল। সেখান থেকে ৩১ ডিসেম্বর ফিরল। ও সবসময় পরীক্ষা দিয়ে নিরাশ হয়ে পড়ত কিন্তু লেখার এবং বোঝার ক্ষমতা তার আছে। পরীক্ষক অন্যান্য হাজার হাজার পরীক্ষার্থীদের মান দেখে পাস-ফেল করান। সেজন্য তার পাস করার ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল না।

২৬ ডিসেম্বর বুকে যখন-তখন একটু-একটু ব্যথা হতে লাগল। শীতের জন্য হবে হয়তো। ভাবলাম, যদি শেয়ালের চামড়ার জ্যাকেট ব্যবহার করি তাহলে বোধ হয় ব্যথা কম হবে। দু-তিন দিন ব্যথা থাকল তারপর বন্ধ হয়ে গেল। মাথায় চেপে বসলেই মানুষের রোগের কথা মনে পড়ে।

রাজস্থানে রাজপুতরা জংলী শুয়োরের মাংস খুব পছন্দ করে। আমাদের পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে তো তাকে গ্রামের শুয়োরের মতোই অভক্ষ্য মনে করা হয়। রাজস্থানে রাজা আর ঠাকুর অন্য কাউকে জংলী শুয়োর শিকার করতে দিতেন না। এজন্য তাঁদের পক্ষে এটা খুব সুলভ ছিল। ঠাকুরানী গুলাবকুমারী ২৯ ডিসেম্বর আট-দশ সের শুয়োরের মাংসের ফালি

পাঠালেন। তাঁর কথায় বোঝা যেত যে, টিন টিন পাঠানো যায় কিন্তু তাঁর এটা খেয়াল ছিল না যে, দেশীয় রাজ্য আর জায়গীর উঠে যাওয়ার পর লোকে জঙ্গলের শুয়োর শিকার করতে পিছপা হবে না। আগে খেতে চরে বেড়ালেও লাঠির ভয়ে হাত তুলতো না। দু-এক বছর পর সত্যিসত্যিই শুয়োর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং 'শূকর-মার্দব' পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল।

বছরের শেষ দিন ছিল ৩১ ডিসেম্বর। কমলা ভিজতে ভিজতে দেরাদুন থেকে এলো। আজ বছরের হিসেব-নিকেশ করলাম। 'যাত্রা কে পন্নে' আর 'রুস মে পচ্চীস মাস' ছেপে বেরিয়ে গেছে। 'রাজস্থানী রনিবাস' ছাপা হয়ে গেছে। এখন প্রেসের বাইরে আসার অপেক্ষা। এই বছর বই লিখেছি—(১) 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস (২য় খণ্ড),' (২) 'গঢ়ওয়াল', (৩) 'নেপাল'। দেড় হাজার পৃষ্ঠা লেখা অসন্তোষজনক বলা যায় না।

'নেপাল'-এ পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে ফেলেছিলাম, আর চাইছিলাম নেপাল যাওয়ার আগে সেটাকে গ্রন্থাকারে তৈরি করে নিই। তাতেও সফল হয়েছিলাম।

এ বছর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সব মিলিয়ে ন হাজারের কিছু বেশি রোজগার হয়েছিল। জমাতে তো আমি শিখি নি। প্রকাশনা হাতে নেওয়ায় খরচ বেড়ে গেল।

দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কে আচার্য গোবর্ধন (১১০০ খ্রি·) কি সুন্দর লিখেছেন—

'নিষ্কারণাপরাধং নিষ্কারণকলহরোষপরিতোষম্।

সামান্য মরণজীবনসুখদুঃখং জয়তি দাম্পত্যম্।'

(যাতে অকারণ অপরাধ অকারণ কলহ-রোষ-পরিতোষ আছে।

এক সঙ্গে মরণ, জীবন, সুখ-দুঃখে দাম্পত্য (জীবন) জিন্দাবাদ।)

কমলা আর আমার স্বভাবে পার্থক্য আছে, এমন কি বিরোধও আছে। আমি যেখানে বুদ্ধির পিছনে চোখ বন্ধ করে চলতে রাজি, কমলা সেখানে বুদ্ধিকে দূরে সরিয়ে রাখে। এটা আমার অবাক লাগে। আবার তার আমাকে অবাক লাগে যে আমি কেন বুঝতে পারি না। কিন্তু আচার্যের কথা অনুযায়ী রোষ পরিতোষে বদলে যেতে দেরি হয় না।

আচার্য আরও একটি কথা বলেছেন, যা তাঁর সময়ে উচিত মনে করা হতো, যখন স্ত্রীলোকদের না ছিল সমানাধিকারের কোনো বিশেষ বোধ, আর না ছিল সমাজে তাদের কোনো স্থান—

গৃহিণীগুণেষু গণিতা বিনয়ঃ সেবা বিধেয় তেতিগুণাঃ।

মানঃ প্রভুতা বাম্যং বিভূষণং বামনয়নানাম্।'

(গৃহিণীর নম্রতা, সেবা ও বাধ্যতা—এগুলোকে গুণ বলা হয়েছে। সুনয়নাদের মান; প্রভুত্ব আর সৌন্দর্যকে ভূষণ বলা হয়েছে।)

নেপালে

১৯৫৩ সালের প্রথম দিন এলো। সকালে দেখলাম আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টি হতে লাগল ও তাপমাত্রা নীচে নামতে লাগল। তারপর শিল পড়ল। শেষে বরফ পড়ে পুরো ভূ-পৃষ্ঠ ঢেকে দিল। কাল থেকেই ঠাণ্ডা ছিল ভীষণ। আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করা হয়েছিল। পরের দিন আরও বেশি বরফ দেখা গেল। গত দুবছরে এত বরফ পড়ে নি। দু-তিন ইঞ্চির চেয়ে কি কম পুরু? সকালে বরফের দৃশ্য খুব সুন্দর ছিল। গাছের প্রতিটি পাতা ও বেড়ার একটি লৌহজালিকা রুপোলি হয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণে মুসৌরীর বাইরে থেকে কেউ এই দৃশ্য দেখতে আসে ততক্ষণে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। তার কারণ পাতলা বরফ সাতটা-আটটার পর পাতাকে মুড়ে রাখতে পারে না। দূর থেকে দেখলে সাধারণভাবে মনে হয় গাছগুলো গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে কিন্তু এই সময় বরফ পিছনে এসে প্রতিটি গাছকে আলাদা আলাদা করে দেয়। হিমদর্শন হচ্ছে মুসৌরীতে থাকার একটি বিশেষ আনন্দ-প্রাপ্তি।

৪ জানুয়ারি সকালে আমরা মুসৌরী থেকে দেরাদুন গিয়ে, শুক্লজীর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সারলাম। এখানে ঠাণ্ডা কম ছিল। ফটোর জন্য কিছু ফিল্ম এবং আরো দু-একটা জিনিস কিনলাম। সন্ধে সাতটায় লক্ষ্ণৌর ট্রেন ধরলাম। কামরায় একাকী যাত্রী খুন হওয়ার খবর কাগজে বেরিয়েছিল। কমলা চেয়েছিল যাতে প্রথম শ্রেণীতে না যাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাতে শোয়া হয় কি না হয় তাও ভয় ছিল! যাক্‌গে, শোবার জায়গা আমরা পেয়ে গেলাম।

পরের দিন সকালে পৌনে নটায় গাড়ি লক্ষ্ণৌ স্টেশনে পৌঁছল। নেমে শ্রীমতী প্রকাশবতীজীর বাড়ি গিয়ে, চা-খেয়ে বুদ্ধ-বিহারে গেলাম। হঠাৎ স্মৃতি সান্যালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে এখন নৈনিতালে পড়ছিল, এই সময় বাড়ি এসেছিল। খাওয়ার পর ন্যাশন্যাল হেরেল্ড প্রেসে 'ভোল্গা টু গঙ্গা'-র দুহাজার কপি ছাপার জন্য কাগজের দাম দিয়ে দিলাম। শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীবাস্তব প্রেস দেখালেন। ছাপার এমন আপ-টু-ডেট মেশিন বোধহয় খুব কম প্রেসে আছে। অবাক হচ্ছিলাম যে, তবু এই প্রেস কেন ধিকি ধিকি করে চলছে।

পাটনা—রাতেই আমরা গাড়ি ধরলাম। ৬ জানুয়ারি সাতটায় পাটনা পৌঁছে গেলাম। বীরেন্দ্রজী, অদ্ভুতজীকে স্টেশনেই পেয়ে গেলাম। থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বীরেন্দ্রজীর বাড়িতে। কাগজে খবর বেরিয়ে যাওয়ার ফলে অনেক বন্ধু-বান্ধব এলেন, কিন্তু বক্তৃতা নেপাল থেকে ফেরার পরই দেব ঠিক করেছিলাম। নেপাল যাওয়ার ছিল বিমানে করে। বিমান প্রতিদিন যেত না—বৃহস্পতিবারেই শুধু যেত।

৭ তারিখের খাওয়া হলো শিবচন্দজীর বাড়িতে। শিবচন্দজীকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি। তাঁর বাবা আচার্য কপিলদেব শর্মার সঙ্গে অসহযোগের সময় থেকে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। তাঁদের বাড়িতে শুধু মেয়েরা নয়, কাজ করার চাকরানীরাও সংস্কৃত বলত। বাড়িতে সংস্কৃত বলার রেওয়াজ ছিল। একদিকে তাঁরা 'ফিরে চলো গুহা-মানবের কাছে' মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী নিজের হাতে ঘরের পায়খানা পরিষ্কার করতেন।

শিবচন্দজী সরজুপারি-বহির্ভূত বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছেন কিন্তু কপিলদেবজী তাতে কিছু মনে করেন নি। শিবচন্দজী নিরামিশাষী, যদিও তাঁদের এখানে শত শত প্রজন্ম ধরে মাংস খাওয়া চলে আসছে। স্ত্রী ছিলেন মাংস খাওয়া বংশের। সেদিন মাছের অনেক রকম পদ তৈরি করা হয়েছিল। নলিনজী এবং অন্য সাহিত্যিকরাও এসেছিলেন। সেটা একটা ছোটোখাটো ভোজ হয়ে গিয়েছিল।

খাওয়ার পরে মিউজিয়াম গেলাম। কিউরেটর সোর সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। আমার আনা সংগ্রহকে দেখলাম। নতুন জিনিস যা সম্প্রতি সংগৃহীত হয়েছে তাও দেখালাম। তারপর নীচে জয়সওয়াল প্রতিষ্ঠানে ড· অল্‌তেকর-এর কাছে গেলাম। ড· অল্‌তেকর বিদ্বানও আবার কাজকর্মেও খুব তৎপর। সত্যিসত্যি, যে মানুষ শুধু বেতনের জন্য কাজ করে তার মধ্যে তৎপরতা আসবে কোথা থেকে? ড· অল্‌তেকর সবসময় গবেষণার কাছে লেগে থাকেন। ভারতীয় মুদ্রার ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বড় মর্মজ্ঞ আজ আর কোথাও নেই। ষোল-সতের বছর ধরে তিব্বত থেকে তালপত্রের ফটো এখানে এসে পড়েছিল, এখন তিনি সেগুলো প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন। আমার সম্পাদিত 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য'-র তো অনেকটা অংশ ছাপাও হয়ে গেছে।

চা-খাওয়ানোর জন্য তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। অল্‌তেকর সাহেব দুঃখ করতেন যে বিহারে ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা সংস্কৃতের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। বিহারের পণ্ডিতদের মহিমা সারা ভারতে প্রসিদ্ধ—প্রাচীনকালেই শুধু নয়, সাম্প্রতিককালেও। বিগত পঞ্চাশ বছরে এখানকার প্রতিটি জেলায় কয়েকশো সংস্কৃত বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। মিথিলায় এমন ব্রাহ্মণ গ্রাম তো খুব কমই পাওয়া যাবে যেখানে সংস্কৃত পাঠশালা নেই। এখন হিন্দির দ্বারা উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে যাওয়ায় এবং অনেক রকম সুবিধের ফলে এক-একটি জেলায় দু-তিনটে করে ডিগ্রি কলেজ হওয়ায় কলেজে পড়ার দিকে সেইসব ছাত্র আর তাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি চলে গেছে, যারা সংস্কৃত বিদ্যালয় পর্যন্তই নিজেদের শিক্ষা সীমিত রাখত। এর ফলে সংস্কৃতর পরিক্ষার্থীদেরও অভাব হয়েছে। সত্যিই এটা আমাদের কাছে বড় সমস্যা যে, পুরনো রীতির সংস্কৃতর বড় বড় বিদ্বানদের পরম্পরাকে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে কিভাবে বাঁচানো যাবে।

৮ জানুয়ারি চা খেয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। কাঠমাণ্ডু থেকে খবর এলো এখন সেখানকার বিমানবন্দরে কুয়াশা রয়েছে। যতক্ষণ সেখান থেকে কুয়াশা না সরে যাচ্ছে ততক্ষণ বিমান কি করে ওড়ে? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। তারপর বিমান ছাড়ল। গঙ্গা পার হওয়ার সময়ই হিমালয়ের শিখর দেখা যেতে লাগল। তারপর ছাপরার ভেতর দিয়ে গণ্ডক পার হয়ে আমরা চম্পারনের ওপর পৌঁছলাম। সমতল ভূমি পেরিয়ে নীচে তরাই-এর জঙ্গল এবং তারপর চুরিয়া (শিবালিক পর্বতশ্রেণী) এলো। গত একশো বছরে জঙ্গল অনেক কেটে ফেলা হয়েছে, তবু এখনো তার অবশিষ্ট অংশ দেখে 'কাজলী বন'-এর প্রবাদ মনে পড়ে। নীচের স্থানগুলো দেখেই বিমান সামনে এগোয়। নেপাল উপত্যকার জল বাগমতী বইয়ে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে বিমান তার ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। আমার দৃষ্টি ছিল তুষার-শিখরের দিকে। ডানদিকে নিরভ্র আকাশে তার নির্মল ছটা চোখের সামনে ছিল। বাঁ দিক কিছুটা আবছা। উত্তরের দিকে পূব-পশ্চিম পর্যন্ত তুষারশ্রেণী চলে গিয়েছিল, এর অন্য পাড়েই তিব্বত। দক্ষিণে গিয়ে একটি হিমশ্রেণী দক্ষিণ দিকে ঘুরে যায় যাতে ধৌলাগিরির উচ্চশিখর রয়েছে।

নেপাল—গিরি মেখলা লঙ্ঘন করে বিমান এবার উপত্যকার ওপর উড়ছিল। এখানের দৃশ্যে বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। ভাদগাঁও, পাটন, কাঠমাণ্ডুর অনেক নগর, গ্রাম এবং মাঝে মাঝে বাগমতী ও তার শাখা নদীগুলোর ধারা চোখে পড়ছিল। বিমানবন্দরে পৌঁছতে দেরি হলো না। পাটনা থেকে উড়ে ৫৫ মিনিট পরে আমরা নেপালের মাটিতে নেমে গেলাম। বিমানবন্দরেই শ্রীজনকলাল শর্মা, শ্রীধর্মরত্ন য়মি, তাঁর কাকা শ্রীমানদাস এবং অন্য বন্ধুদের পেলাম। আগে নেপালে ঢোকা খুব মুশকিল ব্যাপার ছিল। শুধু শিবরাত্রির সময় এক সপ্তাহের ছাড় পাওয়া যেত, নইলে রানাতন্ত্র এমন কড়াকড়ি করে রেখেছিল যাতে কোনো ভারতীয় ঢুকতে না পারে। তবে ইংরেজদের জন্য অত ব্যাপার ছিল না, শুধু খবর দিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট মনে করা হতো। রানাতন্ত্র উঠে যাওয়ায় একটা লাভ হয়েছে যে, আপনি আপনার জেলার কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সই ও স্ট্যাম্প দিয়ে আপনার ফটো তৈরি করে নিন এবং নির্দ্বিধায় বছরের যে কোনো সময় নেপাল চলে যান। আমাদের জিনিসপত্র কাস্টম (কর)-এর লোকেরা দেখল। আমরা ছাড়া পেয়ে গেলাম। গাড়িতে করে আগে জনকলালজীর বাড়ি গেলাম। ওখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল। থাকার জন্য শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ কোইরালা পুতলী সড়কে অবস্থিত তাঁর বাংলোটি দিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু আমি তো নেপাল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে এখানে এসেছিলাম, তাই লোকজনের সঙ্গে বেশি মেলামেশার দরকার ছিল। এই বাংলোটি ছিল মুখ্য শহর থেকে দূরে।

সন্ধেতে ঘোরার জন্য বেরোলাম। মানদাসজীর বাড়ি গেলাম। তারপর ভাজুরত্ন সাহুর বাড়ি। সেইদিনই জগৎরত্ন সাহুর সঙ্গেও দেখা করে এলাম।

৯ জানুয়ারি শুক্রবার ছিল। আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝরাত থেকে ঠাণ্ডা বাড়তে বাড়তে সকালে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেত। মুসৌরীতে এর উল্টোটা, সন্ধে থেকে বেড়ে মাঝরাতের পর কমে যায়। মুসৌরীতে আমাদের বাড়ি সাড়ে ছ হাজার ফুট ওপরে ছিল আর এই নগর চার হাজার ফুট ওপরে। তবু বৃষ্টি-বাদলার জন্য মুসৌরীর মতোই ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল।

প্রুফ সঙ্গে এনেছিলাম। সেটাও ফেরৎ পাঠানোর ছিল। এজন্য ভারতীয় দূতাবাসের ডাকঘরে গেলাম। থাকার জায়গা থেকে সেটা অনেকটা দূরে। রানাতন্ত্রের যুগে নেপাল উপত্যকার দুর্লভ সমতলভূমির একটি বড় অংশ রানার মহল ও বাগানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অন্তঃপুরের জন্য জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল চারদিকে ঘিরে রাখা দরকার ছিল বলে তার মহল থেকে নগরের সৌন্দর্য কম মনে হতো। নারায়ণ হিট্‌টি মহল এক শতাব্দী ধরে শ্রীহীন অবস্থায় পড়েছিল। এর মাঝে পৃথ্বীনারায়ণের সন্তান কেবল গুড়িয়া রাজা হয়েছিলেন। এখন ক্ষমতা রাজা ত্রিভুবনের হাতে ছিল বলে সেখানে খুব জাঁকজমক দেখা যেত। নেপালে মোটর ছাড়া আর কোনো যানবাহন নেই। রাস্তাও এত খারাপ যে ঘোড়ার টাঙ্গা বা সাইকেল রিক্সা চালানো মুশকিল। তাছাড়া রানাতন্ত্রের সময় থেকে পরম্পরা রয়েছে যে সাধারণ মানুষ শাসকজাতির সামনে যানবাহনে চড়ে বেরোবে না। জনকলালজী আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে মাহিলা গুরু শ্রীহেমরাজ শর্মার বাড়িতে পৌঁছলাম। আমি কমিউনিস্ট ভাবনার লোক এটা তিনি জানতেন। আমিও জানতাম যে, তিনি সামন্তবাদের নিরঙ্কুশ সমর্থক। তবু সংস্কৃত ভাষা, ভারতীয় সংস্কৃতি, তৎসম্বন্ধীয় অনুসন্ধান এইসব ব্যাপারগুলো ছিল যার ফলে আমাদের মধ্যে ১৯ বছর

ধরে ঘনিষ্ঠতা রয়ে গেছে। সবশেষ যখন দেখা হয়েছিল তখন তিনি মাহিলা গুরু শাসনের একটি সবল স্তম্ভ এবং প্রভাবশালী রাজগুরু ছিলেন। এখন রানা চলে গেছে বলে তাঁর অবস্থাটা ছিল জলের বাইরে মাছের মতো। বয়সের পুরো ছাপ পড়েছিল তাঁর ওপর। আগের মতোই খোলা মনে দেখা করলেন। দু-তিন ঘণ্টা ধরে সাহিত্য আর গবেষণার চর্চা হলো।

ধর্মরত্নজী এসে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন যেটা ছিল শহরের ভেতরে। এখানে আমার মেলামেশার সুবিধে ছিল বলে পরের দিন থেকে আমরা এখানে চলে এলাম। তাঁর পৈতৃক বাড়িটি সরকার রাজনৈতিক কারণে বাজেয়াপ্ত করেছিল, এখনো ফিরিয়ে দেয় নি। তিনি অন্য কারোর প্রায় অর্ধপরিত্যক্ত খুব বড় একটা তিনতলা বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারই সামনের খোলা জায়গায় তিনি বাংলো বানাচ্ছিলেন। সেইদিনই ধর্মমান সাহুর সহকারী আশি বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো। চোখে কম দেখতেন। পথে চলার সময় মনে হতো কঙ্কাল চলছে। তিনি ছিলেন পুরনো যুগের অবশেষ। তাঁর কত ব্যাপার জানা ছিল কিন্তু এই বয়সে স্মৃতিও তো প্রতারণা করে। সেদিন নাট্যকার শ্রীবালকৃষ্ণ সম এবং অন্য অনেক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন।

১০ জানুয়ারি আমি এবং কমলা, জনকলালজী ও অন্যান্যদের সঙ্গে দেবপাটন গেলাম। এটা সেই অঞ্চলের নাম যেখানে ভারতবিখ্যাত পশুপতির মন্দির আছে। যদিও বসতি এখন মিশে গেছে কিন্তু কোনো সময়ে এটা কাঠমাণ্ডু থেকে আলাদা নগর ছিল। প্রাচীনকালে এটাই নেপালের রাজধানী ছিল। চতুর্দশ শতাব্দির মাঝামাঝিতে বাংলার মুসলমান শাহ তিরহুতের রাজধানী সেমরৌনগড় ধ্বংস করে নেপালের ওপর চড়াও হয়েছিল। এটা যে সবসময় গোপন করার চেষ্টা করা হয়েছে তা আমরা বলে এসেছি। পশুপতি রয়েছে মুখলিঙ্গরূপে অর্থাৎ তিনি সেইসময় থেকে পূজ্য হয়ে আসছেন যখন উত্তর-ভারতের সর্বত্র পাশুপত ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিম আক্রমণের সময় পশুপতি মন্দির লুঠ করা হয়েছিল, মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এই ভাঙা মূর্তি এখনো পথের এক জায়গায় পড়েছিল। প্রথমে এটা কৈলাস 'ধ্বংসাবশেষ'-এর ওপর ছিল যেটা তুলে পশুপতির পূজারী রাস্তার ধারে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। মুখলিঙ্গ, নিম্নলিঙ্গ এখানে যথেষ্ট আছে। সারা দেবপাটন অঞ্চল তার ধরাতল আর অন্তস্তলে গত দুহাজার বছরের ঐতিহাসিক সামগ্রীর আধার হয়ে আছে। কোনো সময়ে এরও ভাগ্য খুলবে।

আজ মহাকবি দেবকোটার দর্শন হলো। অনেক ব্যাপারে নিরালাজীর সঙ্গে তাঁর মিল আছে। যদিও এরকম নয় যে, তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলা যাবে। নিরালাজী এখন অনেক দিন থেকে ইংরেজিতে কথা বলেন। দেবকোটাজী তাঁর একটি বড় নাটক ইংরেজি পদ্যে লিখছিলেন, তাঁর অনেক অংশ তিনি পড়ে শোনালেন। ইংরেজিতে তার দখল আছে। কিন্তু নিজের ভাষা ছেড়ে ইংরেজিতে কবিতা লিখে কি হবে যখন এটা নিশ্চিত যে ইংরেজ আমেরিকান নয়। তাদের রচনার কদর ইংল্যান্ড-আমেরিকায় হওয়া মুশকিল। কিন্তু খেয়াল। তবে তিনি নেপালী ভাষা ব্যবহার না করার দিব্যি খান নি। তিনি সবসময় তাতে লিখে চলেছেন। গদ্য, পদ্য, নাটক, প্রবন্ধ, খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য সব লেখায় তাঁর কলম অবাধে চলে। আত্মভোলা লোক। কাগজে কবিতা লিখছেন এমন সময় কোনো ছেলে খেলতে এলো, তাকে কাগজটা দিয়ে দিলেন। বা নিজেই ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর আবার লেখেন। তাঁর কত কবিতা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তরুণ

বন্ধুদের বললাম, 'এগুলো রক্ষা করার চেষ্টা আপনাদের করা উচিত।'

তারপর বালচন্দ্র শর্মার সঙ্গে দেখা করতে এবং আরো কয়েকটি জায়গাতে গেলাম। নেপালের এক মহিলা নেতা শ্রীমতী প্রভাদেবীর বাড়িতে খেলাম। নেপালী খাবার খেতে আমার বিচিত্র আনন্দ হয়। একবার কোনো খাবারের প্রতি যখন মানুষের পক্ষপাতিত্ব জন্মে যায় তখন তা কমার নাম করে না, নিরামিষ খাবারও মধুর মনে হয়। ডাল, ভাত আর নানা রকমের তরকারি নানা নেপালী মহিলার হাতে অমৃতরসে সিক্ত হয়ে যায়। রানাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করায় নেপাল-উপত্যকার মহিলারাও সামিল হয়েছিল। তারা নানান কষ্ট আর অপমান সহ্য করেছিল। প্রভাদেবী তাঁদের একজন ছিলেন।

সরকার কৃষকদের অবস্থা ভাল করার জন্য ভূমি-সংস্কার-কমিশন গঠন করেছে। আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য তাদের তরফ থেকে হিমালয় হোটেলে চা-পার্টির ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনটের সময় আমি ওখানে পৌঁছলাম। নগরীর ২৫-৩০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা জানতে চাইছিলেন। আমি জানালাম। ওখান থেকে উঠতে উঠতে অন্ধকার হয়ে গেল। আমাদের মালপত্র আগে য়মিজীর বাড়িতে চলে গিয়েছিল। এজন্য আমরা সেখানে চলে গেলাম। রাতে দশটা পর্যন্ত আড্ডা চলতে লাগল। নেপালে আমার বই পঠিত হয়। আমি বিপজ্জনক লোক ছিলাম। তবু লুকিয়ে এখানকার যে তরুণ আমার কাছে আসত সে এখন প্রৌঢ় হয়ে গিয়েছিল।

নেপাল রানাতন্ত্রের জোয়াল থেকে মুক্ত হয়েছিল কিন্তু এই সময়ে বিচিত্র পরিস্থিতিতে ছিল। রানা এবং তার সমস্বার্থের লোকেদের রক্ষার জন্য গোর্খা দল কায়েম হয়েছিল, যাদের কাছে এখনো অনেক টাকাপয়সা আর পুরনো জিনিসপত্র আছে। রানা আর ধিরাজ-এর নিজেদের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু এর ফলে রানা সর্বেসর্বা হয়ে উঠুক এটা ধিরাজ কখনো পছন্দ করে নি। বাকি অনেক দল আছে যারা সকলেই রাজশক্তি নিজের হাতে রাখতে চায়। বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কোইরালা একসময় সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্রী ছিলেন। ধিরাজের সঙ্গে তাঁর খটমট হয়ে গেল। তাঁকে সরিয়ে তাঁর বড় ভাই মাতৃকাপ্রসাদ কোইরালার পদোন্নতি ঘটালো! দুই ভাইয়ের মনোমালিন্য এত গভীর যে তাঁদের কখনো মিলন হবে কি না তাতে সন্দেহ আছে। প্রজা-পরিষদ, রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস ইত্যাদি আরও কিছু পার্টিও এইরকম আলাদা আলাদা বাজনা আলাদা আলাদা রাগ নিয়ে বাজছে। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত কিন্তু লোকের সেদিকে বেশি ঝোঁক রয়েছে। এটা বোঝা গেল, যখন কিছুদিন পরে উপত্যকার পৌর-নির্বাচন হলো, তখন তারাই বেশি ভোট পেল। নেপালের উত্তরসীমায় তিব্বতে কমিউনিস্টরা যে নবরাষ্ট্র রচনা করছে তার প্রভাব নেপালের ওপর পড়বে, এটা বলার দরকার নেই। এটাও ঠিক যে, ভারত সরকার কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে যতই সদ্ভাব রাখুক না কেন এটা কিন্তু চাইবে না যে লোকে তার কাছ থেকে প্রেরণা নিক। রাজা ত্রিভুবন চার প্রজন্ম ধরে নজরবন্দী রয়েছেন। তিনি আজকের দুনিয়া দেখেন নি, এজন্য ভবিষ্যতের পথ তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। বাঁধা হাত খোলা দেখে এখন চতুর্দিকে মেরে বেড়ানোটাই কাজ।

তাদগাঁও-তে—১২ জানুয়ারি জিপে করে বনেপা পর্যন্ত আমাদের যাওয়ার ছিল কিন্তু সাড়ে নটা

পর্যন্ত তা যখন এলো না তখন টুণ্ডীখেল-এর স্ট্যান্ড থেকে আসা-যাওয়া ১৪ টাকায় একটা ট্যাক্সি নিলাম। কমলা, আমি ছাড়া আরও পাঁচজন বন্ধু সঙ্গে ছিলেন। পথে ঠেমী গ্রাম পেলাম। গ্রামটি সেখানকার মেহনতী কৃষকদের জন্য প্রসিদ্ধ। আজকের কৃষিবিজ্ঞান এদের কী শেখাতে পারে? এরা এক আঙুল জমিও বেকার পড়ে থাকতে দেয় না। এরা কাঠমাণ্ডু যায় শাকসবজি বেচতে। সেখানে কোনো নোংরা আবর্জনা বা পায়খানা পড়ে আছে দেখলে তা তুলে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে তারা চীনা আর জাপানী কৃষকদের মতো।

সাড়ে দশটার সময় আমরা ভাদগাঁও পৌঁছলাম। বাইরের বাঁধানো পুকুরের ধারে মোটর দাঁড় করিয়ে দিল। পুকুরের উপরিতল আশপাশ থেকে উঁচু, তাতে অনেক জল রয়েছে কিন্তু পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করা হয় নি। তার পাড়ে বহু তিব্বতী স্ত্রীপুরুষ ডেরা বেঁধে বসেছিল। শীতের দিনে তারা জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্য নেপাল আসে। তারা এটুকুই জানত যে, লাসায় মর্পো (লাল) এসে গেছে। দু-বছর হয়ে গেছে এখনো তারা কমিউনিস্টদের কোনো কাজ নিজের চোখে দেখে নি।

ভাদগাঁও উপত্যকা তিনটে মহানগরীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট কিন্তু আগে এটাই প্রধান রাজধানী ছিল। সমতলের রাজ্য ও রাজধানী সেমরৌনগড়ের মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়ায় ন্যায়দেবের সন্তানরা যখন পালাতে বাধ্য হলো, তখন তারা প্রথমে এখানে এলো। তারপর রাজা তাঁর তিন ছেলের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন যে-কারণে কান্তিপুর (কাঠমাণ্ডু), পাটন আর ভাঁদগাও তিনটে রাজধানী হয়ে গেল। তিনটে নগরেরই বাসিন্দা নেবাররা হচ্ছে স্বনির্ভর। আজকাল যাতায়াতের সুবিধের জন্য অধিকাংশ লোক কাঠমাণ্ডু থেকে জিনিসপত্র কিনতে চায় বলে ব্যবসা-বাণিজ্যে তারই প্রাধান্য রয়েছে।

রাজধানীর পুরনো অবশেষ দেখতে আমরা শহরে গেলাম। আগে থেকেই লোকে জানত। এক জায়গায় খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। ভাদগাঁও তার জুজুধৌ (রাজদধি)-র জন্য বিখ্যাত। ছড়ানো বাসনে দই জমানো হয় যা থকথকে হয়ে যায়। একটু মিষ্টিও মিশিয়ে দেওয়া হয়। কাঠমাণ্ডুর লোকেরাও জুজুধৌ বানানোর চেষ্ট করে কিন্তু তাতে ভাদগাঁও-এর মতো স্বাদ হয় না। নেপাল উপত্যকার প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত। আমাদের জন্য দই-ভাতের সঙ্গে মোষের মাংসও ছিল। দু-তিনটে জাত ছাড়া এখানকার সব লোকেরা মোষের মাংস খায়। বাজারে তা ছাগলের মাংসের মতোই প্রকাশ্যে বিক্রি করা হয়। মোষের মাংস বোধহয় বেশি ভালভাবে সিদ্ধ করে রান্না করা হলে ভাল লাগত। তা খুব চিমড়ে ছিল। তবে জুজুধৌ-র পাশাপাশি ওর কথা আর কী বলব? জুজুধৌ যত খুশি খেতে পারি।

খাওয়ার পর এখানকার রাজমহল দেখতে পেলাম। সুবর্ণদ্বার এখানকার অদ্ভুত কীর্তি। আগের ভূমিকম্প পুরনো চিহ্নগুলি ধ্বংস করে নি। এখনও রাজপ্রাসাদ, তলেজু মন্দির ইত্যাদি আগের মতোই ছিল। অনেক দেওয়ালে চিত্র ছিল।

লোকের কাছে বক্তৃতা দিই নি তবে খাওয়ার সময় আড্ডা হলো। সব দেখার পর চারটের সময় আমরা বাস স্ট্যান্ডে চলে এলাম। ট্যাক্সি এর মাঝে একাধিকবার কাঠমাণ্ডু এসেছিল। সওয়া চারটেয় তাতে চড়ে আমরা পাঁচটার সময় নিজের দরজায় নেমে গেলাম।

শ্রীবালচন্দ্র শর্মা নেপালী ভাষায় নেপালের সবচেয়ে ভাল ইতিহাস লিখেছেন। তা থেকে

আমিও যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে পূর্বাহ্নেও কথাবার্তা হলো। পরের দিন সকালে এবং সন্ধেয় পাঁচটা থেকে নটা পর্যন্ত তাঁর উত্তমসঙ্গ পাওয়া গেল। আমি কেবল আমার লেখা ইতিহাসের কিছুটা অংশ শোনালাম।

ধিরাজ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভেঙে উপদেষ্টাদের শাসন কায়েম করেছিল। তাদের মধ্যে বড়জোর কেসর শমসেরকেই যোগ্য তথা কর্মতৎপর বলা চলত। এক মন্ত্রী মদ খেয়ে মত্ত। দুপুর দুটোর আগে ঘুম থেকে ওঠার তার ফুরসৎ ছিল না। এদের অযোগ্যতা আর কুশাসনের ফল এদের অধিষ্ঠাতাকে নিঃসন্দেহে ভোগ করতে হবে।

১৪ জানুয়ারি সন্ধেবেলা আমার থাকার জায়গা থেকে একটু দূরে সাহিত্যিকদের সভা হলো। তাতে শ্রীবাবুরাম আচার্য, লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোটা, বালকৃষ্ণ সম, বালচন্দ্র শর্মা, ভীমনিধি তিওয়ারি, সিদ্ধিচরণ, কেদারনাথ ব্যথিত, মহানন্দ সাপকোটা, চিত্রধর উপাসক ইত্যাদি সমস্ত মহান সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। সভা তিন ঘণ্টা ধরে চলল। কবিরা কবিতা শোনালেন। সমজী তাঁর নাটকের কিছু অংশ খুব নাটকীয় ঢঙে পড়লেন। আমিও শেষে কিছু বললাম। সভায় আমার মনেই হচ্ছিল না যে আমি কোনো অন্য ভাষার সাহিত্যিকদের মধ্যে বসে আছি। সত্যিসত্যিই ভাষা আর সাহিত্যের দিক দিয়ে নেপালী আমাদের হিন্দি-এলাকার অনেক ভাষার মধ্যে একটি। চম্বা পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের ভাষাগুলির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। এই একটি সভা থেকে নেপালী সাহিত্যের প্রগতির খবর পেয়ে গেলাম।

সেদিন দুপুরের খাবার খাওয়া হলো কম্পাউন্ডার চন্দ্রভানজীর বাড়িতে। খাবারের মধ্যে শুয়োরের সুস্বাদু রান্নাও ছিল। চন্দ্রভানজীকে জাতীয় আন্দোলনের সময় অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল।

এবার আমি এমন সময়ে নেপাল এসেছিলাম, যখন আকাশ সমানে মেঘে ঢাকা থাকত। একটু-আধটু বৃষ্টিও হয়ে চলছিল। য়মিজীর উঠোনে যতটা খালি জমি ছিল সব চাষ করা হয়েছিল। এরকম উর্বর জমি যে কোনো কৃষক ভাল মালগুজারীতে নিতে রাজি ছিল। কি করে তা ফেলে রাখা যায়? নেপালে সার দেওয়ার ব্যাপারে খুব নজর দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে কৃষক সব সময় কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। শতাব্দি ধরে তারা ভাল বীজও উৎপন্ন করেছে। জলেরও অসুবিধে নেই। আমাদের উঠোনে দু-তিন সেরের ফুলকপি লাগান ছিল। এগুলোকে এখানে বড় ধরা হয় না। মুলো তো এখানে একেকটা দশ সের ওজনের যা কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছিল।

১৫ তারিখে দুপুরের খাওয়া হলো শ্রীকলানাথ অধিকারীর বাড়িতে। কলানাথজী ম্যাকমিলন কোম্পানিতে ভাল বেতনে নেপালী প্রকাশনার আধিকারিক ছিলেন। স্বাধীন নেপালের সেবা করা দরকার—এই ভেবে চাকরি ছেড়ে চলে এলেন। বামপন্থী ভাবনা পোষণ করেন। কারণে-অকারণে প্রতিটি জায়গায় তর্কে নেমে পড়তে তৈরি থাকেন। ঘরের সবাই সংগীতানুরাগী। লোকগীত খুব সুন্দর ঢঙে গান এবং রচনাও করেন। তিনি যদি লোকগীত সংগ্রহ করার ব্যাপারে লেগে পড়তেন তাহলে খুব বড় কাজ করতেন কিন্তু এর গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারেন নি। ছটি বাচ্চা আর দুটি মানুষের খরচ, এই রকম বেকারির মধ্যে, খুবই সংকটের কারণ ছিল। খাওয়ার পরও তিনটে পর্যন্ত আমরা ওখানেই থাকলাম। বাচ্চারা গান শোনাল। তাঁর বোন

কিশোরীজী অত্যন্ত সুকণ্ঠী। নেপাল রেডিওতে গান করেন। তিনিও তাঁর গান শোনালেন। মধুর সংগীতের আনন্দ উপভোগ করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমার মন ব্যথিত হয়ে উঠছিল, যখন মনে হচ্ছিল যে, এত বড় পরিবারের কিচ্ছুটি চিন্তা না করে এই যুবক তাঁর নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন।

আজ সন্ধ্যেয় সাংস্কৃতিক সংঘে গিয়ে ভাষণ দিতে হলো। আমার পুরনো বন্ধু ড· দিল্লীরমণ রেগমী সভাপতি ছিলেন। প্রথমে মাহিলা গুরুজীও কিছু বললেন।

অন্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোযোগ সবসময় নিজের গ্রন্থের তথ্য ও নতুন সামগ্রী সংগ্রহ করার দিকে ছিল। য়মিজীর বাড়ি এখন অখণ্ড সভাস্থল হয়ে গিয়েছিল। লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে আমার দুঃখ ছিল না।

১৬ জানুয়ারি সংস্কৃতের ছাত্রদের সভায় বলার ছিল। রানাদের সংঘর্ষের সময়ে এখানকার সংস্কৃত ভাষার ছাত্ররা খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। আমি তাদের সভায় যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা দু-ঘণ্টা পরে এলো আর ওদিকে কন্যা মন্দিরের প্রোগ্রাম মাথার ওপর এসে পড়েছিল। সংস্কৃত-ছাত্রদের কাছে যাওয়া প্রত্যাখ্যান করতে হলো। এজন্য তাদের দুঃখিত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু আমার কী অপরাধ? তবে হ্যাঁ, এই প্রত্যাখানের জন্য তখন খুবই অনুশোচনা হলো যখন শুনলাম কন্যা মন্দিরে সভা হবে না।

১৭ জানুয়ারির মধ্যাহ্নভোজন হলো শ্রীমাধবজীর বাড়িতে। মাধবজী মরিশাসে জন্মেছিলেন। তারপর ভারতে এসে ইউনিভার্সিটির শিক্ষা শেষ করলেন। 'আজ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে খুব যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। তাঁকে মরিশাসের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি ভারত থেকে নেপালে চলে আসেন। ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি আর হিন্দি তিনটে ভাষাতেই তাঁর দখল ছিল। এখানে কোনো স্থায়ী চাকরি ছিল না, শুধু টিউশনের ভরসা। বিয়ে করে ফেলেছিলেন এবং একটি বাচ্চাও হয়েছিল। আমি তাকে বলতাম, 'এসব ছাড়ো, মরিশাসে গিয়ে কাজ করো।'

১৮ জানুয়ারি মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। শ্রীচন্দ্রমান মাস্কে একজন শিল্পী। তখন রানাতন্ত্রের জেলে কয়েক বছর থেকেছেন। তিনিই ওখানকার কিউরেটর ছিলেন। আগেরবার এটা দেখেছিলাম, তখনের থেকে এখন সামগ্রী অনেক বেশি। ভালভাবে ব্যবস্থা করে রাখাও হয়েছে। কিন্তু নেপালের পক্ষে তা উপযুক্ত নয়। এখানে প্রাচীন বস্তুর ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে আছে। কোনো ইংরেজ লিখেছিলেন, এখানে বাড়ির চেয়ে বেশি মন্দির আর মানুষের চেয়ে বেশি মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে অনেক ভাঙা অবস্থায় জায়গায় জায়গায়—চৌরাস্তা, গলি আর খেতে পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে দেড় হাজার বছরেরও পুরনো কিছু মূর্তি আছে। সেগুলি মিউজিয়ামে সংগৃহীত হওয়া দরকার। শিলালেখের এত কম সংগ্রহ দেখে এবং স্থানে স্থানে সেগুলিকে নষ্ট হওয়ার জন্য ফেলে রাখাতে মনটা খচখচ করছিল। চিত্রপটের সংগ্রহ ভালই বলা যায়। সবচেয়ে ভাল সংগ্রহ ছিল পুরনো হাতিয়ারের, যার মধ্যে দ্রব্যশাহ ও পৃথ্বীনারায়ণের নিজের হাতের শস্ত্রও ছিল।

মিউজিয়াম থেকে আবার কিন্দু বিহার গেলাম। প্রথমবার তিব্বত যাত্রায় আমি এখানে অজ্ঞাতবাস করেছিলাম। বাগিচার সেই নির্জন বাড়িটি খুঁজলাম, যেখানে রাতে আধঘণ্টার জন্য বাইরে বেরোন ছাড়া আর সবসময় বন্দী থাকতাম, এই ভেবে যে, রানার কর্মচারীরা যেন জানতে

না পারে এবং আমার তিব্বত যাওয়ায় যেন বাধা না পড়ে। কিন্তু সেটা দেখতে পেলাম না। কিন্দুতে আগে একটি মাত্র বিহার ছিল। এখন সেখানে তিনটে হয়ে গিয়েছিল। গত বত্রিশ বছরে বৌদ্ধধর্মের প্রতি লোকের আকর্ষণ খুব বেড়েছে। তিনটে বিহারের মধ্যে একটির নাম কুশীনারা। একটি বিহারে তিব্বতের একজন সম্মানীয়া ভিক্ষুণী এসে উঠেছিলেন।

মিউজিয়াম থেকে এদিকে আসতে প্যারেডের খুব বড় মাঠ পেলাম। মাঠের একদিকে সেপাইদের ব্যারাক রয়েছে। ভারতীয় সেনা-অফিসার নেপালী সৈন্যদের শেখানো-পড়ানোর কাজ করছে। লোকে অভিযোগ করছিল, 'আগের সেপাইরা পরিশ্রমী ছিল। ফসলের সময় গিয়ে বাড়িতে কাজ করত। এখন বিশেষজ্ঞরা তাদের শিখিয়েছে যে তোমাদের কাজ শুধু বন্দুক চালানো আর লেফট-রাইট করা। এজন্য তারা সুকুমার হয়ে গেছে।' আমাদের অলস অফিসার এছাড়া কী শেখাবে? তারা শুধু ইংরেজ সৈনিকদের সম্বন্ধে জানে আর তাদেরকেই নিজেদের আদর্শ মনে করে। তারা জানে না যে, চীন ও রাশিয়ার কাছেও ভাল সৈন্যবাহিনী আছে যারা ভয়ংকর লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে এসেছে। সেখানে সৈন্যদের শুধু কুচকাওয়াজ-প্যারেডই তাদের কাজ বলে বুঝিয়ে দেওয়া হয় না। তিব্বতে জলপথ আর স্থলপথে জাল বিছানোয় সৈনিকরা খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে।

কিন্দু থেকে স্বয়ম্ভু গেলাম। এটা এখানকার সবচেয়ে পবিত্র ও পুরনো বৌদ্ধ-স্তূপ। কিন্তু নোংরা দেখে শরীর খারাপ হয়ে যায়। বাঁদররা আরও নরক করে রেখেছে। ওখান থেকে একটু নেমে আনন্দ বিহারে গেলাম। এখানে গুরুকুলের মতো একটি বিদ্যালয় খোলা হয়েছে, যাতে তিনটে শ্রেণীতে ছাত্ররা পড়ে। ভাজুরত্ন সাহুর উৎসাহ আর ভক্তির প্রমাণ এটা।

বাড়ি ফিরে এলাম। শ্রীবালকৃষ্ণ শমসেরের বাড়ি থেকে মোটর এলো এবং চা খাওয়ার জন্য তাঁর বাড়ি গেলাম। বালকৃষ্ণও হচ্ছেন রানাবংশের। খুব সম্ভব এই বংশ মূলত মগর, তা নইলে খশ অবশ্যই। মগরদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও আছে। পালপা-এর রাজা ছিলেন মগর, যাদের বিবাহ-সম্বন্ধ হতো সমতলের রাজপুত ঘরানায়। পুরনো রানাদের মুখের মঙ্গোলীয় ছাপই বলে দেয় যে, তাদের মধ্যে মগর-গুরুংদের মতো কিরাত বংশীয় জাতির রক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রভুত্ব প্রাপ্তির পর রানা সূর্যবংশী সিসোদিয়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক না জুড়ে কিভাবে থাকতে পারত? তিনি উদয়পুরের রানার কাছ পর্যন্ত ছুট দিলেন—আমাকে আপনার বংশের বলে স্বীকার করে নিন। যদি স্বীকার করে নিতেন, তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। আসলে আজ রাজস্থানের সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয়রা জাঠ এবং মারাঠী রাজাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করছেই। রানারা যদিও বিয়ের জন্য বা রক্ষিতা রাখার জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল কিন্তু নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য সেই সন্তানদেরই আসল সন্তান বলে মানত যারা রাজপুত নারীদের গর্ভে জন্মাতো। সমজীর বাবাও রাজপুত মায়ের সন্তান ছিলেন না, এজন্য তিনি তিন সরকারের আধিকারিকদের সূচিতে পড়তে পারেন নি। তিন সরকার হওয়ার অধিকার না থাকুক কিন্তু পিতার উদারতা তো পুত্র পেয়েই থাকে। সমজীর বাবাও বেঁচে ছিলেন। সমজীও এখন দাদুর বয়সী। রানাবংশে এখন শিক্ষার কিছুটা প্রচার হয়েছিল কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের দিকে বিশেষ উন্নতি কেউই করে নি। সমজী এর ব্যতিক্রম। তাঁর বাড়ির সবাই শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী। তিনি নিজে নাট্যকার। তাঁর পুরনো মূর্তির সংগ্রহ বেশ ভাল আর বিশাল, যা থেকে বোঝা যায় যে, বহু বছর ধরে তিনি এই দিকে

মনোযোগ দিয়েছিলেন। চিত্রকলারও শখ তাঁর ছিল। চা খেতে খেতে পরিবারটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার খুব আনন্দ হলো।

১৯ তারিখের রাতের খাওয়া হলো ইন্দ্রচকে শ্রীশিবপ্রসাদ রৌনিয়ার বাড়িতে। রৌনিয়ার লোকরা হচ্ছে ভোজপুরী এলাকায় বসবাসকারী ব্যবসায়ী। পুরনো যুগেও এদের সঙ্গে কারবাঁ[১] থাকত, যা শুনে আমার 'শোভনায়কা'-র পঁবাড়া[২] মনে পড়ত। শিবপ্রসাদজীর পূর্বজরা অনেকে প্রাচীনকাল থেকে নেপালের সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসা করত। বলদের পিঠে কাপড় বোঝাই করে তারা এখানে পৌছত এবং তা বিক্রি করে চলে যেত। কোনো একবার তাদের কাপড় বিক্রি হলো না। তারা কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে এখানেই রয়ে গেল। তারপর তো এমন হলো যে ওরা এখানেই বসবাস করতে লাগল। আজ তাদের চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্ম চলছে। এখন দেশের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কেবল বিয়ে-শাদি করাটুকু নিয়ে। শিবপ্রসাদজীর কাছ থেকে জানা যায় নি কিন্তু পরে লহেরিয়াস রায় পুস্তক ভাণ্ডার-এর মালিক শ্রীরামলোচনশরণ বিহারীর কাছ থেকে জানা গেল যে, শেরশাহ্-র যোগ্য মন্ত্রী এবং পরে হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য নামে কয়েকদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন সেই বীরের জন্ম হয়েছিল রৌনিয়ার কুলেই। পশ্চিম এবং পূর্বের বণিকদের মধ্যে, বিশেষ করে ভোজপুরী অঞ্চলের বণিকদের মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে পশ্চিমবাসী অগ্রবাল ইত্যাদি নিরামিশাষী কিন্তু পূর্ববাসীরা হচ্ছে আমিশাষী। শিবপ্রসাদজীর মা সীবান (ছাপরা)-এর মানুষ ছিলেন। তিনি ছাপরার ধরনে আমিষ খাবার তৈরি করেছিলেন।

২১ জানুয়ারি মাহিলা গুরু আমাদের বাড়ি চলে এলেন। এটা কোনো আশ্চর্য ব্যাপার ছিল না। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এমনই ছিল। কিন্তু তাঁর শরীর এখন খুব খারাপ ছিল। আর চেহারায় বার্ধক্যেরও খুব ছাপ ছিল তাই তাঁর আসাটা আমার ভাল লাগল না। আমি নিজে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি বলতে লাগলেন, 'কোনো ব্যাপার নয়, খুব দূর তো নয়, আমি ধীরে ধীরে এসেছি।' তারপর তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে নেপালের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। তিনি ছিলেন নেপালের বিশ্বকোষ, তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ হতো। আমি আমার হিমালয় সম্পর্কিত গ্রন্থে সেখানকার জাতিদের সম্বন্ধেও একটি অধ্যায় রেখেছি। নেপালের আড়াই-তিনশো ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণের সূচিও দিয়েছিলাম। নেপালী ব্রাহ্মণরা কুমাই আর পূর্বিয়া দুটি ভাগে বিভক্ত। আমি এরকমই শুনে এসেছিলাম যে, কুমাই ব্রাহ্মণরা কুমায়ুন থেকে এসেছে। মাহিলা গুরুর পরিবারকেও বলা হতো কুমাই ব্রাহ্মণ। যখন প্রাপ্ত সামগ্রীর বিশ্লেষণ করলাম তখন আমার বোধগম্য হতে লাগল যে, কুমাই-এর অর্থ আজকের কুমায়ুন থেকে নয় বরং পুরনো কুমায়ুন থেকে আসছে, য়ার সীমা কর্ণালী ও তার শাখাগুলি পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। হতে পারে কত্যুরীয়দের সময় সপ্তগণ্ডী অঞ্চলেও হয়তো কুমায়ুনের শাসন ছিল। এরা তাদের পুরনো সম্পর্কের কারণে হয়তো কুমাই বলে আসছে, যাকে আজকের ভূগোলের সঙ্গে জুড়ে লোকে এটা ভাবতে শুরু করেছে যে, এরা কুমায়ুন থেকে এসেছে।

[১] Caravan—নিরাপত্তার জন্য একত্র ভ্রমণকারী মরুযাত্রিদল বা ঢাকনাওলা বৃহৎ শকটবিশেষ।—স·ম·

[২] এক ধরনের গ্রামীণ সংগীত বা শ্রোতাকে ক্লান্ত করে তোলে এমন দীর্ঘ গল্প।—স·ম·

আমি আমার ভাবনা মাহিলা গুরুকে বললাম। তিনি সমর্থন করে বললেন, 'এটা অবশ্যই সম্ভব হতে পারে।' সেদিন হনুমান ঢোকা ইত্যাদি কাঠমাণ্ডুর পুরনো রাজপ্রাসাদ দেখতে গেলাম। নেপালী বাজারে লোকজনের মধ্যে খুব অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ নেপালী টাকার মূল্য কমে যাচ্ছিল। যা কখনো ভারতীয় টাকার সমান ছিল তা এখন ভারতীয় টাকার ১৫১ টাকায় পৌছে গিয়েছিল—আমার সামনে ১৬০ পর্যন্ত উঠে গেল। নেপাল ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণ জিনিসপত্র আনায় যার মধ্যে অনেক কিছুই হচ্ছে শৌখিন। যে পরিমাণ জিনিস আনায় সেই পরিমাণ নিজের জিনিসই নেপাল বাইরে পাঠাতে পারত, এই কারণেই নেপালী টাকার মূল্য কমে যাচ্ছিল। সে-সময় ব্যবসাতে নিয়ম-শৃঙ্খলার কোনো ঠিকই ছিল না। কাস্টম-এর চোখ বাঁচিয়ে জিনিস আনানো, বড় বড় লোকের চোরা বাজারে যুক্ত হওয়া সব তুচ্ছ ব্যাপার ছিল, যার জন্য অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

২১ জানুয়ারি যুদ্ধ-সড়কের একটি ভোজনালয়ে আমরা খেতে গেলাম। দু-জন লোকের খাওয়ার জন্য চার টাকা খরচ করতে হলো। সে খাওয়া যে খুব ভাল ছিল তা বলা যায় না।

নেপাল উপত্যকা গোর্খাশাসনের আগে শুদ্ধ নেবার ভাষার দেশ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে গোর্খাশাসিত রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর এখানে পশ্চিম-নেপালের লোকেরাও এসে বাস করতে শুরু করে। তবু এখানকার বহুসংখ্যক লোক নেবার বলে। আমরা যাকে নেবার ভাষা বলি তাকে ওরা গোর্খালি ভাষা বলে। নেবার ভাষার নিজেকে নেপালী ভাষা বলাটা সম্পূর্ণ উচিত তবে দুটি ভাষাকে পৃথক করার জন্য একটিকে নেপালী আর অন্যটিকে নেবার ভাষা বলাটাই ঠিক। কিন্তু নেবারভাষী লোকেরা নিজেদের অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। নেবার ভাষার কিরাত ভাষার বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে। যদিও তাতে সংস্কৃতর তৎসম ও তদ্ভব শব্দ প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। এর লিখিত সাহিত্যও খুব পুরনো এবং সমৃদ্ধ। এখন তো সেই ভাষায় পত্রপত্রিকাও বের হয়, সাহিত্য সৃষ্টিও হচ্ছে। নেবার মহিলাদের মধ্যে এখনও এমন অনেককে পাওয়া যাবে যারা গোর্খালি ভাষা বোঝে না।

২২ জানুয়ারি নেপাল ভাষা সাহিত্য-সম্মেলন-এর প্রথম অধিবেশন হয় হনুমানঢোকা-র সেই বিশাল অঙ্গনে, যেখানে আজ থেকে পৌনে দুশো বছর আগে তা রাজভাষা হিসেবে বিরাজমান ছিল। নেবার সরস্বতী আজ সেই অঙ্গনে মুখরিত হচ্ছিল। বাইরের অঙ্গনের এক দিকের একটি ফটক দিয়ে আমরা ভেতরের একটি ছোট অঙ্গনে গেলাম। সেখানে নিধন-পর্ব হয়েছিল—কান্ছা মহারানীর হুকুমে জংবাহাদুর এবং তার ভাইয়েরা নিরস্ত্র লোকেদের সঙ্গে রক্তের হোলি এখানেই খেলেছিল, তাদের নির্মমভাবে বধ করেছিল। সেই জানলাও বর্তমান ছিল, যেটা দিয়ে সেই নিষ্ঠুর রানী হুকুম দেওয়ার পর এই বীভৎস দৃশ্য দেখার আনন্দ উপভোগ করছিল। নেবার ভাষার এটা ছিল প্রথম অধিবেশন কিন্তু তা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, নেবারভাষীদের মধ্যে পরিপক্কতা আছে।

পাটনার শ্রীকীর্তিরাজ ঢাকবা আমার খুব পুরনো বন্ধু। প্রথম তিব্বত-যাত্রায় আমি লুকিয়ে নেপাল থেকে সেখানে গিয়েছিলাম এবং একমাসেরও বেশি যাত্রা করার পর শিগর্চে তাঁর ঘরে উঠেছিলাম। তাঁর কাছেই আমি নিজের রহস্য জানিয়েছিলাম। কীর্তিরাজ সে সময় তরুণ ছিলেন এখন বৃদ্ধ। ৩০-৩২ বছর যে কেটে গেছে। তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা করা নেপালীদের মধ্যে

ঢাকবাকে খুব ধনী ও সম্মানিত মনে করা হতো। কীর্তিরাজজী আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। আমি যদি টশীল্‌হুন্‌পো-তে থাকতে চাইতাম তাহলে আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য তাঁর বাড়ি প্রস্তুত ছিল। তিনি তাঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

২৩ জানুয়ারি আমরা তাঁর সঙ্গে মোটরে করে গেলাম। পথে সেই বৃক্ষটি দেখলাম যাতে ঝুলিয়ে শহীদ শুক্ররাজ শাস্ত্রীকে গুলি মারা হয়েছিল। বৃক্ষটি কাটতে রানার কর্মচারীরা ভুলে গিয়েছিল। লোকে সেটিকে সিঁদুর দিয়ে রেখেছিল।

মেঘ কেটে যাওয়ার নাম করছিল না। ঠাণ্ডা নিয়ে আমি অভিযোগ করতে পারতাম না, কেননা মুসৌরীর ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত ছিলাম। নেবার কৃষক যেমন তার জমির এক এক আঙুলের মূল্য উশুল করতে চায়, নেপালী গৃহস্থও তেমনি তার বাড়ির এক আঙুল জমিও নষ্ট হতে দিতে চায় না। যতটা উচ্চতায় আমাদের দোতলা বাড়ি হয় ততটা উচ্চতাতেই সেখানে চারতলা বাড়ি হয়ে যায়। আমাদের হর্নক্লিফ বাংলো যত উঁচু তাতে তো তারা চারতলা বাড়ি বানাতো এবং সে-সময়, বিশেষ করে শীতে, তা বেশি আরামপ্রদ হতো, কারণ সামান্য আগুন জ্বাললেই বাড়ির ভেতরের হাওয়া গরম হয়ে যেত। তবে হ্যাঁ, এই অসুবিধেটা হতো—আমার মতো লোককে প্রতিটি দরজায় মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করতে হতো। বাইরে থেকে দেখলে বাড়িগুলোকে যতই সাধারণ মনে হোক, গলি এবং উঠোন যতই নোংরা দেখাক, ভেতরে কিন্তু তা বেশ পরিষ্কার আর সুন্দর করে সাজানো থাকত। পাটনের অনেক ব্যবসায়ীর তিব্বতের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে। তাদের ঘর সাজানোর জন্য তিব্বতের জিনিস ব্যবহার করা হয়। পাটন তার পুরনো মন্দিরের জন্য কাঠমাণ্ডুর চেয়ে কম প্রসিদ্ধ নয়, উপরন্তু ধাতুর বাসন এবং মূর্তির ব্যাপারে সে-ই এগিয়ে আছে। কাঠমাণ্ডু ও পাটনের মাঝে শুধু বাগমতী রয়েছে, যেটি যে কেউ নিজেই পার হতে পারে। মোটরের জন্য লোহার পুল দিয়ে যেতে হবে, সেটা রয়েছে থাপাথলিতে। পাটনও নেপালের তিনজন রাজার মধ্যে একজনের রাজধানী ছিল। সেখানকার মছেন্দ্রবিহার খুব শ্রদ্ধেয় দেবালয়। সিদ্ধ মছেন্দ্রর সঙ্গে খামোকো এর সম্বন্ধ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে এটি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের বিহার। পাটনের রাজাদের মন্দির আর প্রাসাদ বানানোর খুব শখ ছিল। কৃষ্ণ মন্দিরটিতে সমতলের নিদর্শন অনুযায়ী পাথরের শিখরদ্বার বানানো হয়েছে। এমনিতে নেপালের মন্দিরগুলির নিজস্ব বিশেষ শৈলী আছে যা এখান থেকে তিব্বত-চীন হয়ে জাপান পর্যন্ত চলে গেছে। এতে কাঠের ব্যবহার হয় বেশি যার ফলে সেগুলি ভূমিকম্পও বেশি সহ্য করতে পারে।

কমলা কিছু বাসনপত্র কিনল। চা খাওয়ার জন্য আবার আমরা কীর্তিরাজজীর বাড়ি গেলাম। নীচের উপত্যকায় বৃষ্টি পড়েছে। নেপাল উপত্যকাকে ঘিরে থাকা পাহাড়গুলি ছ-সাত হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। সেগুলির ওপরে বরফ পড়ে গিয়েছিল। উপত্যকায় কদাচিৎ বরফ পড়তো। বাড়ি ফিরে জানলাম শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ কোইরালা এসেছিলেন।

২৪ জানুয়ারি স্বর্ণকাররা ধর্মঘট করল। নেপালী টাকার মূল্য কত অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তা এ থেকে বোঝা যায় যে, এক দিনে তিন-চার টাকার তফাৎ হয়ে যাচ্ছিল। এমন অবস্থায় কে আর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করার সাহস করবে?

সেদিন চারটের সময় শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ কোইরালা তাঁর গাড়ি নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে কবি লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোটার বাড়ি গেলাম। বিশ্বেশ্বর প্রসাদ হচ্ছেন নেপালী ভাষার সিদ্ধহস্ত লেখক,

যদিও রাজনীতি তাঁকে এদিকে এগোনোর সময় দেয় না। দেবকোটাকে দেখে আমার বার বার নিরালাজীকে মনে পড়ছিল—সেই রকম অকৃত্রিম সৌহার্দ আর সেই রকমই কাব্যপ্রতিভা। এখন তাঁর বয়স ছিল ৪৪ বছর। তাঁর যুবক পুত্র সদ্য মারা গিয়েছিল। সেই গভীর দুঃখ তাঁর মনের ওপরে ছিল। তিনি মুখে তা প্রকাশ করতে চাইতেন না। বহুদিন ধরে তিনি মাসিক একশো টাকা বেতনে 'নেপালী ভাষা প্রকাশনী সমিতি'-তে চাকরি করেছিলেন। ওকালতি পাস করা ছাড়াও তিনি পাটনা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট ছিলেন, তবু তিনি এই রকম অবস্থায় থাকছিলেন। তিনি নিজেও তাঁর লেখাগুলির সুরক্ষার কথা চিন্তা করতেন না। লিখতে-ছিঁড়তে-ভুলতে তাঁর দেরি লাগত না। তাঁর ২৬টি বই সমিতির অবহেলায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রমিথিউস তিনি নেপালী ভাষাতেও লিখেছেন। একবার ১২-১৩ অধ্যায় লিখে ফেলেছিলেন যা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয়বার সেটা লিখছিলেন। ক্ষেতের মাঝখানে একটি বাড়িতে তিনি সপরিবারে থাকতেন। এবারের নেপাল-যাত্রায় সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিলেন যে ব্যক্তি তিনি ছিলেন দেবকোটা।

২৫ জানুয়ারি খাওয়ার পর জনকলালজীর সঙ্গে আমি বৌদ্ধা গেলাম। কাঠমাণ্ডু ও দেবপাটন থেকে ভিন্ন জায়গায় নেপালের এটা সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ স্তূপ, আয়ুর দিক দিয়েও যা খুব প্রাচীন। তিব্বত আর মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত এর মহিমা ছড়িয়ে গেছে। ভেবেছিলাম কাছেই, কিন্তু যেতে যেতে বুঝতে পারলাম চার পাঁচ মাইলের কম হবে না। এই বিশেষ স্তূপের পরিধির চারদিকে দোতলা-তিনতলা ঘর আছে যার নীচের অংশে দোকানদার এবং ওপরের অংশে তীর্থযাত্রী থাকে। শীত পড়ায় এখন অনেক তিব্বতী লোক এসে পড়েছিল। চিনিয়া লামার কাছে গেলাম। প্রথম তিব্বত-যাত্রায় তাঁর বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ডুকপা লামার সঙ্গে তিব্বত যাওয়ার লোভে এঁদেরই একটি ঘরে আমি স্বেচ্ছায় নজরবন্দী হয়ে ছিলাম। সে-সময় তিনি যুবক ছিলেন। তাঁর বাবা চীনা ছিলেন, কিন্তু এখানে এসে তিনি তিব্বতী মহিলাকে বিয়ে করেন। কত বছর বাদে দেখা। তাই লামার চিনতে একটু দেরি হলো। বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বিলাসী জীবন ছিল। আর মদের যা স্বাধীনতা ছিল! লোকে বলছিল—খুব টাকা রোজগার করেছেন। কিছুক্ষণ বসে আনমনা হয়ে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে সাক্যার ফুনছোক্ মহল-এর আমার দয়ালু লামা এখন আর নেই। তাঁর পরে ডোলমা প্রাসাদের লামা গদিতে বসলেন। তিব্বতের তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে জানা গেল যে, তাদের সঙ্গে করে টাকা পয়সা আনায় কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। গত বছরের চেয়েও এ বছর বেশি যাত্রী এসেছে। লাল সৈনিকরা এখনো সবাই সীমান্ত-চিহ্নের কাছে পৌঁছয়নি। জায়গিরদারীতে এখনো হাত দেয় নি তবে গ্রামের জায়গায় জায়গায় পাঠশালা খোলা হচ্ছে।

বৌদ্ধা পরিক্রমা করে সাড়ে চারটেয় ওখান থেকে বাড়ি ফিরলাম। সেদিন ড· রেগমীর বাড়িতে চা খাওয়ার ছিল কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম।

২৬ জানুয়ারি সিংহ দরবার গেলাম। চন্দ্র শমশের কয়েক কোটি টাকা ঢেলে এই বিশাল মহল বানিয়েছিলেন। আগে এখানে জনসাধারণ কি আর যেতে পারত? এখন এটা সচিবালয়, যার দপ্তর হচ্ছে এর ঘরগুলিতে। সচিবালয় থেকে কিছু খবর নিতে চাইছিলাম। এখনো সেই নর শমশের ছিলেন পুলিসের সর্বোচ্চ অফিসার, যিনি তাঁর ক্রূরতার জন্য রানাশাসনে কুখ্যাত ছিলেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল শাসনের ক্ষেত্রে কত সামান্য পরিবর্তন হয়েছে।

উপদেষ্টাদের মধ্যে জেনারেল কেসর শমশের ছিলেন সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী, কর্মদক্ষ এবং আমার পূর্ব পরিচিতও। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম কিন্তু সেখান এত ভিড় ছিল যে কথাবার্তা বলা যাবে এটা আশা করি নি। দেরি হচ্ছে দেখে আমি সেখান থেকে ফিরে গেলাম। কোনো লোকে খবর দিয়েছিল। তিনি একজনকে দৌড়ে পাঠালেন আর তারপর নিজে দৌড়তে দৌড়তে এলেন। আমার চেয়ে দু-চার বছরের বড়ই হবেন। আমার অনুতাপ হলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললাম এবং ৩১ তারিখে দশটার সময় তাঁর বাড়িতে যাব কথা দিলাম। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তো এলেন না, তবে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলকে জেনারেল অফিসে পেলাম। এখানকার অনুমতিপত্র (রাহদানী) ছাড়া বিমানের টিকিট পাওয়া যাবে না তাই আমরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সিংহ দরবারের এর চেয়ে ভাল ব্যবহার আর কী হতে পারে? অনেক বড় বড় হল দেখে, গ্যালারি দেখতে গেলাম। বিশাল হল, সেখানে বিভিন্ন রকমের ছবি টাঙানো রয়েছে—শিকারের ছবি তো প্রচুর। সবই আধুনিক ধরনের। এই ঘরেই রানা তানাশাহ্ তাঁর ইংরেজ অতিথি আর প্রভুদের স্বাগত জানাতেন। নেপাল হচ্ছে পাথরের দেশ কিন্তু এই বিশাল মহল বানাতে ইটই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। বাস্তুকলার দৃষ্টিতে এটা হচ্ছে ইউরোপীয় স্থাপত্যের অন্ধ অনুকরণ, যার মধ্যে নেপালী ধরনটি সম্পূর্ণ বয়কট করা হয়েছে।

ওখান থেকে রেডিও স্টেশন গেলাম। রেডিওর মেশিন নেপালী কংগ্রেস তাদের সংঘর্ষের দিনে কোথাও থেকে পেয়েছিল, সেটাই এখন কাজ করছিল।

বাইরে বেরিয়ে আমরা জংবাহাদুরের বাড়ি দেখতে গেলাম। এই এলাকাটিকে থাপাথলী বলা হতো। পুরনো প্রাসাদ খুঁজে বের করতে খুব দেরি হলো। এখন তা শূন্য এবং ধসে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। উঠোনে শরণার্থী অবধ-এর বেগম এবং দাদুর রানীর হাভেলী ছিল, যা এখন ভেঙে পড়েছে।

সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আরো একটি পুরনো প্রাসাদ পেলাম। জংবাহাদুরের বাড়ির মতো তা অতটা পুরনো নয়। আমি ওটার সম্বন্ধে জানতে চাইছিলাম, ঠিক তক্ষুণি এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বেরোলেন। তিনি সে-সময় ওই প্রাসাদে থাকতেন। নাম জানা গেল মুসৌরী শমশের। দেব শমশের অত্যন্ত সজ্জন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ভালমানুষির জন্য দ্রুত পদ ছেড়ে তাঁকে নেপাল থেকে পালাতে হয়েছিল। তাঁর করিৎকর্মা অনুজ চন্দ্র শমশের তাঁর স্থান নিয়ে নিয়েছিলেন, দেব শমশের মুসৌরীতে নিজের জন্য মহল বানিয়েছিলেন। সেখানে জন্ম হওয়ার জন্য পুত্রের নাম মুসৌরী শমশের রাখা হয়েছিল। কনভেন্ট এবং ইউরোপিয়ান স্কুলে পড়েছিলেন। তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি ইংরেজিতেই পড়তেন। না তাঁর নেপালী সাহিত্যের সঙ্গে কোনো সংযোগ ছিল আর না হিন্দি সাহিত্যের সঙ্গে ছিল। তবে হ্যাঁ, আমি মুসৌরীতে থাকি শুনে তাঁর কৌতূহল হলো। লেখক জানতে পেরে বললেন, 'আপনি তো রানাদের বিরুদ্ধে লিখবেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু দেব শমশরের বিরুদ্ধে নয়।'

ওখান থেকে টুণ্ডী খেল, ধরহরা হয়ে কালকের ভুলের মাপ চাইতে ড· দিল্লী রমণ রেগমীর বাড়িতে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে পেয়ে গেলাম। নেপালের রাজনীতি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা হলো। তিনি নিজের লেখা বইও আমাকে দিলেন। ফেরার সময় রাস্তায় শঙ্খাসুরের

শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষ প্রদর্শনী দেখতে ভালবাসে। নেপালের নাগরিকদের অবশ্যই তাতে বিশেষ আগ্রহ থাকে।

২৭ জানুয়ারি কখনো রোদ, কখনো ছায়া ছিল। দশটা পর্যন্ত আমরা আমাদের জায়গাতেই ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া মূলত বাইরেই করতে হতো। তবে সকালের জলখাবার য়মীজীর বাড়িতে খেতাম। স্বয়ম্ভূর পিছনে ছিল স্বামী ঈশ্বানন্দজীর আশ্রম সরস্বতী আখড়া। ঈশ্বানন্দজী শিক্ষিত, সুসংস্কৃত ও জনসেবা করা মানুষ। স্বয়ম্ভূ পর্বতের পিছনের দিকে অবস্থিত এই সরস্বতী আখড়া প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এখানেই খাওয়া হলো। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। এখান থেকে পাহাড়ের সেই অংশটা দেখা যাচ্ছিল,যেখান দিয়ে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার বাস রাস্তা হওয়ার কথা। দূর অব্দি ছিল শুধু খেত আর খেত। বস্তুত, নেপাল উপত্যকা কৃষির পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত মাটি। বৃষ্টি খুব হয় বলে সেচের জন্য পাহাড়ের ওপরে জলাশয় তৈরি করাটা অসুবিধের নয়। মানুষজন চিরদিনই পরিশ্রমী কিন্তু সেই পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল তারা পায় না। নেপালী শিল্পীরা নিজের কাজে খুব দক্ষ। তারা তাদের এই খ্যাতিকে কখনোই লোপ পেতে দেয় নি, যা এক সময় চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিরাট এক রাহু থেকে নেপাল মুক্ত হলো কিন্তু এখন তার লক্ষ্য কী তা সে জানে না। ঈশ্বানন্দজী বলছিলেন, 'এখান থেকে পাঁচ দিনে চিতৌন পৌছান যায়। নেপালের পুরনো রাস্তা এদিক দিয়েই ভিখনাঠোরী হয়ে যেত। ভিখনাঠোরীর কাছে রমপুরবায় এখনো দুটি অশোকস্তম্ভ বিদ্যমান, যা সম্ভবত তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। ওখান থেকে ফেরার সময় আনন্দকুটী বিদ্যাপীঠে আবার গেলাম। ৩০-৩৫ জন ছেলে স্বাগত জানাল। এখানেই চা খাওয়া হলো।

বিকেল পাঁচটার সময় মাহিলা গুরুর সভাপতিত্বে 'নেপালী শিক্ষা পরিষদ'-এর সভায় আমি শিক্ষার বিষয়ে ভাষণ দিলাম। ভাষা সম্বন্ধে আমার ভাবনা-চিন্তা নিয়ে যাতে কোনো ভুল ধারণার অবকাশ না থাকে তাই ভাষানীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলার সময় আমি জানালাম যে, ভারতে হিন্দির যে স্থান আছে, সমগ্র নেপালে নেপালী (গোর্খালি) ভাষার সেই স্থান রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু নেপাল হচ্ছে বহু ভাষার দেশ। এখানকার লোকদের যদি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাক্ষর এবং শিক্ষিত করে তুলতে হয় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে তাদের নিজস্ব ভাষাকে। নেবার ভাষার নিজস্ব প্রাচীন লিখিত সাহিত্য আছে। তাতে শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রম তৈরি করা কঠিন নয়। কিন্তু গুরুং, মগর ইত্যাদি ভাষাগুলিকেও দেবনাগরী লিপিতে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে, যা এখনো পর্যন্ত লেখা হয় নি। কিছু লোকের ধারণা ছিল যে, আমি নেপালী ভাষার দিকটিকে দুর্বল করে দেখাব কিন্তু দুর্বল দেখানো তো দূরের কথা তাকে আরও সবল দেখিয়ে বললাম, 'যে-রাষ্ট্রে অনেকগুলো ভাষা আছে সেখানে একটি সম্মিলিত ভাষার অত্যন্ত প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে নেপালে তা আগের থেকেই আছে। এ জন্য আমাদের তাকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। নেপাল নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় খুলুক, সেখানে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হোক নেপালী।' মাহিলা গুরুও শেষে তাঁর ভাষণে আমার ভাবনাগুলির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করলেন। 'নয়া নেপাল' ভাষা সম্বন্ধে কিছু ভুলভাল কথা লিখে দিয়েছিল যে-কারণে আমাকে সেদিন আমার ভাবনাগুলি আরও স্পষ্ট করার দরকার হয়েছিল।

২৮ জানুয়ারির মধ্যাহ্নভোজন হলো শ্রীগণেশমানজীর বাড়িতে। স্বাধীনতা আন্দোলনে

রানাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণেশমানজী খুব সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁকে অনেক কষ্টও সহ্য করতে হয়েছিল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। যারা তাঁকে মস্তিষ্কবিহীন তোতাপাখি বলতে চাইত তাদের কথা আমার ঠিক মনে হয় নি। তিনি বলতে এবং বুঝতে সক্ষম ছিলেন। বলছিলেন, 'রানা-নেহেরু-ত্রিভুবন—এই তিনের পাল্লায় পড়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা তার কাজে সফল হলো না। নেহেরু এবং তাঁর প্রতিনিধি চন্দ্রেশ্বর সিং এখানে যে কোনোরকম প্রগতিশীল পদক্ষেপ নেওয়ার বিরোধিতা করতেন।' রানা নজরবন্দী থেকে ছাড়া পেতেই ধিরাজের বাইরের দুনিয়ার হাওয়া লাগল এবং সে ফূর্তির ফোয়ারা ওড়াতে লাগল। রানা বছরে ৮৮ হাজার টাকা খরচের জন্য দিতেন। প্রথম অস্থায়ী সরকার তা ছ-লাখ করে দিল। মাতৃকা-মন্ত্রীসভা দশ লাখ দিল। এখন নেহেরুপন্থী উপদেষ্টাদের কৃপায় বছরে বিশ লাখের ওপর সে পাচ্ছে। মোহন শমশের ৮০ লাখের বেশি সোনা-রুপোর সম্পত্তি নেপালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বাধা দিলাম। নেহেরু চাপ দিল আর আমাদের ছেড়ে দিতে হলো। সরকারি খরচে বানানো সিনেমা রানার কর্মচারীরা অমনিই ফেলে রেখে দিয়েছিল। লোকে তার ছ-লাখ টাকা দাম দিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু ধিরাজ সেটা তার কৃপাপাত্রকে প্রথমে দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করার কথা বলল এবং পরে একরকম বিনা পয়সায় দিয়ে দিল। যেখানকার বিধাতা নিজেই মদ-সিগারেট এবং অন্যান্য জিনিসের কাস্টম না দিয়ে দেশের ভেতর এনে চোরাবাজারে দিতে প্রস্তুত, সেখানে আর আশা করার কী থাকতে পারে? সত্যিসত্যি নেপালের শাসনব্যবস্থার ভেতরকার যেসব কথা সেদিন জানা গেল তাতে নেপালের যে কোনো হিতৈষীর খেদ না হয়ে থাকে না।

গণেশমানের পরিবারের লোকেরা নেপাল রাজ্যের বড় বড় পদে ছিলেন। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে সামন্তশাসনের জীবনে। নেপালে মদ খাওয়া সাধারণ ব্যাপার। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেকে তা খায়। দেবী এবং শক্তির উপাসক হওয়ায় তারা এর জন্য ছুতোও পেয়ে যায়। পুরনো যুগের মদের কুঁজো এবং ছোট ছোট পানপাত্র তিনি দেখালেন। আমার বন্ধুদের মধ্যে তা উপভোগ করার মতো কিছু লোকও ছিল। সোনা-রুপোর কুঁজোগুলোতে সুন্দর হ্যান্ডেল আর লম্বা সরু নল লাগানো ছিল। সাধারণ লোকদের পানপাত্র হতো কাঁসার এবং উচ্চশ্রেণীর লোকদের হতো সোনা-রুপোর। অনেক ওপর থেকে সরু ধারা পেয়ালায় ঢালা হয় যার ফলে তাতে ফেনা উছলে পড়ে। এই ফেনিল মদিরা লোকে পান করে।

২৯ জানুয়ারি দুপুরের পর আমি আমার পুরনো সাহায্যকারী ধর্মমান সাহুর বাড়ি গেলাম। এখানে এবং লাসায় আমি ধর্মমান সাহুর বাড়ি যখনই গেছি বাড়ির মতোই অভ্যর্থনা পেয়েছি। সাহু এখন আর জীবিত ছিলেন না। তাঁর যোগ্য মেজ ছেলে জ্ঞানমান সাহুও যৌবনেই মারা গেছেন। বড় ছেলে ত্রিরত্নমান আর ছোট ছেলে পূর্ণমান এখন লাসায় ছিলেন। তাঁদের পরের প্রজন্মের কিছু তরুণ বাড়িতে ছিল। তাদের বউরা তো আমাকে ভালভাবে জানত, কেননা নেপালে কখনো কখনো কয়েক মাস আমি তাদের অতিথি হয়ে থেকেছি। তখন আমার খাওয়া-দাওয়ার ভার তাদের ওপরেই ছিল। জ্ঞানমান সাহুর স্ত্রী খুব ক্ষুণ্ণ হয়ে অভিযোগ করল, 'আপনি সবসময় আমাদের এখানে উঠতেন, এবারে কেন এলেন না?' আমি নিজের দোষ স্বীকার করলাম। কিন্তু আমি জানতাম ত্রিরত্নমানরা দু ভাই এখানে নেই, সেইজন্য আমি আসি

নি। প্রথমে মিষ্টির সঙ্গে তিব্বতী চা আর সুস্বাদু গ্যথুক (চীনা সুপ) এলো। তাতেই পেট ভরে গেল। যদি জানতাম যে মোমোও খেতে হবে তাহলে ওগুলো কম নিতাম। দুটোর সময় মোমো আর খেলাম না। সবচেয়ে ওপর তলায় ছোটমতো ছাদ দেখানো হলো যেখানে ধর্মমান সাহু বসে ধ্যান ও পুজো করতেন। এটি ছ-তলার থেকে ওপরে। আশপাশের বাড়ির ছাদ নিচু মনে হচ্ছিল। এখান থেকে রাস্তা আর শহরের দূর-দূরান্তের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

ধর্মমান সাহু তাঁর পরিশ্রমের ফলে নিজেকে তিব্বতের নেপালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করে তুলেছিলেন। উদারতায় এবং দানপুণ্যে তো কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তিব্বতের বড় বড় লামা বা অফিসাররা তাঁর বাড়িতে এসে উঠতেন। তাঁর উদারতা ও দানশীলতাই পরে তাঁর ঘরটিকে আজ ছ-তলাতেই সীমাবদ্ধ রাখে নি। মূল পুঁজি থেকে লাখখানেক টাকা তিনি বিহারগুলোর মেরামতি তথা অন্যান্য ধর্মীয় কাজে ব্যয় করেছিলেন। কয়েকজন কর্মচারীও ধোঁকা দিয়েছিল যার ফলে বাড়ি সামলানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। পরিবারে ছ জনেরও বেশি ছেলে আছে যার মধ্যে চারজন কাজ করার উপযুক্ত। প্রত্যেকমান তিব্বতেই থাকেন। একজন ম্যাট্রিক পাসও আছে। স্ত্রী খুব দুঃখ করে বলল, 'এখন পুঁজি ভাগাভাগি করতে যাচ্ছে, আপনি বোঝান।' তাঁর বাড়িতে আমার মতামত খাটত এই বিশ্বাসেই তিনি এরকম বলেছিলেন। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে এমন দিন তো আসেই। এখনো আমাদের ব্যবসায়ীরা এটা বোঝে নি যে, হাঁড়ি ভাগ করা দরকার, ব্যবসা বা পুঁজি নয়। আসলে যাতে কারো মনে সন্দেহ না জন্মায় সেভাবে ব্যবসা চালানোর রহস্যও তারা জানে না, তার ফলেই ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। কত জায়গায় ভাগাভাগির কারণ হচ্ছে স্ত্রীদের কলহ। কিন্তু এখানে স্ত্রী ভাগাভাগির বিরোধী ছিল। বড়দের বিলাস এবং আলস্যও ব্যবসাকে আঘাত করেছিল।

আমি এখানকার ভাষাগুলি দেখে আমার নেবার বন্ধুদের কাছেও বললাম—নেবার ভাষাও হচ্ছে সেই কিরাত ভাষার শাখা, যার শাখা কেবল গুরুং, মগর, সুনবার, তমঙ্গ যাখা লিম্বু, রাই-ই শুধু নয়, এমন কি নেপালের বাইরে পশ্চিমে চম্বা-কুলুর লাহুলী, কুলুর মলাণী, কনৌর, গাড়োয়ালের মারছা, কুমায়ুনের রাজকিরাত এবং পূর্বে সিকিমের লেপ্চা ও তারপরে আসামের নাগা হয়ে দূরে কম্বোজ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা লোকেদের ভাষা। এই কথা একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের পছন্দ হলো না। আসলে সংস্কৃততে 'কিরাত' শব্দটি পিছিয়ে থাকা লোকেদের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যারা পূর্ব-নেপালে থাকে। কিন্তু কোনো জাতি যদি একশো বছর ধরে পিছিয়ে থেকে যায় তাহলে ভবিষ্যতেও তারা তেমনিই থাকবে এটা মনে করা ভুল। আজকের যুগে এক দেশে বাস করা সব জাতির একই রকম সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে আসাটা অনিবার্য। আমি বললাম 'কিরাত' শব্দটা বাদ দিন, আজকের নৃতাত্ত্বিকরা যাকে মোন্-খ্মের জাতি বলে, তারই শাখা হচ্ছে এটা, যার মধ্যে কম্বোজ আর থাই (স্যামী)-এর মতো জাতিরাও রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, যে লোকেরা আজকে কিরাত ভাষা বলছে তারা সবাই মূলত কিরাত ছিল। কতবার অন্য জায়গা থেকে আসা জাতি নতুন কোনো জায়গায় বহু সংখ্যায় থাকার পর সেখানকার ভাষাকে আপন করে নেয়। এ জন্য এখানকার নেবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের হাজার হাজার পরিবার যে মধেস থেকে এসেছে এটা মানতে কোনো আপত্তি নেই। ঐতিহাসিক যুগে আজ থেকে তিন কি চারশো বছর আগে এমন অনেক লোক যে এসেছে তার প্রমাণ রয়েছে।

আজ সমস্ত নেরার লোকের চোখে যে একটু-আধটু মঙ্গোল ছাপ আছে তা ওই রক্তের সংমিশ্রণের কারণে।

৩১ জানুয়ারি ছিল নেপাল-প্রবাসের শেষ দিন। সেদিন দশটার সময় আমি জেনারেল কেসর শমসেনের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর মহলে গেলাম। আগেও আমি এই মহলে এসেছিলাম। জেনারেল খুব স্নেহ ও সম্মানের সঙ্গে তাঁর গ্রন্থাগার দেখিয়েছিলেন। রাজনীতি আর সৈন্যবিদ্যায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে। এই বিষয়গুলির ওপর কয়েকশো ইংরেজি বইয়ের খুব ভাল সংগ্রহ আছে এই গ্রন্থাগারে। দ্বিতীয় অনুরাগ হচ্ছে প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের সংগ্রহ করা। তাঁর কাছে শতাধিক তালপুঁথি আছে। যদিও তাঁর মহল আধুনিক ঢঙে ইঁট ও সিমেন্ট দিয়ে বানানো, তাতে যতটা সম্ভব কম কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে, তবু আগুন লাগার ভয়ে এই অমূল্য প্রাচীন পুস্তকগুলি অগ্নিনিরোধক লোহার আলমারিতে রাখা আছে। জেনারেল কেসর হচ্ছেন রাজা ত্রিভুবনের বোনাই। প্রথম স্ত্রী মারা গেছে, যার একটি পুত্র রয়েছে। দ্বিতীয় রানী যুবতী, যার দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করালেন। আমি দম্পত্তি আর বাচ্চাদের ফটো তুলতে চাইলাম। তারা খুশি হয়েই তা তুলতে দিলেন। কেসর শমশের চন্দ্র শমশেরের সুদীর্ঘকালব্যাপী স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে প্রতিপালিত হন এবং বৃদ্ধও হয়ে পড়েন। তিনি বাবার বিশাল সম্পত্তি নিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হন। কিন্তু এত অধ্যয়নশীল ব্যক্তি নতুন যুগের গতির সঙ্গে অপরিচিত থাকতে পারে না। যদি তাঁর মত খাটত, তাহলে যেমনটি ঘটেছে তেমনভাবে রাণাবংশের সমাপ্তি ঘটত না। তাঁর চেয়ে বড় দু-ভাই ছিলেন—মোহন শমশের আর ববর শমশের। তার মধ্যে ববরের ছিল যেমন নাম তেমনি আচরণ। তিনি দুর্যোধনের মতো বলতেন, 'সূচ্যগ্রং, ন দাতব্যং বিনা যুদ্ধেন কেশব' (হে কৃষ্ণ, সূচাগ্রে যে টুকু মাটি ধরে বিনা যুদ্ধে তাও দেব না')। রানাতন্ত্রের শাসন চলে যাওয়ার পরেও কেসর শমশেরের প্রভাব কমে নি। সেটা তাঁর সংশোধিত ভাবনা-চিন্তার জন্যেই। পরামর্শদাতা সরকারের তিনিই একরকম সর্বেসর্বা। ত্রিভুবনের না আছে শাসন করার যোগ্যতা, না আছে ভালমন্দ পরামর্শ দেবার বুদ্ধি। আমাকে যখন নেপালে খুব সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হতো, কেসর শমশের সে-সময়েও আমাকে সৌহার্দ দেখাতে পিছিয়ে থাকেন নি। ৬২ বছর বয়স হয়ে গেছে। তাই আবার দেখা হওয়ার আশা কি আর আছে?

ওখান থেকে ফিরে মাহিলা গুরুর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি তো আরও পাকা ফল, স্বাস্থ্যও জবাব দিয়ে দিয়েছে। বিদায়ের সময় কথাতেও তিনি সেটা প্রকাশ করলেন যে, আর দেখা হবে না। নেপালে সংস্কৃত বিদ্যা আর সাংস্কৃতিক জ্ঞানের অদ্ভুত ভাণ্ডার ছিলেন তিনি। রাজনৈতিক ভাবনায় নিজের প্রভুর (রানাতন্ত্র) বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি কিভাবে সেখানে টিকে থাকতেন? কিন্তু অন্য ব্যাপারে তিনি খুব উদার ছিলেন। আমি চরম নাস্তিক আর তিনি ছিলেন পরম আস্তিক। আমি কমিউনিস্ট আর তিনি সামন্তবাদী, তবু দেখা হলে পর কেউ বলতে পারত না যে, আমাদের মধ্যে কোনোরকম মতভেদ আছে। বড় ছেলে, যাকে গতবার আমি ১০-১২ বছরের দেখেছিলাম এবং ফটো তুলেছিলাম, এখন সে ছ ফুট লম্বা যুবক। সংস্কৃততে সাহিত্যাচার্য করে বি এ পরীক্ষা দেবে। ছোট ছেলে বি এ পাশ করে বোম্বাইতে থাকাকালীন বিলেত যাবার অনুমতি চাইছিল। এটা তাঁর শিষ্টাচার, নইলে জাহাজে বসে ইংল্যান্ড বা আমেরিকা যেতে তাঁর

বাধা কী ছিল? বাবার পক্ষে আজ্ঞা দেওয়া মুশকিল ছিল কেননা এটা রাজগুরুর বংশ। রানা আর ধিরাজ দুই বংশেই বহু প্রজন্ম ধরে তাঁরা মন্ত্র দিয়ে এসেছেন। নেপালে ছুৎমার্গ আর জাতপাতের ঠিকেদার বলতে এই বংশই। বিলেত যাওয়ার পর সে কি এই ব্যাপারগুলো ভাবতে পারবে? আর সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার ছিল যে এখনও সে অবিবাহিত। ওখানে গিয়ে যদি মেম বিয়ে করে আনে তাহলে পিণ্ডদান থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তিনি চিন্তিত ছিলেন কিন্তু জানতেন যে, আজকালকার যুগে পাখনাওলা পাখির মতো সচেতন ছেলের ওড়া বন্ধ করা যাবে না।

খাওয়ার পর দেবপাটনের দিকে জয়বাগেশ্বরী গেলাম। সেখানে নেপাল (গোর্খালি) সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন চলছিল। এখানে কাছেই সেই বাগান যেখানে ধিরাজ রণবাহাদুর এসে প্রায়ই থাকতেন। রণবাহাদুর এক বিবাহিতা সুন্দরী ব্রাহ্মণ রমণীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে তার পেছনে সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন। তাকে শুধু পাটরানীই বানান নি, তারই সন্তান আজকের ধিরাজ। এটি প্রতিলোম বিবাহ ছিল, যে-কারণে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারে সন্তানের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় থেকে নিচু শ্রেণীতে যাওয়ার কথা, কিন্তু 'সক্ষম'-এর এমনটা কে করতে পারত? এমনিতে কোন রাজবংশ আর ধোয়া তুলসী পাতা? ভারতে অধুনা বিদ্যমান মহারাজাদের একজনের পিতা সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ ছিলেন। তিনি এই কাজের জন্য একজন তরুণ স্বাস্থ্যবান মুসলমানেক নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। যে-সিসোদিয়া বংশের সঙ্গে ধিরাজ বংশ তার সম্বন্ধ গড়ে, তাতেই প্রথম এক ভিন্ন জাতের বিধবা পাটরানী হয়েছিল। পুরনো গোত্রের কথা বলে কোনো লাভ নেই। এই পুরনো সম্বন্ধের কারণে আজকে আর কারু ধোপা-নাপিত বন্ধ করা যায় না। কলিযুগ বলুন বা আধুনিক যুগ চলুন, এখন তো সারা ভারতে একটিই বর্ণ হতে চলেছে—সবার খাওয়া-দাওয়া, বিয়েশাদি এক হতে শুরু করেছে। সম্ভবত এই শতাব্দীর পর এই বিভেদ কট্টরপন্থীদের অসভ্যতার সাক্ষী মাত্র হয়ে থাকবে।

সম্মেলন হচ্ছিল খোলা জায়গায়। জায়গাটা মাঠ নয়, মনে হচ্ছিল স্বাভাবিকভাবে শুকিয়ে যাওয়া একটি পুকুর। প্রচুর স্ত্রী-পুরুষ সেখানে উপস্থিত ছিল। প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ, সংগীত, নৃত্য সবরকম প্রোগ্রামই ছিল। কয়েকটি ব্যাপারে নেপালে সবসময় মুক্ত পরিবেশ থেকেছে। পর্দাপ্রথা তো সেখানকার লোকে জানতই না। সদ্য ঘটে যাওয়া নারী-নবজাগরণের ফলেও মেয়েরা অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। কমলার কিছু গল্প হিন্দি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, এজন্য সে নিজস্ব যোগ্যতায় সেখানে উপস্থিত ছিল। শ্রীবালকৃষ্ণ শর্মা এবং অন্যান্য বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলল, 'মহাপণ্ডিতানীও কিছু শোনান।' কিন্তু মহাপণ্ডিতানীর সাহস হলো না।

সম্মেলন থেকে আমরা শেষবার পশুপতির দর্শনে গেলাম। আমার দর্শনের অর্থ হলো ঐতিহাসিক বস্তুগুলিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে অবলোকন, সেগুলির ফটো তোলা আর সেগুলি সম্বন্ধে কিছু নোট নেওয়া। ফটকের ভেতর ঢুকে তবে পশুপতি মন্দিরের সামনে থেকে ফটো তোলা যায়। কিন্তু সেটা নিষিদ্ধ ছিল। এই রকম জায়গায় কী করে কার্যসিদ্ধি করতে হয় তার অভিজ্ঞতা আমার ছিল, সেজন্য ওখানকার রক্ষী না করার আগেই রোলেফ্লেকস টিপে দিলাম। তারপর ভাল মানুষের মতো অজ্ঞ সেজে আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম। নেপাল উপত্যকার এবং বিশেষ করে দেবপাটনের ভাঙা মূর্তিগুলির মধ্যে যদিও অধিকাংশ দশম শতাব্দীর পরের, তবু তার মধ্যে কিছু গুপ্তযুগ ও তার ঈষৎ পরবর্তীকালের মূর্তিও আছে। বাগমতীর ঘাটে প্রায়

মানুষ-সমান বুদ্ধের একটি খণ্ডিত মূর্তি আছে। খুবই পুরনো। জনকলালজী জানালেন অপর পারে লেখ-সম্বলিত একটি পুরনো মূর্তি খেতে পড়ে আছে। আমরা পুল দিয়ে পার হয়ে নদীর কিনারে কিনারে ওদিকে গেলাম। কিনার থেকে ওপরের খেতে যাওয়ার সময় খুব খারাপ গন্ধ আসতে শুরু করল। এদিক-ওদিক দেখছিলাম, কোথা থেকে গন্ধ আসছে। দেখলাম যে-খেতের আল ধরে আমরা যাচ্ছি তাতেই কৃষক-দম্পত্তি বালতিভর্তি পায়খানা হাতে নিয়ে বড় নিশ্চিন্তে একটু একটু করে জায়গায় জায়গায় রাখছে। কৃষককে এমনই হতে হবে। আমি জাপানী কৃষকদেরও এমনি দেখেছিলাম। আমাদের ভারতে যদি এরমক কৃষক হতো তাহলে গ্রাম এতো নোংরা হতো না যে, ভেতরে ঢোকার সময় নাকে রুমাল দিতে হয়। মূর্তির কাছে গেলাম। মূর্তিটি ত্রিবিক্রমের এবং লিচ্ছবি-শাসনকালের (ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর) ছিল। কোনো পণ্ডিত এর উল্লেখ করেন নি। নেপালে এই রকম অনুল্লেখিত অনেক মূর্তি এবং ঐতিহাসিক বস্তু থাকতে পারে। নেপাল উপত্যকার বাইরে সপ্তগণ এবং করনালীর উপত্যকাও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সেখানকার অনুসন্ধান তো একপ্রকার হয় নি বললেই চলে। একবার শ্রীজনকলাল শর্মা কয়েক দিনের জন্য সেখানে গিয়ে কিছু খবরাখবর আর প্রামাণ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। জনকলাল শর্মা আজন্ম ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানকারী। 'ব্যাকরণতীর্থ' হওয়ায় সংস্কৃতে এবং 'সাহিত্যরত্ন' হওয়ায় হিন্দি সাহিত্যেও তাঁর দখল আছে। তিনি প্রাচীন লিপিগুলি নিজে পরিশ্রম করে চিনতে শিখেছেন। পুরনো জিনিসের প্রতি তাঁর মনে তীব্র জিজ্ঞাসা রয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দূর খেতে পড়ে থাকা এই ত্রিবিক্রমের মূর্তি দেখতে গেলাম। তাঁর যদি সময় হয়,তাহলে তিনি নেপালী পুরাতত্ত্বের কানিংঘাম হতে পারবেন।

সেদিন নৈশ-ভোজন হলো শ্রীশিবপ্রসাদ রৌনিয়ারের বাড়িতে। প্রথম দিন নিরামিষ ছিল, আজ আমিষ।

মুসৌরীতে

১ ফেব্রুয়ারি আমরা য়মি পরিবার থেকে বিদায় নিলাম। আমি যাঁকে ছেলে হিসেবে দেখেছিলাম সেই ধর্মরত্ন এখন বয়সে ও জ্ঞানে দুইয়েই ছিলেন প্রৌঢ়। তাঁর স্ত্রী আমাদের দুজনের আতিথ্য করার কাজে লেগে থাকতেন। বাড়ির সমস্ত কাজ তাঁকে করতে হতো। অনেক বাচ্চাদের সামলাতে হতো। কিন্তু তিনি সাধারণ রাঁধাবাড়া করা মহিলা ছিলেন না। তাঁর স্বামী যখন জেলকে নিজের বাড়ি বানিয়ে নিলেন এবং আর কোনো আশ্রয় তাঁর থাকল না, তখন তিনি আরো লেখাপড়া করে শিক্ষিকা হয়ে গেলেন। যখন সুযোগ এলো তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেও পিছপা হন নি। নিঃসন্দেহে তাঁর বীরত্ব যেকোনো পুরুষের বীরত্বের চেয়ে বেশি ছিল, কারণ নেপালে তখন ক্রুর সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিদের শাসন ছিল।

—১৯৫৩—

সাড়ে আটটায় বেরিয়ে নটার সময় এয়ারপোর্টে পৌছে গেলাম। দু-চারটে বাসন, চিঁড়ে আর নেপালের কয়েকটি উপহার আমাদের সঙ্গে ছিল। কাস্টমে আটকানোর মতো কোনো জিনিস ছিল না। চার সপ্তাহ থাকায় উপত্যকার শিক্ষিতরা আমার নাম শুনেছিল। জনকলালজী, মানদাসজী, য়মিজী এবং অন্য অনেক বন্ধু বিমানবন্দরে বিদায় দিতে এসেছিলেন। নেপাল থেকে পাটনা, সেমরা, বীরগঞ্জ আর পোখরা এই তিন জায়গায় বিমান যেত। বিমানগুলি চালাত ভারতীয় কোম্পানি। এখনো বিমান চালানোর কাজ ভারত সরকার নিজের হাতে নেয়নি বলে ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি ছিল। প্রথমে সেমরার বিমান এলো। সেটা উড়ে যাওয়ার পর পাটনার বিমান আধঘন্টা লেট করে এলো। সেটা থেকেই শ্রীখঙ্গমান সিং নামলেন। রানাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। এখন সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমরা মাত্র কয়েক মিনিটই কথা বলতে পারলাম। তারপর শ্রীবালচন্দ্র শর্মা, কবি কেদারনাথ ব্যথিত, শ্রীধর্মরত্ন য়মী, মানদাসজী, শ্রীকলানাথ অধিকারী এবং তাঁর স্ত্রী সবাইকে নমস্কার জানালাম।

নতুন ও পুরনো পরিচিত সহৃদয় পুরুষ-মহিলাদের মধুর স্মৃতি নিয়ে এগারোটা বেজে ৩৫ মিনিটে আমরা পাটনা থেকে উড়লাম। আকাশ পরিষ্কার ছিল। উপত্যকা তার মোহময় রূপ নিয়ে নীচে পড়ে ছিল। পরকোটা লঙ্ঘন করে বিমান বিহারের দিকে এগোল। মেঘ ছিল না কিন্তু কুয়াশা খুব ছিল। তরাই-এর জঙ্গল পেরিয়ে সেই জায়গায় পৌছল যেখানে একদা লিচ্ছবিদের প্রতাপশালী গণ ছিল। আমরা আধ ঘণ্টায় তাদের পুণ্য নগরের ওপরে পৌছে গেলাম। বৈভবশালী গণদের উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর মগধের অধীনতা স্বীকার করার চেয়ে লিচ্ছবিরা পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া ভাল মনে করেছিল। পরিবার আর স্থাবর-জঙ্গম কিছু সম্পত্তি নিয়ে নেপাল পৌছতে তাদের বোধ হয় কয়েক মাস সময় লেগেছিল। ওখানে প্রথমে তারা নিশ্চয় গণ-ব্যবস্থা অনুযায়ীই তাদের শাসন কায়েম করেছিল। পরে সেই লিচ্ছবি রাজবংশই হয়ে গেল নেপালের প্রথম ঐতিহাসিক শাসক। উপত্যকায় তাদের পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ রয়েছে। প্রাচীন লিচ্ছবি-ভূমি আগে হয়তো গণ্ডক-এর ওপারেও কিছুটা ছিল কেননা এই সদানীরা (গণ্ডক) নদী মুক্তভাবে বইত। তার জলের গতি বদলে যেত। ভরসক-মরৌড়া থানাগুলির ওপর দিয়ে গিয়ে আমরা গঙ্গার বিশাল বালুকা রাশির দিকে এগোলাম। সেটা পার হয়ে সওয়া বারোটার সময় পাটনার মাটিতে নামলাম। শ্রী যোগেন্দ্র তিওয়ারী, বীরেন্দ্রবাবু, অদ্ভুতজী ইত্যাদিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিনিসপত্র নিয়ে ছজ্জু বাগে যোগেন্দ্রজীর বাংলোতে পৌছলাম। তাঁর বড় ভাই ও আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদী ছাপরা থেকে এসে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর স্ত্রী এখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

পাটনা—২ ফেব্রুয়ারি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোলাম। পুরনো সাথী ভাই চন্দ্রমা সিংহকে পথে পেয়ে গেলাম। চন্দ্রমা সিংহকে দেখেই তরুণদের ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লাহোর ষড়যন্ত্রে গুপ্তচর হয়ে বিপ্লবীদের ফাঁসি দিল যে দেশদ্রোহী তাকে মেরে তার দুষ্কর্মের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন চন্দ্রমাভাই-ই। সে-সময় বিপ্লবীরা তাদের কাজের জন্য পয়সা জমা করার উদ্দেশ্যে ডাকাতি করত, তবে তা বেশির ভাগই সরকারি কোষাগারে। চন্দ্রমা ভাই রেলের

তহবিল লুট করেন। স্টেশন মাস্টার সরে যাক এটাই তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু সে তাকে ধরতে চাইল ফলে গুলি চালাতে হলো। ঘটনাচক্রই বলতে হবে যে ফাসী না হয়ে তাঁর যাবজ্জীবন দীপান্তর হলো। অনেক বছর জেলে থাকার পর তিনি ছাড়া পেলেন। তিনি ভাবনাচিন্তায় আরো এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হলো কমিউনিজম (সাম্যবাদ) ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তিনি তখন থেকেই কমিউনিস্ট এবং সব সময় মজুরদের সেবায় লেগে রয়েছেন। ১৯৪০-৪২ সালেই আড়াই বছরের জেলজীবনে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তখন চন্দ্রমাভাইয়ের সঙ্গে কত মজা করতাম, কত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। আজও তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ে সেইরকম ভালবাসা ও সম্মান ছিল। তিনি পাটনায় থাকতেন না। দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। পার্টির অন্য সাথীদের সঙ্গেও আলাপ করলাম। তারপর আমার জেলার লোক শ্রীগোরখ পান্ডের মূক-বধির স্কুল দেখতে গেলাম। উকিল হয়েও তিনি ওকালতি করেন নি। কিছুদিন ইংরেজি খবরের কাগজে কাজ করেছিলেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি গেল অসহায়, মূক-বধির শিশুদের দিকে। তিনি নিজেই সে-সম্বন্ধে পড়াশুনো করলেন। পাটনায় এসে নিজেই একটি ভাড়া বাড়িতে স্কুল খুললেন। কোনো উপকরণ ছিল না কিন্তু তাঁর একাগ্রতা ছিল। তাঁর স্ত্রীও সাহায্য করলেন। এখন দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল যে, তিনি নিজের পাকা বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন। সরকারও স্কুলকে সাহায্য দেয়। ১৯৪২ সালেও তিনি তারুণ্যের সীমা পার হন নি। এখন তাঁর তৃতীয় প্রজন্ম চলে এসেছে দাদু-দিদার ভালবাসা পেতে। তিনি স্কুল দেখালেন।

ওখান থেকে ফিরে যোগেন্দ্রজীর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করলাম। ছাপরায় রাজনৈতিক জীবনের বন্ধু ব্রহ্মচারী মঙ্গলদেব (বেনিনাপুরের বাসিন্দা) তাঁর সাংস্কৃতিক বিদ্যাপীঠটি দেখতে অনুরোধ করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে গঙ্গার তীরে টেকারীর বাড়িতে গেলাম। ৩০ জনের বেশি ছাত্র ছিল। সে-সময় সংস্কৃত বলার নিয়ম ছিল। ছ-সাত মাসে ছাত্ররা সে-ব্যাপারে বেশ উন্নতি করে নিত। তিনি সংস্কৃতের শুধু প্রচারের মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখতে চাইতেন না, বরং চাইতেন যে সাত-আট বছর পড়ে ছাত্ররা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিক। আমি বললাম, 'আপনি এখানে ইউরোপিয়ান স্কুলগুলোর কিছু ভাল ভাল জিনিস গ্রহণ করুন। সেখানে মাধ্যম ইংরেজি রাখা হয় যার সঙ্গে আমাদের ভাষার কোনো সম্বন্ধ নেই। সংস্কৃত হচ্ছে হিন্দির জীবন-স্রোত। আপনি এটা চালু রাখুন।' পরে কে জানে কেন, বিদ্যাপীঠের এই বৈশিষ্ট্যটি ত্যাগ করা হয়েছিল।

সেদিন সন্ধেতে শ্রীমোহনলাল বিশনোই-এর বাড়িতে চা খেলাম। তিনি 'নেপাল' প্রকাশ করার জন্য সাগ্রহে তার পাণ্ডুলিপিটি চাইলেন। আমি তার কিছু অংশ তখন দিয়েও দিলাম। এটা ১৯৫৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারির ঘটনা, আজ ১৯৫৬-র শেষ। তিন বছর হয়ে গেছে 'নেপাল' তাঁর কাছেই রয়েছে। ৩০৪ পাতা ছাপা হয়ে তেমনিই পড়ে আছে। লেখক কী করবে? এত পরিশ্রম করে নতুন তথ্য দিয়ে এর যে গ্রন্থটি প্রস্তুত করে দিলাম তা এইভাবে ঝুলে রয়েছে। টেক্সট-বুক আর অন্যান্য ছাপার কাজ থেকে তাঁর ফুরসৎ মিলছে না। রাগ হয়। মনে হয়, কবে যে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাব?

৩ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন-ভবনে শিবপূজনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কমলার বমি পাচ্ছিল। গাড়ি তখনো পুরো থামে নি, আমি তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে তাকে মুখ বের করার সুযোগ করে দিতে গেলাম। গাড়িতে বেগ ছিল। পড়ে গেলাম। ডান হাঁটুতে দু-জায়গায় খুব রক্ত

বেরোতে লাগল। বাঁদরের চুলকানি আর ডায়াবিটিসের ঘা-দুই-ই সমান বিপজ্জনক। যাক্‌গে, শিবপূজনবাবুর বাড়িতে গেলাম। তাঁর সঙ্গে একটুখানি কথাবার্তা হলো। তাঁরও ডায়াবিটিস আছে। তিনি তো কখনোই মেদবহুল হন নি। ডায়াবিটিস আমারও ছিল। সেটাকে আমি চিন্তার ব্যাপার বলে মনে করতাম না, যদিও ক্ষতের কারণে আজ তা চিন্তার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। আমি তাঁকে বললাম, 'ইনসুলিন নিন আর নির্দ্বিধায় সব কিছু খান। আপনি শিবের ভক্ত, কিন্তু কে জানে পৃথিবীতে আবার আসার সুযোগ মেলে কি না মেলে, তাই মিষ্টি মিষ্টি রসগোল্লা আর মিহিদানার লাড্ডু থেকে কেন আপনি নিজেকে বঞ্চিত করবেন?'

ডেরায় ফিরে পেনিসিলিন নিলাম। এবার মনে হলো সোজা মুসৌরী চলে যাই, কেননা ইনসুলিন, পেনিসিলিন, সিবাজল পাউডার আর অয়েন্টমেন্টের জন্য এখন একান্তভাবে প্রার্থনা করা দরকার। পথে বেনারস, লক্ষ্ণৌ এবং এলাহাবাদেও আসব বলে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম। সেসব প্রোগ্রাম তো বাতিল করা সম্ভব নয়।' সেদিন বিকেলে সওয়া চারটের সময় বি এন কলেজের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে হলো।

পরের দিন (৪ ফেব্রুয়ারি) শ্রীশকুন্তলাজী মগধ মহিলা কলেজের ছাত্রীদের সামনে বক্তৃতা দিতে নিয়ে গেলেন। পা-ভাঁজ করা কষ্টকর ছিল। গাড়িতে করে গিয়েও কিছুদূর হাঁটতে হলো। বন্ধু চন্দ্রশেখর সিং আর তাঁর স্ত্রী শকুন্তলাজীর বাড়িতে চা-পানের ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রশেখর পার্টির মেম্বার হওয়ায় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যুদ্ধের সময় আমরা নজরবন্দী হয়ে এক সঙ্গে ছিলাম। শকুন্তলাজী ছিলেন আমাদের ছাপরার পুরনো সহকর্মী এবং বন্ধু নারায়ণবাবুর মেয়ে, যাঁকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতাম। আজ নারায়ণবাবুর স্ত্রী এবং চন্দ্রশেখরের মা-ও এখানে উপস্থিত ছিলেন।

পাটনা থেকে বিদায় নিলাম। ভোর পাঁচটায় গাড়ি ধরবার ছিল। যোগেন্দ্রবাবু আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। পাঞ্জাব মেলে যে-ক্লাসের টিকিট ছিল তাতে জায়গা ছিল না বলে নীচের ক্লাসে বসলাম। যখন ট্রেন ছাড়ল তখন অন্ধকার ছিল। পাটনা ও আরা জেলার ভেতর দিয়ে গিয়ে আটটার সময় তা মোগলসরাই পৌঁছল। দশটার সময় দেরাদুন এক্সপ্রেস এলো। পাঞ্জাব মেলে গেলে মাঝরাতে লাক্সার পৌঁছে গাড়ি বদলাতে হতো। এখন পায়ে চোট নিয়ে যাচ্ছিলাম তাই এখানেই গাড়ি পাল্টানো ভাল মনে করলাম। দুপুরে বেনারস পৌঁছলাম। 'আজ'-এ দেখলাম খবর ছেপেছে যে রাহুলজী দুটোর সময় আসছেন। আমরা বেনারস থেকে সামনে এগোলাম। ট্রেন অযোধ্যা-ফৈজাবাদের রাস্তায় ঘুরে যাচ্ছিল। সঙ্গের এক ভদ্রলোক যাত্রীদের খুন আর ডাকাতির কথা বলছিলেন। কমলা ঘাবড়ে গেল। আমি বললাম, 'দশ হাজার যাত্রীর মধ্যে দু-একজনের এইরকম অবস্থা হয়। আমরা কেন সেই অভাগাদের দলে নাম লেখাব?' ফৈজাবাদে বালিকা বিদ্যালয়ের কোনো মহিলা অফিসার তাঁর বাচ্চাদের সঙ্গে উঠলেন। তাঁর পতিদেব যখন গাড়িতে তুলে দিয়ে বিদায় নিচ্ছিলেন এবং ট্রেন প্রায় ছাড়ছিল তখন পত্নী পতিদেবের চরণধূলি মাথায় ঠেকালেন। আমি কমলাকে বললাম, 'দেখ।' অনেক ব্যাপারে সে প্রাচীনপন্থী কিন্তু তারও এটা পছন্দ হলো না।

লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম তাই ভিড় হলেও কোনো ব্যাপার ছিল না। ৬ ফেব্রুয়ারি হরিদ্বারে সকাল হলো। পরে ইঞ্জিনের গণ্ডগোলের

জন্য ট্রেন লেট করে সাড়ে নটার সময় দেরাদুন পৌছল। মেহতাজী সাহায্য করার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শুক্লজীর বাড়িতে থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু পায়ে আঘাত নিয়ে এখন আর একদিনও থাকা ভাল মনে হলো না। ১২ টাকায় ট্যাক্সি করে বাজার থেকে কিছু জিনিস কিনে আমরা সোজা মুসৌরী পৌঁছলাম। গাড়িতে করে চড়াইয়ে উঠলে কমলার অবশ্যই বমি হতো, কিন্তু আজ হলো না। সম্ভবত সর্দির জন্য ঘ্রাণশক্তি কাজ করছিল না।

মুসৌরী—কিতাবঘর থেকে রিকশা নিয়ে চললাম। একটা মোড় পার হওয়ার পর বরফ দেখা যেতে লাগল। আজ থেকে দু-সপ্তাহ আগে, ১৬-১৭ জানুয়ারি, বরফ পড়েছিল। তার অবশেষ এখনও কত জায়গায় দেখা গেল। বোঝা যাচ্ছিল এখানে বোধ হয় এক-দেড় ফুট বরফ পড়েছিল। বাড়ি পৌঁছলাম। ভূতনাথ স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। যদিও মোটা হয় নি কিন্তু এক মাসের অনুপস্থিতির জন্য বেশ উঁচু ও লম্বা দেখাচ্ছিল।

কমলা গত বছর কালিম্পং ঘুরে এসেছিল, এবার আবার যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। আমি তার আগ্রহ দেখে বললাম, 'আচ্ছা যাও।'

এবার ক্ষতটি ভালভাবে দেখাশোনা করা দরকার ছিল। বাঁ হাঁটু হলে কোনো ব্যাপার ছিল না, কিন্তু ডান হাঁটু ভাঁজ হচ্ছিল না। ইনসুলিন আর পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন রোজ চলতে লাগল। কমলা ইঞ্জেকশন দেবার কাজে দক্ষ হয়ে গিয়েছিল। এখন সে চলে গেলে ইঞ্জেকশন দেওয়াটাও সমস্যা। এই সময় তার মেজ বোনের অসুখের চিঠি এলো। তার যাওয়া নিশ্চিত ছিল। খুশহালও এখন কাজ ছাড়তে চাইছিল, এটা আরেক সমস্যা ছিল। কিন্তু এখন নিজের বাড়িতে ছিলাম বলে কোনোভাবে কেটে যেত।

১৫ তারিখ রোববার কমলা কালিম্পঙের উদ্দেশে রওনা হলো। একা এতখানি দীর্ঘযাত্রা সে করে নি। ট্রেনে খুন আর ডাকাতির কথা শুনে ভয়ও পাচ্ছিল কিন্তু মহিলাদের বাপের বাড়ি খুবই প্রিয়। দেরাদুনে মেহতাজী কলকাতার ট্রেনে চাপিয়ে দিলেন। ওখান থেকে আসা-যাওয়ায় সাহায্য করার জন্য মহাদেব ভাই এবং সেঙ্গরজী ছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না কালিম্পঙে পৌঁছে সে চিঠি দেয় ততক্ষণ চিন্তা তো থেকেই যায়।

১৭ তারিখে মমগাইজী তাঁর ছেলের কথা জানালেন। তিনি কংগ্রেসের জন্য অনেকবার জেলে গিয়েছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। অনেক কষ্টে তাঁর একমাত্র ছেলেকে তিনি এখানকার ইউরোপীয় স্কুলে ও পরে দেরাদুন ডি এ ভি কলেজে পড়িয়েছিলেন। ছেলেটি ছিল তেজী, স্বাস্থ্যবান। সে সৈন্যদলে যেতে চেয়েছিল। পরীক্ষায় তাঁর স্থান হলো ২৪ নম্বরে। তার ভর্তির অধিকার ছিল কিন্তু ২৪-তম স্থানকে ৩৪ করে দেওয়া হলো এবং তাকে খবরও দিল না। বোকা হলে, লেঠা সেখানেই চুকে যেত কিন্তু ছেলেটি দিল্লী চলে গেল। সেখানে অফিসের লোকেদের ধরা হলো। 'ভুল হয়ে গেছে' বলে তাকে জায়গা দেওয়া হলো। এখন ভর্তি করার জন্য হাজার টাকার ওপর প্রয়োজন ছিল। এইরকম সংকট তৈরি করে দিয়ে আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা লোককে জবরদস্তি বেইমানি করতে বাধ্য করছে না কি?

সেদিন মহাদেব ভাই-এর তারবার্তা থেকে জানা গেল—দুপুর তিনটেয় কমলা কালিম্পং রওনা হয়ে গেছে।

—১৯৫৩—

২০ তারিখে 'পুরনো ও নতুন প্রজন্ম' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখলাম। আমি পুরনো প্রজন্মকে অনেক ব্যাপারে অযোগ্য মনে করি। সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা নতুন প্রজন্মের মধ্যেই রয়েছে। পুরনো প্রজন্ম শুধু শরীরের দিক দিয়েই দুর্বল ও বৃদ্ধ নয়, সেই সঙ্গে মানসিক দিক দিয়েও তারা অক্ষম। আগে থেকে গদি দখল করে থাকার জন্য নিষ্পত্তির ভার থাকে পুরনো প্রজন্মের হাতেই। তারা নতুন প্রজন্মকে কোনোরকম সুবিধে দিতে চায় না, তাদের যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দেয় না। পুরনো প্রজন্ম এটা বোঝে না যে, ভাগ্যের ফয়সালা করা তাদের হাতে নেই—নতুন প্রজন্মের ওপর তাদের ফয়সালা কার্যকরী হবে না, বরং নতুন প্রজন্মের ফয়সালা পুরনো প্রজন্মের ওপর খাটবে। তবে অধিক সঞ্চিত জ্ঞান পুরনোদের কিছুটা সুবিধে করে দেয়। তাদের অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার গভীরতা নতুন প্রজন্মকে সরল সহায়তা দিতে পারে। তবু ফসিলদের কাছে খুব সীমিত ক্ষমতা থাকা উচিত। নতুন প্রজন্মেরও এই কথা সব সময় মনে রাখা উচিত যে, আমাদেরও একদিন পুরনো প্রজন্ম হতে হবে, তখন আমরাও এই ভুল যেন না করি।

২৩ ফেব্রুয়ারি মনে হলো এবার ক্ষতটা শুকোচ্ছে। একটু নিশ্চিন্ত লাগল। ১৩ মার্চ কমলাও কালিম্পঙ থেকে ফিরে এলো। চিন্তা আর উদ্বেগ দূর হলো। তত দিনে ক্ষতও অনেকটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারির শেষে মুসৌরীর পৌর নির্বাচনের ধূম চলছিল। বহু বছর ধরে বোর্ডকে সরিয়ে সরকার নিজের হাতে সব কাজ নিয়ে রেখেছিল। নির্বাচনে হোটেলের মালিক কাপ্তেন কৃপারাম সভাপতি পদের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিই মুসৌরী কংগ্রেসের প্রধান ছিলেন, এবং সেইসঙ্গে সবচেয়ে বড় হোটেলের মালিক হওয়ায় তাঁর প্রভাবও ছিল ওপর মহল পর্যন্ত। কংগ্রেসের টিকিট তিনিই পেলেন। তাঁর চেয়েও পুরনো কংগ্রেস কর্মকর্তা উকিল কুকরেতি সাহেব বর্তমান ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ বর্মা (উকিল)-এর জায়গায় যদি কুকরেতিজী দাঁড়াতেন, তাহলে অবশ্যই তাঁকে হারানো মুশকিল হতো। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

৩ মার্চ থেকে কমরেড স্তালিন সংজ্ঞাহীন ছিলেন। তাঁর পুরো জীবন একটি মহৎ কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লেনিনের ডান হাত হয়ে তিনি কার্যোদ্ধার করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হবার ভার ছিল তাঁর ওপর। তিনি তাঁর জীবনের এক-একটি মুহূর্তের মূল্য চুকিয়ে নিয়েছিলেন। ৫ মার্চ রাত নটা ৫০ মিনিটে মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হলো। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু···'—৭৩ বছরের আয়ু নিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। তাঁর কাজ সদা অমর থাকবে। মার্কস যে সাম্যবাদের দর্শন দিয়েছিলেন এবং তা পৃথিবীতে আনার পথ দেখিয়েছিলেন, তা পৃথিবীতে আনতে লেনিন সফল হলেন। সাম্যবাদী বিপ্লবের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আর সাফল্যের সঙ্গে তা প্রয়োগ করা ছিল লেনিনের মহৎ কাজ। কিন্তু সাম্যবাদী শক্তিকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করে তাকে ফ্যাসিবাদের মারাত্মক সংকট থেকে উত্তীর্ণ করার মহৎ কাজটি করেছিলেন স্তালিন। আমি তাঁর সময়ে দু-বছর রাশিয়ায় ছিলাম। সেখানকার প্রগতি আমি চোখের সামনে দেখেছিলাম। সেখানকার প্রতিটি ব্যাপার আমার কাছে প্রেরণাদায়ক মনে হয়। তবে স্তালিনের ব্যক্তিপূজা আমার খারাপ লাগত। বেশিদিন ধরে তা চালানো যায় নি, কেননা ব্যক্তিপূজা ছিল সাম্যবাদ-বিরোধী। যত বড়ই হোক না কেন, এই দোষটির জন্য স্তালিনের মহান কাজকে তুচ্ছ বলা যায় না। এই সময় মনে হলো যে, স্তালিনের ওপর কিছু লিখি। আগে

লিখেছিলাম। তাতে সন্তুষ্ট হই নি—বিশেষ করে এই ভেবে যে হিন্দিতে স্তালিনের কোনো ভাল জীবনী নেই। 'স্তালিন' লিখে ফেলার পর ভাবলাম, লেনিনকে বাদ দিয়ে রাশিয়ার সাম্যবাদ সম্পূর্ণরূপে বোঝা যাবে না। 'লেনিন'ও লিখলাম। তারপর মহান দ্রষ্টা মার্কস কি করে বাদ থাকেন? 'মার্কস'ও লিখলাম। এশিয়ার ৬০ কোটি মানুষকে সাম্যবাদের মহান পথে আনার মহৎ কাজটি যিনি করেছিলেন এবং যাঁর পথ-প্রদর্শনেই চীন আজ এভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই মাও-সে-তুং-এর জীবনী কি করে বাদ দিই? আমি এই বছর এই চারটে জীবনীই লিখে ফেললাম। পরের দু-বছরের মধ্যে 'স্তালিন' ও 'লেনিন' ছেপে বেরিয়ে গেল। এ বছর 'মার্কস'ও প্রকাশিত হয়ে গেল আর 'মাও' পরের বছর অবশ্যই বেরোবে।

মুমূর্ষু পুঁজিবাদ আর তার সমর্থক আততায়ী আমেরিকান ধনতন্ত্র আশা করে বসে ছিল যে, স্তালিন সমস্ত ক্ষমতা হাতে রেখেছেন, তিনি মারা গেলেই রাশিয়ার পুরো গঠনটা এলোমেলো হয়ে যাবে। কিন্তু সে ব্যাপারে তাদের সম্পূর্ণ নিরাশ হতে হলো।

১১ মার্চ শ্রীশিবকুমার ঢিণ্ডা তাঁর স্ত্রী মালতীজীর সঙ্গে এলেন। মালতীজীর অনেক গল্প পত্র-পত্রিকায় দেখেছিলাম কিন্তু এটা জানতাম না যে, তিনি বেনারসের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্রর নাতনী। দাদু দুজনের সম্বন্ধে চিঠি লিখে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকবার এই সংস্কৃতিবান দম্পতির সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছে। ঢিণ্ডাজী তাঁর কাজে খুব দক্ষ এবং নিরলস ছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন উর্দু কবি। নির্বাচনের পর পৌরসভাতে যে দলবাজি ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে, তার কুফল তাঁকেও ভোগ করতে হয়েছে। কয়েক মাস যাবৎ সভাপতি তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে রেখেছিল। আবার যোগ দিয়েছেন। খুশি হলাম যে এখন খাণ্ডলা (কচ্ছ)-র নতুন নগরটি দেখাশোনার কাজ তিনি পেয়েছেন। বর্তমান ব্যবস্থায় যোগ্যতার কদর খুব কমই হয়।

১৫ মার্চ এখানকার তার-টেলিফোনের অফিসার গৌতমজী এলেন। মানুষটির বুদ্ধি আছে। কিন্তু যখন রেগে যান তখন বুদ্ধি পুরোপুরি কাজ করে না। হস্তরেখা আর জ্যোতিষে তাঁর বিশ্বাস আছে। সে সম্বন্ধে তিনি নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করেন, এটা খারাপ কথা নয়। কিন্তু এটা তিনি বুঝতে চাইতেন না যে, লোকে কেন এই 'মহান বিদ্যা'টি মানতে অস্বীকার করে। এইভাবেই ঈশ্বরকেও তিনি লাঠি হাতে নিয়ে মানাতে চান। তাঁর কবিতার প্রতিও অনুরাগ আছে। এইরকম কবিকে কি করে বোঝানো যায় যে 'তুকবন্দী' কবিতা নয়। তিনি উর্দুতেও কবিতা লেখেন, হিন্দিতেও লেখেন এবং নানা রকম ছন্দে তাঁর দখল আছে। তিনি লম্বা লম্বা কবিতা লিখে কতবার আমার কাছে পাঠিয়ে সোজাসুজি গালাগাল না দিয়ে শুধু আক্ষেপ করেছেন। আমি একটিরও জবাব দিই নি। এটাকে তাঁর জয় মনে করা উচিত ছিল কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। বরাবর তুকবন্দীতে চিঠি লিখে পাঠিয়ে যাচ্ছেন। সৌভাগ্য এটাই যে আমি তাঁর বাড়ি থেকে আড়াই-তিন মাইল দূরে থাকি, নইলে প্রতি দু-তিন দিন অন্তর হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়তেন।

আজকাল আপনি কোনো গভীর জঙ্গলের নির্জনতায় গেলেও রেডিও যদি থাকে তাহলে পৃথিবীর গতিবিধি বুঝতে অসুবিধে হয় না। হর্নক্লিফে এসেই আমি রেডিও নিয়ে নিয়েছিলাম। সেটা বেশ ভাল চলত। ১৭ মার্চ হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। তখনো রেডিওর দোকান ছিল না। আমি নিজেই ওটা ঠিক করব স্থির করলাম। বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ-জল ইত্যাদি লাইন সামান্য কিছু

গণ্ডগোল করলে যদি কেউ তা সারাতে না পারে তাহলে আমি মনে করি সে আধুনিক যুগের নাগরিক নয়। রেডিও সম্বন্ধেও আমরা ভাবনা এই রকম। লেনিনগ্রাদে রেডিও দু-একবার গণ্ডগোল করেছিল, আমার প্রতিবেশী মেজরকে তা ঠিক করতে আমি দেখেছিলাম। সেজন্য সাহস হলো। খুললাম। ভাল্ব খারাপ হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল না তাহলে কী গণ্ডগোল হয়েছে? জনকেও ডেকে এনেছিলাম কিন্তু শেষে আমার মাথা থেকেই বেরোল যে, ভেতরে ডায়াল ঘোরানোর তারটা ছিঁড়ে গেছে। তার লাগে বিশেষ ধরনের। কিন্তু আমি ভাবলাম, কোনো শক্তপোক্ত সুতো হলেই হবে। সেইরকম একটা সুতো নিয়ে তাতে লাগিয়ে দিলাম। রেডিও চলতে শুরু করল। তবে সূচক সংখ্যাগুলিতে তার ঠিকভাবে লাগছিল না, সে জন্য আরও পরিশ্রম দরকার ছিল। আমি আন্দাজে কাজ চালাতে লাগলাম। সেই দিনের মেরামত করা আমার রেডিও আজ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালেও কাজ করছে।

ভূতনাথ ভীষণ খামখেয়ালীপনা করতে চাইছিল। অ্যালসেশিয়ানের মতো বড় কুকুরকে মেরে-ধরে ঠিক করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে অনেক গল্প আমি শুনেছি। ধমক দিলে আমাকেও সে ঝাপটা মেরেছিল, কমলাকেও দু-বার ঝাপটা মেরেছিল। আমি ভাবতে লাগলাম, এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। কিন্তু কমলা তা করতে রাজি ছিল না।

যদিও হাঁটুর ঘা ভাল হয়ে গিয়েছিল তবু যতক্ষণ না ভালভাবে ছাল উঠে যায় ততক্ষণ কোনো ভরসা ছিল না। শোওয়ার সময় অসাবধানতাবশত কিছুটা কাঁচা ছাল উঠে গেল। আবার চিন্তা হতে লাগল, কিন্তু আমি সাবধানে থাকাটা স্থির করে নিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে মনে বিষণ্ণতা জেগে উঠত, তার কিছুটা ছিল কমলার জিদের কারণেও। তার প্রতি সব সময় আমার অভিযোগ ছিল যে, সে মাথা খাটিয়ে কেন কাজ করে না? আমি চাইতাম তার পড়াশোনা অবিচ্ছিন্নভাবে চলুক। যখন দেখতাম সবসময় মোজা-সোয়েটার বুনছে আর রেডিও শুনছে, তখন বলতেই হতো। ৬০ বছর বয়সে পৌঁছনোর পর বোঝা যায়, জীবনের একটি নতুন মোড় আসে আর মানুষ বুঝতে শুরু করে যে, এবার তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। মৃত্যু যে কোনো সময়েই আসুক তা নিয়ে আমার চিন্তা ছিল না। আমি মনে করতাম এত বছর আমার যা করণীয় ছিল তা করে ফেলেছি। এখন না আমাকে পৃথিবীর দরকার, না পৃথিবীকে আমার দরকার। কখনো মনে হতো, 'কত ভাল হতো যদি এখানেই শুয়ে থাকাকালীন মৃত্যু আসত এবং তা ৬১ বছরের মধ্যেই। আল্লা আল্লা খৈর সল্লা। না কারও কাছে পাওনা আছে, না কারও কাছে দেনা আছে।'

৩১ মার্চ জানা গেল কমলা সাহিত্যরত্ন পাস করে গেছে। একটি বড় লক্ষ্যে পৌঁছান গেল।

৬ এপ্রিলের চিঠিতে শান্তি ভিক্ষু লিখলেন—'আমি গৃহস্থ হয়ে গেছি।' স্বাধীন জীবন থেকে কারুরই বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আমি পছন্দ করতাম না। গৃহস্থ হয়ে গেলে মানুষের কাজ করার শক্তি অর্ধেক হয়ে যায়। শান্তি ভিক্ষু এতদিন পর্যন্ত সমস্ত সময় বিদ্যার্জনে ব্যয় করেছিলেন। লেখা এবং পড়া দুইয়েরই প্রতিভা আছে তাঁর, বৌদ্ধসাহিত্য ও দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং তার জন্যই তিনি তিব্বতী ও চীনা ভাষা পড়েছেন।

৯ এপ্রিল আমার ৬০তম বছরের পূর্তি ছিল। গত বছর প্রথম কমলা তা পালন করেছিল। এবার সেইদিন সবার আগে অমৃতের অভিনন্দনের তার পেলাম। আমার বাবা গোবর্ধন পাণ্ডে

সম্ভবত ৪০ বছরেরও মুখ দেখেন নি। দাদু জানকী পান্ডেরও সেই অবস্থাই হয়েছিল। আমি তাদের দেড়গুণ বেঁচে থেকেছি কাজেই আর লোভ করা উচিত নয়।

১১ তারিখে প্রয়াগ 'পরিমল'ও তারে অভিনন্দন জানালেন—'জীবহু লাখ বরীস।'[১] অভিনন্দনগুলি বার্ধক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। আমাকেও অন্তর-অবলোকন করতে বাধ্য হতে হলো। সাবধান হতে শুরু করলাম যে, বার্ধক্যের প্রবৃত্তিগুলি আমার মধ্যে এসে পড়েছে না তো?

মেহরবাবা—এবার এপ্রিলে আমাদের ওপরের বাড়ি হর্নহিলে এক মাসের জন্য ভারতের এক মহান সিদ্ধপুরুষ তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে নিয়ে উঠেছিলেন। মেহরবাবার নাম মাঝে মধ্যেই আমি শুনেছিলাম। কিন্তু সিদ্ধ মহাত্মাদের প্রতি আমার না ছিল আস্থা আর না ছিল কোনো আকর্ষণ, তাই আমার কোনো কৌতূহলও ছিল না। কিন্তু রোজ তাঁরা যখন বেড়ানোর জন্য আমাদের ফটকের সামনে দিয়ে যেতেন তখন সেদিকে চোখ যাবে না তা কি করে হয়? আমি ভাল করে জানতাম যে মেহরবাবা, অরবিন্দ ও রমণ মহর্ষির চেয়ে কোনো অংশে কম নন। যদি তাঁরা দুজন তাঁর চেয়ে বেশি খ্যাতি পেয়ে যান তাহলে তার কারণ এটাই যে তাঁরা হিন্দু ছিলেন এবং আমাদের দেশে হিন্দুদের বসবাসই বেশি। ভক্তিতেও এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে। নন্দু মেহরবাবার কাছে কাজ করত। সে বলত, হর্নহিলের দিকে কারুর যাওয়ার অনুমতি নেই। নিজেদের প্রতিটি ব্যাপার রহস্যময় করে তোলা ভারতীয় সাধুদের টেকনিক। মেহরবাবা বাইরে আসতেন, পথেও চলতেন। লোকের সঙ্গে মেশায় তাঁর ততটা আপত্তি ছিল না। তবে কুড়ি বছর ধরে তিনি কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর কুড়ি-বাইশজন মহিলা ও পুরুষ ছিলেন। অধিকাংশ পারসী, কিছু হিন্দু, আমেরিকান আর ইউরোপিয়ানও ছিল। বিজ্ঞাপন ছাড়াই মুসৌরীতে তাঁর খ্যাতি হয়ে গিয়েছিল। যখন-তখন লোকে দর্শন করার জন্য চলে যেত কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হতো। কিছু নিরাশ লোক আমার কাছে অভিযোগ করত। আমি তাদের বলে দিতাম, 'সকাল-সন্ধেয় তিনি বেড়াতে বেরোন, সে সময় দর্শন করে নিন।' কিলডের-এর পুসঙ্গ বোনেরা মেহরবাবার প্রতিবেশী ছিল। তারা ফটকের সামনে দিয়ে রোজ তাঁকে যেতে দেখত। তারা এটাও দেখেছিল যে, মেহরবাবার মহিলা ভক্তদের মধ্যে আমেরিকান আর ইউরোপীয় মহিলাও আছে। কোনো খ্রিস্টান কেন কোনো ভারতীয় সিদ্ধপুরুষের পিছনে পিছনে ঘোরে, এটা তাদের কাছে শুধু বিস্ময়েরই নয়, অপ্রসন্নতারও ব্যাপার ছিল। রাঁধুনী ছিল একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা ভক্ত। তাদের আলোচনা শুনে আমি বললাম, 'সন্ত আর সিদ্ধদের সমালোচনা করা ঠিক নয়।' তারা এটাও বলত যে, কেন স্ত্রীলোকরাই তাঁকে ঘিরে থাকে। যখন বাইরে ঘুরতে বেরোতেন তখন আমিও দেখতাম, স্ত্রীলোকরাই তাঁর ছত্রধারিণী ও অনুচরী। তাঁর নিজের বাসস্থানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারেও তারা দোষ ধরত। তারা জানত না যে, আমাদের দেশের পরম সিদ্ধ অরবিন্দ একযুগ ধরে বছরে একবারই লোককে দর্শন দিতেন। সর্বদা বন্দী থাকার ফলে ডায়াবিটিস

[১] 'লক্ষ বছর বেঁচে থাকো।'—স·ম·

হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। তাঁর এখানে চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি করার জন্য সৌভাগ্যক্রমে একজনই মহিলা পাওয়া গিয়েছিল। সিদ্ধদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের ভেদ থাকে না। ব্রহ্মলীন মানুষ পরম অদ্বৈতবাদী হয়। যদি মেহরবাবার কাছের মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের সম্পর্ক কম রাখতে দেওয়া হয় তো তার কারণ খোঁজার প্রয়োজন নেই। আমি মেহরবাবার পক্ষ নিচ্ছিলাম আর পুসঙ্গ বোনরা তাঁর ছিদ্রান্বেষণের জন্য মুখিয়ে ছিল। বলছিল, মৌন আর নির্জন বাসের যদি তিনি এত ভক্ত তাহলে বাংলোয় টেলিফোন কেন লাগিয়ে রেখেছেন? কেন রেডিও শোনেন? কেন খবরের কাগজ পড়েন?

মেহরবাবার সঙ্গে একজন ইরানীও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার ফারসীতে প্রায়ই কথাবার্তা হতো। আমি যখন কৌতূহল দেখালাম না এবং দর্শনের কোনো ইচ্ছেই আমার দেখতে পেলেন না, তখন তাঁর ভক্তরা ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ছাপা মেহরবাবা-সম্বন্ধী প্রায় কুড়িটি বই স্তূপীকৃত করে দিল আমার টেবিলে। তা থেকে জানা গেল যে, দেশে-বিদেশে মেহরবাবার কত ভক্ত রয়েছে। একটি বই আমি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। তাতে ভারতবর্ষের প্রতিটি জায়গার পাগলদের বিবরণ দেয়া হয়েছিল, কয়েকজনের ফটোও ছিল। মেহরবাবা তাদের সবাইকে সিদ্ধ পুরুষ বলেছিলেন। যদি এইসব পাগলদের আশেপাশে থাকা লোকদের জিজ্ঞেস করা হতো তাহলে তারাও দিব্যি গেলে এই কথাই বলতো। পাগল অ্যাবনর্মাল হয়। যদি তারা অহিংস না হয় তাহলে তাদের ওপর লোকের আস্থা আরও বেড়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিভাসম্পন্ন, যার ঝলক কথাবার্তায় কখনো-সখনো পাওয়া যায়। কিছু লোক ধর্মপাগলও হয়। মেহরবাবা এই সূচি তৈরি করে একটি বড় কাজ করেছিলেন কিন্তু বিবরণ অসম্পূর্ণ ছিল।

কমলা এখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল। আরও একটি বড় দায়িত্ব আমাদের ওপর আসতে যাচ্ছিল। আমি চাইতাম না যে, সে আর বাজার করতে যাক। একবার সে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বোঝালেও বুঝতে চাইত না। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সিজিনের প্রভাব দেখা যেতে লাগল। আমাদের প্রতিবেশী-বাংলোটি মেহরবাবা খালি করে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের ফটকের সামনে এসে বিশেষভাবে দেখা করার জন্য ডাক দিলেন। আমিও সেই সুযোগটা নিলাম। আমাদের বাড়িতে এখন অতিথি আসতে শুরু করেছিল। ১৭ মে সত্যা গুপ্ত এলেন। তাঁকে কৌরবী লোকগীত ও লোককাহিনী সংগ্রহ করার কথা বলার সময় আমি এটা আশা করি নি যে, তিনি এই কাজে লেগে পড়বেন। খুব খুশি হলাম যখন তিনি ১৩০০ গীত আর ২০০-এর বেশি সংগৃহীত কাহিনী দেখালেন। তার মধ্যে অনেকগুলো শিল্পের বিচারেও ছিল উৎকৃষ্ট। তবে হ্যাঁ, উচ্চারণগুলো সঠিকভাবে লেখার ব্যাপারে যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল তা তিনি দেন নি। তাঁর উৎসাহও ছিল প্রচণ্ড। মেয়েদের কাছেই এই সম্পদ মূলত থাকে এবং তা শিক্ষিতা মেয়েরা যত সহজে সংগ্রহ করতে পারে তত সহজে পুরুষরা পারে না। কাজটিকে আরো এগিয়ে দেবার জন্য আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বললাম, 'তুমি পি এইচ ডি-র জন্য এই বিষয়টি নিয়েই তৈরি হও।' পরে সে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে ডি ফিল-এ ভর্তিও হলো।

১৮ মে বিহারে আমার এক পরিচিত জমিদার কোনো একজন হিপ্নোটিস্টকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এলো। তার সিদ্ধ গুরু দুরারোগ্য ব্যাধিকে তাঁর দিব্যশক্তির দ্বারা দূর করে দিতেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আমাদের পাশের বাড়িতেও একজন দিব্যপুরুষ এসে রয়েছেন, আপনি তাঁকেও

দর্শন করুন।'

১৯ মে জামিয়ার ইংরেজির প্রফেসর ও আমার বন্ধু চৌহান এলেন। তিনি জানালেন যে, গত বছর যে-ইতিহাসের অধ্যাপককে আমি 'ভোল্গা সে গঙ্গা (উর্দু) দিয়েছিলাম, তিনি তাতে মুসলমান মেয়েকে হিন্দুর বিয়ে করার ব্যাপার দেখে তা ছিঁড়ে ফেলেছেন। আজকালকার যুগে কোনো তরুণ এবং শিক্ষিত যে এইরকম ভাবনা মাথায় রাখতে পারে তা আশ্চর্যের।

২২ মে পাটনা থেকে বীরেন্দ্রর পাঠানো লিচুর পার্সেল এলো। লিচু আর আমের মরশুম এসে গেছে। মে-র শেষ নাগাদ মুসৌরী জমে উঠল। সন্ধের সময় মাল রোডে ভিড় হতে লাগল। ব্যবসায়ীরা এখনও সন্তুষ্ট ছিল না। বলছিল, 'লোক তো আছে, কিন্তু পয়সা খরচ করতে পারে না।'

শ্রীভূদেব বিদ্যালংকার—বলদেবজীর বড় ভাই-এর সঙ্গে পরে কানপুরেও দেখা হয়েছে। কিন্তু আমার তাঁর ১৯১৭ সালের কাছাকাছি সময়ের মুখই মনে পড়ে, যখন আমি মহোবা আর্যসমাজে উঠেছিলাম এবং তিনি গুরুকুল থেকে সদ্য স্নাতক হয়ে এসেছিলেন। দু'ভাই পাহাড়ে একই জায়গায় আসেন না, তাই এবার বলদেবজী আসেন নি।

২৭ মে বৈশাখীপূর্ণিমা ছিল। অফিস ছুটি দেখে অনুমান করছিলাম যে, ভারত সরকার সম্ভবত বুদ্ধজয়ন্তীকে জাতীয় ছুটি বলে গণ্য করেছে।

'প্রমাণবার্তিকভাষ্য' ছাপা হয়ে গিয়েছিল, এখন তার ভূমিকা লেখার ছিল। ড· অলতেকর তিব্বত থেকে আনা বৌদ্ধ সংস্কৃত-গ্রন্থ 'ভিক্ষু-প্রকীর্ণক' সম্পাদনা করার জন্য লিখেছিলেন। আমি সম্মতি জানিয়ে দিয়েছিলাম।

শ্রীকান্হাইয়ালাল সহল পিলানি থেকে এখানে এলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে রাজস্থানী লোকগীতের গায়ক এবং পিলানির এক শিক্ষককে এনেছেন। জানতে পারলাম যে, সেখানে লোকগীত সংগ্রহের কাজ হচ্ছে। তিনি কয়েকটি গানের নমুনা শোনালেন, যা খুবই করুণ ছিল। বুঝলাম, রাজস্থানেও 'নিহালদে' গাওয়া হয় এবং এত বড় যে সারা বর্ষা ধরে গাওয়া হয়। এটা জেনে আরও ভাল লাগল যে, 'নিহালদে'-কে ওস্তাদরা নষ্ট করে নি, যা কৌরবীতে দেখা যায়। কৌরবীর ওস্তাদরা 'নিহালেনদে এবং সুলতান'কে নতুন রূপ দিয়েছে, যার জন্য পরম্পরা থেকে কণ্ঠস্থ করা গীতের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে লুপ্ত হয়ে গেছে। লোকগীতের ব্যাপারে রাজস্থান খুব সমৃদ্ধ। কারণ সামন্তবাদ ওখানে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির সময় পর্যন্ত অনেকটা অক্ষুণ্ণ থেকে গিয়েছিল। লোকগীতের পেশাদার গায়ক সেখানে উপস্থিত ছিল যাদের প্রতিপালন আর সম্বর্ধনা করে এসেছেন রাজস্থানী রাজা আর ঠাকুররা। এখন সেই বরদহস্ত আর নেই বলে লোকগীতের সমৃদ্ধ পরম্পরা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। যদিও লোকগীত সংগ্রহের দিকে এখন দৃষ্টি গেছে কিন্তু অত সম্পদ জমা করে সংরক্ষিত করার জন্য যে-পরিমাণ টাকা আর পরিশ্রমের প্রয়োজন তা সরকার এদিকে নজর দিলে তবেই হতে পারে।

ডা· রাম আমাদের এলাকার লোক। আমি ১৯৫০ সালে এখানে এসে থাকতে শুরু করেছিলাম আর তিনি ১৯৪৬ সালেই বাংলো কিনে নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী কেরেলিয়ান। ৩১ মে তাঁর কাছে গেলাম। বেচারা বারোমাস অসুখে ভোগেন। গরমের তিন-চারটে মাস এখানে কাটান। বাড়ি ফরুখাবাদে এবং প্র্যাকটিসও ভাল। কাছেই লালা কুন্দনলালের স্ত্রীকেও দেখতে

গেলাম। বুড়ির দু পায়ের ঘা বহু বছর ধরে রয়েছে। সেইসঙ্গে ডায়াবিটিসও ছিল। ইঞ্জেকশন নেওয়া বন্ধ করে শেঠগিন্নি অন্য ওষুধ ব্যবহার করতে থাকে। ঘা বুজে গেল। তারপর হাঁটুতে প্রচণ্ড জ্বালা করতে লাগল। ব্যথার চোটে বুড়ি কঁকাতো। পা তো শুকিয়ে একেবারে কাঠি হয়ে গিয়েছিল। আব এখন শয্যাশায়ী। বলছিল, 'এবার ভগবান আমাকে ডেকে নিন।'

১ জুন 'লেনিন' লেখা শুরু করলাম। আজ সত্যেন্দ্রজী এলেন। দুপুরে কবিরাজ রামরক্ষ পাঠক উপাধ্যায়, আচার্য যাদবজী ত্রিকমজীর সঙ্গে এলেন। চিকিৎসা চূড়ামণি যাদবজীর নাম তাঁর শিষ্যদের কাছে আমি বিহারেই শুনেছিলাম। আধুনিককালে আয়ুর্বেদ গ্রন্থের উদ্ধার এবং আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রসারের জন্য যাদবজী যত কাজ করেছিলেন তা আর কেউ করে নি। প্রাচীন পরম্পরার মর্মজ্ঞ এবং অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আধুনিক প্রবৃত্তির অন্ধ বিরোধী ছিলেন না। বস্তুত আয়ুর্বেদের অনেক মৌলিক অবদান আছে যেগুলি আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত নয় এবং যেগুলি নিয়ে আমাদের দেশ গর্ব করতে পারে। এ ব্যাপারে আধুনিক চীনের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক। চীনে কবিরাজদের পুরনো পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে আবার আধুনিক পদ্ধতিও বোঝাব ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধির সম্বন্ধে গবেষণা করার কাজে কবিরাজ ও ডাক্তারদেব সহযোগিতায় আধুনিক রীতিতে ঔষধের পরীক্ষার মূল্যায়ন হয়। রোগের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও কবিরাজদের বিধির সঙ্গে ডাক্তারদের পরিচিত হওয়ার প্রেরণা দেওয়া হয়। আমাদের চাব হাজার বছরেব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কবিরাজরা তাঁদের পরীক্ষার দ্বারা অনেক রকম তত্ত্ব আব ঔষধি পেয়েছেন যার মধ্যে কয়েকটির গুণাগুণ ডাক্তাররাও স্বীকার করেছেন। একবার অন্তত আমাদের সমস্ত ঔষধিব বিশ্লেষণ হওয়া দরকার।

৪ জুন ভবঘুরে শিবশর্মার বাবা কবিবাজ শ্রীদেবরাজশর্মা এলেন। ছেলের জন্য পাগলা হয়ে গিয়েছিলেন। বলছিলেন, 'ওব মা খুব কাঁদে, শিব কখনো পাটিয়ালা এলেও ঘরে আসে না।' আমি বললাম, 'আপনারা যত তাকে আটকে বাখতে চাইবেন, ততই সে দূরে পালাতে থাকবে। এরকম যদি না করেন তাহলে ও নিজে নিজেই ঠিক রাস্তায় চলে আসবে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে, আপনি তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। বর্তমান যুগে বিয়ের ব্যাপারে ছেলেরা মা-বাবার দেওয়া কথা মনে রাখে না।' পরে আমি শিবশর্মাকেও বললাম, 'বন্ধনে পোড়ো না, তবে মা-বাবাকে শত্রু মনে করা খুব খারাপ।'

সত্যা গুপ্তর বাবা শ্রীবৈদমিত্রজী বহু বছর ধরে একাকী জীবন যাপন করছিলেন। তিনি তখনও প্রৌঢ় হন নি এমন সময় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হলো। গায়ত্রী আর সত্যা—দুই মেয়ে ছিল। পুরনো আর্যসমাজী বংশ। তিনি ধর্মীয় অধ্যয়ন আর সৎসঙ্গে নিজেব সময় কাটাতে শুরু করলেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিলেন। গায়ত্রী ডাক্তার হয়ে গেলেন আর সত্যা এম এ। গায়ত্রী একজন বিবাহিত ডাক্তারকে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করলেন। বাবার এটা পছন্দ হলো না। মেয়েকে সারাজীবন দুঃখ ভোগ করতে হলো। তিনি চাইছিলেন সত্যার বিয়ে হয়ে যাক কিন্তু সত্যা রাজি ছিলেন না। গরমের সময় তিনি চার-পাঁচ মাসের জন্য মুসৌরীতে চলে আসতেন। তিতরোঁ-তে (সাহারানপুর) নিজের বাড়ি ছিল, কিন্তু ওখানে অনেক বছর হয়ে গেল যান নি। শীতকালটা হরিদ্বার বা হৃষিকেশে কাটিয়ে দেন। তাঁর হার্টের অসুখ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। মেয়েদের জন্য দুশ্চিন্তা করাটা তাঁর পক্ষে খারাপ। নিজের লোকদের

হার্দিক সান্ত্বনাই তা দূর করতে সাহায্য করতে পারে। আর্যসমাজে এমন কোনো সন্ত নেই যিনি তাঁকে আধ্যাত্মিক সুখ দিতে পারেন, তাই যে কোনো সন্তের পিছনে পিছনে ঘোরেন। আমাকেও এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, 'অনীশ্বরবাদী নাস্তিকের প্রেসক্রিপশন এখন এই বয়সে আপনার পক্ষে কাজের হবে না। মানুষের মনের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা আছে, এর জন্য আপনাকে আবার অধ্যয়ন ও চিন্তা করতে হবে। আর আপনার বয়স ৫৫ বছর হয়ে গেছে। ওজন কমানোর চেষ্টা করুন।' নিরামিষাহারীদের পক্ষে এটা আরও অসুবিধের, কেননা তাদের প্রিয় খাবারের মধ্যে চিনি আর ঘি-এর আধিক্য থাকে যা ওজন বাড়ানোর পরম সহায়ক। বেদমিত্রজী অনেক বছর ধরে তাঁর কোম্পানিতে লাগানো টাকার লাভ থেকেই দিন চালাতেন। তাঁর পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল।

এলাহাবাদের প্রফেসর মহেশনারায়ণ সাক্‌সেনা প্রায় প্রতি বছর মুসৌরী এসে গরমের ছুটি কাটান। প্রয়াগ থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল। ৭ জুন অনেকক্ষণ ধরে কথোপকথন হতে লাগল। সংগীতের প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগ ছিল। এম এস সি-র প্রথম বছর পাস করেছিলেন, কিন্তু সেদিকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, এজন্য এম এ পাস করেছেন। তারপর তিনি তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্ঠা সংগীতে দিয়েছিলেন। বহু দিন ধরে এলাহাবাদের একটি সংগীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এখন ইউনিভার্সিটিতে আছেন। এইরকম ব্যক্তি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য সংগীতের তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি আমাদের লোকগীতগুলিও অধ্যয়ন করতে পারতেন। তিনি জানালেন, 'আমি আমার ডি ফিলের জন্য 'সন্ত কবি ও সংগীত'কে নিয়েছি।' এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে আমাদের সন্ত কবিই শুধু গীতের পদ রচনা করতেন না, এমন কি এই পরম্পরা অষ্টম শতাব্দীর পূর্বার্ধের আদি সিদ্ধপুরুষ সরহ অব্দি চলে যায়। বস্তুত আমাদের অনেক সংগীত যে সব পদরূপে সুরক্ষিত আছে তা হচ্ছে সিদ্ধপুরুষ সন্তদেরই পদ। তাঁরা তাঁদের প্রতিটি পদের সঙ্গে রাগের উল্লেখ করেছেন। নোটেশন (স্বরলিপি) সে সময় ছিল না। এই সব পদের দ্বারা সেই রাগের আকার স্থির করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আসলে নাগরিক-সংগীত এবং লোক-সংগীতের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কাজ আমাদের এখানে হয় নি বললেই চলে। আমি তাঁকে এটাও বললাম যে, আন্তর্জাতিক স্বরলিপির প্রচারের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে, কারণ আন্তর্জাতিক সংগীত-সমাজে এর দ্বারাই আমরা সহজে আমাদের জিনিসগুলি পৌঁছে দিতে পারি।

সেই দিনই সন্ধেয় স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দজী এলেন। তিনি অন্ধ। সব মানুষই প্রতিভাবান হবে, এটা ঠিক নয়, কিন্তু যিনি প্রতিভাবান হন তিনি অসাধারণ হন। পণ্ডিত সুখলালজীও এর উদাহরণ। স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দজী সংস্কৃত শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। আমার সঙ্গে যদিও তাঁর পরে পরিচয় হয়, তাহলেও তাঁর নাম আমি আগেই শুনেছিলাম। তিনি ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে আমার ভাষণ শুনেছিলেন আর তখন থেকেই পরিচিত ছিলেন। সংস্কৃতের গভীর জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর মধ্যে কূপমণ্ডুকতা ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নেই। সংস্কৃত বিদ্যার প্রসারের দিকেও তাঁর মনোযোগ যে আছে তার প্রমাণ হচ্ছে বেনারসের উদাসী সংস্কৃত বিদ্যালয়। আমেদাবাদে চার-পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে তিনি বেদমন্দির বানিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, 'সংস্কৃতের বহু গ্রন্থ অপ্রকাশিত রয়েছে, বহু বই প্রকাশিত হয়েও এখন দুর্লভ। এগুলো হাতে

তৈরি চিরস্থায়ী কাগজে প্রকাশ করা দরকার। দশ-বিশটা বই বেরনো পর্যন্ত তো আশা করা ঠিক হবে না যে এই প্রকাশনা স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। তবে পরে স্বাবলম্বী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। সেইসঙ্গে বেদান্তের মূল গ্রন্থগুলোর হিন্দি অনুবাদ এমন হওয়া উচিত যাতে মূলের স্বাদ পাওয়া যায়, টীকা না মনে হয়।' স্বামী সত্যস্বরূপজী তাঁর শিষ্যদের একজন যাঁর সঙ্গে বছরে দু-একবার দেখা হয়ে যেত। এখনও আমি এই ব্যাপারটির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেতাম।

রাকেশজী কৃত 'কামায়নী'-র সংস্কৃত অনুবাদ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতিতে ছাপার জন্য নেওয়া হয়েছিল। আমার আশা ছিল যে অহিন্দি ভাষাভাষী এলাকায় হিন্দির প্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়া এই গ্রন্থটি এবার প্রকাশিত হবে কিন্তু সেটা ওখান থেকে ফেরৎ এলো। তারপর আশা করলাম হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের কাছে। কয়েক মাস পাণ্ডুলিপি ওখানে পড়ে থাকল। এবার চিঠি এলো যে, রিসিভার তা প্রকাশ করার অনুমতি দেন নি। রিসিভার একজন উকিল, তাঁর সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহ নেই।

এরপর মানুষের সহজেই মনে হতে পারে যে, হিন্দি সংস্থার সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করার মানেটা কী? তারা এটা কি করে বুঝতে পারবে যে, হিন্দির গ্রন্থরত্নের সংস্কৃত অনুবাদ অহিন্দি ভাষার তাবড় সাহিত্যিকদের কাছে পৌঁছে নিজের দিকে তাদের আকৃষ্ট করতে পারে। আমাদের কত মহান গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদগুলি একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের মহিমা পৌঁছে দিয়েছে, তা তো আমরা দেখছিই।

১০ জুন সরকারের পক্ষ থেকে 'হর্মিটেজ' নীলাম হলো। এই হর্মিটেজ ছিল বাংলোর মতো কটেজ বা কুটীর। 'হর্মিটেজ' বিড়লারা নিয়ে লাখ-লাখ টাকা ঢেলে তাকে বিড়লা-নিবাস বানিয়ে দিয়েছিল। সে-সময় কটেজটি এক মুসলমান ভদ্রলোকের সম্পত্তি ছিল। তিনি ২৫-৩০ হাজারের নীচে নামতে রাজি ছিলেন না। দেশ বিভাগের সময় তিনি পাকিস্তান পালিয়ে গেলেন। বাংলোর সমস্ত ফার্নিচার আর জিনিসপত্র লোকে নিয়ে নিল। ছাদ, দেওয়াল আর দরজা রয়ে গেল। দরজাও লোকে খুলে নিতে যাচ্ছিল। চৌকিদার যখন নেই তখন কে তা রক্ষা করবে? নীলামে ডাক দেওয়ার জন্য অনেক লোক এসেছিল। শ্রীমোহিনী জুত্‌শীও পাঁচ হাজার পর্যন্ত দিতে রাজি ছিলেন। ডা· রামের লোক সাড়ে সাত হাজার পর্যন্ত দর দিল। বিড়লার তরফ থেকে যখন আট হাজার বলা হলো তখন আর কারও সাহস হলো না। সেই দিন তো কথা পাকা হলো না, পরে নীলাম-অফিসার বলে দিলেন, 'দশ হাজারের কমে বিক্রি করার এক্তিয়ার আমাদের নেই।' পরের নীলামে দশ হাজারে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। তখনও বাড়ির দাম ছিল। গত দুবছরে তা আরও নেমে গেছে। বিড়লা-নিবাসের সঙ্গে লাগোয়া বলে তা দশ হাজারে বিক্রি হওয়া সম্ভব ছিল। জুত্‌শীজী আমাদের পাশাপাশি থাকার কথা চিন্তা করেই ওটা নিচ্ছিলেন।

একদিন (১৪ ফেব্রুয়ারি) মেঘলা থাকতে থাকতে রাত থেকেই বৃষ্টি হতে লাগল। সকালেও একটু হলো। তারপর সারাদিন মেঘমুক্ত থাকল। হাওয়া আর বৃষ্টি মুসৌরীর তাপমাত্রার ওপর খুব প্রভাব ফেলে। সেদিন তাপমাত্রা এত কমে গেল যে দু-এক ঘণ্টার জন্য গরম কাপড় আর কোট পরতে হলো। এবার বৃষ্টি-বাদলার সম্ভাবনা ছিল। যদিও এটা একেবারে নিয়ম নয় যে ১৫ জুন থেকে বর্ষা আরম্ভ হয়ে যাবে। সার্ভের লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে ২৬ জুনকে বর্ষার আরম্ভ বলে মনে করে।

—১৯৫৩—

১৬ জুন 'লেনিন' শেষ হয়ে গেল। যখন-তখন বৃষ্টি হওয়ায় ভ্রমণার্থীদের বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল। তারা সঙ্গে সঙ্গে মুসৌরী থেকে চলে যেতে শুরু করল।

'স্তালিন', 'লেনিন' এবং 'মার্কস'-এর জীবনী শেষ করার পর ২২ জুন থেকে চতুর্থ পুস্তক 'মাও'-তে হাত দিলাম। সেইদিনই উন্নাও-এর এক মুসলমান উকিল সাহেব এলেন। ইংরেজদের শাসনকালে দেশে দেশে বিরোধ সৃষ্টি করার জন্য যারা মুসলমানদের পথ দেখাতেন তাদের এটা বোঝানো মুশকিল যে, নতুন যুগে পুরনো বিভেদের মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তাদের কাছে সেটাই একমাত্র পথ যা চার শতাব্দি আগে আকবর দেখিয়ে ছিলেন। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর এবং পুরনো মনোবৃত্তির জন্য দেশ বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় শিক্ষিত মুসলমানরা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে নিরাশ হয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সব কেন অধিকাংশও ওখানে পালিয়ে যেতে পারে না। যাদের আত্মীয়স্বজনরা পাকিস্তান চলে গেছে তারা সেখানকার কষ্ট দেখে এখন বুঝছে যে আমাদের জন্য পাকিস্তান নয়, হিন্দুস্তানই ভাল ছিল। এই অবস্থাটি তাদের সহ্য হচ্ছিল না যে তারা 'কেউ নয়' মনে করা হোক। উকিল সাহেব এইসব কষ্টের কথা জানাচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'মুসলমান জাতি বিপন্ন বললে ভ্রান্ত চিৎকার হবে। আমাদের দেশে সব ধর্মই স্বাধীনভাবে থাকতে পারে, আমাদের পুরনো ঐতিহ্যও এর অনুকূল। কিন্তু বিভেদের মনোভাব দূর করতে হবে এবং মুসলমানদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তেমনিই মানতে হবে যেমন খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন বা হিন্দুরা মানে।'

আজকাল চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা নয়, বরং জাত আর সম্বন্ধ জিজ্ঞাস্য হয়। পণ্ডিত গয়াপ্রসাদ শুক্লের সুপুত্র শ্রীবিশ্বনাথ শুক্ল এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছিলেন। দেরাদুন ডি এ ভি কলেজে পড়েছেন। ওখানেই তাঁর বাড়ি। এখানে অধ্যাপনার কাজ পেলে বাড়িতে থাকার খুব সুবিধে ছিল। কিন্তু ডি এ ভি কলেজে কায়স্থদের প্রভুত্ব রয়েছে। কায়স্থ তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ ও বিভাগাধ্যক্ষ হতে পারে। অধ্যাপকের দরকার ছিল। যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় আর কেউ যোগ্যতম প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে নিজেদের লোকের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সবচেয়ে ভাল উপায় ছিল এটাই যে, এখন লোকের দরকার নেই বলে ব্যাপারটা স্থগিত রাখা। যোগ্য ব্যক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। সে কোনো জায়গায় ঢুকে যাবে। তখন আবার নিজের লোককে চুপিচুপি বসিয়ে দেওয়া হবে। বিশ্বনাথজী নিজের বিষয়ে খুবই যোগ্য ছিলেন বলে তিনি বেরিলি কলেজে কাজ পেয়ে গেলেন আর দু-এক বছর পরই আমেদাবাদে হিন্দি বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে চলে গেলেন। তাঁর বাবা প্রফেসর গয়াপ্রসাদ শুক্ল, দেরাদুনে নিজের বাড়ি বানিয়ে ওখানেই থাকেন। বাড়ি ছেড়ে আমেদাবাদে যাওয়া কি আর বিশ্বনাথের ভাল লেগেছিল? দেরাদুন ডি এ ভিকলেজেরই শুধু বদনাম দেব কেন, সব জায়গায় এই ব্যাপার। আত্মীয়তা অথবা খোশামুদিতে কাজ হয়। খোশামুদিতে যে যোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সে যোগ্যতম ব্যক্তিকেও ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যায়। আমাদের অঞ্চলের একজন নিম্নমানের অর্থনীতিবিদ আছেন, যিনি মন্ত্রীর কৃপাপাত্র হওয়ায় ইউনিভার্সিটির বিভাগাধ্যক্ষ হয়ে গেছেন। এইরকম লোককে সম্মানীয় পদে বসতে দেখে সত্যিই মন ভীষণ বিদ্রোহ করতে চায়। অন্য একটি তরুণকে জানি। আই এ এস-তে সব বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর যে তিন-চারজন প্রার্থী পেয়েছিল তাদের মধ্যে সে ছিল একজন। তার পাস করা উচিত ছিল, কিন্তু নেহেরুতন্ত্র

পার্সোনালিটি (ব্যক্তিত্ব) সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস বলে মনে করে, যার জন্য বোধহয় ৩০০ নম্বর আছে। পার্সোনালিটির পরীক্ষা চেয়ারে বসা লোকেরা মুখে মুখেই করে এবং তাদের ফয়সালাই চূড়ান্ত। কোনো লোক সেই তরুণকে দেখে বলবে না যে সে ব্যক্তিত্বে অন্য কারু চেয়ে খাটো অথচ ব্যক্তিত্বে তাকে দশ নম্বর দেওয়া হলো। যে রাজ্যে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই, রাজাও অযোগ্য, সেখানে ন্যায়ের কদর কোথা থেকে হবে? বিশেষ করে নেহেরুজীই যখন এই সন্দিগ্ধ ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষার বড় সমর্থক। সেই তরুণ একটি বিষয়ে পি এইচ ডি-র থিসিস লিখল। সেটা যে খুবই ভাল ছিল তা এর থেকেই প্রমাণ হয় যে এক প্রকাশক এই গ্রন্থটি ইংরেজিতে প্রকাশ করেছে। একটি ইউনিভার্সিটিতে একজন বোকা বিভাগাধ্যক্ষ হয়ে গেল। তরুণটি অন্য প্রবন্ধ লিখে, দু-বছর হলো, তার কাছে দিয়েছে। খোশামুদে দরবাবীর এত সময় কোথায়? এখন তার হয়তো ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার আশা। তার জন্য সেইসব দেবতাদের খুশি করা দরকার যাদের কৃপাদৃষ্টি পেলে এই পদে পৌঁছতে পারে। দুবছর ধরে তার ফুরসৎ হলো না থিসিসটি পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর। একদিকে একজন তরুণের জীবনের প্রশ্ন, অন্যদিকে এই মানুষটির এই নীচতা। 'ধিক্ ব্যাপকং তমঃ।'

২৪ জুন সাথী যজ্ঞদত্ত শর্মা তাঁর স্ত্রী সরলাজীর সঙ্গে এলেন। ন-দশ বছরের মধ্যে এত পরিবর্তন হয় তা আমার জানা ছিল না। দশ বছর আগে তাঁকে দিল্লীতে দেখেছিলাম। সাথী যজ্ঞদত্ত একটি কলেজের প্রফেসর ছিলেন। কমিউনিজম লক্ষ লক্ষ লোকের মতো তাঁকেও ফকির করে দিয়েছিল। নিজের যোগ্যতা আর কর্মক্ষমতা তিনি গরিবদের উদ্ধার করার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তিনি দিল্লীর কমিউনিস্ট নেতা। তাঁর স্ত্রী সরলা গুপ্ত ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রথমে ছাত্রছাত্রী, তারপর নারী ও শ্রমিকদের সংগঠনের কাজ করতে শুরু করেছিলেন। যজ্ঞদত্তজী আগে যুবক ছিলেন, এখন একটু মেদবহুল হয়ে গেছেন। তাঁর কালো চুলের অনেকটাই পেকে গিয়েছিল।

গর্ভাবস্থা পূর্ণ হয়ে আসছিল। কমলাকে মেটারনিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। মিশনারিদের সেন্ট মেরি হাসপাতাল হচ্ছে মুসৌরীর ভাল হাসপাতালগুলির একটা, সেটা আমাদের বাড়ি থেকে কাছেও। লেডি ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। জানালেন, রক্তচাপ একটু কম। ভিটামিন 'বি' ইঞ্জেকশন দিতে এবং ক্যালসিয়াম খেতে বললেন।

সেদিন ড· ধীরেন্দ্র বর্মা, ড· বিশ্বেশ্বর প্রসাদ এবং প্রিন্সিপ্যাল সদগুরুশরণ অবস্থীর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। পরের দিন পণ্ডিত নরদেব শাস্ত্রী এলেন। শাস্ত্রীজী চার মাইল দূরে লণ্ঢৌর-এ প্রতিবছর থাকেন, সিজিনের সময় অবশ্যই দর্শন দেন।

৩০ জুন জামিয়া মিলিয়ার অধ্যাপক ড· সলামতুল্লা তাঁর মেয়ে সঈদার সঙ্গে এলেন। তিন ঘণ্টা ধরে ভাষা এবং অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। আমার হিন্দি-প্রীতিকে অনেক লোকই উর্দু-বিদ্বেষ বলে মনে করেন। শোনা কথায় লোকের বিশ্বাসও হয়ে যায়। আমি উর্দুকে হিন্দি মনে করে তার প্রতি সেই রকমই অনুরাগ পোষণ করি এবং চাই যে উর্দুর অমূল্য সম্পদ দেবনগরীতে মুদ্রিত হয়ে ব্যাপকভাবে পঠিত হোক। আমি উর্দু লিপি ত্যাগ করার কথাও বলি না। ড· সলামতুল্লা সাহিত্য-প্রেমিক এবং উদার ভাবনা-চিন্তা পোষণ করেন। এইজন্য আমরা পরস্পরের ভাবনা বুঝতে পারি।

১ জুলাই অমৃতসর থেকে ভাইয়ার চিঠি এলো যে ভাবীজীর ছোটবোন ১৯ তারিখে মারা গেছে। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় খুব সাবধানে থাকা দরকার। বেচারা পড়ে গিয়েছিল। গর্ভস্রাবের সঙ্গে ভীষণ রক্তস্রাব হতে লাগল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল। গত বছর তার দিদির সঙ্গে মুসৌরী এসেছিল। বয়সই বা কি এমন হয়েছিল! কিন্তু মৃত্যু কি বয়স জেনে আসে? ছোট্ট একটি বাচ্চা আর এক মেয়ে সে রেখে গেছে।

মুসৌরীতে থাকা তিন বছর হয়ে গেল। এখানকার সবরকম জীবন দেখে আমার মনে হলো অন্যকেও এর ক্ষণিক দর্শন দেওয়া দরকার। সেজন্য আমি গল্প লেখা স্থির করলাম। প্রথম গল্প ছিল 'মহাপ্রভু', যা ১২ জুলাই লিখেছি। আমার গল্প প্রায় এক ফর্মার (১৬ পাতা) হয়। বেশির ভাগ সময় আমি একবার বসেই একটি গল্প শেষ করি। 'মহাপ্রভু' হচ্ছে আধুনিক কালের একজন ধর্মের দোকানদার শিরোমণির গল্প। মুসৌরী সম্বন্ধীয় গল্পগুলির আগে আমি 'মধুপুরী' নাম রাখতে চেয়েছিলাম, ইতিমধ্যে 'মধুপুরী' নামে কারু কাব্যগ্রন্থ বেরিয়ে গেল, তাই আমাকে বইয়ের নাম 'বহুরঙ্গী মধুপুরী' রাখতে হলো। ২১টি গল্পে যদিও একজন ব্যক্তির জীবনের ছাপ হয়তো বেশি পড়েছে কিন্তু তা সৃষ্টি করতে অনেক মানুষের জীবনী নেওয়া হয়েছে।

১৬ তারিখে বাজার গেলাম। কুল্‌হড়ীতে জানা গেল, একটি গাছে একজন মহাত্মা তপস্যা করছেন। বাজার থেকে এই গাছটি কাছেই ছিল। সত্যি সত্যি 'বঞ্জ' গাছের ওপর গেরুয়া রঙ দেখা যাচ্ছিল। মাচানের মতো বেঁধে গাছে উঠে মুখ ঢেকে কোনো সাধু বসেছিল। মুসৌরী তপোভূমি নয়, বিলাসভূমি। তপস্যা করার জন্য এখানকার সবচেয়ে বড় বাজারটিই কেন অনুকূল হয়ে উঠল? কিছু লোক মনে করল, এ নিরেট মূর্খ। এইরকম জায়গায় এসে নিজের ভণ্ডামি দিয়ে লোককে প্রভাবিত করতে চাইছে। কিন্তু পেড়বাবাকে (গাছবাবা), এই নামেই তাঁকে ডাকা হচ্ছিল, যারা তাঁকে মূর্খ বলছিল তাদেরই মূর্খ মনে করতেন। বৃষ্টির দিন ছিল, তাই ঠাণ্ডাও বেড়ে গিয়েছিল। সে-সময় চব্বিশ ঘণ্টা গাছের ওপর নানান মানুষের মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি দু-এক মাইল দূরেও তপস্যা করতে যেতে পারতেন কিন্তু যদি কোথাও ভালুকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত? তারা মুসৌরীর আশপাশের জঙ্গলে থাকে। তাহলে বেচারার তপস্যা ভঙ্গ না হয়ে যেত না এবং তারপর ভক্তরা তাঁর কাছে যেত কি করে? ১৫ জুলাই হঠাৎ এখানে পেড়বাবা বসে আছেন দেখা গেছে। এখন মাত্র তিনদিন হলো তাতেই লোকের মনে ভক্তি অংকুরিত হয়ে গেছে। দর্শকদের ভিড় হাতে শুরু করেছে। লোকে বলছিল, 'মহাত্মা না কিছু খান, না কিছু পান করেন, সব সময় শুধু ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকেন।' পান করার জন্য তাঁর ভেজা কাপড় থেকেই প্রচুর জল পাওয়া যেত আর খাওয়া দেখার জন্য কে আর ওখানে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছিল? পেড়বাবা নিশ্চয় একা আসেন নি। তাঁর সিদ্ধ সাধকরা মুসৌরীতে নিশ্চয় তাদের প্রোপাগাণ্ডা করে যাচ্ছিল। এক সপ্তাহ কাটতে কাটতে পেড়বাবা অনেক দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেন। আর্যসমাজী তথা অন্যান্যরা তাঁর ছিদ্রান্বেষণ করতে লাগল, কিন্তু ভক্তির বন্যায় তাদের আওয়াজ ডুবে গেল। পুরো একমাস তপস্যা করার পর, মুসৌরীতে এখন এই মহান তপস্বীর বিরুদ্ধে কিছু বলার আর কারুর সাহস থাকল না। তিনি সেখান থেকে নামলেন। একটি ভাল বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে রাখা হলো। এবার তিনি বললেন যে, ভাগবতপাঠ এবং একটি বড় যজ্ঞও হওয়া দরকার। ভক্তরা হাজার

টাকা সংগ্রহ করে দিল। ভাগবত পাঠ হতে লাগল। পেড়বাঁবা এক পায়ে খাড়া হয়ে তা শোনাতে লাগলেন। পাঠের পর বিদায়। পেড়বাবার শোভাযাত্রা বেরোল এবং মুসৌরী দিগ্বিজয় করে, সেখানকার বিলাসীদের হৃদয়ে ভক্তির গঙ্গা বইয়ে দিয়ে তিনি এখান থেকে বিদায় হলেন। কত আধুনিক কায়দায় শিক্ষিত গ্রাজুয়েট আর উকিলও নাস্তিকতার পাঁক থেকে তাঁর জন্য মুক্তি পেল। এটা বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধ, ভারতে কি এ জিনিস সফল হতে পেরেছে?

২৩ জুলাই জোড়হাট (আসাম)-এর রাজহৌলী গ্রাম নিবাসী ভবঘুরে মেঘনাথ ভট্টাচার্য এলেন। ভারতের অনেক জায়গা ঘুরেছেন, কাশ্মীরই নয় পশ্চিম পাকিস্তানের সীমাতেও গেছেন। তাঁর দুর্গম পার্বত্য-যাত্রা শুনে বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, এই মানুষটি প্রথম শ্রেণীর ভবঘুরে হওয়ার যোগ্য। শিক্ষিত হলেও শারীরিক পরিশ্রমে তার কোনো ভণ্ডামি ছিল না—এটা সোনায় সোহাগা।

২৬ জুলাই জানা গেল কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি-সন্ধি হয়ে গেছে। আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ায় সন্তুষ্ট না হয়ে উত্তর কোরিয়াকেও চুটকি বাজাতে বাজাতে নিতে চাইল। কিন্তু তার চামচা সিংমনরী-র এমন দুর্গতি হলো যে, এক সময় মনে হলো তাকেও চিয়াং-কাই-শেকের মতো হয়তো ঠেলে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর আমেরিকা নিজে যুদ্ধে নামল। যখন তার সেনারা পুরনো সীমা থেকে উত্তর দিকে এগোতে লাগল, তখন ভারত বলল যে এরকম করা উচিত নয়, কারণ তাহলে চীন চুপ করে থাকবে না। চীন তার সীমান্তের ওপর আমেরিকানদের উপস্থিতি কি করে সহ্য করে? চীনা স্বেচ্ছাসেবকরা যুদ্ধক্ষেত্রে সেখানে এলো এবং আমেরিকাকে পালাতে হলো। তারা সেটাকে অনেক দেশের সম্মিলিত যুদ্ধে পরিণত করেছিল কিন্তু যুদ্ধে মারা যাচ্ছিল আমেরিকান তরুণরা। এটা ডলারের ক্ষতি ছিল না, ছিল মানুষের প্রাণের আহুতি। আমেরিকান পুঁজিপতি নেতা মনে করছিল, আমার কাজ ডলার ছড়ানো আর প্রাণ দেবে অন্যরা। আমেরিকান জনতা দেখল উল্টো বিপত্তি। শেষে আমেরিকাকে যুদ্ধ বিরতি-সন্ধি করতে হলো।

বন্দুক আর রিভলবারের লাইসেন্স আমার নামে ছিল। আমি অনুপস্থিত থাকলে কমলার সেটা দরকার পড়তে পারে বলে লাইসেন্সে আমি তার নামেও হস্তান্তরকরণের ব্যবস্থা করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলাম। তিনি ২৯ জুলাই দুজনের লাইসেন্স পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে বাঁদরের হাত থেকে শাকসবজি রক্ষা করার জন্য টুপি দেওয়া বন্দুকও মঞ্জুর করলেন।

এবার একটু দেরি করে ভাইয়া আর ভাবী মুসৌরী এলেন। গত বছর থেকে ভাবীজীকে মানসিক অসুখে ভুগতে হতে হচ্ছিল। ছোটবোন মারা যাওয়ার ফলে তাঁর অবস্থা আরও খারাপ ছিল। মনে হচ্ছিল দু-বছর আগেকার ভাবীজীকে আর ফিরে পাব না। এখানে থাকাকালীন আগের বছরগুলির মতো আবার আমাদের জীবন ছিল এক, ঘর ছিল দুটি। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন আমাকে তাঁদের বাড়িতে যেতে হতো। ৪ আগস্ট আমি লণ্ঢৌর অব্দি গেলাম। কিষাণ সিং খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। চলাফেরা করাও কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। হার্টের অসুখ, বাঁচার কোনো আশা ছিল না। লণ্ঢৌরের কিছু দোকানদার পালিয়ে গিয়েছিল, তবে দু-তিনটে স্বর্ণকারের দোকান বন্ধ ছিল। পুরুষোত্তমজীর দোকান কয়েক মাস ধরে বন্ধ পড়েছিল। মুসৌরীতে কয়েকজন দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল এবং সে-জায়গায় আবার কয়েকজনের ভাগ্য পরীক্ষা করতে আসাটা এখন মামুলি ব্যাপার ছিল।

৬ আগস্ট কোম্পানি বাগে বনভোজন হলো। মঙ্গল ও ঠাকুরানীজীর সঙ্গে আমরা এখান থেকে কোম্পানি বাগ গেলাম। কুলহড়ি থেকে ভাইয়া-ভাবীজী উষা আর বাবাকে নিয়ে এলেন। বারোটার সময় ওখানে পৌঁছতেই মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল, ফলে খোলা বাগানে না থেকে তার একটি বাড়িতে আশ্রয় নিতে হলো। নানা রকমের রান্না করা খাবার এসেছিল। আমাদের ভোজ চলতে লাগল। বৃষ্টি থামল তিনটের সময়। তারপর আমরা সেখান থেকে বাড়ি ফিরলাম।

বৃদ্ধ স্যার সীতারাম গরমে সবসময় মুসৌরী আসেন। বয়স সত্তরের কম নয়, কিন্তু এখনো পথে হাঁটতে দেখা যায়। চোখে নিশ্চ ভাল দেখতে পান না। ইংরেজদের কৃপাপাত্র হলেও তিনি দেশের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তাঁর অধ্যয়নের শখ আছে। ১৫ আগস্ট টাউন হলের মিটিং থেকে ফেরার সময় দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হতে লাগল। সব জায়গায় ভ্রষ্টাচার, সব জায়গায় বেকারি এটা চিন্তার ব্যাপার ছিল। বলছিলেন, 'এর সমাধানটা কী?' আমি বললাম, 'কমিউনিস্টদের কাছে এটা কোনো সমস্যা নয়। তাদের সুযোগ দিলে তারা অনায়াসে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে। চীনেও এঁই সব হয়েছে। পুরনো প্রজন্ম এই রকম ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারত না। কিন্তু পুরনো নেতাদের ঘরে নতুন রীতির নতুন প্রজন্ম এসে গেছে যারা ছবির উল্টো পিঠ দেখতে বাধ্য করে। স্যার সীতারামের ছেলে মার্কসবাদী। সে তাঁর মন থেকে অন্তত কমিউনিস্টদের প্রতি বিদ্বেষ দূর করে দিয়েছে।

আগস্টে 'জৌনসার-দেহরাদুন' লেখাতেও আমি হাত দিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল যে হিমালয় সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি দার্জিলিং থেকে জম্মু-কাশ্মীরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া দরকার।

এবার শহর থেকে দূরে থাকার একটি কুফল দেখা গেল। এখান থেকে হাসপাতাল দূরে। কমলার কে জানে কখন দরকার পড়ে। ভাইয়াজী বললেন, 'ওকে আমার কাছে রেখে দাও।' কমলা ১৯ আগস্টে ওখনে চলে গেল। প্রয়োজনের সময়ই মানুষ মানুষেব মূল্য বুঝতে পারে। এখানে থেকে নিজের পুঁথি-পত্তর ছাড়া আর কোনো জিনিসের চিন্তা করার আমার দরকার ছিল না।

সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে পরমাণু বোমা আছে, তারা সেটার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে—এ খবর আমেরিকা পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে। আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে ওখানে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ হলো এটাও আমেরিকাই জানিয়েছে। আমেরিকার পক্ষে এটি বিপজ্জনক ঘটনা ছিল, কেননা তারা এই অস্ত্রের ভরসাতেই পৃথিবীতে বকবক করছিল। এটা যদি আমেরিকার পক্ষে খারাপ খবর ছিল তাহলে ইরান থেকে ভাল খবরও সে পেয়েছিল। প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সঙ্গে নিয়ে মুসদ্দিক ওখানকার পচা সামন্তবাদের ওপর ভীষণ আঘাত করেছিল। পৃথিবীর সমস্ত গলাপচাকে বাঁচিয়ে রাখার ঠিকে আমেরিকা নিয়ে নিয়েছে। ইরানে এটা সে কি করে বরদাস্ত করত? ইরানের শাহ্ যখন রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন, তখন তো আমেরিকান পুঁজিপতিদের ঘরে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। মুসদ্দিক দল দ্রুত তাদের পরিস্থিতি থেকে লাভ আদায় করে নেয়ার চেষ্টা করে নি। লেনিন বিপ্লবের প্রতিটি মিনিটকে মূল্যবান মনে করতেন।রাশিয়াতে মার্কসবাদের বিজয় ঘটানো তাঁর মতো দূরদর্শী পুরুষেরই কাজ ছিল। বুড়ো মুসদ্দিক মিনিট আর সেকেন্ডের মূল্য কি বোঝে? এই রকম অবস্থায় জনতার মনোভাব ক্ষণে ক্ষণে বদলে যেতে থাকে। তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতীক্ষা করতে রাজি হয় না। বদলে

যাওয়া মনোভাবের সুযোগ নিল বিরোধীরা এবং শাহ্ আবার এসে ইরানী জনতাকে জ্বালাতন করার জন্য উপস্থিত হলো।

মুসৌরীর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারগুলোকে আমি যখন দেখি তখন আমার সেই সময়ের কথা মনে পড়ে যখন ভারত থেকে গ্রিকদের প্রভুত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় লাখ খানেক গ্রিক এখানে বর্তমান ছিল। অনেক প্রজন্ম ধরে জন্মভূমির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাদের জাতভাইরা শাসক হওয়ায় তারা নিজেদের গ্রিক বলে গর্ববোধ করত। প্রভুত্ব শে হওয়ার আগেই তারা ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের মিনান্দরের মতো রাজাও বৌদ্ধ হয়ে যান। এইভাবে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারতের অন্য লোকদের সঙ্গে তাদের ততটা বিভেদ ছিল না যতটা রয়েছে এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের। এই শ্রেণীটির জন্ম দিয়েছিল ইংরেজরা। নিজেদের সন্তান বলে শিক্ষা এবং আর্থিক দিক দিয়ে তাদের সাহায্য করেছে কিন্তু নিজেদের সমাজে সব সময় ঘৃণার চোখে দেখে তাদের অপমানিত করেছে। অপমান সহ্য করেও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা এই দেখে খুশি ছিল যে, আমরা কালো মানুষদের ওপর ইংরেজদের মতোই কর্তৃত্ব করতে পারি। চাকরী ও বেতনের দিক দিয়েও আমরা বিশেষ সুবিধে পেয়েছি। ইংরেজ শাসনের তারা প্রবল সমর্থক ছিল। তারা কি জানতো যে ইংরেজদের একদিন পালাতে হবে, তারপর ভিন্ন ভিন্ন জীবন-যাপনের এই দেশে তাদের কোনো স্থান থাকবে না? ইংরেজরা যেতেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের পালানো শুরু হয়ে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি ইংরেজ উপনিবেশগুলো তাদের জন্য দরজা খুলে দিল। কিন্তু শর্ত থাকল যে, রঙ এবং চেহারায় ইংরেজদের মতো হতে হবে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কালো থেকে শুরু করে ইউরোপিয়ানদের মতো টকটকে ফর্সা স্ত্রী-পুরুষ দেখা যায়। কিন্তু এই রঙের সীমারেখা একটি পরিবারের মধ্যেও পাওয়া মুশকিল। যাদের রঙ বেশি ফর্সা ছিল তারা নিজেদের জমি-জায়গা বেচে উপনিবেশে চলে গেল। যাদের রঙ খাপ খাচ্ছিল ছিল না তাদের মধ্যেও কিছু লোক ঘুষ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশে চলে গেছে। এই সব গণ্ডগোল দেখে ওখানে যখন বিরোধিতা করা হলো তখন অনেকেই ঘুষের টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে এবং নিজেদের জমি-জায়গা বেচে দেওয়া সত্ত্বেও এখানেই থাকতে বাধ্য হলো।

কিন্তু তাদের আর্থিক সমস্যা ছাড়া সাংস্কৃতিক সমস্যাও কম নয়। এখনো পর্যন্ত ইংরেজি ছিল তাদের মাতৃভাষা। ইংরেজ রাজত্বে যে-ভাষার কদর ছিল সবচেয়ে বেশি এবং আমাদের অন্ধ শাসকদের জন্য এখনও তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অ্যাংলো-ইন্ডয়ানদের নিজেদের বিশেষ স্কুল আছে যেখানে কেমব্রিজের পরীক্ষা হয়। তার খরচও খুব বেশি। খরচের বড় একটা অংশ বহন করে সরকার। সেটা এখন একটি বর্গ বিশেষের প্রতি পক্ষপাত বলে তা বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ফ্র্যাংক অ্যান্টনির মতো নেতা এটাও বুঝতে পারেন না যে, ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর ইংরেজির প্রভুত্ব থাকতে পারে না। কিছু ভারতীয়র মাতৃভাষা ইংরেজি থাকুক, তারা তাদের খ্রিস্টধর্মও বজায় রাখুক—তাতে কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের দেশের বিভিন্নতা ও বহু বর্ণময়তা হচ্ছে সৌন্দর্যের বস্তু কিন্তু ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে বয়কট করে তা হওয়া অসম্ভব। দু-হাজার বছর আগে গ্রিকরাও তাদের ভাষা আর বর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা হয়তো করেছিল কিন্তু দেশ-কালের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে তারা মোকাবিলা করতে পারে নি।

পঞ্চাশ-একশো বছর পরে অর্থাৎ আজ থেকে চার-পাঁচ প্রজন্ম বাদে আগত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সন্তানরা এই ধরনের বিভেদ কখনোই পছন্দ করবে না। তখন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরও কি সেই রকম অবস্থা হবে, যেমন অবস্থা হয়েছিল পুরনো ভারতীয় গ্রিকদের? ইতিহাসে তারা কি বালুকার পদচিহ্নের মতো হারিয়ে যাবে? নদী তার অস্তিত্ব লোপ করে সমুদ্রে একাকার হয়ে যায়, তা কেউ আটকাতে পারে না। তবে ইতিহাসের ছাত্র হওয়ার ফলে, আমার মনে হয়, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ঐতিহাসিক সামগ্রী সুরক্ষিত করা দরকার। আমি এখানকার হর্সী আর উইলসনের মতো পুরনো পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করারও চেষ্টা করেছি। আরো করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সময়ে কুলোলো না। আশির বেশি বয়সের এক বৃদ্ধার কাছে কয়েকটি ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। আমি আজ যাব কাল যাব করলাম। বৃদ্ধা মারা গেলেন। এই ভাবেই আরও একজন ওই বয়সের বৃদ্ধের খোঁজ পাওয়া গেল। তাঁর কাছেও যাওয়া গেল না। আমার প্রতিবেশী পুসঙ্গ-এর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবার প্রকৃতপক্ষে মুসৌরীর নয়। ল্যাডলিদেরও একই ব্যাপার। বৃদ্ধ ল্যাডলির কাছ থেকেও অনেক কিছু জানতে পারতাম। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই এখানে এসেছিলেন। তিনি মুসৌরীর অন্তত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস জানতেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি। ল্যাডলি আর তাঁর পুত্র জনের চেহারা-টেহারায় ইংরেজদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য ছিল না। জনকে যখন লড়াই করতে দেখি তখন মনে হয় এর পক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে থাকা মুশকিল।

বৃদ্ধ ল্যাডলির সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ হতো। তিনি খুব আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে পুরনো জগতের কথা বলতেন। এত কর্মঠ ছিলেন যে, সত্তরের বেশি বয়স হয়ে যাওয়ার পরও মনে করতেন তাঁর শরীর আগের মতোই আছে। নিজের ফুলবাগানে কাজ করতেন। হাঁটারও তার শখ ছিল। কখনো কখনো রাত আটটা-নটার সময়েও তাঁকে বেড়িয়ে ফিরতে দেখতাম। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'ক্যামেলস বেকের দিক থেকে ঘুরে আসছি।' শীত বেশি বেড়ে গেলে এখানে বৃদ্ধদের বড় কষ্ট হয়। ঠাণ্ডা এলাকা যে কী জিনিস তা সেখানকার বৃদ্ধই জানে। শীতের সময় ঠাণ্ডা বেড়ে যাওয়ায় জন এবং বারবারা ল্যাডলিকে দেরাদুন পাঠিয়ে দিত। ১৯৪২ সালে যেতে বললে বৃদ্ধ ল্যাডলি বলেছিলেন, 'ক্রিসমাস করে তবে যাব।' এই মহান উৎসব নিজের পরিবারের মধ্যে কাটাতে কার না ইচ্ছে হয়? কিন্তু তিনি ভুল করলেন। পক্ষাঘাত হয়ে গেল আর দু-তিন দিন অচেতন থেকে তিনি মারা গেলেন। আমিও শবদেহের সঙ্গে ক্যামেলস বেকের সেমেট্রি গেলাম। যেখানে তাঁর পত্নী অনন্ত নিদ্রায় বিলীন হয়ে ছিলেন, সেখানেই বাক্সবন্দী করে বৃদ্ধ ল্যাডলিকেও শুইয়ে দেওয়া হলো। পাদরি কিছু ধর্মীয় কথা বললেন। শবযাত্রীদের মধ্যে মিসেস কোমরীও ছিলেন। তাঁর স্বামী আই সি এস অফিসার। যে টাকা তিনি এখানে পাচ্ছিলেন, ইংলন্ডেও তাই পেতেন। তাঁদের বাচ্চারাও ইংল্যান্ডে ছিল। কিন্তু তাঁরা ইংল্যান্ড যেতে রাজি ছিলেন না। পরে হলেন। এখানকার সর্বস্ব বিক্রি করে ইংল্যান্ড গেলেন। এখানকার জীবন যতই ব্যয়বহুল হোক, ইংল্যান্ডের চেয়ে তা অনেক সস্তা। খাওয়া আর সেই সঙ্গে ৩০-৪০ টাকা বেতনে ভাল বেয়ারা ছিল। সে খাবার বানাত। ফুলবাগান দেখাশোনা করত। এখনও কত ইংলিশভাষী পরিবার এখানে আছে, ফলে দেখাশোনা, কথাবার্তা, আলাপ আলোচনারও সুবিধে রয়েছে। ইংল্যান্ড গেলেন, কিন্তু সেখানকার খরচাপাতি দেখে চোখ খুলে গেল। কোনো কাজের

লোক রাখতে পারছিলেন না, টাকায় কুলোত না। নিজের হাতে কাজ করারও বয়স ছিল না। তাঁরা তরুণ দম্পত্তি হিসেবে ভারতে এসেছিলেন, তখন থেকে সবসময় চাকরে তাঁদের কাজ করত। ইংল্যান্ডে তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধে ছিল এই যে, সেখানে জিনিসপত্রের দাম ছিল অত্যধিক। সাত-আট মাস পরে তাঁরা আবার মুসৌরী ফিরে এলেন। নিজেদের ফার্নিচার জলের দরে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য আপসোস তাঁদের ছিলই কিন্তু তবু এখন চাকর রেখে তাঁরা তাঁদের বৃদ্ধাবস্থা ইংল্যান্ডের চেয়ে ভালভাবে এখানে কাটাতে পারছিলেন,এটাই তাঁদের ভাল লাগছিল। সেদিন মিসেস কোমরী বললেন, 'আমার মায়ের কবরও এখানেই।' বহু বছর তিনি এখানে আসেন নি। আগে চৌকিদার রেজিস্টার দেখে বলতে পারত, কিন্তু এখন তারও ভাল কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমরা দুজনে খোঁজার চেষ্টা করলাম। শেষে সেই কবর পাওয়া গেল। অনেক বছর কেউ স্মরণ করেনি। বললেন, 'আমি মেরামত করাব।' 'তিনি মেরামত করাতে পারেন, কেননা তাঁর মা অথবা বাবা এখানে শুয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে কে এই কবর দেখাশোনা করবে? এর চেয়ে কি মৃতদেহ দাহ করার প্রথাটি ভাল নয়?

১৫ আগস্টে লেখা লোলার চিঠি ৩ সেপ্টেম্বর পেলাম। অনেক বছর পর এই চিঠি এলো। তখনকার থেকে এখন জীবনপ্রবাহ কোন দিকে ঘুরে গেছে! ইগর ভালভাবে পড়াশুনো করছে, এটা জেনে ভাল লাগল। কিন্তু আমার জীবন তো এখন কমলা আর তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। ৫ সেপ্টেম্বর ইগরের জন্মদিন ছিল তাই চার তারিখে আমি অভিনন্দনের তার পাঠিয়ে দিলাম। এই চিঠি আসার খবর শুনে কমলার খুব দুঃখ হলো। সবসময় তার ভয় থেকেই যায়। আমি বলতাম, 'আমাকে দরকার এখানে। ইগর এমন দেশে জন্মেছে যেখানে তার লেখাপড়ায় কোনো অসুবিধে হতে পারে না। সময় কেটেই যাবে। নিজের শিক্ষা শেষ করে সে তার যোগ্য কাজ পেয়ে যাবে। এখন সে পনের বছরের হয়েছে। আমি এমন কখনোই করতে পারব না, নিজের দুই সন্তান (জয়া সেই সেপ্টেম্বরেই ২০ তারিখ হয়েছিল আর জেতা হয়েছিল ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫৫ সালে)-কে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।'

জয়া—১৯ তারিখে ভাইয়ার ফোন থেকে জানা গেল এখনো কিছু হয় নি। পরের দিন ২০ তারিখে হাসপাতালে টেলিফোন করলাম। খবর পেলাম আজ দুটো বেজে ২৫ মিনিট জয়ার জন্ম হয়েছে। জয়া যখন পেটে ছিল তখনই আমি বলে দিয়েছিলাম যে মেয়ে হবে এবং তার নাম রাখা হবে জয়া। কমলা এটা মানতে রাজি ছিল না। জেতার সম্বন্ধেও আমি এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছি। আসলে আমার কাছে কন্যাও যে পুত্রের মতোই অতিপ্রিয় এটুকুর চেয়ে বেশি কোনো মূল্য ভবিষ্যৎবাণীর ছিল না। বিকেলে সেন্ট মেরি হাসপাতালে গেলাম। শুনলাম পূর্বাহ্ণে ব্যথা শুরু হয়েছিল। অপরাহ্ণে ব্যথা ক্রমশ বাড়তে লাগল। রাতে ঘুমোনোর জন্য মরফিয়া ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো। আজ সকালে ব্যথা খুব বাড়তে লাগল। দুপুর নাগাদ তা চরম সীমায় পৌঁছে গেল। জয়ার ওজন ছিল আট পাউণ্ডের বেশি. সেজন্য প্রসব করাতে সামান্য অপারেশন করতে হয়েছিল। আমি দেখলাম বাচ্চার মাথা আর মুখ গোল। চুল কালো। কয়েক মাস অব্দি শিশুর মুখ এত দ্রুত বদলাতে থাকে যে তার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। কমলা ছেলের

জন্য ব্যাকুল ছিল। তবু জয়া পৃথিবীতে আসায় তার আনন্দ কিছু কম হয় নি। আমার তো এতে বিশেষ আনন্দ হলো। কমলা খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। এখন দশ-বারো দিন তাকে এখানে থাকতে হবে। সেদিন জয়ার চোখ বন্ধ ছিল। ২২ তারিখেও সে ভাল করে তা খুলছিল না। পঞ্চম দিন থেকে চোখ খুলতে শুরু করল। বাচ্চা চোখ খুললে প্রায় সব মা ভাবতে শুরু করে যে সে দেখছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দু-মাস পর্যন্ত চোখ খোলা থাকলেও বাচ্চা দেখে না। চোখ এবং আলো, বাহ্যিক বস্তু দুটি মজুদ থাকার পরও যতক্ষণ মস্তিষ্কের সঙ্গে চোখের ঠিকভাবে সম্বন্ধ গড়ে না ওঠে ততক্ষণ বাচ্চা দেখতে পায় না।

২৩ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর কেদারনাথের এক পাণ্ডা এসে দেখা করলেন। বলতে লাগলেন—'গাড়ওয়াল'-এ কেদারনাথের পাণ্ডা সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন তাতে আমাদের আপত্তি আছে। আমি সেই জায়গাটা দেখলাম। সেখানে বিশালমণির আক্ষেপের প্রসঙ্গ অবশ্যই ছিল কিন্তু আমি পরিষ্কার লিখেছিলাম যে, সেকথা ঠিক নয়। প্রাচীনকাল থেকে এত প্রতিষ্ঠিত কেদারনাথ ধামের তীর্থপুরোহিত ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। আরো কী দরকার ছিল? কারু মতকে খণ্ডন করার প্রয়োজনেও তা উদ্ধৃত করা যাবে না, এটা অযৌক্তিক কথা। তবু আমি কাউকে দুঃখ দিতে চাইছিলাম না। সেই জন্য আমি বললাম, 'প্রকাশক যদি ঐ অংশটি বাদ দিতে রাজি হয় তাহলে আমি পরিবর্তন করতে প্রস্তুত আছি।' পাণ্ডাজী এটাও বললেন, 'এর জন্য যা খরচা হবে আমরা দেব।' সে এলাহাবাদে প্রকাশকের কাছেও গেল। আমি পরিবর্তনের ব্যাপারে চিঠিও লিখে দিলাম কিন্তু সে উৎসাহ বেশি দিন থাকল না। ব্যাপারটা ওই পর্যন্তই থেকে গেল। ২৭ সেপ্টেম্বর কেদারনাথের আরও দুজন পাণ্ডা এলো। তাদেরও আমি সেই কথাই বললাম।

২ অক্টোবর কমলাকে হাসপাতাল থেকে আনার জন্য পৌনে নটার সময় আমি সেখানে পৌঁছলাম। হাসপাতালের ব্যবস্থা খুবই ভাল ছিল। লেডি ডাক্তার এবং নার্স সকলের দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকতাও ছিল। খরচের ২১২ টাকা খুব বেশি ছিল না। জয়া এখন চোখ খুলতে পারছিল। জন্মের সময় জয়ার ওজন যদিও ৮ পাউন্ড ৪ আউন্স ছিল কিন্তু তা আবার ৮ আউন্স কমে গিয়েছিল। আবার বাড়তে শুরু করল। এখন ভাইয়াজীর বাড়িতে থাকার ইচ্ছে ছিল,তাই সেখানে নিয়ে গেলাম। ৪ অক্টোবর সে বাড়ি আসতে পারল। স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকার মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে তা আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম। যখন শুধু স্বামী-স্ত্রীই থাকে তখন মতভেদ প্রায়ই তিক্ততায় পরিণত হয়। কিন্তু সন্তান প্রথমত এই তিক্ততা তৈরি হতেই দেয় না আর হলেও দ্রুত তা দূর করে দেয়। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের জবরদস্ত সিমেন্ট।

মিস পুসঙ্গ জয়ার জন্য আগে থেকেই জামা আর খেলনা মজুত রেখেছিলেন। হার্টের অসুখের জন্য তিনি তাঁর চৌহদ্দির বাইরে বেরোতে পারতেন না, কিন্তু জয়ার উপহার তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। জয়া চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গে থাকার মেয়ে ছিল। কোনো শিশুকে জন্ম থেকে দেখার এবং এত বেশি করে দেখার সুযোগ আমার হয় নি, তাই তার প্রতিটি জিনিসই আমি মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। সে কাঁদত খুব চিৎকার করে। কমলা বলছিল, হাসপাতালেও সে সারা ঘর মাতিয়ে দিত। আঙুলগুলো ছিল লম্বা এবং সরু সরু। মিস পুসঙ্গ বললেন, 'শিল্পী হবে।' অনামিকা আর মধ্যমা একদম সমান ছিল। শিশুর কষ্ট হলে তা জানার

উপায় খুবই কম। কাঁদলে বোঝা যায় অসোয়াস্তি হচ্ছে, কিন্তু তা চেনা মুশকিল। হাসলে আনন্দের প্রকাশ অবশ্যই হয়।

মায়ের দুধ পর্যাপ্ত না হলে পাউডার দুধ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত হলেও বোতলে দুধ খাওয়ানোর সুবিধে আছে। কারণ তাতে শিশুর আহারে নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। পেটের গণ্ডগোল হলে দুধে জল মিশিয়ে দেওয়া যায়, যা মায়ের দুধে করা সম্ভব নয়। হতে পারে, পাউডার দুধে কয়েকটি ভিটামিনের অভাব আছে—বাইরে থেকে দুধে মিশিয়ে পূরণ করা যায়।[১]

১৩ অক্টোবর ভাইয়াজী অমৃতসর থেকে জয়ার জন্য দোলনা আনিয়ে দিলেন এবং তা বারান্দায় আর ঘরে টাঙানোরও ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দোলনার দিকে সবসময় নজর রাখতে হতো। একবার দড়ি ছিঁড়ে গেল। দোলনা নীচে এসে পড়ল। অনেকটা গদি ছিল তাই আঘাত লাগল না। দু মাস পর্যন্ত মানুষের বাচ্চার চোখ কাজ না করায় বোঝা যায় যে, সে কত অসহায় হয়ে জন্মায়। হরিণের বাচ্চা জন্মেই দৌড়তে পারে,গরু-মোষও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ডানাবিহীন মোরগ বাচ্চাও নিজেই ডিম ভেঙে বেরিয়ে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। মানুষের শিশু মাতা-পিতার ওপর নির্ভর করে থাকে, হাত-পায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, চোখের ওপরও না।

১৪ অক্টোবর[২] জয়ার জন্ম উপলক্ষে বন্ধু ও হিতৈষীদের নিয়ে একটি ছোটমতো খাওয়া-দাওয়া হলো। ২০ অক্টোবর জয়া একমাসের হয়ে গেল। তখন সে লম্বায় সাড়ে ২২ ইঞ্চি আর ওজন ছিল ১০ পাউন্ড। চোখ ছাড়া আর সব ইন্দ্রিয় কাজ করছিল, বিশেষ করে স্পর্শেন্দ্রিয় ছিল বেশি তীক্ষ্ণ। মস্তিষ্ক সম্ভবত ততটা সক্রিয় ছিল না। কপালে বেশ কিছু রোম দেখে কমলা ভাবতে লাগল যে এগুলিকে রগড়ে তুলে দেওয়া দরকার নইলে সারা জীবন এই রকমই থেকে যাবে। সাত-আট মাসের মানবশিশুর শরীরে বানরের মতো লোম থাকে। প্রকৃতি নিজে নিজেই সেগুলি নষ্ট করে দেয়। কমলার তাতে বিশ্বাস ছিল না। প্রতিবেশী চৌকিদারনী জানাল, 'আমি তো ছাই দিয়ে ঘষে আমার বাচ্চাদের লোম তুলে দিই।' পাঁচ বাচ্চার মা। এর নিশ্চয় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। যাক্‌গে, কমলা এত জবরদস্তি করে লোম তোলার পক্ষপাতী ছিল না। সেগুলি নিজে নিজেই উঠে গেল। দ্বিতীয় মাস সম্পূর্ণ করার সময় জয়া লম্বায় আধ ইঞ্চি বাড়ল আর ওজন যেমনকার তেমনি থাকল। তৃতীয় মাসের শেষে সে ছিল ২৫ ইঞ্চি লম্বা। জন্মানোর সময় সমস্ত চর্বি মুখে জমা হয়ে যায়, তারপর সেখান থেকে কমে কমে তা সারা শরীরে ছড়াতে শুরু করে। পরের মাস শেষ হওয়ার পর সে হাসতে আর মিউ মিউ করতে শুরু করেছে, জিনিসপত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এখন তার সমস্ত মনোযোগ ছিল দুধের দিকে। আহার মানুষের প্রথম প্রয়োজন, তাই শিশু তার প্রতি বিশেষ পক্ষাপাতী হবে এটাই স্বাভাবিক। জয়া অনেকটা সময় নিয়ে নিত তবু কমলা আগ্রা ইউনিভার্সিটির বি এ ফর্ম পূরণ করে দিল। যেটুকু সময় পেত পড়ত।

[১] বলা বাহুল্য, এই কথা কয়েকটি লেখকের তৎকালীন ধারণাপ্রসূত, যা বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বাংশে সত্য নয়।—স·ম·

[২] সম্ভবত তারিখটি ত্রুটিপূর্ণ। লেখক পরেও ঐ দিনে ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন।—স·ম·

—১৯৫৩ সালের ছোট সিজিনে (অক্টোবর) পৌরসভার তরফ থেকে বিশেষ উৎসবের ব্যবস্থা— হলো। ভাইসরয় যদিও গরম কাটাতে সিমলা যেতেন কিন্তু তাঁর ঘোড়াগুলো দেরাদুন থেকে আসত। ভাইসরয়ের খরচ গণরাজ্য হওয়ার পর কমানো যায় নি, বরং তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। নেহেরুরাজত্বে খরচ কমানোটা হচ্ছে প্রতাপ ও সম্মান কমানো, তা সে-খরচের টাকা লোকের মুখের আহার থেকেই আসুক বা চোখের জল থেকেই আসুক। রাষ্ট্রপতির প্রথম শ্রেণীর ৪০টি ঘোড়া ঘোড়দৌড়ের জন্য এসেছিল। এদের দিয়ে ভাল প্রচার করা যেত কিন্তু কাঠের মেশিনে কোমলতা কোথায়? সেগুলোকে রাখা হয়েছিল হ্যাপি-ভ্যালির ক্লাবে, যেখানে ভ্রমণার্থী খুব কম আসে। একবার যদি এই ৪০টি ঘোড়াকে লণ্ঢৌর পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের দৌড় দেখতে সারা মুসৌরী ভেঙে পড়ত। শোনা গেল, চিত্র-তারকাদেরও ডাকা হয়েছে। হাজার হাজার টাকা এইভাবে খরচ করলে দেশের লোক মুসৌরীতে দৌড়ে আসবে, এমন সম্ভাবনা কমই ছিল। কিন্তু সরকারি মেশিন টাকা খরচ করলেই নিজের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করে।

মুসৌরীর পৌর নির্বাচনের ধূম চলছিল। একদিকে কংগ্রেসী প্রার্থী ছিল, অন্য দিকে বাকি লোকেরা মিলে জনতা পার্টি গঠন করেছিল। জনতা পার্টি থেকে শ্রীশম্ভুনাথ বৈদ্য শুরুতেই বেরিয়ে গেলেন। তিনি ড· প্রকাশকে মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি পদের জন্য দাঁড় করিয়ে দিলেন। এর ফলে সভাপতির পদের জন্য ক্যাপ্টেন কৃপারামের পক্ষ মজুবত হলো, যদিও সাম্প্রতিক অন্ধ অনুসরণের জন্য মুসৌরী-কংগ্রেসের সর্বেসর্বা হওয়ার ফলে ততটা জনপ্রিয় তিনি ছিলেন না কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী একজন নয় দুজন, যাদের মধ্যে ভোট ভাগ হওয়ার ছিল। ড· প্রকাশকে আসলে এমনিই দাঁড় করানো হয়েছিল, কারণ কিছু দাঁতের রুগী ছাড়া তাকে চেনে এমন ভোটার ছিল খুব কম। কিন্তু দাঁড়িয়ে যখন গেলেন তখন যতই হাত টেনে খরচ করুক না কেন, পকেট থেকে কয়েক হাজার টাকা তো হাওয়া হবেই? শ্রীমতী মোহিনী জুত্‌শী ছিলেন কংগ্রেসী, তিনিও কংগ্রেসীর পক্ষ থেকে প্রচারে সামিল হয়েছিলেন। মেম্বারশিপের প্রার্থীদের মধ্যে শীলাজীও দাঁড়িয়ে ছিলেন। নির্বাচনের সময় যেমন-যেমন এগিয়ে আসতে লাগল, প্রচারের বেগও তেমনি-তেমনি বাড়তে লাগল। আমাদের এলাকার অধিকাংশ লোকের নাম ভোটার লিস্টে ছিল না—ল্যাডলি পরিবারও নয়, কুন্দনলালাও নয়, পুসঙ্গও নয়। লোকে বলছিল যে, জেনেশুনেই এটা করা হয়েছে। যাদের মনে হয়েছিল যে, কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেবে না, তাদের নামই লিস্টে তুলতে দেওয়া হয় নি। আমাদের কাছেও প্রার্থীরা এলো—আমি আর কমলা দুজন ভোটার ছিলাম। ২৬ অক্টোবর রোববার ভোট দেওয়ার দিন ছিল। আমাদের এলাকার ভোট দেওয়ার জায়গা ছিল চার্লবিলের প্রাইমারি স্কুলে। আমরা সেখানে গিয়ে নিজের ভোট দিলাম। কমলা যাকে ভোট দিতে চেয়েছিল তাড়াহুড়োতে তার ঘরটিই বুঝতে পারে নি এবং সে অন্যকে দিয়ে এসেছে।

ভোট দিয়ে আমরা ভাইয়ার বাড়ি গেলাম। কাছারীতে কুলহড়ীবাসীদের ভোট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল উৎসবের দিন। লোকে নিজের কাজ-কর্ম ফেলে ভোটের পরব দেখছিল। মোহিনীজী অভিযোগ করছিলেন, 'প্রচারে খুব নোংরামি হয়েছে, অন্তত বর্মাজীর কাছ থেকে এরকম আশা করি নি।' তবে যে কোনো নতুন ব্যাপারে মানুষ যথেষ্ট অভ্যাসের পরই প্রকৃতিস্থ হয়।

—১৯৫৩—

২৯ অক্টোবর নির্বাচনের ফলাফল বেরোল। বর্মাজী সভাপতি নির্বাচিত হচ্ছেন তা তো ভোটের দিনই বোঝা গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন কৃপারাম কয়েক হাজার ভোট পেলেন। ড· প্রকাশকে তো হারানোর জন্যই দাঁড় করানো হয়েছিল। পরের দিন সমস্ত নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়ে গেল। শীলাজীও পৌরসভার সদস্যা হলেন। রামজীর সহায়ক উকিল জগন্নাথ শর্মাও জিতলেন, যার সহ-সভাপতি হওয়ার ছিল। জনতা সভার ছ-জন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেসের চারজন আর নির্দল দু-জন। কংগ্রেস সরকার তিনজন মেম্বারকে বিশেষ কাজে নিযুক্ত করার অধিকারও নিজের হাতে রেখেছিল। সেটা নিশ্চয় এমন লোকদের নেওয়া হতো, যারা ছিল কংগ্রেসী। এই ভাবে কংগ্রেসের সাতজন আর জনতার ছ-জন মেম্বার ছিল। ভাগ্যের নিষ্পত্তি ছিল দুই নির্দল প্রার্থীর হাতে, জনতা দল যাদের নিজেদের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। লোকে বড় বড় আশা করল কিন্তু এ তো ছিল রাজা ভোজের সিংহাসন বা কলঙ্ক-কুটির। যত বুঝদার লোকই যাক না ওখান থেকে বেঁচে বেরনো মুশকিল। আগের মতোই পৌরসভায় এলোমেলো খরচ করা হলো। তাদের সময় শেষ হওয়ার পর আশা করা যাচ্ছিল না যে, কংগ্রেস-বিরোধী দলের কর্ণধার আবার মানুষের কাছে বিশ্বাসভাজন হবে।

এবারে পোলো ময়দানে ১০ অক্টোবরে পোলো খেলাও হলো আর ঘোড়দৌড়ও হলো।

১১ অক্টোবর জানা গেল, ব্রিটিশ গায়নার সংখ্যা গরিষ্ঠ শক্তিশালী জগন সরকারকে চার্চিল কমিউনিস্ট বলে ভেঙে দিয়েছে। চার্চিল এবং ইংল্যান্ডের সরকার এখন ছিল আমেরিকার ধর্মপুত্র। আমেরিকা পৃথিবীর কোনো প্রগতিশীল সরকারকে সহ্য করতে পারে না। তাহলে সেই জগনকে আমেরিকার মাটিতে এরকম কেন করতে দেবে? তিনটে গায়নাতেই ভারতীয় কুলিরা গিয়ে দেশকে শস্যশ্যামল করেছে। তাদেরই সন্তানরা ওখানে প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করে। সেজন্য জগন সরকারকে ভেঙে দেওয়া ভারতীয়দের পক্ষে একটি বিশেষ ব্যাপার ছিল। যেখানে বিপ্লবের পথে কমিউনিস্ট বা প্রগতিশীল শক্তি ক্ষমতায় আসে, সেখানে পুঁজিবাদীরা এটাকে গণতন্ত্র-বিরোধী বলে হায় হায় করে। আর যেখানে তিন-চতুর্থাংশ লোক ভোট দিয়ে তাদের মনের মতো সরকার গড়ে, সখানে কমিউনিজমের অপবাদ দিয়ে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। পুঁজিবাদ দানব হচ্ছে নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ। সে যে কোনো উপায়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়।

১৪ অক্টোবর জয়ার জন্ম উপলক্ষে ভাইয়া আর ভাবীজী তাঁদের বাড়িতে চায়ের পার্টি দিলেন। মা-বাবাকে যেতেই হতো। ড· সত্যকেতু, শীলাজী এবং স্বামীকে নিয়ে শ্রীমতী মোহিনী জুত্‌শীও এসেছিলেন।

আজমগড়ের শ্রীজ্যোতিস্বরূপ সিংহ 'কর্মযোগী' নামে একটি সাপ্তাহিকী বের করা ঠিক করলেন। আমার কাছেও লেখা চাইলেন। আমি চাইতাম নিজের জেলা থেকে জেলার ধ্বনি প্রকাশ করার জন্য কোনো কাগজ বেরোক। আমি রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। আমার শৈশবের স্মৃতিচারণ বিষয়ক প্রায় ছত্রিশটি ছোট ছোট লেখা লিখলাম।

১৯১৫ থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমার জন্ম যে জেলায় সেখানকার নিবাসী স্বামী সত্যানন্দ (আগেকার বলদেব চৌবে) এখন আর ইহলোকে নেই। এক-এক করে বন্ধুদের এইভাবে চলে যাওয়াতে কষ্ট হয়। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করে আমার কলম কি থেমে

থাকতে পারে? আমি 'নয়া সমাজ'-এ তাঁদের ওপর একটি লেখা লিখলাম।

২৭ অক্টোবর ভাইয়া ও ভাবীজী অমৃতসার চলে গেলেন। প্রতি বছরের মতো এবারও কয়েক সপ্তাহ ধরে তাদের অভাব পীড়া দিচ্ছিল।

হিমালয়-বিষয়ক গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, সেগুলি লা-জার্নাল প্রেস থেকে বেরিয়ে যাবে। 'গঢ়ওয়াল' বেরিয়ে গিয়েছিল, 'কুমায়ুঁ'ও মনোতে পাঞ্চ করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আগেই বলেছি যে দর সাহেবকে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং শেঠদের নিজেদের মনের মতো লোককে সেখানে আনা হয়েছিল, যারা শুধু এটুকুই জানত যে, প্রতিটি লোকই লক্ষ্মী-পাত্রের সামনে নাক খৎ দিতে জন্মেছে। দর সাহেব অগ্রিম দিতে না পারার কথা জানালে আমি পাটনার প্রকাশককে 'নেপাল' দিয়ে দিয়েছিলাম। লা-জার্নালের আমলারা তার অজুহাত দেখিয়ে লিখল, 'আপনি এই গ্রন্থমালার একটি গ্রন্থ অন্য জায়গায় দিয়ে আমাদের চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন বলে আমরা 'কুমায়ুঁ' ছাপতে রাজি নই।' এদিক-ওদিক সব জায়গায় চিঠিপত্র লিখলাম কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। পাঞ্চ করা গ্রন্থ ফিরিয়ে দেওয়া হলো। আমিও আমার কাছে পাঠানো অগ্রিমের হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম। আমি আটকাতে পারতাম কিন্তু ঝগড়া করে কি লাভ? বড় শেঠের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করার এটাই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এতদিন অন্যের মুখে শুনেই আমি বলতাম, 'পুঁজিবাদ, তোমার ভেলা ডুবে যাক।' এখন নিজেই তার কেরামতি দেখলাম। আর সে এমন কেরামতি যার ফলে হিমালয় বিষয়ক সমস্ত পুস্তকের প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে গেল। যদি এই প্রেসকে 'গঢ়ওয়াল' না দেওয়া হতো, তাহলে যেখানে তার ব্যবস্থা হতো সম্ভবত সেখান থেকেই অন্য বইগুলিও বেরিয়ে যেত।

৩ নভেম্বর আমাদের প্রতিবেশী লাইনমেন কল্যাণ সিংহকে মুসৌরী থেকে বদলি করে সপরিবারে দেরাদুন পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দুই ছেলে, তিন মেয়ে আর নিজেরা দুজন মিলে সাতজনের পরিবার আর সে পাচ্ছিল মহার্ঘ ভাতা নিয়ে মাসিক ৫৯ টাকা। বর্ষার সময় থেকে আমাদের ফটকের বাইরের ঘরে থাকত। নিজের আশপাশের জমি থেকে পাথর বেছে ফেলে সেখানে সামান্য খেত বানিয়ে নিয়েছিল, যাতে তার প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি শাকসবজি সে ফলিয়ে নিত। এই এলাকায় জঙ্গল বেশি বলে ছাগল আর গরু রেখেছিল। এখন সবকিছু তাকে জলের দরে বিক্রি করতে হবে। ১৪ টাকায় তিনটে ছাগল বিক্রি করল, যা এর চেয়ে দ্বিগুণ অবশ্যই পাওয়া যেত, গরু মাত্র ১৫ টাকায় দিয়ে দিল। সকলেই জানত যে গরজ আছে। এই পরিবারের সঙ্গে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছিল! এখানে তাদের কাঠ কিনতে হতো না, শাকসবজি কিনতে হতো না। দেরাদুন শহরে থেকে এখন তাদের প্রতিটি জিনিস কিনতে হবে। এখানে গরু-ছাগল থেকেও কিছুটা আমদানি হতো, তাও গেল। মাসখানেক ধরে সেই শূন্য কুটির আমার মনে ব্যথা দিতে দাঁড়িয়ে ছিল।

১০ নভেম্বর একটি হৃদয় বিদারক খবর শুনলাম। প্রতিভাবান তরুণ ইঞ্জিনিয়ার বাসুদেব পাণ্ডে ২৬ বছর বয়সে জিপ দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তার বাবা গণেশ পাণ্ডেই শুধু তার প্রতি যথেষ্ট আশা পোষণ করতেন না, আমিও খুব আশান্বিত ছিলাম। মির্জাপুরের দিকে ক্যানেলের কাজে বহাল হয়ে সে আমাকে তার কাজের অসুবিধের কথা লিখেছিল। আজকাল আমলাতন্ত্রে যোগ্যতার কদর কোথায়? সেখানে তো খোশামুদিতেই সব কিছু হয়। তবু আমার বিশ্বাস ছিল

বাসুদেব তার যোগ্যতা প্রমাণ করে ছাড়বে। ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে হিন্দিতে তার অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল। সব উচ্চাকাঙক্ষা নিয়ে একটি তরুণ-জীবন শেষ হয়ে গেল।

সভাপতি নির্বাচনে কৃপারাম হেরে গিয়েছিলেন। পুরুষরা পরাজয় কেমন হাসিখুশি হয়েই মেনে নেয়। শুনলাম শ্রীরামকৃষ্ণ শর্মা তার কোনো মক্কেলের টাকা আদালত থেকে উদ্ধার করে কিছুদিন নিজের কাছে রেখেছিল। এটা মক্কেলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। মোকদ্দমা দায়ের হলো। ফয়সালা হলো চটপট এবং শর্মাজীকে কর্মচ্যুত করা হলো। শহরে এর বিরুদ্ধে হরতাল হলো।

১৩ নভেম্বর লেনিনগ্রাদ থেকে চিঠি আর ফটো এলো। তা দেখে কমলা ভীষণ উদ্বিগ্ন হলো। খুব কাঁদল। আমি আমার মনোভাব প্রকাশ করে বললাম, 'আমি বলেছি তো জয়ার আর তোমার আমাকে দরকার। আমার রাশিয়া যাওয়ার ইচ্ছে নেই।' কিন্তু সে চাইছিল আমি চিঠিপত্র দেওয়াও বন্ধ করি। এর চেয়ে আত্মহত্যা করা কি সহজ নয়? যে পিতা ইগরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে তার ওপর কি বিশ্বাস রাখা যায়? যে-সময় কমলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সে-সময় কে আশা করেছিল যে, রাশিয়া থেকে আবার সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে? এখন যদি তা হয়েছে তাহলে ইগরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা মানবতা-বিরোধী ব্যাপার। কমলা যদি তাই চায় তবে কোনো ভয়ংকর পদক্ষেপ গ্রহণের আগে মা-মেয়ে দুজনের ব্যবস্থা তো করে ফেলতেই হবে।

এই ব্যাপারে ১৪ নভেম্বর আমি আমার ডায়েরিতে লিখলাম—'কাল থেকে আমি আমার চোখে খাটো হয়ে গেছি, সারা জীবনের জন্য। কমলার ভাবনাই একেবারে ঠিক। আমি তার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়েছি। হ্যাঁ, পরোপকার, দয়া দেখানো আরও কি সব ছলছুতো করে। সে কেন আমাকে বিশ্বাস করবে?'

আমাদের এলাকায় সবচেয়ে বড় হোটেল হচ্ছে চার্লবিল। সেখানে একশোর বেশি পরিবারের থাকার জায়গা রয়েছে। তরুণ কালিদাস বাবার আমল থেকে সেই হোটেলে ধোপার কাজ করে আসছে। বড় ভাই গ্র্যাজুয়েট হয়ে পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। কালিদাস গত বছর বি এ পরীক্ষায় ফেল করেছিল, এ বছর আবার তৈরি হচ্ছিল। তার বাবা ছিলেন রুহেলখণ্ডের ব্রাহ্মণ, যাঁর প্রেম হয়েছিল তরুণী ধোপানীর সঙ্গে। ধোপানীকে তিনি ব্রাহ্মণ বানাতে পারেন নি, তাই নিজেই ধোপা হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের কাজে তিনি দক্ষ ছিলেন। বহুদিন টেকারীর রাজার প্রধান ধোপা হিসেবে মুসৌরীর বাইরেও ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরে হোটেলে কাজ করতে শুরু করেন। কালিদাস জন্ম থেকেই মুসৌরীর সঙ্গে পরিচিত। সাদা-সিধে কিন্তু সকলের দুঃসময়ে কাজে লাগা লোক। এই রকম মানুষের বন্ধুও থাকে আবার শত্রুও থাকে। সে ১৯৪৭-এর হিন্দু-মুসলিম প্রলয়ের কথা বলছিল—১৯৪৬ সালে এখানে লিগের খুব প্রতিপত্তি ছিল। লণ্ডৌরে তারা বলেছিল—আমরা রাস্তার ওপর গরু কাটব। ব্যবসায়ীদের সাহস কোথায়? তাদের মধ্যে কিছু লোক পালিয়ে গেল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের আগেই পশ্চিম-পাঞ্জাবের, বিশেষ করে লাহোরের, হাজার হাজার হিন্দু পালিয়ে চলে এল। সমতলে শহরে বাড়ি পাওয়া মুশকিল ছিল আর এখানে বাড়ি খালি পড়ে ছিল। তারাও মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিল। তাদের জন্য মুসলমানরা দমে গেল। তাদের কান ফোনে আর রেডিওতে সবসময় লাগানো থাকত। ভাবতো যে লাহোর ভারতে

থাকার খবর আসবে এবং আমরা আমাদের ঘরে ফিরে যাব। লাহোর পাকিস্তানে পড়ল। তারপর খবর এল পশ্চিম-পাঞ্জাবে হিন্দুদের প্রকাশ্যে হত্যা করা হচ্ছে। এখানকার মুসলমানদের তারা কি করে ক্ষমা করবে? এখানেও ১৭-১৮ জনকে হত্যা করা হলো। রাজপুরে এক-দেড়শো আর দেরাদুনে তার চেয়েও বেশি মুসলমানের জীবন গেল। এক ড্রাইভার থানার সামনে বাস গর্তে ফেলে দিয়েছিল যার ফলে অনেক লোক মরল। খচ্চরখানায় চার-পাঁচ জন মারা গেল। সবচেয়ে দমনমূলক মৃত্যু হয়েছিল এখানকার একজিকিউটিভ অফিসার কিদবাই-এর। তাঁর পুরো পরিবার ছিল জাতীয়তাবাদী। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তাঁর মতো লিগের শত্রুর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। কিন্তু সে-সময় বহু লোকের মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল। কিদবাইকে পথে চলতে চলতে মেরে ফেলা হলো। অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস বৃদ্ধ হামিদ আলি সেই দুর্যোগের দিনেও পথে হাঁটা থেকে বিরত হন নি। মুসৌরীবাসীর ভয় হলো যে, তাঁর ওপর কেউ হাত চালাবে। তিনি নিজের সঙ্গে রক্ষী হিসেবে কাউকে রাখতে রাজি ছিলেন না বলে তাঁর ৫০ গজ পিছনে লোক লাগিয়ে দেওয়া হলো। বৃদ্ধ সারা দুর্যোগ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মুসলমানদের শুধু প্রাণই নেওয়া হয় নি, সেই সঙ্গে ধনী মুসলমানদের সর্বস্ব লুঠ করা হয়েছিল। লাখ-লাখ টাকার সম্পত্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী নেতাদের ঘরে চলে গিয়েছিল। এখনও লোকে তিনজন লোকের নাম করে যারা তার আগে একেবারে সাধারণ ছিল কিন্তু দুর্যোগের পর লাখপতি হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের রামপুরের নবাবের বাংলো এবং অন্যান্য নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছিল। পরে সশস্ত্র সৈনিকের তত্ত্বাবধানে বাসে তুলে তাদের সমতলে পাঠানো হলো। সে-সময় সমস্ত বড় বড় বাড়িতে বলতী মুসলমান চৌকিদার ছিল। রাস্তা বানানোর কাজও করত বলতী মজুররা। সকলেই সংকটে পড়ে গেল এবং মুসৌরী ফাঁকা করে তারা চলে গেল।

নভেম্বরে 'বহুরঙ্গী মধুপুরী'-র গল্প লিখতে লাগলাম। নরেন্দ্র য়শকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার ভাবনা কয়েক মাস ধরে মাথায় ঘুরছিল, যা শুরু করলাম ২১ নভেম্বর থেকে। 'রাজস্থানী রনিবাস' এখন ন্যাশন্যাল হেরল্ডে ছাপার ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল।

৩১ ডিসেম্বর বছর শেষ হতে চলল। হিসেব-নিকেশ করার পর দেখা গেল, এ বছর ৩০০০-এর বেশি পাতার বই লিখেছি। বছরটা খারাপ ছিল না। তবে ভবিষ্যতের কথা ভাবলে আর্থিক দুশ্চিন্তায় পড়তাম।

বৃদ্ধ ল্যাডলি

১৯৫৪ সালের নববর্ষের দিন বৃদ্ধ ল্যাডলী অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। গত পাঁচ-ছয় দিন থেকে তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল। ১ জানুয়ারি পক্ষাঘাত হলো। তাঁর ৭৮ বছর চলছিল, পাকা ফল তো ছিলেনই, হাওয়ার সামান্য ঝাপটানির অপেক্ষা ছিল। বেশি শীত পড়ার পর যদি দেরাদুন চলে যেতেন তাহলে হয়ত এখন আরও কিছুদিন জীবিত থাকতেন। পক্ষাঘাতের পর আর তাঁর জ্ঞান হলো না। ৬ জানুয়ারি মারা গেলেন। ৭ তারিখে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো।

৩১ জানুয়ারি বরফ পড়ল। কাল রাতে আর ১ তারিখে সারাদিন বরফ পড়তে লাগল। মাটিতেই শুধু নয়, গাছের ওপরও বরফের টুকরো দেখা যেত। হিমালয়ের প্রতিটি বিন্দু বরফে ঢেকে গিয়েছিল। সারাদিন আগুন জ্বালিয়ে ঘরের ভেতরে বসে থাকলাম। পরের দিন থেকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, রোদ উঠতে লাগল আর খোলা জায়গায় বরফ গলতে শুরু করল। ৩ জানুয়ারি সন্ধেতে মহাদেব ভাই এলেন। অনেক বছর বাদেও নয় কিন্তু চুল দেখছিলাম বেশি পেকে গেছে। শরীরের বাড়তি ওজন থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে প্রৌঢ় অবস্থায় পা ফেলে এখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন।

যদিও হিমালয় সম্পর্কে লেখা গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হতে এখনো বাকি ছিল কিন্তু আমি জম্মু-কাশ্মীরের সীমা পর্যন্তই হিমালয় নিয়ে লিখব ঠিক করে ফেলেছিলাম, তাই এখন শেষ গ্রন্থ 'হিমাচল প্রদেশ' (জলন্ধর খণ্ড) লেখায় হাত দিয়েছিলাম। এই বছর কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনসাধারণের ভাষায় এক ফর্মার করে বেয়াল্লিশটা পমফ্লেট লিখব ঠিক করেছিলাম। ৬-৭ জানুয়ারি প্রথম পমফ্লেট 'কমিউনিস্ট ক্যা চাহতে হ্যায়' লিখেও ফেললাম। ৭ তারিখ থেকে 'হিমাচল প্রদেশে'-এও হাত দিলাম। শীতের সময় খোলা আকাশ আর রোদ ভাল লাগে। হিমবর্ষণও খারাপ লাগে না কিন্তু যদি অনেক দিন ধরে মেঘলা আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি লেগে থাকে তাহলে ভাল লাগে না। এখানের আর কি? বাদলা হাওয়া বয়, শীত বেড়ে যায়। রোদ উঠলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। মহাদেব ভাই সর্দির কবলে পড়েছেন। হরিশচন্দ্রজী তাঁর স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে দুদিনের জন্য এসে কাঁপতে লাগলেন। শুধু শুধু এই ঠাণ্ডা সহ্য করতে তারা কেন চাইবেন?

১৭ জানুয়ারি আবার বৃষ্টি আর হিমবর্ষণের পালা শুরু হলো। সেদিন দুপুরের পর বরফ পড়তে লাগল কিন্তু মাটি ঢাকতে পারল না। ঠাণ্ডা বেড়ে গেল। পরের দিন মধ্যাহ্ন থেকে হিমবর্ষণ হতে লাগল। পুরো মাটি ঢেকে গেল। ১৯ জানুয়ারি মাঝে মাঝে বরফ বা শিল পড়তে লাগল। হাওয়াও তীক্ষ্ণ ছিল। তিনটের সময় বারান্দায় তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি, অর্থাৎ হিমাঙ্ক থেকে এক ডিগ্রি নিচে।

হিম দেখার জন্য নিচের থেকে বহু লোক এসেছিল। আমাদের দুটি ঘরে আগুন জ্বালানো থাকত। জয়া পৃথিবীতে প্রথম শীত দেখল। ভয় হচ্ছিল ঠাণ্ডায় খারাপ কিছু না হয়ে যায় কিন্তু বাচ্চারা ভীষণ সহ্য করে নেয়। কমলার বোন গঙ্গা আর ভাই হরিমঙ্গল পাশের অন্য কামরায় আগুনের সামনে বসে থাকত। দিনের বেলায় আগুনের উত্তাপ নিতে নিতে ঠাণ্ডা কাটানো মন্দ

না, যদি গল্প চলে আর মাঝে মাঝে গরম পানীয় খাওয়া হয়। গরম গরম মাংসের স্যুপ খুব ভাল লাগে কিন্তু শহর থেকে দূরে থাকার ফলে মাংস ইচ্ছে হলেই সহজে পাওয়া যেত না।

অমৃতসর—আগেই ঠিক হয়েছিল শীতে ভাইয়া-ভাবীর কাছে যাওয়া হবে। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার এটি ছিল ভাল উপায়। ২২ জানুয়ারি চা খেয়ে নটার সময় বাড়ি থেকে বেরোলাম। পথে খুব বরফ পড়েছিল। গাছের ওপরও জমে ছিল। চিনির মোটা দানার ওপর হাঁটছিলাম। টোল-এর পাশে আধ ফুটের বেশি পুরু বরফ ছিল। রিবেরার আগে পর্যন্ত অধিকাংশ পথ বরফে ঢাকা পেলাম। কিতাব ঘরের স্ট্যান্ডে কোনো ট্যাক্সি ছিল না। কিংক্রেগ-এ দুটি সিট পাওয়া গেল। এগারোটায় ছাড়ল। ৩৫০০ ফুট পর্যন্ত যেখানে-সেখানে বরফ পেলাম। বলছিল কাল রাজপুরেও শিল পড়েছে। যদি তারও তাপমাত্রা দু-ঘন্টা এইরকম থাকত তাহলে দেরাদুনেও হিমবৃষ্টি হয়ে যেত।

বারোটার সময় শুক্লজীর বাড়িতে পৌছলাম। খাবার প্রস্তুত ছিল। জয়া আর ওর মা ওখানে শুক্লজীর স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল আর আমি দেড় ঘণ্টার জন্য মিশ্রজীর সঙ্গে কাটাতে চলে গেলাম। এবার দিনে দিনেই অমৃতসর যাওয়া স্থির করেছিলাম। সাড়ে তিনটের সময় অমৃতসরের ট্রেন পেলাম। প্রথম শ্রেণীতে সিট রিজার্ভ করা ছিল। নিচের সিট পাওয়া গিয়েছিল। হরিদ্বার পৌছতে পৌছতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। লুকসর-এ পৌছে খাবার খেলাম। মাঝে-রাত্রিতেও দেখছিলাম বৃষ্টি হচ্ছে। আর ঠাণ্ডা তো মুসৌরী থেকে পিছনে তাড়া করে আসছিল।

ঠিক সাতটার সময় গাড়ি অমৃতসর স্টেশনে পৌছল। ভাইয়াজী উপস্থিত ছিলেন। টাঙ্গায় বসে আটটার সময় আমরা তাঁর বাড়ি পৌছলাম। সেদিন দুপুর তিনটের সময় ঘোরার জন্য কোম্পানি বাগ গেলাম। রিক্সোয় করে অনেক দূর অব্দি গেলাম। অমৃতসরের গলিও বেনারসেরই মতো। ভিড়ও থাকে খুব। মুসৌরীর ঠাণ্ডা ভাল লাগছিল না কিন্তু এখানকার ঠাণ্ডা খুব ভাল। ভাইয়ার বক্তব্য ছিল—'শীতের চার মাস এখানেই কাটাও।' কিন্তু শীত কাটানোটাই তো জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। লেখাপড়া ছাড়া কি করে দিন কাটবে? সে সুবিধে ছিল মুসৌরীতেই। ওখানে বইপত্র ছিল আর দেখাসাক্ষাৎ করতেও খুব কম লোক আসত।

২৪ জানুয়ারি তিনটের সময় রিক্সোয় করে ক্যান্টনমেন্ট গেলাম। তারপর সেখান থেকে হেঁটে কোম্পানি বাগ। কোম্পানি বাগ বললেই বোঝা যায় যে, এটা ১৮৫৭ সালের আগে স্থাপিত হয়েছিল। হাঁটতে এবার ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। অমৃসতর শহরের কিছু অংশ পুড়ে গেছে। এখানেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জোর সংঘর্ষ হয়েছিল। মুসলমানদের সংখ্যা কম তাই তাদেরই ধনে-জনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল, শেষে প্রত্যেককে পাকিস্তান চলে যেতে হয়েছিল। এই ব্যাপারটাই উল্টো করে ঘটেছিল লাহোরে। যেখানে মুসলমানদের বড় বড দোকান ছিল সেখানে এখন শরণার্থীদের ছোট ছোট দোকান খাড়া হয়ে গিয়েছিল। বড় বাড়ি তো জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুরা এগুলি জ্বালিয়ে নিজেদেরই ক্ষতি করেছে, কিন্তু সেই সময় কার মাথার ঠিক ছিল? রোববারে দোকান বন্ধ থাকে কিন্তু শরণার্থীদের দোকান সেদিনও খোলা ছিল এবং অন্য দোকান থেকে সেখানে জিনিসপত্র সস্তায় পাওয়া যেত। তাই ক্রেতা বেশি আসাটা স্বাভাবিক।

৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের একই রকম দিনলিপি ছিল। ছাতে এক জায়গায় সবার আগে রোদ আসত। সেখানেই শতরঞ্জী-বালিশ চলে আসত আর তাতে কমলা, জয়া, আমি, ভাবীজী বেশ জুত করে বসে পড়তাম। ভাই সাহেব মাঝে মাঝে অন্য কোনো কাজ করে আসতেন। আমরা ততক্ষণ সেখানেই বসে থাকতাম যতক্ষণ দুপুরের রোদ সেখান থেকে সরে না যায়। পেট ভরা জলখাবার আর চায়ের পর দশটার সময় মালটা-মুসাম্বির পর্ব শুরু হতো। একটা পুরো ঝুড়ি সামনে রেখে দেওয়া হতো। আমরা কেটে কেটে চুষতাম এবং ঝুড়ি খালি করে দিতাম। ভাবীজী পরিবেশনেও খুব দড়। কোনো অতিথির সাধ্য নেই গলা পর্যন্ত না খেয়ে আর অম্বল না নিয়ে এখান থেকে যেতে পারে। ভাই সাহেব নিজের মতো করে বাড়িটি বানিয়েছিলেন। যে কোনো সাধারণ ভারতীয় বাড়ির মতো এখানেও পায়খানার ভাল ব্যবস্থা ছিল না। ফ্ল্যাশের ব্যবস্থা না হলে সেটার ভাল ব্যবস্থা হতে পারে না। আমরা আরও কিছুদিন থাকতাম কিন্তু কমলা বি এ-এর ফর্ম পূরণ করেছিল আর এখানে পড়াশোনাও হচ্ছিল না। ওদিকে 'বহুরঙ্গী মধুপুরী'-র প্রুফও আসতে শুরু করেছিল। কমলার প্রকাশনায় এটা তৃতীয় এবং শেষ গ্রন্থ ছিল।

২৮ জানুয়ারি চারটের সময় পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোলাম। দেশভক্ত পরিবারের বাবা কেদার সিংহর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সেই সব বীরদের একজন যাঁরা আমেরিকার সুখী জীবনকে লাথি মেরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের মুক্তিযুদ্ধে নিজের সর্বস্ব আহুতি দিয়েছিলেন। ইংরেজ সবাইকে ফাঁসিতে ঝোলাতে রাজি ছিল না সেজন্য বাবা কেদারসিংহ এবং তাঁর আরও অনেক সাথীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়েছিল। ৭৯ বছর বয়স হয়েছিল। পুরো ছয় ফুট লম্বা, কিন্তু এখনো কোমর নুয়ে পড়েনি। হাঁটাচলাও করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় দুজনেরই খুব আনন্দ হলো। কে জানত সেটাই শেষ সাক্ষাৎ। তাঁর কাছ থেকে জানলাম তিন-চার বছর আগে বাবা করমসিং ধুতের মৃত্যু হয়েছে। তিনিও দেশের স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা থেকে চলে এসেছিলেন। রাশিয়াতে বহু দিন থেকে সাম্যবাদের শিক্ষা গ্রহণ করে, কয়েক বছর স্বদেশের জেলে ছিলেন। তরুণদের কত আনন্দ দিতেন। বাবা মোহনসিং ভাখনা আমেরিকায় ভারতীয় 'গদর পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা। এখন তিনি জীবিত ছিলেন। কোমর আগেই বেঁকে গিয়েছিল, এখন চলাফেরা করাও কষ্টকর ছিল। বেশিরভাগ সময় নিজের গ্রামেই থাকতেন। ৩১ জানুয়ারি তাঁর গ্রামে যাওয়া ঠিক ছিল কিন্তু সামান্য জ্বর হলো, এজন্য যাওয়া স্থগিত রাখতে হলো। বাবা কিষাণসিংহ এখনো বেঁচে ছিলেন, কিন্তু খুব দুর্বল। তিনি তো কয়েক বছর ধরে টি বি-তে ভুগছিলেন। দেওলী ক্যাম্পের আরও অনেক কমরেডের সঙ্গে দেখা হতো কিন্তু এখন পেপসুতে পুনর্নির্বাচন হচ্ছিল বলে সব কমরেডরা তাতে ব্যস্ত ছিল।

৩১ জানুয়ারি 'লোক-লিখারী সভা'র পক্ষ থেকে রিপাবলিক হলে আমাকে ভাষণ দিতে হলো। সাহিত্য, ভাষা আর শিল্প নিয়ে বললাম। পাঞ্জাবী ভাষা ও প্রদেশের কথাও এলো। শুধু লেখকই নয়, নগরের অন্যান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন। অমৃতসরে এই রকম একটি ভাষণ দেওয়ার ফলে লোকে আমার আসার খবর পেয়ে গিয়েছিল। আমি এটাও বলেছিলাম যে, পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে নিয়ে যাওয়ার মতো বোকামি আর নেই। তার ভাগ্যে বিধ্বস্ততাই লেখা আছে। মৃত-প্রসব একেই বলে। অমৃতসর যদি সীমান্তের কাছে

হতো তাহলে রাজধানী হওয়ার পক্ষে জলন্ধর সবচেয়ে উপযুক্ত নগর ছিল। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও তা পাঞ্জাবের সবচেয়ে পুরনো নগর এবং কেন্দ্রতেও অবস্থিত। কয়েক মাইল দূরেই কাপুরখলা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গেলে ওখানে না ছিল জমির সমস্যা আর না সরকারি অফিস বা লোকের থাকার জন্য বাড়ির অভাব। একজন ধনী ব্যক্তি বললেন, 'এই ভেবে জমি নিয়েও আমি ওখানে বাড়ি বানাই নি।' পাঞ্জাবের অধ্যবসায়ী ব্যবসায়ীরা ভালভাবেই জানে যে তাদের বাড়-বাড়ন্তের স্থান কোনটি হতে পারে। যদি তাদের নিজের শহর ছাড়তে হয় তাহলে তারা দিল্লীকেই বেশি পছন্দ করবে। অমৃতসরের জনসংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে কিন্তু বাড়ি তত বাড়েনি। কোনোরকম স্থায়ী সম্পত্তি বা তার সরঞ্জাম এখানে রাখাটা লোকে ভাল মনে করছিল না। যখন জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী শুনে হাজারে হাজারে লোক শহর ছেড়ে পালায়, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক সামান্য খারাপ হলেই হুলুস্থুলু বেঁধে যায়, তখন কে আর এখানে নতুন কারখানা খুলবে? আগে অমৃতসর দুই পাঞ্জাব আর কাশ্মীরেও কাপড় এবং অন্যান্য অনেক জিনিসের মুখ্য বাজার ছিল, এখন আর তা নেই। এর কু-প্রভাব পড়েছে অমৃতসরের বাজারের ওপর।

মুসৌরী—অমৃতসরে ১২ দিন থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি রাতের গাড়িতে আমরা মুসৌরী রওনা হলাম। জয়ার হাতে গুটি বসন্তর টিকে দিয়েছিলাম। প্রথমবারের টিকে ওঠে নি, ফের দ্বিতীয়বার নিল। এখন তা ফুলে উঠেছিল, জ্বরও ছিল, বেচারার মুখ শুকনো হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চাদের হাসিখুশি মুখই ভাল লাগে। জ্বর আর টিকে ওঠা অবস্থায় মুসৌরী নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাচ্ছিলাম না, কিন্তু যেতেই হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি সাহারানপুরে সকাল হলো। রাতভর বৃষ্টি হয়েছে আর তা মুসৌরী পর্যন্ত। নদীর জল বেড়ে গিয়েছিল। ক্ষেত জলভর্তি ছিল। নটার সময় গাড়ি লুকসর পৌঁছল। ট্রেনটা যাচ্ছিল ছ্যাকরা গাড়ির মতো।

সওয়া একটার সময় দেরাদুন পৌঁছলাম। মধ্য-হিমালয়ের অনেক পাহাড়ও হিমালয়শ্রেণী হয়ে গিয়েছিল। মুসৌরীর দেরাদুনের দিকের অংশে খুব কমই বরফে ঢাকা দেখা যেত কিন্তু এবার তাও ঢাকা ছিল। সমতলে রাত্রিবেলায় যে বৃষ্টি হচ্ছিল ওখানে সেটা হিমবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছিল।

দেড়টার সময় শুক্লজীর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। এবার এলাহাবাদে কুম্ভমেলা শুরু হয়েছিল। ভারতের সব দেব-মহাদেব কুম্ভমেলা দেখতে এবং নিজেদের দেখাতে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্যবস্থাপক পুলিসরা দেবতার দরবারে উপস্থিত ছিল। লোকের এত ভিড় হয়েছিল যে হাজার খানেক লোক পিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল। এ খবর পাওয়ার পরও দেবতাদের ভোজ চলছিলই। কিরকম ক্রূর পরিহাস! কুম্ভমেলায় শুক্লজীর স্ত্রীও গিয়েছিলেন। বললেন, 'জীবনের কি ভরসা। কুম্ভমেলা তো আবার সেই বার বছর পর আসবে।' শুক্লজী তাকে বাধা দিয়ে কেন পাপের ভাগী হবেন? তারের পর তার পাঠাচ্ছিলেন কিন্তু প্রয়াগ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। তার করার লোক তিনি একা তো ছিলেন না। হাজার হাজার লোকের তার ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া তার-ঘরের কর্মীদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। প্রয়াগের হৃদয়বিদারক খবর কাগজে বেরোচ্ছিল। তা পড়ে চিন্তা আরো বেড়ে গিয়েছিল। আজ তার এল। তাতে

কুশলে পৌঁছনোর খবর ছিল।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে কল্যাণ সিংহর বাড়িতেও গেলাম। তার অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। সাতজন লোক, শহরের জীবন অথচ রোজগার দিনে দু-টাকাও নয়।

৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীহরিনারায়ণ মিশ্রর বাড়িতে অনেক ছাত্র ও শিক্ষকদের সভা হলো। খাওয়ার পর কন্যা গুরুকুলে ভাষণ দিলাম। এই সংস্থা ধীরে ধীরে বড় আকার ধারণ করেছে। প্রায় একশো একর জমি আছে আর দু-লাখের বেশি বাড়ি। অনেকদিন আগে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই সংস্থাটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে লাভ হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। যদিও শিক্ষার আধুনিক চাহিদাগুলি এখানে পূরণ করা হয়েছে,কিন্তু সেটা পুরো মনোযোগ দিয়ে করা হয় নি। এই কারণেই কন্যা গুরুকুল ততটা উন্নতি করতে পারে নি। ড· সত্যকেতুর কন্যা উষা এই সময় ওখানে পড়ছিল। পড়াশোনার উপকারিতা সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল। ভাষায় তার খুব উন্নতি হয়েছিল এবং পড়াশোনাতেও। তার ওজন বেশ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মা-বাবার মনে হলো যে আধুনিক তরুণীর যেমন হওয়া উচিত তেমনটিই সে হতে পারবে না, এজন্য কিছুদিন পর তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হলো। যদিও ওখানে খরচও কম পড়ছিল।

৭ তারিখ সকালে শুক্লজীর স্ত্রী এলেন। সবাই খুব খুশি হলো। আশঙ্কা হচ্ছিল যে তিনি বোধ হয় দেরাদুনের জায়গায় বৈকুণ্ঠ পৌঁছে গেছেন। আমরা পৌনে এগারোটায় গাড়ি ধরলাম। সাড়ে বারোটায় মুসৌরীতে নিজের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। চার তারিখের বরফ এখানে রাস্তায় পড়েছিল, তবে তা ২১ জানুয়ারির মতো নয়।

টিকার জন্য জয়ার গায়ে জ্বর ছিল। বাচ্চার করুণ কান্না শুনতে অসহ্য লাগে। বাড়িতে এসে সবচেয়ে বেশি আরাম ছিল বাথরুমের। এটুকু আধুনিক তো এখন আমরা হয়েছিলামই যে, বাথরুম হবে ঘরের পাশেই এবং ফ্ল্যাশ থাকবে। ডায়াবিটিস তাকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল। নটার সময় জয়ার জ্বর যখন একেবারে ছেড়ে গেল এবং সে হাসতে শুরু করল, তখন খুব ভাল লাগল। জল মিশিয়ে গরুর দুধও খাওয়ানো হচ্ছিল। ও সেটা হজমও করতে পারছিল। তার সব ইন্দ্রিয়গুলি এবার কাজ করছিল। বালিশে হেলান দিয়ে একটু বসতেও পারছিল। ওঠাবসার তো বিরাম ছিল না।

২ মার্চ শীতের সমাপ্তি সূচিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল যখন নগ্ন বৃক্ষে নতুন পাতা গজিয়ে উঠতে দেখলাম। এ ব্যাপারে আমাদের নাশপাতি গাছটি সবার আগে থাকে। ৫ মার্চ তাতে লাল লাল পাতা দেখা যেতে লাগল। ৮ মার্চ জয়া বসতে শুরু করল। 'হিমাচল প্রদেশ' ডিকটেট করে টাইপ করাতে করাতে অনেকটা লিখে ফেলেছিলাম। হিমালয়ের কোনো অংশের পরিচয়-গ্রন্থকে আমি সম্পূর্ণ মনে করি না, যতক্ষণ না সেখানকার যাত্রাও তাতে যুক্ত হয়। তাই এবার হিমাচল-প্রদেশে যাত্রা করার ছিল। সঙ্গে কাউকে নেওয়া দরকার ছিল। ধূপনাথজী আর জনকলালজী দুজনকেই আমি চিঠি লিখলাম, দুজনেই রাজি ছিলেন।

শুক্লজীর কন্যা মুক্তা (কমল)-এর ১১ মার্চ বিয়ে ছিল। ১০ তারিখে আমিও সেখানে পৌঁছলাম। সেদিন সন্ধেতেই বরযাত্রী এলো। একমাত্র মেয়ের বিয়ে। মা-বাবা পুরো উৎসাহ নিয়েই দিতে চেয়েছে। যদিও পাত্রপক্ষ তা ততটা পছন্দ করত না। বিদ্বানের বাড়ির বিয়েতে

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পণ্ডিত আসাটা স্বাভাবিক ছিল। বর কৃষ্ণকান্ত মিশ্র পড়াশোনায় সবসময় প্রথম হয়ে এসেছেন। যদি চালবাজি না করা হতো তাহলে তিনি আই এ এস হয়ে যেতেন। তিনি একটি ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক। আশা করা যায়, এইরকম প্রতিভাশালী তরুণের পথ কখনো রুদ্ধ হয়ে থাকবে না। শ্রীকিশোরী দাস বাজপেয়ী বরযাত্রীর পক্ষে ছিলেন। কন্যার দাদু বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র অব্দি দেখে নিয়েছিলেন। ঠাকুমার মা তো আরো একটি প্রজন্ম দেখেছিলেন। বিয়ে হলো দিনের বেলায়। যদিও পোশাকে প্রাচীনত্ব রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু বরের কোনো সংকোচ ছিল না আর কন্যাও ততটা লজ্জায় জড়ো সড়ো হয়ে ছিল না। বিয়ে দিচ্ছিলেন যে পণ্ডিতজী তিনি যখন বললেন 'শর্মণস্য', তখন হাসি পেয়ে গেল। পুরোহিতের সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। বিয়ের ব্যাপারে এসেছিলাম তবু দুটো বক্তৃতা দিতেই হলো। কমলাও আমার সঙ্গে বিয়েতে উপস্থিত ছিল। সে এই প্রথম উত্তরপ্রদেশের কোনো বিয়ে দেখার সুযোগ পেল।

১৩ মার্চ ট্যাক্সি করে আমরা দুপুর নাগাদ মুসৌরী পৌঁছে গেলাম। ল্যাডলির বাড়ির মাঝামাঝি গিয়ে আমার একটু অসোয়াস্তি বোধ হলো। দুপুর আর রাতেও কিছু খাই নি। রাতে মনে হলো জ্বর এসেছে। এই সময় লম্বা লম্বা তুকবন্দী[1]-র মাধ্যমে গৌতমজীর ধমক কানে আসছিল যাতে বৌদ্ধধর্ম, সাম্যবাদের প্রতি গালাগাল ছিল। এইরকম লোককে কিছু বলাও যায় না।

একটু শরীর খারাপ হলেই খাটে শুয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা আমার নিয়ম। জ্বর বা পেটের গণ্ডগোল হলে আমি খাওয়াও বন্ধ করে দিই, তবে তার অর্থ এই নয় যে, পড়াও বন্ধ করে দিই বা প্রয়োজনীয় প্রুফ এলে তা ফেলে রাখি। এবার খাটে শুয়ে শুয়ে আমি প্রেমচন্দের 'গোদান' পড়তে শুরু করেছি। অনেক বছর আগে পড়েছিলাম। মনে এখন তার কোনো ছাপও ছিল না। শেষ করে ডায়েরিতে লিখলাম—অদ্ভুত লেখার ক্ষমতা। কত গুণ! ভাষার কথাই যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে কী দারুণ কাজ করেছেন। সাধারণ মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দগুলি নিঃসংকোচে প্রয়োগ করেন। অনাবশ্যক কঠিন শব্দ বাদ দিয়ে দেহাতী শব্দের প্রয়োগও করেছেন। হতে পারে তার মধ্যে এমন কিছু শব্দ আছে যা হিন্দির পশ্চিমাঞ্চলে বলা হয় না। কিন্তু তার জন্য কি চিত্রণের একটি উৎকৃষ্ট উপকরণ বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ চিত্র আঁকা যায়? অথবা অনাবশ্যক এবং অপ্রযোজ্য তৎসম বা উর্দু শব্দ নেওয়া যায়? কৃষকের দুঃখময় জীবনের এত স্পষ্ট, বিস্তৃত তথা গুরুত্বপূর্ণ চিত্রণ কে করেছেন? ভারতে তো এমন হয় নি। কোনো অনাবশ্যক পাত্র-পাত্রী নেই—মালতী আর খান্নাও নয়। এত নাম উপন্যাসে আসবে অথচ তাদের পরিণতির আগেই বিস্মৃত বা মৃত দেখানো যাবে না—এটা যথার্থ দাবি নয়। 'গোদান'-এর পাত্রপাত্রীদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব রয়েছে।

১৭ মার্চ বসে কাজ করা শুরু করলাম। ১৯ তারিখে কল্যাণ সিংহ এলেন। 'কমলসিংহ' নাম দিয়ে অনেকটা তাঁরই জীবনী নিয়ে যে গল্প আমি লিখেছিলাম তা 'সাপ্তাহিক হিন্দুস্তান'-এ ছাপা হয়ে গিয়েছিল। দেরাদুনে কেউ সেটা পড়েছিলেন এবং আঁচ করেছিলেন। তিনি

[1] ত [illegible] সাধারণ ছন্দমিলযুক্ত নিম্নমানের কবিতা।—স·ম·

কল্যাণসিংহকেও শুনিয়ে ছিলেন। কল্যাণসিংহ বলছিলেন, 'আপনি সব ব্যাপার কি করে জেনে ছিলেন?' হ্যাঁ, কিছু জিনিস আমি তাতে কল্পনা করে লিখেছিলাম, তবে তাঁর মতো অবস্থার মানুষের পক্ষে তা সম্পূর্ণ সম্ভবপর ছিল, এই জন্যই মিলে গিয়েছিল। নতুন পৌরসভা এখন গঠিত হয়েছিল। আমি তার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে সুপারিশ করলাম আর কল্যাণ সিংহকে দিয়ে মুসৌরীতে তাঁর বদলি করানোর দরখাস্ত লেখালাম।

আমাদের এখানে প্রায় সব উৎসবই দুদিন হয়। উৎসব দুদিন থাকুক, লোকে দু-দিন উৎসব পালন করুক, এটা খারাপ নয়। কিন্তু তিথি নির্দিষ্ট হওয়াটা অবশ্যই খারাপ। এই মহল্লার লোকেরা ১৯ তারিখেই হোলি পালন করছিল অর্থাৎ ১৮ তারিখেই তারা হোলি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমরা আমাদের বাড়িতে ২০ তারিখে দোল দেখলাম। ভাল ভাল খাবার বানানো হলো। কমলা প্রতিবেশীদেরও কিছু দিল। জয়া আজ ছমাসের হয়েছিল। কিছু জিনিস নকল করতে শুরু করেছিল। যদিও মোটা ছিল না কিন্তু দুর্বলও বলা যেত না।

২১ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের খবর এল। যে মুসলিম লিগকে অজেয় মনে করা হতো তা পাকিস্তানের অধিক জনতা সম্পন্ন সবচেয়ে বড় সাড়ে তিনশোটির মধ্যে দশটি আসনও পেল না। মুখ্যমন্ত্রী আর অন্য সব মন্ত্রীরা ভোটে হেরে গেল। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা লোকের নিজস্ব ভাষা বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে চাইছিল, তার বিরোধিতা করাতে গুলি চালাল। সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য বড় বড় চাকরিতে শাসন করার জন্য পাঞ্জাবীদের প্রাঠিয়ে দেওয়া হলো। সাত বছর ধরে ওখানকার জনগণের মধ্যে যে রাগ জমা হয়েছিল, এটা ছিল তারই পরিণাম।

২৩ মার্চ 'আর্যান পেশোয়া'-র চারগণ আমাদের এখানেও এলেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আর্যান পেশোয়া নামটি বেশি পছন্দ করেন। এর মিলিত অর্থে ধর্মের পয়গম্বর হওয়ার গন্ধ আসে আর প্রচলিত অর্থ ভারতের একটি শক্তিশালী বংশ। আজ রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ যদিও পুরোপুরি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর কথায় একমত হওয়াটা মুশকিল তবু দেশের স্বাধীনতার জন্য যে আত্মত্যাগ তিনি করেছেন তা ভোলা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাড়ি আর রাজকীয় ভোগবিলাস ত্যাগ করে বেরোলেন তারপর ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরলেন। তিনি সবসময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করে এসেছেন, আজও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তিনি সেইরকমই বিরোধী। উৎসর্গীকৃত দেশভক্ত ছাড়াও তিনি খুব বড় ভবঘুরে ছিলেন। তিনি বহুবার পৃথিবী-পরিক্রমা করেছেন এবং তা অর্থের বলে নয়। এই রকম মানুষের সামনে আমার মাথা নত হবেই। 'পেশোয়া' ১০ মে দিল্লী 'দখল' করতে যাচ্ছিল। মুসোলিনি রোম দখল করেছিল, সম্ভবত সেই ভাবনা আর্যান পেশবার মাথাতেও ঢুকেছিল। তিনি গেলেনও, কিন্তু তাঁর সঙ্গে এক হাজার পলটনও ছিল না। তিনি তাঁর হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু পত্রিকাগুলোতে খুব চাঁছাছোলা কথা লেখেন যা আইন উল্লঙ্ঘন করে। কিন্তু সরকার সে ব্যাপারে চুপ মেরে থাকে, এর জন্যও তাঁর দুঃখ ছিল। তাঁকে জেলে পাঠালেও হয়তো কাজ কিছুটা এগোত।

কমলার ভাই হরি আর বোন গঙ্গাকে এখানে এই জন্য আনা হয়েছিল যে, তাদের পড়াশোনার সুবিধে হবে। গঙ্গার স্কুলে নাম লিখিয়ে দিয়েছিলাম, সে পড়তেও যেত। হরিরও রমাদেবী হাইস্কুলে নাম লেখানোর জন্য প্রিন্সিপ্যাল মালহোত্রাকে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম। এই

স্কুলটি পরীক্ষার ফলাফলের দিক দিয়ে মুসৌরীর সবচেয়ে ভাল স্কুল। হরির এখানকার জীবন পছন্দ ছিল না। ঘরে অবশ্যই তার দুই বোন আর মঙ্গোল-নেপালী ভাষা বলার লোকেরা ছিল কিন্তু বাইরে সে কালিম্পঙের পরিবেশ পেত না। স্কুলে গেলে অপরচিত তথা অন্য ভাষাভাষী ছেলের সারল্যের সুযোগ অন্যরা নিতে পারে কিন্তু এটা তেমন কোনো ব্যাপার ছিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যেত। হরি তার মনোভাব কারু কাছে প্রকাশ করত না। আমরা জানতাম, সে পড়তে যাচ্ছে।

২৮ মার্চ কমলা তার বি এ পরীক্ষার জন্য জয়া আর হরির সঙ্গে দেরাদুন গেল। প্রবেশপত্র ভুলে এখানেই ফেলে গিয়েছিল বলে কমলাকে পাঠিয়ে হরি ফিরে এলো এবং অন্য বাসে গেল। জয়ার হর্ষধ্বনি নেই বলে আমাদের ঘর খালি খালি মনে হচ্ছিল। সেই সঙ্গে এটাও মনে হচ্ছিল। যে এখন মার্চ মাসের শেষে দেরাদুনে গরম পড়ে গেছে, কি জানি সে কেমন আছে। ৩০ তারিখে কমলার চিঠি এল। তাতে গরম আর মাছি দুইয়েরই সমস্যার কথা ছিল। ১ এপ্রিল দশটার সময় কমলা ফিরে এলো। চিন্তা দূর হলো। জয়াকে মশাতে কামড়ে শেষ করে দিয়েছিল। পরীক্ষা সম্বন্ধে হতাশ ছিল না, তবে আফসোস অবশ্যই করছিল যে, এফ এ-তে যদি সব বিষয়ে পরীক্ষা দিত তাহলে পাস করলে পুরো ডিগ্রি পেয়ে যেত।

'বিস্মৃত যাত্রী' আগের বছরই লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দিল্লীর 'সাপ্তাহিক হিন্দুস্তান' আমাদের এখানে তা ধারাবাহিকভাবে বের করার ইচ্ছে প্রকাশ করল। 'হিন্দুস্তান'-এর গ্রাহক সংখ্যা দেখে আমার ইচ্ছে হয়েছিল যে, গ্রন্থাকারে ছাপার আগে তা যদি কোনো পত্রিকায় বেরিয়ে যায় তাহলে ভালো হয়। কিন্তু এই রকম লেখার প্রতি যে স্বেচ্ছাচারিতা করা হয় তা লেখকের পছন্দ হতে পারে না।

২ এপ্রিল বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদের পক্ষ থেকে ড· ধর্মেন্দ্র ব্রহ্মচারীর চিঠি এল যে, পরিষদ 'মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস' প্রকাশ করতে রাজি হয়েছে। কতদিন ধরে, কত আশা আর পরিশ্রম করে লেখা এই গ্রন্থ, প্রকাশের মুখে এসে ঝুলছিল। প্রকাশক খুব চটপটে ছিলেন কিন্তু প্রেসের ভূত তাঁকে এমন দাবিয়ে দিল যে, ১৯৫৭ সালেও দ্বিতীয় খণ্ড বেরোবে কিনা সন্দেহ থাকল।

হিমাচল যাত্রার জন্য ধূপনাথজী ও জনকলালজী দুজনই প্রস্তুত ছিলেন। ৫ এপ্রিল ধূপনাথ চলে এসেছিলেন তার পরের দিন জনকলালজীও এলেন। জনকলালজী ছিলেন যুবক এবং পাহাড়ী লোক, সেই সঙ্গে কবিরাজীও জানতেন বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা ভাল মনে হলো।

১০ এপ্রিল আমরা এখান থেকে হিমাচল-যাত্রার জন্য বেরোনো স্থির করেছিলাম। ততদিন 'হিমাচল প্রদেশ' আবার পড়ে তাকে ঠিকঠাক করার কাজে লেগে রইলাম। ৭ তারিখে লণ্ডৌর গেলাম। খুব আশা করেছিলাম ছিল যে, কিষাণ সিংহের সঙ্গে দেখা হবে। দেখলাম দোকানে তালা লাগানো। খটকা লাগলো। তিনি এতদিন দিল্লীতে গরম সহ্য করার লোক ছিলেন না। পরে রাম সিংহের বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি জানালেন, ১ এপ্রিলই কিষাণ সিংহ দিল্লীতে মারা গেছেন। কনৌরে জন্মে। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তারপর মুসৌরীতেই থেকে গেলেন। তিনি কি সরল আর মিষ্ট স্বভাবের লোক ছিলেন! মুসৌরীতে তাঁর অভাব আমাকে সব সময় নাড়া দেবে। স্ত্রীকে দুটি বাচ্চা মানুষ করতে হবে, বড়টির বুদ্ধিসুদ্ধি খুব কম আর ছোটটি

অবোধ শিশু। কিষাণ সিংহর কথা ভেবে বন্ধু-বান্ধবরাও মাঝে মাঝে সহানুভূতি দেখাবে কিন্তু সমস্ত কষ্ট তো স্ত্রী বেচারাকেই ভোগ করতে হবে। তিনি ছিলেন ভারতের কোটি কোটি মানুষেরই একজন, তাঁর অভাব কে মনে রাখবে? কিন্তু আমি তো কিষাণ সিংহকে কাছ থেকে দেখেছিলাম। আমি কি করে তাঁকে সারা জীবন ভুলে থাকতে পারি?

হিমাচল প্রদেশে

নাহন—১০ এপ্রিল জনকলালজী আর আমি এক সঙ্গে দেড়টার সময় দেরাদুন রওনা হলাম। সেই দিনই পথে ছবি তোলার জন্য ক্যামেরার কিছু ফিল্ম আর অন্যান্য জিনিস কিনলাম পরের দিনের জন্য সাড়ে সাত টাকায় নাহন অব্দি বাসের টিকিটও কেটে নিলাম। ঠাণ্ডা জায়গার বাসিন্দার পক্ষে গরম সহ্য করা কঠিন ব্যাপার। ১১ তারিখে দুপুরে বাস ছাড়ার ছিল। গরমের চোটে মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল। হিমাচল সরকার যে বাস সার্ভিস চালু করেছে তার মধ্যে একটি বাস হরিদ্বার পর্যন্ত আসে। ফেরার সময় আমরা সেটাই ধরলাম। যমুনার তীরে গিয়ে তা ছাড়ার কথা। চুহড়পুর বাজারেও যাত্রী নেবার ছিল। চুহড়পুর এখন খুব বড় হয়ে গিয়েছিল। শরণার্থীদের তাতে যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সহসপুরের কাছাকাছির জল-বিভাজক দ্বারা দুন-উপত্যকাটি গঙ্গা আর যমুনার দুটি এলাকায় ভাগ হয়ে গেছে। সহসপুর চুহড়পুর থেকে অনেকটা এদিকেই পড়ে। চুহড়পুর থেকে ফিরে বাস যমুনার তীরে গেল। এপ্রিলের মাঝামাঝি। ঠিক দুপুরবেলা। গাছপালা যমুনার তীর থেকে দূরে ছিল। ঘাটে যে কি গরম ছিল তা আর বলে কাজ নেই। ভালমানুষদের দিয়ে এটুকুও সম্ভব হয় নি যে, এই রকম সময়ে নৌকা আগেই তীরে ভিড়িয়ে রাখবে। সেই রোদে যাত্রীদের ঘণ্টাখানেকের ওপর পড়ে থাকতে হলো। আমার কাপড়-চোপড়ে কোনো বিশেষত্ব ছিল না তবু সেই বাসেই আসা ঠাকুর বডোত্রা জনকলালজীকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। আমার লেখা চোখে পড়েছিল এই জন্য নাম জানতেন। নাহনে তিনি কো-অপারেটিভ ইনসপেকটর ছিলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

যমুনার স্রোত এখানে খুব তীব্র কিন্তু চওড়া ছিল না। নৌকাটিকে পারাপারে টানার জন্য দড়ি বাঁধা ছিল, যাতে প্রবাহ নৌকাকে টেনে না নিয়ে যায়। পার হলাম। পথে কিছুটা জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হলো। মোজার ওপর দিয়ে পায়জামা-পরা লোকদের অসুবিধে ছিল। জনকলালজীর পক্ষে আরও অসুবিধে কেননা পায়ে ছিল নেহেরুপন্থী পায়জামা যা হাঁটুর ওপরে তোলা মুশকিল। ৫ মাইল দূরে গুরু গোবিন্দ সাহেব থাকায় পবিত্র পাঁওটা সাহেবের ডাকবাংলোয় খানিকটা বিশ্রাম করার জন্য ঠাকুর সাহেব বললেন। ততক্ষণ বাসেরও যাত্রী তোলার ছিল। ঠাকুর সাহেব সঙ্গে গেলেন না তবে তিনি তাঁর একজন লোককে সঙ্গে দিলেন।

'পাঁওটা সাহেব'-এ শরণার্থী বিশেষ করে শিখ প্রচুর এসে পড়েছিল। দোকান-পাট ছোট খাটো শহরের রূপ দিয়ে দিয়েছিল। দেরাদুন থেকে নাহন ৫৮ মাইল। বাস যমুনার দুটি তীর পর্যন্তই যায়। পাঁওটা সাহেবর থেকে কিছুটা যাওয়ার পর আবার চড়াই এল যা পাঁচ মাইলের বেশি ছিল না। গিয়ে ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে উঠলাম। একটু পরেই শ্রীযুগলকিশোর সেওলও সাহায্য করার জন্য এসে পড়লেন।

সন্ধেয় বাজারে ঘুরতে গেলাম। নাহন রাজধানী এবং এই প্রান্তের ভাল শহর। এখানেও বাজারে শরণার্থীদের অনেক দোকান দেখছিলাম। রাতে তো আমি খেতাম না কিন্তু যখন দেখলাম জনকলালজী ৪ আনায় মাংস ভাত পেলেন তখন আমার সত্যযুগের কথা মনে পড়ল। এই বাড়িতে মশা-মাছির বিরুদ্ধে ভাল ব্যবস্থা ছিল। দরজা-জানলায় জালি লাগানো ছিল। গরমের উৎপাতও ছিল না।

১২ এপ্রিল সকালে নগর-পরিদর্শনের জন্য বেরোলাম। জগন্নাথ মন্দির এখানকার সবচেয়ে পুরনো মন্দির। রাজাকে এখানে রাজধানী গড়ার উপদেশ সওয়া তিনশো বছর আগে বাবা বনোয়ারি দাস দিয়েছিলেন। এটি ছিল রাজমান্য মন্দির। মোহান্তজী হচ্ছেন সংস্কৃতের পণ্ডিত। বনোয়ারি দাস তাঁর দশ প্রজন্ম আগে জন্মেছিলেন। পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে নেপালী রাজা গীর্বাণ যুদ্ধবিক্রম শাহ-র একটি দানপত্র পাওয়া গেল। রাজা জগতপ্রকাশেরও দেওয়া কিছু দানপত্র ছিল। অনেক পুরনো কাগজপত্র আদালতে দাখিল ছিল নইলে আরও কিছু পাওয়া যেত। জানা গেল, মৃতা তরুণী রাজকুমারীর নামে মহিলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে প্রচুর বই আছে। পৌরসভা এবং জেলা স্কুল ইন্‌স্পেক্টরও সাহায্য করার ব্যাপারে খুব সৌজন্য দেখালেন। রাজমহলের দরজায় বন্দুক নিয়ে সেপাই পাহারা দিচ্ছিল। তবে রাজা এখন বেশির ভাগ সময় দেরাদুনে থাকেন। চাবিও তাঁর কাছে ছিল বলে রাজকীয় সংগ্রহগুলি দেখতে পেলাম না। রাজপুরোহিতের কাছেও সাহায্য নিতে চাইলাম। তিনি এখন, এগারোটার সময়, পুজোয় বসেছিলেন। সাহায্যের কথা বলাতে চারটের সময় আসতে বললেন। আজকের মধ্যাহ্নভোজন আমি কালকের পরিচিত দোকানে করলাম। বেচারা বাবু-লোকদের চাটাই-এ বসাতে সংকোচ-বোধ করছিল। আমি বললাম, 'আমি তোমার সুস্বাদু খাবার খেতে এসেছি, চাটাই-এর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।' শ্রীযুগলকিশোর সেওল সকাল থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন ফলে তাঁর পরিচয় পাওয়া সহজ হলো।

একটি বাঁধানো পুকুরের (জোহড়) মাটি তোলা হয়েছে দেখলাম। অনেক দিন ধরে পুকুরটির দেখাশোনা হয়নি বলে মাটি ভরে গিয়েছিল। এখন জলে পূর্ণ হয়ে এই দীঘি শহরের সৌন্দর্য বাড়াবে। পৌরসভার রোজগার দেড় লাখ যার মধ্যে এক লাখের ওপর হচ্ছে চুঙ্গী। এর থেকেই শহরটির ব্যবসা-প্রধান হওয়ার কারণ বোঝা যায়। ভোজনালয়ের মালিক অভিযোগ করছিল যে, এখন আগের মতো লোক আসে না। কোনো রকমে পেট চলে যায়। আমি বললাম, 'আজকালকার যুগে এটাকেও আশীর্বাদ মনে করতে হবে।'

ঠাকুর বডোত্রা দুপুরের আগেই চলে এলেন। তিনি পছন্দ করছিলেন না যে আমরা তাঁর বাড়িতে উঠেছি অথচ খাচ্ছি ভোজনালয়ে। আমি বললাম, 'আমাদের শহরে ঘুরে কাজ করতে হবে যদি খাওয়ার ব্যাপার থাকে তাহলে মাঝখানে সময় দিতে হবে।' নাহন থেকে ২৫ মাইল

দূরে দদাহু একটি তহসিলের মুখ্য স্থান। আমরা সেটি দেখব স্থির করে নিয়েছিলাম। এখান থেকে ওই পর্যন্ত বাস যেত তাই যেতে কোনো অসুবিধে ছিল না। তিনটের সময় মোটর ছাড়ল। পথ, পাহাড়ের পিঠ বেয়ে এবং কখনো কখনো উৎরাই ধরে যাচ্ছিল। কয়েক মাইল অব্দি সিমলার পথেই গেল। যখন আমরা দদাহু পৌঁছলাম তখন সূর্যাস্ত হচ্ছিল। এখন কোনো মেলা ছিল। সেখানে থেকে লোকে ফিরছিল কিন্তু এখনও নাটক দেখার জন্য প্রায় দু-হাজার লোক উপস্থিত ছিল। কুস্তিও হলো। পাহাড়ে এটার খুব শখ আছে। দদাহুতে হাইস্কুলও আছে। বড়োত্রাজী একজন লোক দিয়েছিলেন যার জন্য আমাদের থাকার সমস্যা হয় নি।

রেণকাজী—পরশুরামের মাতা রেণকাজী এখান থেকে এক-দেড় মাইল দূরে। সেখানকার সরোবর দর্শনীয়। পাঁচটার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পথে গিরী নদী পড়ল। পার হওয়ার জন্য পুল ছিল না। লোহার তারের ওপর খাটুলি ছিল, যার ওপর লোকে বসে পড়ত আর দড়ি দিয়ে এই পার থেকে ওইপার করা হতো। এত সকালে খাটুলিওলা ছিল না। খাটিলও ওই পারে বাঁধা ছিল। একজন লোক পার হয়ে সেটা খুলে দিল। দোলনা এদিকে টেনে আমরা এক এক করে পার হলাম। রেণকা এক মাইলের কমই ছিল। প্রথমে পরশুরাম পেলাম, যা ছোট এবং জলও ভাল ছিল না। এরই বাঁদিকে লাল টিনের গির্জার মতো ছাতওলা পরশুরামের মন্দির। আমরা এটা ফিরে এসে দেখলাম। মন্দিরও নতুন আর মূর্তিও নতুন। সামনে এগোলাম। বড় দীঘির আগেই কিছু পুরনো মন্দির পেলাম। সরোবরের কাছে মন্দির আর বাঁধানো ঘাটও ছিল। দীঘিটির বেড় ছিল তিন মাইল। আশেপাশে ঘিরে থাকা পাহাড় নীচ থেকে ওপর অব্দি সবুজে ঢাকা যার জন্য সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায়। লোকে বিশ্বাস করে যে, পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম নিজের মাকে এখানে হত্যা করেছিলেন। আর এখানেই তিনি দীঘির রূপ ধারণ করেছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষি জমদগ্নি সম্বন্ধে এরকম কোনো পরম্পরা বৈদিক যুগে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাতে কি? কাহিনী পরে তৈরি করা হয়েছে আর তার সঙ্গে সরোবরকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রতি বছর খুব বড় মেলা বসে। কয়েকশো দোকান বসে। পাহাড়ের নরনারীতে জায়গাটি ভরে ওঠে। সরোবরের ধারে, জলজ উদ্ভিদ তার শোভা নষ্ট করছিল আর সে-কারণে স্বচ্ছন্দে স্নান করারও অসুবিধে ছিল। এটা ভ্রমণার্থীদের তীর্থ হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সেজন্য এখানে থাকা আর খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এসব তখনই হতে পারে যখন আমাদের প্রতিটি নারী-পুরুষের মাসিক আয় একশো টাকা হবে আর সেই সঙ্গে কেউ নিরক্ষর থাকবে না।

পুরনো মূর্তি বা অন্য কোনো জিনিস দেখতে পেলাম না কিন্তু নবম-দশম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের জিনিস অবশ্যই পাওয়া উচিত যদি ভালভাবে অনুসন্ধান করা যায়।

দদাহু থেকে আটটার সময় বাস ছাড়বে বলে আমাদের তাড়া ছিল। আমরা পৌনে আটটায় পৌঁছে গেলাম। চাওলা চা আর ডিম দিল। দদাহু বাজার ভাল। চায়ের দোকানও আছে। এইজন্য যাত্রীদের কোনো অসুবিধে হয় না। হাইস্কুল, হাসপাতাল, তহসিলদারের কার্যালয় থাকার ফলেও এটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বাস ছাড়ল। চওড়া কিন্তু জল কম আছে এমন একটি নদী পুল ছাড়াই পার হলো। আবার চড়াই শুরু হলো। সিমলাগামী রাস্তায় পৌঁছল। তারপর সদ্য পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া টারপ্যান্টাইন ফ্যাক্টরির পাশ দিয়ে গিয়ে তিন ঘণ্টায় নাহন পৌঁছে গেল।

আজ নাহনে বাকি কাজ করে কাল এখান থেকে সিমলা যাওয়ার ছিল।

১৪ তারিখ সকালেই সেওলজী আর অন্যান্য নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বেরোলাম। মহিলা[১] গ্রন্থাগারের বৃদ্ধ গ্রন্থাগারিক সন্ত বালকৃষ্ণ শর্মা অত্যন্ত সৌজন্য প্রকাশ করলেন। চা-মিষ্টি না খাইয়ে ওখান থেকে ওঠার অনুমতি দিলেন না। গ্রন্থাগারে আমার দু-ডজনের কাছাকাছি বই ছিল। এ থেকে মহিলা গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব বুঝলাম। এই পঙ্‌ক্তিগুলি যখন লিখছি ততদিনে নাহনে ডিগ্রি কলেজও খুলে গেছে বলে গ্রন্থাগারের আরও উন্নতি হয়েছে আশা করা যায়। দুপুরের খাওয়া হলো বডোত্রাজীর বাড়িতে। তাঁর জন্যই নাহনে কোনোরকম কষ্ট হলো না।

শিমলা—১৬ টাকা দিয়ে সিমলার বাসের দুটি টিকিট নিলাম। দুপুর পৌনে একটায় আমরা প্রস্থান করলাম। সাড়ে সাত মাইল অব্দি তো সেই রাস্তাই ছিল যা দিয়ে আমরা রেণকা গিয়েছিলাম। আবার চড়াই ধরে ৬০০০ ফুট অব্দি বাস উঠল। ২৬ মাইল যাওয়ার পর সরাহাঁ পেলাম। ইংরেজিতে লিখলে এটা এবং বিসাহর এস্টেটের সরাহন এক হয়ে যায়। মূলশব্দটি সম্ভবত একই ছিল। এখানে তহসিল, থানা, ডাকবাংলো এবং এক ডজনের ওপর দোকানও আছে। হিমালয় বাস সার্ভিসের বাবুও থাকে যে যাত্রী এবং মালপত্রের জন্য টিকিট দেয়। বাস একটুক্ষণ দাঁড়াল। কেউ কেউ চা খেল। সামনে ববাগধার পেলাম। 'ধার'-এর অর্থ পর্বতশ্রেণী। এখানে আলুর সরকারি ফার্ম ছিল। নৈনাটিকরিতেও দু-একটি দোকান ছিল। সারা রাস্তায় পাইন আর ওক গাছই বেশি চোখে পড়ল। কুম্‌হারহিট্টীতে কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার রাস্তা পেয়ে গেলাম। সোলন বেশ ভাল শহর। এখানে চা খেয়ে চললাম। কণ্ডাঘাটে অন্ধকার হয়ে গেল। ৮৮ মাইলের যাত্রা সাড়ে সাত ঘণ্টায় শেষ হল। রাতে কোনো পরিচিতের বাড়ি খুঁজে বের করাটা ভাল মনে হলো না। রয়েল হোটেল ছিল কাছেই। দৈনিক ৬ টাকা হিসেবে একটি ঘর নিয়ে থেকে গেলাম। ফোন করে জানা গেল যে, মন্ত্রী গৌরীপ্রসাদজী মাণ্ডী গেছেন, পরশু ফিরবেন। অন্য মন্ত্রী পদ্‌মদেবজী বাড়িতে ছিলেন না। সে রাতে শুয়ে পড়লাম। মুসৌরীর চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা ছিল না।

১৫ তারিখ সকালে চা খেয়ে মাউণ্ড প্লেজেণ্টে কো-অপারেটিভের ডেপুটি রেজিস্ট্রার পণ্ডিত বিদ্যাসাগর শর্মার বাড়ি চলে গেলাম। বাস-স্ট্যান্ড থেকে তাঁর জায়গা অনেকটা দূরে ছিল। পথে হিমাচল বিধানসভা-ভবন পড়ল। বিদ্যাসাগরজী তাঁর বড় ভাইকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বড় ভাই (হিমাচল বিধান সভার অধ্যক্ষ) পণ্ডিত জয়বন্তের ছেলে উকিল শিবকুমারজী বাড়িতেই ছিলেন। শিক্ষিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন পরিবার, দেখলাম সবরকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরজী কত তথ্যাদি দিলেন। তা এত বেশি ছিল যে, আর না পেলেও কাজ চলে যেত।

১৫ এপ্রিল ছিল হিমাচল প্রদেশের নির্মাণ-দিবস, যা খুব উৎসাহের সঙ্গে পালন করা হবে। আমরা হাসপাতালে পণ্ডিত জয়বন্তজীর সঙ্গেও দেখা করলাম। প্রথমে চন্‌না স্কুলের শিক্ষক

---

[১] মূলগ্রন্থে এই গ্রন্থাগারটি 'মাহিলা গ্রন্থাগার' নামেও অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মহিলা গ্রন্থাগার' নামটিই গৃহীত হলো।—স·ম·

এবং পরে সেখানকার সংগ্রহালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে থেকেছেন অনেক বছর। হৃদরোগের জন্য হাসপাতালে পড়েছিলেন। ডাক্তাররা পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, এজন্য তাঁদের পক্ষ থেকে কিছু না বললেও আমরা বেশি সময় নিতে চাইছিলাম না। শিবকুমারজী অনুরোধ করলেন যে, হোটেল থেকে যেন তাঁদের বাড়িতে যাই। তথ্যগুলি সংগ্রহ করার জন্য এখানে থাকলে সুবিধে ছিল, এজন্য লটবহর নিয়ে তিনটের সময় হোটেল থেকে মাউন্ট প্লেজেন্টে চলে এলাম। যখন আমরা একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম তখন মুসৌরীতে দেখা মঙ্গোল ভিক্ষু মঙ্গলকে দেখতে পেয়ে গেলাম। বলছিলেন যে পুরো শীতকালটা তিনি লক্ষ্ণৌতে ছিলেন।

সাড়ে চারটের পর মহোৎসব দেখতে গেলাম। সচিবালয়ের বাইরে একটুখানি সমতল জায়গা ছিল। সেখানেই লোক জমা হয়েছিল। লোকগীত আর লোকনৃত্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু লোকগীতের নামে মীরাসী[১] দম্পতি তাকে খাঁটি সংগীত ও গজলের রূপ দিতে লাগল তখন তা অসহ্য হয়ে উঠল। এখানে লোকশিল্পের কোনো জিনিস ছিল না, বাদ্যযন্ত্রও ছিল আধুনিক। এর মধ্যে ভাল ব্যাপার যেটুকুছিল তাহল চম্বা জেলার চুরাহী নর-নারীর লোকনৃত্য, যা এই বছর দিল্লীতে গণরাজ্য মহোৎসবের সময় ভারতের প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। স্ত্রী-পুরুষের বেশভূষা আর বাদ্যযন্ত্রও স্বাভাবিক ছিল। গানও ছিল মনোমুগ্ধকর। সাতটা-আটটা অব্দি হিমাচলধাম সচিবালয় প্রাঙ্গণে উৎসব দেখতে লাগলাম। দশ লাখ লোকের হিমাচল প্রদেশ এখন অর্ধেক হয়ে গেছে। কাংড়া জেলাকে এর থেকে আলাদা করে পাঞ্জাবে রাখাটা অনুচিত। সেটা মিলে গেলে এর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে আর সেটাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে যদি গাড়োয়াল, কুমায়ুনকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নতুন পরিকল্পনাগুলি এখানে দ্রুতগতিতে রূপায়িত হতে পারবে।

১৬ এপ্রিল চা খেয়ে নটার পরে বেরোলাম। ছোট সিমলা অব্দি গেলাম। এখনো ভ্রমণার্থীরা আসেনি। আশপাশের সমস্ত জায়গা হিমাচলের মহাসু জেলার অন্তর্গত। ষাট বর্গমাইলের সিমলা শহর রাখা হয়েছে পাঞ্জাবে। সিমলার নীচের কিছুটা পাহাড়ী অংশ হচ্ছে পেপসুর। মুশ্‌কিল হলো যে আজ গুড ফ্রাইডে। অনেক অফিস বন্ধ, তাই শুধু নগর-পরিদর্শনের কাজই হলো।

১৭ এপ্রিল আকাশ পরিষ্কার ছিল। চা খাওয়ার পর সকালে বেরিয়ে গেলাম। কখনো পুরনো পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে ভাল ভাল বই পাওয়া যেত কিন্তু এখন মুসৌরীর মতো এখানেও ইংরেজদের চলে যাওয়ার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। দু-একটি কাজের বই পেলাম আর শিমলা এবং চম্বা জেলার স্কুলে পড়ানো হিন্দি ভূগোলও পেয়ে গেলাম। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরজী খুব তৎপরতার সঙ্গে গ্রন্থসম্বন্ধীয় প্রয়োজনগুলি পূরণ করছিলেন। পণ্ডিত জয়বন্তজী অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও অনেকগুলি কথা জানালেন এবং জেলার হাকিমদের কাছে অনেক চিঠি লিখে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে এটাও জানা গেল যে, চম্বার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন আমার পরিচিত নেগী ঠাকুরসেন।

শিবকুমার আর তার ভাই রামকুমার দুজনেই নতুন প্রজন্মের উৎসাহী যুবক। তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল, হিমাচলের লোকরা পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারদের জ্বালায় কতখানি

[১] মুসলমানদের একটি সম্প্রদায় যারা গানবাজনা করে জীবিকা অর্জন করে।—স·ম·

উত্যক্ত।

সেদিনই রাত আটটার সময় গৌরীপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তাঁর বিভাগের তথ্যসামগ্রী দিতে সাহায্য করবেন কথা দিলেন, এবং সেই কথা রাখলেনও। আমি হিমাচলের মন্ত্রীদের কাছে 'গঢ়ওয়াল'-এর একটি করে কপি পাঠিয়েছিলাম যাতে হিমাচল সম্বন্ধে কী ধরনের বই লিখতে যাচ্ছি তা বুঝতে পারেন। গৌরীপ্রসাদজী প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়েছিলেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আর শিক্ষামন্ত্রীর সে ফুরসৎই হয়নি। এজন্য তাঁদের সঙ্গে দেখা করাটাও নিরর্থক মনে করলাম।

আমাদের ১৮ এপ্রিল সকালের বাস ধরার ছিল। জানা গেল, বাস সাড়ে ছটায় ছেড়ে দেয় আর আমাদেরই তখন সাড়ে ছটা বেজে গিয়েছিল। শিবকুমারজী আর রামকুমারজী জোর দিয়ে বললেন, কিন্তু বাস পাবো বলে আমাদের ভরসা হচ্ছিল না। আসলে বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার আমাদের দরকার ছিল না, মাউন্ট প্লেজেন্ট থেকে এক বা দেড় ফার্লং দূরে ১০৩ নম্বর সুড়ঙ্গে তা ধরার ছিল। বাসওলাদের কাছে আমাদের টেলিফোনও চলে গিয়েছিল। এজন্য সাতটার সময় আমরা সেখানে বাস পেয়ে গেলাম। আমাদের পরের লক্ষ্য ছিল বিলাসপুর, যা এখান থেকে ৫৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

বিলাসপুর—রাস্তা ছিল খুব সরু। অত্যন্ত দক্ষ ড্রাইভারই এর ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে পারত।কিন্তু বড় রাস্তা বানানোর জন্য বড় অংকের টাকা দরকার। ৩৫ মাইল দূরে ঘাট পেলাম। শিবমন্দির দেখে বাস থামতেই আমরা সেদিকে দৌড়লাম। মন্দিরের আকার থেকে প্রাচীনতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। পুরনো পাথর, কিন্তু কোনো ভাঙা মূর্তি দেখতে পেলাম না। ভাঙা মূর্তি নদীতে ভাসিয়ে দেবার রেওয়াজ আছে সারা ভারতে। ভেঙে গেলে তার দর্শনেও পাপ হয় বলে লোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা বিলুপ্ত করতে চায়—যার সঙ্গে সঙ্গে বহু ঐতিহাসিক সামগ্রী চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়।

প্রাডীতে দু-তিনটে দোকান ছিল। রুটি-ডালও পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা খেলাম। বিলাসপুর আরো ১৮ মাইল বাকি ছিল। সামনে সেই পাহাড় ঢালু হাতে লাগল। ঢালু জমির সব জায়গায় বিস্তৃত খেত ছড়িয়ে ছিল। আমরা সিমলার সাড়ে ছ-হাজার ফুট উচ্চতা থেকে বিলাসপুরের এক হাজার ফুট উচ্চতায় পৌছে যাচ্ছিলাম। বারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে যখন বাসস্ট্যান্ডে নামলাম তখন গরমে হয়রান হয়ে যাচ্ছিলাম। থাকার জায়গার কথা জিজ্ঞেস করায় লোকে বাজারের একটি হোটেলের কথা জানাল, যার না মেঝে ঠিক ছিল না দরজা। দড়ির খাট অবশ্য ছিল। আমাদের দুজনের এখানে ঘুরে ঘুরে নিজেদের কাজ করবার ছিল। এই রকম অরক্ষিত জায়গায় জিনিসপত্র রেখে কি করে যাই? কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে অসুবিধে কিছু ছিল না। কাছেই শতদ্রু নদীতে মাছ ভর্তি ছিল আর বাজার এত বড় যে ওখানে খাবার লোক পেয়ে যাবে বলে মাঝি মাছ রান্না করে রেখেছিল। দেখা গেল জনকলকলজী ভাতপ্রেমিকই আর মাছ-মাংস না থাকলে আমিও ভাতপ্রেমিক হয়ে যাই। গরমের চোটে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা জল দরকার ছিল। খাবার সুস্বাদু ছিল। ভালভাবে খেলাম। তারপর সেই রোদেই ছাতা মাথায় বেরোলাম। স্ট্যান্ডের কাছে একটি চূড়াওলা মন্দির পেলাম। সেখানে খুব পুরনো কোনো জিনিস ছিল না।

কাছেই সাধুর কুটির দেখে নিজের পুরনো জীবন মনে পড়ল। বুড়োবাবা নিজের বয়স বলতে পারতেন না। ৭০-এর বেশি তো অবশ্যই হয়েছিল। তিনি সারা ভারতে ঘুরেছেন। সামনে ধুনী ছিল। গাঁজা-ভাঙের কলকে আর দু-একজন ভক্তও উপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণ বসলাম। পরিচয় বাড়ালাম। আমাদের হোটেলের চেয়ে এই জায়গাটি বেশি সুরক্ষিত, যদিও এখানেও তালা-চাবি দেওয়া ঘর ছিল না কিন্তু বাবা সবসময় থাকতেন।

আমরা আরও কিছু পুরনো মন্দির দেখে নিতে চাইছিলাম। সেজন্য নীচের রাস্তা ধরে শহরের বাইরে চলে গেলাম। রাস্তার ধারেই মন্দিরসহ একটি স্বচ্ছ জলাধার পেলাম। নীচে শতদ্রুর কিনারায় আরও অনেকগুলি পুরনো মন্দির পেলাম। মন্দিরগুলি দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, এগুলি প্রাচীন কিন্তু প্রাচীন ভাঙা মূর্তিগুলি তো জেনেশুনেই শতদ্রুতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, ফলে সেগুলি আর কোথায় পাওয়া যাবে? শতদ্রু এখানে যথেষ্ট চওড়া। ভাকরার বাঁধ পূর্ণ হয়ে গেলে এটি সমুদ্রের রূপ ধারণ করবে আর দুদিকে কয়েক মাইল অব্দি অপার জলরাশি দেখা যাবে। সে সময় এই সব মন্দির জলের নীচে-তলিয়ে যাবে।

ফেরার সময় আমরা ওপরের রাস্তা থেকে পুরনো বাজারের দিকে গেলাম। রঙ্গনাথ মন্দিরের নাম শুনেই মনে হলো এটা দক্ষিণের রঙ্গনাথের নামে, আচারী বৈষ্ণবের বানানো কোনো নতুন মন্দির হবে কিন্তু এটা বিষ্ণু নয় শিবের মন্দির এবং এখানকার খুব পুরনো মন্দির। এটা বর্তমান রাজবংশের আগেকার এলদেব নামে কোনো এটা রাজা বানিয়েছিলেন। মন্দিরটি কাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর এদিকের হতে পারে না। এখানকারও অধিকাংশ মূর্তি শতদ্রু পেয়েছে, কিন্তু কয়েকটি এখনও রয়েছে। সেগুলি নিজেদের সময় আর উন্নত শিল্পকলার কথা জানাচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করায় লোকে এটাও জানাল যে, মহারাজা আনন্দচন্দ এখন এখানে নেই। তবু পুরনো ও নতুন প্রাসাদ দেখার ছিল, সেজন্য মাঠ পেরিয়ে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। নতুন মহলে সশস্ত্র সেপাই মজুত ছিল। তারাও মহারাজার না থাকার কথা বলল। আমরা দেখার আগ্রহে প্রাসাদের ফটকের ভেতর চলে গেলাম। কোনো একটি লোক জানাল রাজাসাহেব আছেন। নাম পাঠাতেই তিনি চলে এলেন আর স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'আমি আপনার আসার প্রতীক্ষা করছিলাম।' আমি মুসৌরী থেকে বেরোনোর আগেই অনেক জায়গায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। রাজা আনন্দচন্দ অসাধারণ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতবান প্রৌঢ় পুরুষ। আজমীরের রাজকুমার কলেজে পড়ার সময় তিনি সর্বদা তাঁর ক্লাসে প্রথম হতেন। রাজ্যের শাসনকার্য চালানোর সময় তিনি প্রজার ভালর জন্য অনেক কিছু করেছেন। শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। তবে সাত-আটশো বছরের তাঁর পুরনো বংশের স্বার্থ কি করে নিজের ইচ্ছেয় ছাড়তে চাইবেন? প্যাটেলের লাঠি করদ রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তিতে সই করতে বাধ্য করিয়েছিল কিন্তু তখনও তাঁর জেদ ছিল যে, তাঁর রাজ্যকে যেন হিমাচল প্রদেশে না মেলানো হয়। যোগ্যতায় যারা তাঁর তুল্যও নয়, তারা রাজা সরকারের কৃপাপাত্র হয়ে মৌজ করছে। আনন্দচন্দ যদি সামান্যও দরবারী মনোভাব দেখাতেন তাহলে তিনিও সামনের সারিতে আসতেন। কিন্তু নিজের যোগ্যতার জন্য তাঁর গর্ব আছে।

কুটির ছেড়ে এখানকার রাজপ্রাসাদে রাত কাটাতে আমাদের বাধ্য হতে হলো। রাজা সাহেব এই প্রাসাদটি নিজের রুচি অনুযায়ী বানিয়ে ছিলেন। বানানোর সময় স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের

দিকে পুরো দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। শিল্পের দিকেও ততদূর মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল যে পর্যন্ত তা বেশি ব্যয়সাপেক্ষ না হয়। ঘরগুলি ছিল বড় বড়। হাওয়া-বাতাসপূর্ণ। মার্বেল পাথরও যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। গোটা প্রাসাদটি ভাকরা সাগরের গর্ভে চলে যাবে। তবে রাজা সাহেব মহলের টাকা অবশ্যই পেয়ে যাবেন। দেখে বিলাসপূর্ণ স্নানাগারে ঠাণ্ডা-গরম জলেরও ব্যবস্থা আছে প্রথমে আমাদের স্নান করার ইচ্ছে হলো। স্নানের পর কয়েক ঘণ্টা ধরে রাজাসাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা হতে লাগল। তিনি তাঁর রাজ্য সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য এবং অন্যান্য খবর দিলেন।

১৯ এপ্রিল সকালে চা খেলাম, তারপর রাজসাহেবের বইয়ের আলমারিগুলি দেখতে লাগলাম। ২২টি আলমারি দেখে বুঝতে পারলাম যে, এই মানুষটি কত বই-প্রেমিক।

আজকালকার যুগে সাজানোর জন্যও বই সংগ্রহ করে রাখা হয়, বিশেষ করে আধুনিক পুঁজিপতিদের বাড়িতে তো নিজেদের শিক্ষা আর সংস্কৃতির প্রতাপ দেখানোর জন্য এইরকম করাটা জরুরি মনে করা হয়। আজও অনেকক্ষণ ধরে রাজাসাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা হতে লাগল। হিন্দির প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না, কারণ ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজির দাওয়াই পেয়ে গিয়েছিলেন, তীব্র বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তবু তাঁর পোশাক-আশাক আর আচার-আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি ইংরেজিয়ানার কবলে পড়েননি।

এগারোটার সময় বিলাসপুরের ডেপুটি কমিশনার শ্রীমহাবীর সিংহজীর বাড়ি গেলাম। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে তথ্যাদি সংগ্রহ করার কাজে আমাকে সাহায্য করলেন এবং একজন অফিসারকে ডেকে সব বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দেখানোর জন্য বললেন। দুপুর বেলায় এক অফিস থেকে অন্য অফিসে যাওয়াটা খুব আরামদায়ক ছিল না কিন্তু 'অর্থী দোষং ন পশ্যতি'। ডেপুটি-কমিশনার বলছিলেন, 'আলাদা রাজ্য হওয়ায় সমস্ত বিভাগ আলাদা আলাদা ভাবে রয়েছে। সেসব ফাইলে সই করতেই তো আমার অনেকটা সময় লেগে যায়।'

দুটোর সময় খাবার খেলাম। রাজাসাহেবের কৃপাপাত্র শাস্ত্রীজী মাণ্ডীর দুটি টিকিটও এনে দিলেন। তিনটে বাজার আগেই রাজা সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং আশা প্রকাশ করলাম যে, হিন্দির মাধ্যমে তিনি তাঁর জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। রাজার গাড়িতে বাসস্ট্যান্ড পৌঁছলাম। তিনটের সময় আমাদের বাস ছেড়ে দিল। বিলাসপুরে আশপাশে অনেক সমতল ভূমি আছে। রঙ্গনাথজীর মন্দির হচ্ছে শহরের সবচেয়ে উঁচু স্থানে কিন্তু সেটারও চূড়া অব্দি ভাকরা সাগরে ডুবে যাবে। ভাকরা বাঁধ বানানোর দিকে যতটা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, বিলাসপুর সম্বন্ধে তার এক শতাংশ ভাবনাও নেই। ডেপুটি কমিশনার বলছিলেন, 'আমরা যদি বিদ্যুৎ আর রোপওয়ে আগে থেকে পেয়ে যাই তাহলে আমরা সময়ের আগেই সমস্ত জিনিস সেই জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি, যেখানে আগামী দিনের বিলাসপুর গড়ে উঠবে। কিন্তু ওপরের লোকরা বড় বড় জিনিস মাথায় রাখে।' দিল্লীর মহাদেবের এই কথাটি সব সময় তাঁদের সামনে থাকে—'ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে কেন চিন্তা কর?'

বাস পাহাড়ের ওপর দিকে এগোতে লাগল। গরমে গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। কিনে রাখা কমলা লেবুর কথা এই সময় মনে পড়ল। দেখা গেল জনকলালজী ঝোলাতে তা বাড়িতেই ফেলে

এসেছেন। সে কমলালেবুগুলো বাবার কাজে লাগলে, আমাদের পক্ষে তা খুব খুশিরই ব্যাপার। আমরা বিলাসপুরের ১৬ হাজার লোকের উচ্ছেদ হওয়া ঘরগুলির কথা মনে রেখে চারদিকে দেখছিলাম। বাসটি অনেক পাহাড়ী নালা পার হয়ে রেহরার পুলে পৌঁছল। এখানে চাটান পাথর শতদ্রুর ধারাকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে, তারই ওপরে লোহার পুল রয়েছে যা বাসের জন্য তৈরি করা হয় নি। এটা কিছুদিন পর ভাকরা সাগরে ডুবে যাবে। তখন পুল আরও ওপরে বানানো হবে। কিছুটা এগিয়ে দোকান পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে একটি পুরনো কেল্লাও পেলাম, যা এখন ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। কিছুটা রাস্তা যাওয়ার পর বাসটিকে আর বেশি চড়াই উতরাই-এর মধ্য দিয়ে যেতে হলো না। সাতটা নাগাদ আমরা পুরনো সুকেত রাজ্যের রাজধানী সুন্দর নগরে পৌঁছে গেলাম। এই দেশীয় রাজ্যের লোকদের প্রাণপাত করা অর্থ রাজাদের শখের কাজে লাগত তাই প্রাসাদ ছিল, বাংলোও ছিল। এগুলি অন্য কোনো কাজে যদি লাগানো না হয় তাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই ভেঙে পড়বে। বাজার যথেষ্ট বড়। তার ভিতর দিয়ে গিয়ে বাসটিকে এক জায়গায় জলের ওপর দিয়ে যেতে হলো। রাত সওয়া আটটায় আমরা মান্ডীর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। মান্ডী আগে অনেকবার এসেছি কিন্তু দেশবিভাগের পর শরণার্থীদের যে দল এসেছে তারা বাজারের চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। কৃষ্ণা হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

মান্ডী—তরুণ শ্রীসুন্দরলালজীর সঙ্গে আগেই চিঠির মাধ্যমে আলাপ ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। ২০ এপ্রিল সকালে প্রথমে ডেপুটি কমিশনার শ্রীঅন্তানীজীর বাংলোয় গেলাম। সেটা ছিল শহরের বাইরের একটি খুবই রমণীয় স্থানে। ইংরেজ দেওয়ান এটা নিজের জন্য বানিয়েছিল বলে ফুল ও ফলের বাগান, রাস্তা, ভাল ঘর ছিল। অন্তানীজী সবরকম সাহায্য করার কথা বললেন। ঠিক হলো যে, সাড়ে দশটার সময় আমি নীচে অফিসে দেখা করব। সেখানে যাওয়ায় তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের মান্ডী জেলা সম্বন্ধে তথ্যাদি দিতে বললেন। ভারতে খনিজ লবণের খনি একমাত্র এখানেই আছে। আমরা চাইলাম সেই অফিস থেকে লবণের উৎপাদন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি জেনে নিই কিন্তু লবণ-বিভাগটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং তা অন্তানী সাহেবের নাগালের বাইরে। সেখানকার অ্যাসিস্টেন্ট ভদ্রলোক গুপ্ত রহস্যের সামান্যও জানাতে রাজি হলেন না, বললেন, 'এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখুন।'

দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ সুন্দরলালজী এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আবার বেরোলাম। আজ সকালের পরিদর্শনে শহরের ভেতরে ভূতনাথের মন্দিরে হরগৌরীর ভগ্নমূর্তি দেখে নিয়েছিলাম। এখন পুল দিয়ে ব্যাস নদীর পারে গেলাম। সেখানে পুরনো রাজধানী ছিল এবং এখন সে জায়গায় একটি গ্রাম আর আর বহু পরিত্যক্ত মন্দির রয়েছে। ত্রিলোকনাথের মন্দিরে সংবত তথা শকাব্দ ১৩৩৫-এর শিলালেখ লাগানো রয়েছে। লেখাটি বড়। মান্ডীর এই অংশটি যে হিন্দু-যুগের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সম্ভবত মুসলিম যুগের আগেই এটিকে লুণ্ঠন এবং ধ্বংস করা হয়েছিল। তারপর শতদ্রুর বামতীরে রাজধানী গড়া হয়েছিল। বাঁদিকেও নদীর তীরে যমরাজের মন্দিরের প্রাঙ্গনে কয়েকটি পুরনো শিবমন্দির রয়েছে, তার থেকে বোঝা যায় এদিকেও নগরের একটি অংশ প্রাচীন যুগে বর্তমান ছিল।

সন্ধে ছটায় সাহিত্যসদনে সাহিত্যিকদের ছোট একটি সভায় ভাষণ দিলাম। নটার সময়

চৌরাস্তায় জনসভাতে শান্তির বিষয়ে বলতে হলো। এতক্ষণে মাণ্ডীর শিক্ষিতরা আমার আসার খবর পেয়ে গিয়েছিল।

কুলু—২১ এপ্রিল চায়ের বদলে লস্যি খেয়ে হিমালয় সরকারের সাধারণ বাসে বসে পড়লাম। এতে সিট রিজার্ভের ব্যবস্থা ছিল না। যে আগে আসবে সে নিজের ইচ্ছেমতো সিটে বসে পড়বে। আমি ড্রাইভারের পাশে জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। সাতটার সময় গাড়ি ছাড়ল। কুলু চুয়াল্লিশ মাইল দূর ছিল। গাড়ি চলতে চলতে দেখলাম লাহুলের ঠাকুর নির্মল চন্দ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যাচ্ছেন। আমি ১৯৩৩ সালে তাঁকে দেখেছিলাম, যদিও ১৯৩৭ সালেও লাহুল গিয়েছিলাম কিন্তু তখন বোধহয় দেখা হয়নি। পরিচয় হলো। তিনি তাঁর বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। এখন কুলুতেও একজন অফিসারের সাহায্য পাওয়া নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় যাত্রা ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে গেল। ২৬ মাইল পর ওট এলো। এখানেই কুলু আর মাণ্ডীর সীমান্ত মিশেছিল। কুলুর কোনো যাত্রীই ওটের মিষ্টি বটুরাকে ভুলতে পারে না। এখানে কয়েকটি দোকান রয়েছে। দুই দিকের লরিগুলিকে এখানে থামতে হয় কেননা রাস্তা সরু বলে লরিগুলো একটা সময়ে একইদিকে যেতে পারে। ওট থেকে সামান্য এগিয়ে সিমলা থেকে অনী হয়ে আসা রাস্তা পেয়ে গেলাম। এখান থেকে বাঞ্জার ১১-১২ মাইল দূরে, যেখানে গাড়ি যায়। আমি ভুল ভেবেছিলাম যে, মাণ্ডী থেকে মোটরের রাস্তা বাঞ্জার হয়ে যাবে আর সেখানে ড· ভগবান সিংহর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে।

১৫-২০ মিনিট দাঁড়ানোর পরে আমাদের বাস ছাড়ল। বজৌরা এলো ন-মাইল পর। এখানে বিশ্বেশ্বরের ঐতিহাসিক প্রাচীন মন্দির আছে কিন্তু সেটা আমি পরের দিনে দেখার জন্য রেখে দিলাম। কুলুর ঢালপুর, সুলতানপুর, অখাড়া ইত্যাদি অনেক গ্রাম রয়েছে যা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠেছে। ঢালপুর আগে পড়ে। এখানেই স্কুল, হাসপাতাল, কাছারি আর ডাকবাংলো আছে। ঠাকুর নির্মলচন্দের জায়গাও ছিল এখানেই। কুলু উপত্যকা হিমালয়ের খুব সুন্দর উপত্যকাগুলির মধ্যে একটি। হিমালয়ের অনেক ভেতরের দিকে হওয়ায় চার হাজার ফুট উঁচু এই জায়গাতেও বরফ পড়ে। ব্যাস-এর এই উপত্যকার বৈশিষ্ট্য শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই নয়, উপরন্তু এখন তা আপেলের বাগানেও পরিণত হয়েছে। আগে পুরো হিমালয় সম্বন্ধে পড়াশুনো করিনি এবং লাহুল সম্বন্ধে শুধু এটুকুই জানতাম যে, ওখানে ওপরের লোকেরা তিব্বতী বলে আর নীচের লোকেরা বলে পাহাড়ী ভাষা। কিন্তু এখন বুঝেছিলাম যে তিব্বতী আর আর্যভাষাভাষী লোকদের মধ্যেও আগে এখানে কিরাত-লোকরা থাকত, যাদের ভাষার অবশেষ এখনো এখানে-সেখানে পাওয়া যায়। চন্দ্রা আর ভাগা লাহুলে যেখানে মিশে গিয়ে চন্দ্রভাগা হয়ে যায় তার থেকে অনেক নীচে অব্দি লাহুলবাসীরা কিরাত ভাষা বলে। ঠাকুর নির্মলচন্দ ভোটভাষী ছিলেন। কিন্তু ওখানে কয়েকজন কিরাতভাষী লাহুলের বাসিন্দাও পেয়ে গেলাম। তাদের কাছ থেকে ভাষার কয়েকটি নমুনা নিলাম। কুলুর সবচেয়ে বড় অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর সঙ্গে আমার গ্রন্থ এবং তথ্যাদি সম্বন্ধে কথা বললাম। তিনিও সাহায্য করলেন। ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ইনচার্জ আরও বেশি সাহায্য করলেন এবং অনেক খবরাখবর এবং ছাপা তথ্য সেই দিনই পেয়ে গেলাম। কিছু পরের দিন পাওয়ার আশ্বাস

পেলাম।

হাঁটতে হাঁটতে নদী (গৌরী) পেরিয়ে সুলতানপুর পেলাম। কুলু রাজার প্রাসাদ ছিল এখানেই। অনেক শতাব্দী ধরে হিমালয়ের এই রাজবংশটি স্বাধীনভাবে এখানকার শাসক হয়ে থেকেছে। শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল, তাই তারা রাজ্যটি শেষ করে দিল। ইংরেজরা যখন শিখদের রাজ্য নিজের হাতে নিল তখন তাদের কি দায় পড়েছিল যে রাজাকে আবার তার গদিতে বসাতে যাবে? তারা তাঁকে একটি জায়গীর দিয়ে দিল। কিন্তু কুলুর লোকেরা তাদের রাজাকে রাজা বলেই মনে করতে লাগল। ইংরেজ তাঁকে যতই রায় ভগবান সিংহ বলুক, লোক কিন্তু তাঁকে রাজা ভগবান সিংহ বলত আর তাঁর কুমারকে টীকা (যুবরাজ) বলে ডাকত। টীকা সাহেবের বিয়ে হয়েছে নেপালের জেনারেল কেশর শমশেরের অনুজ কৃষ্ণ শমশেরের মেয়ের সঙ্গে। রাজা সাহেব নিজের বংশ সম্বন্ধে উর্দুতে লেখা একটি ঐতিহাসিক বই দেখালেন। ওখান থেকে কুলুর তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় বাজার অখাড়া বাজারে গেলাম। আগে তা এত জমজমাট ছিল না, এখন তো সেখানে বহু দোকানদানি হয়ে গিয়েছিল।

মানালি—২২ এপ্রিল আবহাওয়া ভাল ছিল। আমরা সাতটার সময় চা খেয়ে ট্যাক্সি—বাসে রওনা হলাম। ১২ মাইল গিয়ে কটরাই পেলাম। সেখান থেকে বিপাশা পার হয়ে আমরা কভী নগরে রোইরিক নিবাসে গেলাম। এখন সেটা খালি পড়েছিল, তা নইলে সেই সঙ্গে নগরের প্রাচীন স্থানগুলিও দেখে নিতাম। আগে কটরাইতে দু-দিকের গাড়ি একে অন্যকে পার করে দিত। এখন সে-রকম কোনো নিয়ম নেই। ড্রাইভার নিজের সময় দেখেই গাড়ি ছেড়ে দেয়। আরও ১২ মাইল এগিয়ে এগারোটার সময় মানালি পৌছলাম। সেই বাসটিই বারোটার সময় ফেরার ছিল। দেড় মাইল পরে বশিষ্ঠ কুন্ডের গরম জলের প্রস্রবণ ছিল। তার প্রাচীনতা সম্পর্কে লোকে অনেক কথা জানিয়েছিল। ড্রাইভার বলল, 'আপনারা সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারেন।' আমরা ওখান থেকে হাঁটা দিলাম। জায়গাটা মাইল দেড়েক দূরে ছিল। আমরা আধ ঘণ্টারও কম সময়ে সেখানে পৌছে গেলাম। কিছুদূর অব্দি তো লাহুল যাওয়ার সমতল রাস্তা ধরে গেলাম তারপর ডানদিকে উঠে খেতের মধ্যে দিয়ে বশিষ্ঠ কুন্ডে পৌছলাম। বেশ ভাল গ্রাম। সাত হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু হওয়ায় তুষারাচ্ছন্ন জায়গায় অবস্থিত। এখানে কাছেই দেবদারু জঙ্গলও আছে। যব-গমের সবুজ সবুজ খেত হাওয়ায় দুলছিল যার মধ্যে স্থানে স্থানে স্থলপদ্ম ফুটে রয়েছিল। কুণ্ডের জল খুব গরম নয়। তার পাশেই বশিষ্ঠের পাথরের স্থূল মূর্তি। সেখান থেকে কিছুটা সরে সুন্দর চূড়াওলা রামের মন্দির। এখানকার স্ত্রী-পুরুষরা বেশি ফর্সা। খশদের শুদ্ধ নমুনা এদের মধ্যে পাওয়া যেত। এখানের পোশাক ছিল সেই উলের ডোরা যা চম্বা থেকে চোমো (চুম্বী) উপত্যকা পর্যন্ত দেখা যায়। মাথায় রুমাল বাঁধাটাও পাহাড়ী মেয়েদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। দোকানে মিছরি আর নারকেল পাওয়া গেল। আমরা তা খেয়ে ওখান থেকে ফিরলাম। মানালিতে বাসস্ট্যান্ডে পৌছনোর পরও হাতে সময় ছিল। আমরা মাংসভাত খেয়ে সাড়ে বারোটায় গাড়ি করে ফিরলাম। মানালি হচ্ছে কুলুর সবচেয়ে রমণীয় স্থান। এখানে চারদিকে আপেলের বাগান। পাহাড়ে দেবদারুর বন। কটরাই পৌছানোর পর একবার মনে হলো নগরে চলে যাই। পরে সে-চিন্তা ছাড়তে হলো।

অখাড়া বাজারেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। হঠাৎ পুণ্যসাগরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এখানে স্পিতীতে তিনি ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। শীতে ওখান থেকে চলে এসেছিলেন। এখন আবার নিজের কাজে যেতে চাইছিলেন। জোতের ওপর এখন খুব বরফ ছিল। রাস্তা খোলা ছিল না বলে স্পিতীর লোকদের আসার প্রতীক্ষা করছিলেন। কুলু মহিলাদের শালের জন্য প্রসিদ্ধ। খাঁটি পশমের শাল ৫০ টাকার কমে পাওয়া যেত না। আমি উপহার দেওয়ার জন্য ২৪ টাকায় একটি উলের চাদর নিয়ে নিলাম। আজই আমাদের বিজৌরা ঘুরে আসার কথা। ড্রাইভার তুলে নিল কিন্তু ঢালপুর অব্দি গিয়েই যন্ত্রাংশ ভেঙে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে নামিয়ে দিল। প্রাইভেট বাসে যাত্রীদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। হিমাচল প্রদেশ সরকার নিজের জায়গায় সরকারি বাস চালু করেছে কিন্তু কুলু পাঞ্জাব সরকারের, এজন্য এটি প্রাইভেট বাসের রাজ্য। পাহাড়ী লোকেরা পাঞ্জাবীদের ওপর কেন চটবে না? তারা দেখছে যে রোজগারের সমস্ত উপায় তারা নিজেদের হাতে রেখেছে। রাস্তার বড় বড় ঠিকাদারীর কাজ পাঞ্জাবীরা করে। বড় বড় অফিসার পাঞ্জাবী, দোকান আর ব্যবসাও তাদেরই হাতে, গাড়িও তারাই চালায়। তার মানে তো পাহাড়ীরা শুধু কুলিগিরি করার জন্য জন্মেছে।

দু-ঘণ্টা সময় নষ্ট হলো। তারপর বিজৌরার জন্য অন্য একটি বাস পেয়ে গেলাম। আমরা সাড়ে তিনটেয় বেরিয়ে সওয়া চারটের সময় ওখানে পৌঁছে গেলাম। রাস্তা থেকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। মুসলমান যুগে তার মূর্তিগুলো ভাঙা হয়েছিল কিন্তু গ্রামবাসী এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগকেও ধন্যবাদ দেওয়া দরকার যে অনেক মূর্তি এখনো এখানে রয়েছে। পাশেই হচ্ছে হাট গ্রাম, বস্তুত মন্দিরও তার সঙ্গেই জড়িত। কুমায়ুন-গাড়োয়ালের উদাহরণ থেকে আমি জানতাম যে, পাহাড়ে হাটের অর্থ রাজধানী। জানা গেল, আগে এখানে কোনো রাজা থাকতেন, তিনিই এই মন্দির বানিয়েছিলেন। শিখরা মন্দির ধ্বংস করেছিল এটাই সাধারণ ধারণা। কিন্তু সেটা বিশ্বাস করা যায় না কেননা শিখরা তো তখনো অকালী হয়নি এবং তাদের ধর্মশালায় মূর্তিও ছিল। তাছাড়া সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে শিখ আর হিন্দু হচ্ছে এক, সেজন্য মূর্তিতে তারা কেন হাত দেবে? মন্দিরের তিন দিকে আলাদা আলাদা গণেশ, বিষ্ণু আর দুর্গার মূর্তি আছে। অনেক লকুলীশ লিঙ্গ প্রমাণ দিচ্ছিল যে কোনো সময়ে এখানে পাশুপতদের প্রতাপ ছিল। মন্দিরের বাইরেও কিছু মূর্তি রাখা ছিল। সেখান থেকে দুরে বিপাশার দিকে খেতের মধ্যেও অনেক ভগ্নমূর্তি পড়েছিল। হিমাচল-প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিশেষ বিবরণ 'হিমাচল প্রদেশ'-এ পাওয়া যাবে এজন্য এখানে সে সম্বন্ধে বেশি লেখার দরকার নেই।

যাওয়ার সময় তো বিজৌরা চলে গিয়েছি কিন্তু এখন ফেরাটা ছিল সমস্যা। মাণ্ডী থেকে বাস বিশেষ বিশেষ সময়ে আসত তবে তাতে জায়গা পাওয়া যাবে কিনা কোনো ঠিক ছিল না। কে জানে হয়তো এখানেই রাত কাটাতে হবে। সাড়ে পাঁচটার বাসে জায়গা পেয়ে গেলাম। তাতে পঙ্গী অঞ্চলের সিয়ার মঠের সিদ্ধ লামাকে তাঁর পরিবার আর শিষ্যদের সঙ্গে পেলাম। আমাকে তিব্বতী ভাষায় কথা বলতে দেখে লামার পুত্র জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনি রাহুলজী নন তো?' আমরা সামনের গ্রাম অব্দিই একসঙ্গে যাব এজন্য দ্রুত কিছু কথা বলে নিলাম। তাঁরা খালসার থেকে তীর্থ করে আসছিলেন। সিদ্ধ ছিলেন অমদোর বাসিন্দা। ঘুরতে ঘুরতে পঙ্গীর ভোটভাষী এলাকায় এসে পড়েছিলেন। সিদ্ধ হওয়ায় মহামুদ্রা থাকাটা আবশ্যিক। পুত্র আর স্ত্রীও তারপর

এসে উপস্থিত হলো। গোটা পরিবারটি ছিল সংস্কৃতিবান। দুঃখ থাকল যে আমরা বেশিক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারলাম না। তাঁরা পঙ্গীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমাদের চম্বাও যাওয়ার ছিল, কিন্তু পঙ্গী যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

মাণ্ডী—২৩ এপ্রিল পুণ্যসাগর আর ঠাকুর মঙ্গলচন্দজী বাসস্ট্যান্ড অব্দি পৌঁছে দিতে এলেন। সাধারণ বাসে জায়গা পাওয়ার জন্য দুজন লোক অখাড়া বাজার থেকেই বসে এসেছিল। এবার আমাদের পিছনের সিট মিলেছিল যার ফলে বাইরেটা দেখার সুবিধে ছিল না। নটায় ওট পৌঁছলাম। ড· ভগবান সিংহ আমার আসার খবর জানতেন। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই তিনি কুলু যাচ্ছিলেন। আমি লিখেছিলাম যে, আমি বঞ্জার আসব। কিন্তু এখন বঞ্জারকে দূর থেকে নমস্কার করে চলে যেতে চাইছিলাম। ঘটনাচক্রে এই সময় ডাক্তার সাহেবও এসে গেলেন। তার চেয়েও আমার বেশি খারাপ লাগছিল বঞ্জার না যাওয়ার জন্য। তাঁর মেয়ে প্রেমলতা বেচারা ওখানে খুব আশা করে বসেছিল। ড· ভগবান সিংহ বঞ্জার থেকে এগিয়ে সিমলার রাস্তায় অনীতে বাড়ি ও জমি করে নিয়েছেন। তাঁকে এ বছর ডিসেম্বরেই চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে। বলছিলেন, 'অনীতে থাকা আমার পক্ষে মুশকিল কেননা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কুলুতেই সে-সুবিধে বেশি।' ওখান থেকে তিনি প্র্যাকটিসও করতেন আর সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরায় থাকায় কুলুতে একটি বৌদ্ধবিহার স্থাপনের জন্যও কিছু কাজ করতে পারতেন। মাত্র কয়েক মিনিট কথাবার্তা বলতে পারলাম। আফসোস থাকল কিন্তু দেখা হয়ে যাওয়ায় খুব খুশি হলাম।

সওয়া নটায় বাস ছাড়ল। বিপাশার সঙ্গে সঙ্গে তা চলছিল। এখানে এক জায়গায় বিশাল পাহাড় কাটতে বিপাশার বোধহয় কয়েক লক্ষ বছর সময় লেগেছে। নদী সেখানে সরু হয়ে গিয়েছিল আর পথও বানানো গিয়েছিল খুব কষ্টে। এক জায়গায় শ্লেট পাথরের খনি ছিল। সেখান থেকে সেগুলো বের করে লরিতে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো। মাণ্ডী থেকে যাওয়ার সময়ই আমরা বলে গিয়েছিলাম যে দুপুরের বাসে আসব। এগারোটার সময় যখন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম তখন শ্রীহুতাশন শাস্ত্রী, সুন্দরলাল এবং অন্যান্য বন্ধুদের সেখানে পেলাম। আগের বার তাঁরা হোটেল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক করে বলছিলেন, কিন্তু আমরা ফেরার সময়ের কথা বলে মুক্তি পেয়েছিলাম। এখন মাস্টার জয়বর্ধনের বাড়িতে গেলাম। এখানেই খাওয়ানোরও ইচ্ছে ছিল। আমরা তা মানলাম না কেননা তা বানাতে দেরি হয়ে যেত এবং এই সময়ে হোটেলের তৈরি খাবার খেয়ে আমরা আমাদের কাজে লেগে পড়তে পারতাম। অন্তানী সাহেবের কাছে সবকিছু জিনিস তৈরি অবস্থায় পেলাম। লবণ সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারও সাহায্য করলেন।

ডাকে কমলার দুটি চিঠি পেলাম। জয়ার পায়খানা বন্ধ হচ্ছে না, সে দুর্বল হয়ে গেছে—এটি পড়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে মন চাইছিল কিন্তু চম্বা অব্দি যাওয়াটা দরকার ছিল। কমলা বি এ পরীক্ষা ভাল দিয়েছে। এটাও চিঠি থেকে জানতে পারলাম।

কাংড়া—২৪ তারিখ সকালে হুতাশন শর্মা শাস্ত্রীর শ্বশুরবাড়িতে খাওয়ার ছিল। নামটি বোধহয়

শাস্ত্রীজী নিজেই রেখেছিলেন। হুতাশন কেন, অগ্নি নামও আজকাল শোনা যায় না। তিনি দ্রুত মাণ্ডীর খাবার তৈরি করিয়ে ছিলেন। সাড়ে সাতটায় আমাদের বাসস্ট্যান্ডে পৌছনোর ছিল, এজন্য নিশ্চিন্তে কোনো কাজ হওয়া সম্ভব ছিল না। স্ট্যান্ডে বন্ধুরা পৌছতে এলেন। ড্রাইভারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ২৫ বছরের এই সুন্দর তরুণ তবলা বাজানোর ব্যাপারে অদ্বিতীয়। দেশীয় রাজ্য থাকলে তাকে মোটরের স্টিয়ারিং ধরতে হতো না, যে সরু সরু আঙুলগুলি শিল্পে তাদের দক্ষতা দেখাতে পারত তা গাড়ি চালানোর কাজে লেগেছিল। তরুণের সুন্দর চেহারাটি খুব সৌম্য ছিল। আমাদের সঙ্গে খনির ইঞ্জিনিয়ারও যাচ্ছিলেন। লবণের খনি পথেই ছিল। গত বছর দেড় লাখ টাকার লবণ বেরিয়েছিল। এখানে খাদ্য লবণ ছাড়া কালো লবণও পাওয়া যায়। লবণের তো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। এখন তাতে সামান্যই কাজ হচ্ছে।

বারোটার সময় বৈজনাথে নেমে গেলাম। জায়গাটি এক হাজার ফুটের চেয়ে হয়তো সামান্য বেশি উঁচু, তাহলে আর গরম হয়রান করবে না কেন? বৈজনাথ কোনো সময়ে কিরগ্রাম নামে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক নগর ছিল। মাঝে তা প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। গাড়িগুলি আবার তাকে জনবহুল করে তুলেছে। অনেক দোকান রয়েছে। একটি ভোজনালয়ে মালপত্র রেখে খাবার খেলাম, তারপর সেখানকার ঐতিহাসিক মন্দির দেখতে গেলাম। চূড়াওলা মন্দির পাহাড়ে কমই থাকে। এটি হিমালয়ের প্রাচীন এবং অতি সুন্দর মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। মন্দিরের চাতালে একাদশ শতাব্দীর দুটি শিলালেখ লাগানো রয়েছে যা থেকে জানা যায় যে এখানে বৈদ্যনাথ শংকরের মূর্তি ছিল। অনেক ভগ্নমূর্তি আছে। ভ্রষ্ট হওয়ার পর বহু বছর ধরে মন্দির শূন্য পড়ে ছিল। তারপর এক সাধু সেখানে ডেরা বাঁধলেন। আবার পুজো শুরু করলেন। ভূমিকম্পের দরুন ধ্বংস হওয়া মন্দিরের মেরামতও করালেন। মূর্তিগুলির মধ্যে একটি তীর্থংকরের মূর্তিও ছিল। তার থেকে জানা গেল যে, এখানে জৈনরাও ছিল। একটি বৃক্ষধারী সূর্য আর সন্দিগ্ধ বুদ্ধমূর্তিও দেখলাম। এখানে সর্বধর্ম সমাগম হয়েছিল। কিরগ্রাম লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামও ধ্বংস হয়ে গেল। লোকে শংকরের নামেই এই জায়য়াটিকে বৈদ্যনাথ বলতে শুরু করল। নীচে বিম্নু নদী বইছিল। দুপুরের সেই প্রখর রোদেও স্থানটি রমণীয় মনে হচ্ছিল। সকাল-সন্ধে আর বর্ষায় এই জায়গাটিকে সৌন্দর্যের খনি মনে হতো।

দুটোর সময় আমরা মলাঁ (মলানী শহর)-এর উদ্দেশে বাসে করে রওনা হলাম। নামে শহর হলেও দোকান ছিল মাত্র তিন-চারটে। আমাদের পটিয়ার-এ হিমালয়ের সবচেয়ে পুরনো শিলালেখ দেখতে যাওয়ার ছিল। মালপত্র দোকানদারের কাছে রেখে দিলাম আর জনকলালজীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। এই উপত্যকাটি খুব চওড়া, কখনো কখনো তো দেশ বলে ভ্রম হয়ে যায়। পটিয়ার বেশ বড় গ্রাম। সাতশো ঘর আর বহু টোল রয়েছে। একশো রাঠী, চারশো ঘির্থ চৌধুরী, কুড়িটি ব্রাহ্মণ আর একশো হরিজন পরিবার থাকে। লোকেরা পটিয়ারের রাস্তা তো ধরিয়ে দিল কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী শিলালেখ কোথায় আছে তা কেউ জানত না। আমরা আড়াই মাইল অব্দি সেই কাঁচা রাস্তাতেই চলে গেলাম। কয়েকটি দোকান পাওয়া গেল। লোকে জানাল এখান থেকে আধ মাইল দূরে খেতের মধ্যে সেই চাটানটি রয়েছে। এদিক-সেদিক করে খুঁজে খুঁজে খেত আর ঘর পেরিয়ে সেই জায়গায় পৌছলাম, যেখানে কখনো রাঠী বাকুলের পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীর এখন নামগন্ধ নেই। এই অঞ্চলে জায়গায়

জায়গায় মাটি থেকে শিলা বেরিয়ে রয়েছে দেখা যায়, তারই মধ্যে একটির ওপর ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীতে লেখা ছিল—'বাকুলস পুকরিণি'। অভিলেখের রঠ্ঠী শব্দটি এখনো এখানকার কয়েকশো রাঠী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। সেই সময় রাষ্ট্রিক কোনো সরকারি পদ ছিল। সামন্ত বাকুল সম্ভবত এখানে ভাল ও বিশাল পুষ্করিণী বানিয়েছিলেন।

ওখান থেকে ফিরলাম আর সাড়ে পাঁচটায় মর্লা পৌঁছে গেলাম। অনেক গাড়ি কাংড়া যাচ্ছিল কিন্তু জানা গেল যে, আমরা জায়গা পাব না। নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম, সেই সময় একটি বাস এলো যাতে আমাদের নিয়ে সাতটার সময় পুরনো কাংড়ায় পৌঁছে দিল। স্ট্যান্ডের কাছেই একটি হোটেলে এক টাকায় একটি ঘর নিলাম। পুরনো কাংড়া আগে নগরকোট বা ভবান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার ভবানী ছিলেন ভারতের প্রতাপশালিনী দেবীদের একজন, গজনীর মামুদ এখান থেকে প্রচুর সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯০৪-এর ভূমিকম্প কাংড়ায় এমন ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল যে ইটের গায়ে ইট ছিল না। ব্রজেশ্বরী ভবানীর মন্দির ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভক্তরা মন্দির আবার তৈরি করে দিল। আমাদের কাছে প্রাচীন মন্দির আর ভাঙা-চোরা মূর্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সে সব কোথাও দেখতে পেলাম না। এখন একটু সময় ছিল তাই আমরা গিয়ে মন্দির দেখে এলাম। শহরটি কেমন শ্রীহীন মনে হচ্ছিল। বাজারটি বেশ লম্বা-চওড়া। ফিরে এসে নিজেদের ঘরে গেলাম। নাগদেবতা দর্শন দিলেন। জনকলালজী ভয় পেলেন। আমি বললাম, 'নাগদেবতা দর্শন দেওয়ার জন্যই ছিলেন। এখন তিনি তাঁর কাজ করে ফেলেছেন। তাই ভয় পাওয়ার দরকার নেই।' তবু দরজার যেখানে তিনি ঢুকে গেলেন সেখান থেকে সরিয়ে আমরা আমাদের খাটটি পাতলাম এবং রাতে নির্বিঘ্নে ঘুমোলাম।

পুরনো কাংড়া কখনো হয়তো গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল কিন্তু যে কেল্লার নামে কাংড়া প্রসিদ্ধ তা এখান থেকে এক মাইল দূরে দুর্গম পাহাড়ের ওপর বানানো হয়েছে। আজ যদিও মাঝে জনবসতি নেই কিন্তু রাজা সংসারচন্দের সময় (১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ) নগরটি ভবান থেকে কেল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা ওপরের পথ ধরে কেল্লার দিকে চললাম। পথে আমের বাগান পেলাম। হ্যাঁ, ভাল জাতের আম বোধ হয় এগুলো ছিল না। কেল্লার দরজার চাবি নিয়ে চৌকিদার এল। আমরা ফটকের ভেতর ঢুকলাম। ভূমিকম্প এই কেল্লারও খুব দুর্দশা করেছিল, তবু পুরাতত্ত্ব বিভাগ অবশিষ্ট জিনিসগুলি সুরক্ষিত করে রাখার চেষ্টা করেছে। ভূমিকম্পের আগেই পুরাতত্ত্ব বিভাগ এর সম্বন্ধে অনেক ফটো আর লিখিত তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছিল। এটা ভাল করেছিল। মুসলমান যুগের আগেকার মাত্র এক-আধটা জিনিস এখানে আছে। কেল্লার বাইরে রয়েছে স্নানাগার, যা সম্ভবত মুঘল আমলের অবদান। এখানে মুঘল রাজ্যপাল আর তাঁর বেগমদের স্নানের জন্য গরম জল (হাওয়াই)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেল্লার মধ্যে মসজিদও আছে এক জৈন তীর্থংকরের মূর্তির ওপর অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখও রয়েছে। জানা যায় শেঠ মুঘল রাজ্যপালের খাজাঞ্চি ছিল। কাংড়ার কেল্লা মুসলমান আর গোর্খাদেরই শুধু বিপদে ফেলেনি, এর ইতিহাস আরো পুরনো। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে এই পাহাড়গুলোতে কির (কিরাত) লোকেরা থাকত, যাদের নামে বৈদ্যনাথ একাদশ শতাব্দীতেও কিরগ্রাম নামে বিখ্যাত ছিল। কির লোকেরা আর্যদের কাছে ছিল দস্যু ও শত্রু। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমতলের প্রাক-দ্রাবিড় জাতিকে জয় করে আর্যরা সপ্তসিন্ধু (পাঞ্জাব)-তে গেড়ে বসল। তিনশো বছরে

তাদের বিস্তৃতি যমুনার তীর পর্যন্ত পৌছে গেল। অর্ধ-পশুপালক অর্ধ-কৃষক আর্যদের তৃষ্ণা তাতে নিবৃত্ত হলো না এবং তারা পাহাড়ের চারণক্ষেত্রের দিকে এগোল। সে-সময় (খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে) পাহাড়ী কিরদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হলো। পাহাড়ীদের প্রতাপশালী নেতা শম্বর তার এক আঙুল জমিও শেতাঙ্গদের দিতে রাজি ছিল না। তার একশোটি পাথরের গড় (কেল্লা) ছিল। ৪০ বছর ধরে শম্বরের নেতৃত্বে কিররা আর্যদের মজা টের পাইয়ে দিয়েছিল। দিবোদাস আর তার পুরোহিত (প্রধানমন্ত্রী) ভরদ্বাজের বুদ্ধি লোপ পেল। তখন তারা শম্বরকে মারতে এবং কাংড়া উপত্যকা অধিকার করতে সক্ষম হলো। এই কেল্লাটি শম্বরের সময়কার একশোটি দুর্গের মধ্যে একটি অজেয় দুর্গ ছিল। সময় পেরিয়ে গেছে—শম্বরকে এখন অমানুষ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকে তার নামও ভুলে গেছে এবং শম্বরকে জলন্ধর নামে ডাকতে শুরু করেছে। জলন্ধরকে মেরেছেন যিনি তাঁকে ভবানের দেবী বলা হয় অর্থাৎ শম্বরের সঙ্গে দিবোদাসের নামও ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিবোদাসের পুরোহিত এই জয়ের কৃতিত্ব তাঁর মহান দেবতা ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন।

ইংরেজরা শিখ রাজ্যের সঙ্গে এই পাহাড়ী ভূমিও নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। প্রথমে তারা কাঁংড়াকেই জেলার মুখ্য স্থান হিসেবে রাখল কিন্তু পরে ধর্মশালার মতো ঠাণ্ডা জায়গা পাওয়া গেল, সেজন্য তারা সেখানেই থাকতে লাগল। পাকিস্তান হওয়ার আগে কাঁংড়ার এই অংশে পঞ্চাশটির বেশি মুসলমান পরিবার থাকত। এখানেও খুনোখুনি হলো এবং যারা রক্ষা পেল তারা পাকিস্তান চলে গেল। কাঁংড়ার এই অংশটি হয়তো খালি হয়ে যেত নষ্ট হয়ে কিন্তু শরণার্থীরা এসে ঘর পূর্ণ করে তুলল। তবে সন্দেহ আছে যে, তারা এখানে জীবিকা অর্জন করতে পারবে কি না। যদি না পারে তাহলে ঘর আর কি করে মানুষকে বাঁধবে?

আমরা এমন সময়ে ব্রজেশ্বরীর মন্দিরে গেলাম যখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আজ সেখানে গিয়ে ফটো তুললাম। আজই জ্বালামুখী যাওয়া স্থির হলো।

জ্বালামুখী—খাওয়া-দাওয়া করে সাড়ে এগারোটার গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম। জ্বালামুখী এখান থেকে ২৪ মাইল। জ্বালামুখী রোডের কাছে পর্যন্ত রাস্তা ভাল ছিল। তারপর পাহাড়ী কাঁচা রাস্তা এল। একটার সময় আমরা জ্বালামুখী পৌছে গেলাম। এপ্রিলের শেষের দিকের মধ্যাহ্ন, তার সঙ্গে জ্বালামুখী নামও মিলে গেছে। সেখানকার রোদ অসহ্য মনে হতো। জিনিসপত্র আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই নি কেননা কাঁংড়ায় ফিরে আসার ছিল। স্ট্যান্ড থেকে মায়ের থানের দিকে এগোলাম। আঁকাবাঁকা গলি আর তার দুদিকেই দোকান ছিল। শেষপ্রান্তে নৈবেদ্যর দোকান বেশি ছিল। বোঝা যায় ভূমিকম্প এখানে তার প্রতাপ দেখায় নি। আসলে, আশ্চর্য দেবী যে এখানে উপস্থিত! ফটকের ভেতরে গেলাম। তারপর অগ্নিদেবীর মন্দিরে ঢুকলাম। পূজারী জানালেন, সোনার ছত্র মহারাজ রণজিৎ সিংহ অর্ঘ দিয়েছিলেন। ভেতরের দেয়ালে তিনটে আর বাইরের কুণ্ডে দুটি দীপ শিখা জ্বলছিল। এত ক্ষীণ যে ফুঁ দিলেই নিভে যেত আর গ্যাসের গন্ধ বেরোত। মন্দিরের ভেতর এত ধূপ জ্বালানো হয় যে তাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের গন্ধ চাপা পড়ে যায়। এর চেয়ে কত বড়। অগ্নিশিক্ষা আমি বাকুতে বেরোতে দেখেছিলাম। যদিও ওখানকার অগ্নিদেবীর বড় শিখাটি, প্রথমবার ১৯৩৫-এ আমি সেখানে পৌছনোর দশ-বারো বছর আগেই

নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে নিঃসন্দেহে সেই অগ্নিশিখা এর চেয়ে অনেক বড় ছিল। আমি আমার দ্বিতীয় বার রাশিয়া যাত্রায় ট্রেন থেকে কি প্রচণ্ড আগুন বেরোতে দেখেছিলাম যার কাছে এই শিখাগুলি নগন্য। যাকগে, এখন বাকুর অগ্নিদেবীর নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটেছে। আমাদের কাছে তো এই অগ্নিদেবীই রয়ে গেছেন। কোনো এক সময় জ্বালামুখী সন্ন্যাসী-আখড়ার খুব বড় কেন্দ্র ছিল। এটি ভারতের বেশ ভাল ব্যবসার জায়গা ছিল। শুধু দেশের মধ্যেই নয় নেপাল, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত আর চীন পর্যন্ত ব্যবসা করত। এখন তাদের বাড়িগুলি ছিল ভগ্নপ্রায়, পরিত্যক্ত ও বিষণ্ণ। স্ট্যান্ডে ফিরে এলাম। মাত্র কয়েক মিনিট আগে যদি আসতাম তাহলে কাঁংড়ার গাড়ি ঠিকঠাক পেয়ে যেতাম। কাছেই ভাল একটি ধর্মশালা তৈরি হয়েছিল। সেখানেই দু-ঘন্টার ওপর নিরাশ হয়ে প্রতীক্ষা করতে হলো। তারপর একটি বাস জ্বালামুখী রোড স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজি হলো। সেখানে গিয়ে পাঠানকোট থেকে ধর্মশালা যাওয়ার অন্য বাস পাওয়া গেল। কাঁংড়ায় বাসস্ট্যান্ডের কাছেই আমাদের জিনিসপত্র ছিল তাই সেগুলি নিয়ে আমরা সেই দিনই সওয়া সাতটার সময় ধর্মশালা পৌঁছে গেলাম। এই জায়গাটি মুসৌরী আর সিমলার মতো ঠাণ্ডা। উপরন্তু এখানে তার চেয়েও বেশি বরফ পড়ে। মুসৌরী ও সিমলার দিকে যেখানে একটিই শৈলশ্রেণী রয়েছে সে-জায়গায় এদিকে তিন-তিনটে শ্রেণী আছে যার মধ্যে সবচেয়ে দক্ষিণের শ্রেণীটি ধর্মশালার কাছে পড়ে। আমরা সেদিন গিয়ে হিন্দু হোটেলে উঠলাম।

ধর্মশালা—২৬ এপ্রিল দিনটি ছিল ধর্মশালার জন্য। কাঁংড়া জেলার সরকারি দপ্তর এখানেই। কাঁংড়া যদিও পাঞ্জাবের মধ্যে কিন্তু আসলে তা হিমাচল প্রদেশেরই অঙ্গ। কুলুকে নিয়ে এই একটি জেলায় জনসংখ্যা গোটা হিমাচল প্রদেশের সমান। সেদিন চা খেয়ে জনকলালজীর সঙ্গে বাইরে বেরোলাম। ভাবলাম ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে অফিসের চেয়ে বাংলোতে দেখা করাটাই ভাল হবে। আটটার সময় পৌঁছলাম। কার্ড পাঠালাম। সাহেব বাহাদুর হুকুম দিলেন, 'দশটার সময় এসো।' কার্ডের আগে আমি চিঠিও লিখেছিলাম এবং তাতে আসার উদ্দেশ্যও জানিয়েছিলাম। আমি ভাবলাম—যাক, এই দু-ঘন্টায় ধর্মশালার ওপরের সীমা অব্দি দেখে আসি।

সাড়ে ছ-আনা দিয়ে আমরা ওপরে যাওয়ার বাসে বসে পড়লাম। বাসটি ম্যাকলৌডগঞ্জ পর্যন্ত যেত। এখানেই ধর্মশালার সেনা-ছাউনি। এখানে গোর্খা সেনা রাখা হয়। ঠাণ্ডা এলাকায় ইংরেজরা গোরা ও গোর্খাদের জন্য ছাউনি বানিয়েছিল। সেখান থেকে আমরা মাইলখানেক দূরে অবস্থিত ভাকসুকুণ্ড গেলাম। এঁটা ধর্মশালার তীর্থ। বস্তুত ভাকসুকুণ্ডের দর্শনার্থীদের জন্যই কেউ ধর্মশালা বানিয়ে দিয়েছিলেন যার নামে এই শহরটির এই নাম হয়ে গিয়েছিল। ভাকসুকুণ্ডের মোহান্ত হচ্ছেন রামদয়াল গিরি বৈদ্যভূষণ। শিক্ষিত বলে তিনি সারা দুনিয়ার খবর রাখেন। রাহুলের কোনো বই তিনি পড়েছিলেন কিনা তা বলা মুশকিল। তিনি ব্যবহার করলেন পরিচিতের মতোই। এখানে পাহাড়ের ভেতর থেকে এসে একটি বড় জলধারা কুণ্ডে পড়েছে। এই জল নলের মাধ্যমে ধর্মশালার সব জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ভাকসুনাথ যে খুব পরোপকারী তা আমরা তার জল বিতরণ থেকে প্রত্যক্ষ করছি। গিরিজী তাঁর যে জীবনী শোনালেন তাতে আমরা আরও প্রভাবিত হলাম। ভাকসু আর পাহাড় সিংহ দু-ভাই

বিকানির-যোধপুরের দিকের বাসিন্দা ছিলেন। বড় ভাই পাহাড় সিংহ রাজা ছিলেন আর ছোট ভাই কুমার। এখানে জলের কষ্ট দেখে তাঁদের খুব দুঃখ হলো। তাঁরা মানুষকে উদ্ধার করার কাজে নেমে পড়লেন। জানতে পারলেন উত্তরাখণ্ডে একটি পাহাড়ের নামই জলন্ধর যেখানে প্রচুর জল আছে। দুভাই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এখান থেকে দেড় মাইল গিয়ে রাস্তার ওপর নাগডল মহাসরোবরের খোঁজ পাওয়া গেল। কেউ জানাল, জল তো আছে কিন্তু হাজার হাজার নাগ তা আগলে রেখেছে। বড় ভাই বিপদের সম্মুখীন হতে রাজি ছিলেন না। তিনি অজুহাত দেখালেন—'কাছের পাহাড়ে তপস্যা করার খুব ভাল জায়গা আছে। আমি তো সেখানে ভজন করব। ছোট ভাই একাই সেখানে যাওয়া স্থির করল। কেউ কোনো উপায় বলে দেওয়াতে সে নাগদের ঘুম পাড়াতে সফল হলো এবং হ্রদের অর্ধেক জল চুরি করে পালাল। কুণ্ডের স্থানে পৌঁছতে পৌঁছতে সরোবরের রাজা নাগও পিছু ধরে এল। সে ভাকসুকে দংশন করল। ভাকসু শেষকালে শিবজী মহারাজের নাম স্মরণ করল। শিব তৎক্ষণাৎ পার্বতীর সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন। শিবজী মহারাজ ভাকসুর সাহস দেখে খুব প্রসন্ন হলেন এবং বললেন, 'দুটি বরের মধ্যে একটি চেয়ে নাও—জল অথবা জীবন।' সেই মহাপ্রাণ বললেন, 'আমি প্রাণ চাই না। লোকে জল পাক, এই আমি চাই।' শংকরজী বললেন, 'এবমস্তু' এবং সেই সঙ্গে তাঁকে নিজের রূপ দিয়ে সেখানেই বসিয়ে দিলেন। ভাকসু শংকর পাশের মন্দিরে বিরাজ করছেন।

এই স্থানের সঙ্গে অন্য একটি গল্পও যুক্ত রয়েছে। বাবা উমেদগিরি এখানে এসে তপস্যা করছিলেন। রাজা ধর্মানন্দ শিকার করতে এখানে এলেন। বিনতি করলেন, 'বাবা, আপনার কী সেবা করতে পারি?' বাবা বললেন, 'বেটা, ধুনিতে কাঠ দিয়ে দে।' রাজা রাজধানীতে ফিরে বিলাস-ব্যসনে ভুলে গেলেন। বাবা জঙ্গলকে জ্বালিয়ে তাকেই ধুনি বানিয়ে দিলেন। রাজার হুঁশ হলে পরে এসে এই চমৎকারীত্ব দেখলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং সেবক হয়ে গেলেন। বাবা উমেদগিরি জীবিত অবস্থাতেই এখানে সমাধিস্থ হলেন। তাঁর এবং উত্তরাধিকারী মোহান্তদের সমাধি এখানেই বানানো হয়েছে। মন্দিরে কোনো জায়গির ইত্যাদি নেই। গিরিদের আখড়া যদি এখানে ইংরেজরা আসার আগে থেকেই ছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মোহান্তজী চা না খাইয়ে ওখান থেকে আসতে দিলেন না।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছনোর আগেই বাস ছেড়ে দিয়েছিল। উতরাই ছিল তাই হেঁটেই যেতে শুরু করলাম। ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় পৌঁছে জানতে পারলাম, কে এল কাপুর সাহেব গ্রামে ঘুরতে চলে গেছেন। আমাদের দুঃখ করার কোনো কারণ ছিল না। সাহেব আই সি এস অফিসার এবং কোনো মন্ত্রীর আবার আত্মীয়ও—একে মা মনসা তার ওপরে ধুনোর গন্ধ! কাছারিতে গিয়ে মোকদ্দমা করা দরকার। কিন্তু কতবার টেলিফোন বেজে যায়—সাহেব বাংলোতেই এজলাস বসাবেন। বাংলো শহরের এক প্রান্তে আর কাছারি অন্য প্রান্তে। এই রকম লোকের কাছে এটাই আশা করা যায়।

আমরা নীচে ধর্মশালায় গেলাম। সেখানে অনেক সরকারি অফিস আছে। ভাবলাম পাবলিসিটি অফিসার (তথ্য আধিকারিক)-কে দিয়ে কিছুটা কাজ হবে এই জন্য শ্রীভগতরাম খান্নার কাছে গেলাম। তিনি কিছু তথ্য দিলেন আর বাকি পাঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়, তৃতীয় শতাব্দীর একটি শিলালেখ আমরা পঠিয়ারে দেখে এসেছিলাম। অন্য

শিলালেখটি ছিল খজিয়াতে। এবার আমরা সেদিকে চললাম। রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য খাম্নাজী দু-ফার্লং পর্যন্ত তাঁর লোক পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের রাস্তা বেশির ভাগ ছিল উতরাই, চড়াই ছিল নামমাত্র এবং যেতে হচ্ছিল পাকদণ্ডী ধরে। রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক ঘুরতে হতো। গোরখাদের একটি গ্রাম পেলাম যেখানে পেনশনার নেপালীরা বসতি করেছিল। আরও দু-একটি গ্রাম হয়ে ধর্মশালা থেকে খজিয়ার যাওয়ার বাস-রাস্তা ধরলাম। একজন লোক নীচে নেমে যাওয়ার পাকদণ্ডী দেখিয়ে দিল আর বলে দিল যে, কাছেই খেতের মাঝে সেই চাটান রয়েছে। খুব খুঁজতে হলো না। আমরা খেতের মাঝে উঠে থাকা চাটানের কাছে পৌঁছে গেলাম। চাটানে অভিলেখ রয়েছে। এখানেই কৃষ্ণযশ আরাম (ভিক্ষু-বিহার) বানিয়েছিলেন। চাটানটি আসলে দাড়িতে আছে কিন্তু বিখ্যাত খজিয়ার-এর নামে, কেননা সেটা বড় গ্রাম। কোনো এক সময়ে এখানে ভিক্ষুদের বসবাস ছিল। পঠিয়ারে পুষ্করিণী ছিল এবং লেখ থেকে জানা যাচ্ছিল না যে, তার সঙ্গে কোনো বিহার বা অন্য ধর্মীয় আশ্রম যুক্ত ছিল কি না। কিন্তু এখানে তো পরিষ্কার 'আরাম' লেখা ছিল। যদিও এর অর্থ উদ্যানও হয় তবু সে-যুগে বৌদ্ধ বিহারকেই সাধারণত আরাম বলা হতো, সেজন্যই এত গুরুত্বপূর্ণ লেখা লিপিবদ্ধ করা দরকার হয়েছিল। আমরা দুজন সেখান থেকে ফিরে আবার পথের সেই জায়গায় পৌঁছলাম এবং ওপরের দিকে উঠে সূর্যাস্তের পর ধর্মশালা পৌঁছে গেলাম। জনকলালজীর একজন নেপালী সাহিত্যিকের ঠিকানা জানা ছিল বলে তিনি সেই রাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে শ্যামনগরে চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনি রাত সওয়া দশটার সময় ফিরলেন। এর মধ্যে 'তালিব' সাহেব কারও কাছে শুনে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এসে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হতে লাগল। আরও অনেক ভদ্রলোক এলেন। জানা গেল, আজকে আমাদের যাঁর সঙ্গে মূলত দেখা করার কথা, তিনি ব্রিজ খেলা থেকে ফুরসৎ পান না এবং এক মন্ত্রী সাহেবের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে হতে চলেছে। 'স্বামী হলো কতোয়াল, এখন ভয় কিসের?'

ডালহৌসী—পাঠানকোট যাওয়ার বাস ভোর পাঁচটায় ছিল। ৫৬ মাইলের রাস্তা। আমরা গিয়ে সেটাই ধরলাম। পথে নুরপুর পেলাম। এখানকার রাজা, বাদশা নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের প্রতি ভক্তি দেখানোর জন্য এটিকে ধমেরী থেকে বদলে নুরপুর করে দিয়েছিল। তবু ধমেরী (ধর্মগিরি) নামটা অনেকদিন পর্যন্ত লোকের মুখে মুখে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ যাত্রীরাও এই নামটিই স্মরণ করেছে। বলেছে যে আগে রাজধানী ছিল পাঠানকোটে। সমতলে থাকার দরুন তা শত্রুর আক্রমণ থেকে খুব সুরক্ষিত ছিল না এই জন্য এটিকে এখানে আনা হলো এবং একটি চাটানের ওপর দুর্গ বানিয়ে এখানেই রাজধানী গড়ে উঠল। ধর্মগিরির সম্বন্ধ যে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ছিলই এটা নিশ্চিত নয়, তবে হয়তো ছিল, কেননা অন্য লোক নিজের দেবতাদের নামে নগরের নাম রাখতে বেশি পছন্দ করত, যেখানে তারা বৌদ্ধধর্মের সেবক হতে চায়।

পাঠানকোট থেকে পাঠান বা আফগান অর্থ বোঝাটা ঠিক নয়। মুসলিম ঐতিহাসিকরাও এর নাম বলে পৈঠন, যা প্রতিষ্ঠান-এর অপভ্রংশ। কোট তো কেল্লা অর্থে তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এটা ছিল সবচেয়ে উত্তরের প্রতিষ্ঠানপুর। দ্বিতীয়টি প্রয়াগের সামনে গঙ্গার ওপরে ঝুসী। ঝুসীও প্রতিষ্ঠান ছিল আর তৃতীয়টি মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ থেকে দক্ষিণে গোদাবরীর তীরে

আজও পৈঠন নামে প্রসিদ্ধ, যা অন্ধ্র রাজাদের রাজধানী ছিল। আর্য-অসুর বা দিবোদাস-শম্বরের যুদ্ধের সময় এই নৈসর্গিক পাহাড়ী দুর্গটি অবশ্যই শম্বরের একশো দুর্গের মধ্যে একটি ছিল। বিশেষ করে এখান দিয়েই পাহাড়ে ঢোকার রাস্তা হওয়ায় এই স্থানটির বেশি গুরুত্ব ছিল। আমি ভাবলাম ফটো তুলে নিই, কিন্তু সব ড্রাইভার একরকম হয় না। একমিনিটও ফুরসৎ ছিল না। সোজা স্ট্যান্ডে গিয়ে একটুক্ষণের জন্য দাঁড়াল। সওয়া আটটায় পাঠানকোট পৌঁছে গেল।

বিভাজনের পর পাঠানকোট খুব বড় হয়ে গেছে। আগে চম্বা আর কাঁংড়া-মণ্ডী যাওয়ার রাস্তার কারণে এর গুরুত্ব ছিল। এখন এটা পাকিস্তানের সীমানার কাছে হওয়ায় এখানে বিশাল সৈন্যদের ছাউনি রয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা লোকে ভরে গেছে। কাশ্মীর যাওয়ার রাস্তাও এখান দিয়েই গেছে বলে বাণিজ্যিক সুবিধে যে বেশি, তা বলার দরকার নেই। এপ্রিলের শেষে পাহাড় থেকে একেবারে নীচে সমতলে গড়ে ওঠা এই বসতির গরমের কথা আর কি বলব? তবে আমাদের আধ ঘণ্টার বেশি বসার দরকার হলো না। একটু জলখাবার খেয়ে আমরা পৌনে নটার সময় ডালহৌসীর বাসে উঠে পড়লাম।

সমতল পার হয়ে পাহাড়ে ঢুকলাম। তারপর চক্কর কাটতে কাটতে ক্রমশ ওপরে উঠতে উঠতে ৪৫ মাইল গিয়ে বনিখেত-এ পৌঁছলাম। বেশ ভাল বাজার। এখানকার একটি রাস্তা চম্বা যায় আর অন্যটি যায় পাঁচ মাইল দূরে ডালহৌসী। আমরা সেই গাড়িতেই ডালহৌসী চলে গেলাম। ক্ষণিক দর্শন করার ছিল। হিমালয়ের শহরগুলির মধ্যে ডালহৌসী আমার সবচেয়ে ভাল মনে হয়েছে। এর এমন কোনো অংশ নেই যেখানে শ্যামলিমা নেই। বিশালকায় দেবদারু জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সময়টা ছিল দুপুরবেলা কিন্তু গরমের কোনো চিহ্ন ছিল না। ডালহৌসীর এটা সুবিধে যে এখানে সেনা-ছাউনি আছে। সীমান্তের কাছে হওয়ার দরুন জনবসতি থাকবে, তা অবশ্যই আশা করা যায়। এখন জেনারেল সাহেবের আসার ছিল তাই সৈনিকরা তোরণ করে ফুলমালা লাগিয়ে রেখেছে। স্ট্যান্ডে গিয়ে একটি ভোজনালয়ের কাছে আমরা মালপত্র রাখলাম আর ভাবলাম, বাস ফিরে আসতে তিন ঘণ্টা যখন দেরি আছে ততক্ষণে ডালহৌসী দেখে নিই। একটার সময় আমরা পৌঁছেছিলাম। 'শতং বিহায় ভোক্তব্যং'—আগে পেটপুজো করলাম, তারপর চললাম শহর দেখতে। চৌরাস্তায় পৌঁছলাম। ইংরেজরা তাদের লন্ডনের প্রিয় চৌরাস্তার নাম দিয়ে এটিকে চেরিং ক্রশ বানিয়ে দিয়েছিল। খানিকটা নীচে নেমে মূল বাজারে পৌঁছলাম। চারপাশ বিষাদে ছেয়েছিল।

৩০ এপ্রিল মানে গরমের সময়। দেশ বিভাগের আগে হলে এতদিনে এখানে হাজার হাজার ভ্রমণার্থী চলে আসত। কিন্তু এখন অর্ধেক দোকানে তালা বন্ধ ছিল। লোকে জানাল ১৯৪৭ থেকে এদের তালা খোলা হয় নি। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলছিলেন, 'এখানে হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল। সবাই আসত। ডালহৌসী জমজমাট হয়ে থাকত। এখন তো বাজারের অনেক দোকানই বছর বছর ধরে তালাবন্ধ।' আমরাও দেখলাম ছাদের শ্লেট সরে গিয়েছিল। মেরামত করার কেউ ছিল না। বর্ষার জল নিশ্চয় ঘরের ভেতর ঢুকত। মুসৌরীর দুরবস্থার দিকেই আমরা নজর দিতাম কিন্তু সেখানকার বাজারে তো আমরা এই রকম অবস্থা দেখি নি। কখনো এখানে ধর্মের নামে মাথা ফাটাফাটি হতো—মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো উচিত না। আজ আর্য-অনার্য সব মন্দিরই শূন্য পড়ে থেকে নিজের ভাগ্যর জন্য চোখের জল ফেলছিল।

আরও অনেকটা চক্কর দিয়ে আবার আমরা মুখ্য পর্বতের পরিক্রমায় বেরোলাম। জমাদার ঝাড়ু নিয়ে পথ পরিষ্কার করছিল। বলা যায়, এটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, কেননা রাস্তায় লোক তো এখন কমই চলাচল করত। বলছিল, 'কী বলব? ডালহৌসীর সৌন্দর্য তো সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে।' সাহেবরা চলে যাওয়ার জন্য অনুশোচনা করার লোক বিলাসপুরীগুলিতে যথেষ্ট পাওয়া যাবে। আরও একজন লোককে পেলাম,সে একটু আশান্বিত ছিল। বলছিল যে, আগামী মাসের (মে) শেষে অনেক লোক আসবে। ছাই আসবে! পরিক্রমা করতে করতে ঘুরলাম তারপর স্ট্যান্ডে এসে পড়লাম। চারটা নাগাদ বাস পেয়ে গেলাম। ফেরার সময় জানতে পারলাম ভারতের মহাসেনাপতি রাজেন্দ্র সিংহজী আসছেন। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্যই প্রস্তুতি চলছে। বনিখেত-এ গিয়ে চম্বার গাড়ি ধরলাম। এবার বাসগুলো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, তা সে সরকারি বাস হলেও। সময়ের কোনো নির্দিষ্টতা ছিল না। ড্রাইভার খুব দক্ষ ছিল। আসলে এখান থেকে চম্বা যাওয়ার রাস্তা মোটর গাড়ির পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। খুব সরু আর উতরাইও ছিল খাড়া। সবচেয়ে বড় কথা—ড্রাইভারের দুই বন্ধু তার পাশে বসে গেল আর কথা বলতে লাগল। এটি আরোহীদের প্রাণ নিয়ে খেলা করার সামিল। তারপর ক্লিনার মোবিলের খোলা টিন আমাদের মাঝে এনে রেখে দিল। কাপড়-চোপড় খারাপ হোক তাতে ওর কি? যাত্রী ছাড়া ন মণ শাকসবজির বাক্সও তুলেছিল। চম্বা যখন আর ১৪ মাইল বাকি তখন একদিকে হেলে পড়ায় পথে বাস থামাতে হলো। মোবিল রেখে দেওয়া আর ড্রাইভারের সঙ্গে লোকদুটোর কথা বলা আমার ভীষণ খারাপ লাগল। আমি অভিযোগ-বই চাইলাম। ড্রাইভার বলল, 'আমার কাছে নেই।' প্রাণ হাতে করে যেতে হলো কিন্তু পরে সে খুব নরম হয়ে গেল। নিজের লোকদের ধমকে ওদের দিয়ে মোবিলের টিন ওখান থেকে সরিয়ে দিল। এই রকম খারাপ রাস্তায় বাস চালিয়ে রাত সাড়ে আটটার সময় চম্বা পৌঁছে দিতে গিয়ে যে দক্ষতার পরিচয় সে দিল তাতে সমস্ত রাগ দূর হয়ে গেল। চম্বায় নেগী ঠাকুরসেন ছিলেন ডেপুটি কমিশনার। ১৯৪৮ থেকে তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। পরেও চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ডেপুটি কমিশনারের বাংলো অর্থাৎ পুরনো ইংরেজ সর্বেসর্বার মহল কি জানি কোথায় হবে আর রাতে গেলে তাঁকে অসুবিধেয় ফেলা হবে বলে আমরা ওখানে গেলাম না। পণ্ডিত জয়বন্তরামের বাড়ির খোঁজ করে তাঁর বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে তাঁর ভাগ্নে শ্রীনিবাসজী ছিলেন। তিনি একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওঠালেন। বাড়িটি খুব ভাল ছিল কিন্তু ভারতীয়দের স্বভাব অনুযায়ী পায়খানা একেবারে নোংরা করে রাখা এবং তা দূরে হওয়াটা অনিবার্য ছিল। ডায়াবিটিসের রুগীর পক্ষে প্রস্রাবাগার দূরে থাকাটা বিপজ্জনক ব্যাপার।

চম্বা—২৮ এপ্রিলের সকাল হলো। আকাশ পরিষ্কার দেখে খুব ভাল লাগল। ফটো তোলা আর লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্যেও ভাল আবহাওয়া থাকাটা দরকার। পোস্টাপিসে কমলার তিনটে চিঠি পেলাম। আমি পথে আসতে আসতে ছয়খানা চিঠি লিখে ফেলেছিলাম কিন্তু সে মাত্র একটা পেয়েছে। জয়া এখন ভাল আছে জেনে নিশ্চিন্তে হলাম। প্রথমে আমরা ডেপুটি কমিশনার নেগী ঠাকুরসেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন, 'আমাদের এখানে চলে আসুন।' যদিও চম্বার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকেই বেশি সাহায্য নেওয়ার ছিল তাই

এখানে এলে সুবিধে হতো, তবু এই বলে আমি ক্ষমা চাইলাম, 'আপাতত ওখানে থাকতে দিন। ভরমৌর থেকে ফিরে এসে আপনার বাড়িতে উঠব।' জেলার ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব তিনি নিলেন। নেগী ঠাকুরসেন অন্য ধরনের অফিসার, যা আজকালকার আমলাদের মধ্যে দুর্লভ। তিনি চান, জনগণের অবস্থা ভাল হোক। কিন্তু যেখানে গোটা মেশিনটাই বিগড়ে গেছে সেখানে একজন লোক কী করতে পারে? তবে পরিশ্রমী মানুষ হাত-পা গুটিয়ে এলিয়ে বসে থাকতে পারে না। তিনি কনৌরের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় জন্মেছিলেন। কৃষি বিজ্ঞানে বি এস সি করেছিলেন। এই দুটি গুণই জনসেবার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বিবাহ করেননি যে তার ফলে আমাদের কাজে বাধা তৈরি হবে। যুদ্ধের সময় নৌ-সেনাবাহিনীতে কয়েক বছর ছিলেন, সেজন্য তাঁর মধ্যে সেনা-অফিসারের নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে। পাহাড়ে জন্ম হওয়ার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি লোকই পাখির মতো উড়ে হিমালয়ের দুর্গম পথ পার হয়ে যাবে। চম্বা থেকে ভরমৌর হয়ে সোজা লাহুল যেতে একটি দুর্গম পথ-বিজয় সম্বন্ধে পড়েছিলাম। নেগী সাহেব বললেন, 'কৃষি কলেজে পড়ার সময় আমি এই পথে গিয়েছিলাম।'

চম্বা খুব পুরনো নগর। সম্ভবত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ ফুটের নীচে কিন্তু সমতল থেকে অনেক দূরে এবং অক্ষাংশতেও বেশি উত্তরে হওয়ায় এখানে মুসৌরী আর সিমলার পাহাড়ের উঁচু জায়গার মতো ঠাণ্ডা রয়েছে। প্রতি বছরই এখানে বরফ পড়ে। এখানে পুরনো মন্দিরের একটি পঙক্তি রয়েছে যার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ, লালপা, হরিরায়, চম্পেশ্বরীর মন্দির হচ্ছে প্রসিদ্ধ। কি জানি কতবার এখানে মূর্তি ভঙ্গকারীরা এসেছে, নগর লুট করেছে আর মূর্তি ভেঙেছে। পুরনো ভগ্নমূর্তির বেশির ভাগ রাবী নদীর গর্ভে চলে গেছে। তবুও কিছু দেখতে পাওয়া গেল। মন্দিরের শিখরদ্বার আমাদের প্রাচীন যুগের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতীক। বারোটা পর্যন্ত ফটো তুলে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নগরেই ঘুরলাম। নগরের বাইরে একটি টিলার ওপরে চামুণ্ডার মেলা বসেছিল। দেখলাম মেয়েরা দলে দলে যাচ্ছে। এটা মেয়েদেরই মেলা। চম্বার মেয়েরা বেশি সুন্দর এবং পেশওয়াজ[১] তাদের খুবই মানায়। এই পেশওয়াজ মুঘল সংস্কৃতির প্রতীক। প্রাচীন যুগে এখানেও দোড়ু (উলের চাদর) পরা হতো। তারপর রানীরা মুঘল নারীদের মতো পেশওয়াজ পরে অন্যদের পথ দেখালেন। রাজস্থানেও ভদ্র মহিলারা ঘাঘরা-লুগড়ি না পরে পেশওয়াজ পরত।

ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করলাম। আবার বেরোলাম। ডাকঘরের সামনে খুব বড় মাঠ রয়েছে। ডাকঘরের কাছেও একটি পুরনো মন্দির আছে এবং ডাকঘরের প্রায় গায়ে লাগানো পণ্ডিত অবন্তজীর বাড়ি। চম্পেশ্বরীর মন্দির দেখতে গেলাম। রাজকন্যা চম্পার নামে নগরীর নাম হয়েছে চম্পেশ্বরী। চম্পা কোনো সিদ্ধ পুরুষের কাছে সৎসঙ্গের জন্য যেত। রাজার নিজের কন্যার প্রতি সন্দেহ হলো এবং তাকে হত্যা করে ফেললেন। পরে যখন প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন তখন নিজের কন্যার নামে গড়ে তোলা এই নগরীতে নিজের রাজধানী স্থাপন করলেন।

---

[১] নাচের সময় ব্যবহৃত মেয়েদের এক ধরনের পোশাক।—স·ম·

ভারতের যেসব স্থানে সবচেয়ে বেশি পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী পাওয়া গেছে চম্বা তাদের মধ্যে একটি এবং এর চেয়ে প্রাচীন ভারতে কোনো রাজবংশ নেই। এখানে ইংরেজরাই মূলত শাসন করেছে তবে রাজার দেওয়ান হয়ে। তারা ভাল করে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। মোটর চলার রাস্তা না বানালেও অন্য রাস্তা বানিয়েছে, ডাকবাংলো তৈরি করেছে, স্কুল এবং হাসপাতাল খুলেছে। এই কাজের মধ্যে এখানকার ভূরিসিংহ মিউজিয়ামও রয়েছে যেখানে বহু মূর্তি আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তাম্রপত্র সুরক্ষিত করে রাখা আছে। বইও যথেষ্ট সংগ্রহ করা হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে অনেক হাওয়া হয়ে গেছে। আমাকে জানানো হলো যে, গত বছরই একজন প্রভাবশালী নেতা ওখানে এসেছিলেন এবং পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি বই দেখার জন্য নিয়ে গেছেন, তা আজও ফেরৎ দেননি।

২৯ এপ্রিল আবার মিউর্জিয়াম গেলাম। ওখানে চিত্র এবং বহু অভিলেখের ফটো তুললাম। কয়েকটি দুর্লভ বইয়েরও ফটো নিলাম। সন্ধের সময় আবার মিউজিয়াম গেলাম। বস্তুত এখানে এত জিনিস দেখার আর পড়ার ছিল যে, তার জন্য দু সপ্তাহও যথেষ্ট সময় নয়। শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়কে আমি আমার আসার খবর দিই নি। কিন্তু হিমাচল প্রদেশে উর্দুর চেয়ে হিন্দি বেশি প্রচলিত বলে এমন শিক্ষিত তরুণ এখানে খুব কমই আছে যে আমার এক-আধটা বই পড়ে নি। সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত আমাদের এখানে তরুণরা আসতে লাগল।

ভরমৌর—অন্তত চম্বার পুরনো রাজধানী ভরমৌর দেখাটা আমি অত্যন্ত জরুরি মনে করেছিলাম। এমনিতে যতক্ষণ চন্দ্রভাগার তীরের পঙ্গীলাহুল অঞ্চল লোকে না দেখবে ততক্ষণ এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে না। তবে এটা সপ্তাহ খানেকের কাজ ছিল বলে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। নেগী সাহেব দুটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। সে-রাতেই শেষ বাসস্ট্যান্ড রাখ-এর জন্য রওনা হয়ে গিয়েছিলাম। কেউ বলল,অন্ধকার থাকতেই গাড়ি চলে। আমরা তাই সাড়ে পাঁচটাতেই বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। বাস সওয়া ছটার সময় রওনা হলো। রাস্তার কথা আর কী বলব? রাস্তা ছিল কাজ চলা গোছের, যার ওপর ভগবানের নাম নিয়ে গাড়ি চালানো হতো। শহর থেকে বোধহয় পাঁচ মাইল গিয়েছি। গাড়ি স্বাভাবিক গতিতে চলছিল। আমি ড্রাইভারের পাশে বসেছিলাম। দেখলাম গাড়ি ডানদিকে চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ কথা বলতে আমি যতটা সময় নেব, ততটুকু সময়ও লাগল না। কেন এমন হচ্ছে তা বোঝার জন্য মাথা খাটাতে না খাটাতেই বাস কাৎ হয়ে পড়ল। ড্রাইভার স্টিয়ারিঙে আটকা পড়ে গিয়েছিল। যাত্রীরা একে অন্যের ওপর পড়ে গিয়েছিল। ড্রাইভোরের তো কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল। আমি বললাম, 'বেরিয়ে তো এসো।' বাঁ দিকের জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। কয়েকজন জানলা গিয়ে বেরিয়ে এল। লোকজনকেও ধরে ধরে বের করল। আজ কারুর কি বাঁচার আশা ছিল? রাস্তা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ে গাড়ি পড়ে গেল অথচ একজনও আহত হলো না। আমি নিজেকে ভেবেছিলাম অক্ষত আছি কিন্তু পরে দেখলাম পায়ের এক জায়গায় একটু ছড়ে গেছে, সেখান থেকে সামান্য রক্তও বেরোচ্ছে। সকলেই নিজের দেবতাকে মানত করতে শুরু করল। সবাই যখন নেমে এল তখন আমরা ভাবলাম এখানে অপেক্ষা করার দরকার নেই। কেন না চম্বা থেকে এখুনি কারুর আসার কোনো ভরসা

নেই এবং ছয় সাড়ে ছয় মাইল আগে রাখ-এ আমাদের জন্য ঘোড়া অপেক্ষা করছে।

শ্রীবিদ্যাধর এম এল এ-ও আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তিনিও সঙ্গে যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেলেন। ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। সত্যিই একচুলের জন্য প্রাণ বেঁচেছেন। তখনই যদি গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়ে যেত তাহলে আমার কত বই লেখা বাকি থেকে যেত। জীবন আর মৃত্যুর চিন্তায় মরে যাওয়াটা আমার কাছে ঘৃণার ব্যাপার ছিল। আমি কোন ভগবানকে ধন্যবাদ দেব? আমি তো জানি যে তিনি কখনো ছিলেন না এবং এখনো নেই। বিদ্যাধরজীর সঙ্গে কথা বলতে থাকায় কখন রাখ পৌঁছে গেলাম বুঝতেই পারলাম না। সেখানে সহিস ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুত ছিল। ভাবলাম সামান্য জলযোগ করে বেরোব। একটু জিরোতেই অন্য বাসে করে পুলিস আর মোটর সার্ভিসের একজন অফিসার এসে পৌঁছল। এদিকে লালা বক্‌খুচন্দ না খাইয়ে যেতে দিতে চাইছিলেন না। আমরা অন্য একজনকে খাবার বানাতে বলে দিয়েছিলাম, তাঁকে মানা করতে হলো। পুলিস বাস-দুর্ঘটনার জন্য লোকের বয়ান নিল। আমি জানালাম যে, কিভাবে স্টিয়ারিঙের নিয়ন্ত্রণ না মেনে বাস ডানদিকে চলে গিয়েছিল এবং ড্রাইভার সমস্ত চেষ্টা করেও হার স্বীকার করল। আসলে ড্রাইভারের দোষ ছিল না। এই সব পাহাড়ে প্রতিটি বাসের স্টিয়ারিং আর ব্রেক নিখুঁত থাকাটা অনিবার্য হওয়া দরকার কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়া হয় না। এই বছর (১৯৫৬ খ্রি·) এইভাবে একটি বাস হিমাচল প্রদেশে পড়ে গিয়েছিল। সেখানে সব লোকই মারা যায়। আমাদের বাস যদি আর দশ-পা ওপরে উঠে বাঁদিকে যেত তাহলে বোধহয় আমাদের মধ্যে একজনও ঘটনার কথা বলার জন্য থাকত না। এম এল এ সাহেবও তাঁর বক্তব্য লিখলেন। তিনি বাড়ি বানাচ্ছিলেন। বাড়ির ছাদের জন্য ভাল স্লেট এদিকে পাওয়া যেত। সে-ব্যবস্থা করতেই তিনি এদিকে যাচ্ছিলেন। বাড়ি হওয়াটা তাঁর নিয়তি ছিল, এ জন্য বিদ্যাধরজী বেঁচে গেলেন। কোনো ভগবান তাঁকে বাঁচায় নি।

লালা বক্‌খুচন্দ হচ্ছেন রাখ-এর বড় দোকানদার। এখন আমরা বলি ব্যবসায়ীরা রক্ত চুষে খায় কিন্তু প্রাচীনকালে না তারা নিজেদের সম্পর্কে এরকম ভাবত আর না অন্যরা তা ভাবত। শাস্ত্রে বলত 'লক্ষ্মী বসতি ব্যাপারে।' তার মধ্যে রক্ত চুষে খায় এমন লোকও ছিল আবার সরল, শ্রদ্ধালু, দয়ালু লোকও ছিল। লালা বক্‌খুচন্দ এই রকমই একজন সরল বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। শুধু আমাদেরই নয়, মনে হয় আরো অনেককেই তিনি চা-জল বা খাবার দিয়ে তৃপ্ত করেছিলেন। আমরা খাওয়া-দাওয়া করে ঘোড়ার পিঠে চড়লাম। কয়েক মাইল যাওয়ার পর রাবী-র বাঁ দিক থেকে ডানদিকে আসতে হলো। এখানকার সোফিয়ানা (হালকা) পুল দেখে ভাল লাগছিল। এত কম খরচে পুল হয়ে গেলে যে কোনো জায়গাতেই তা বানানো সহজ। লোহার মোটা তারের নীচে ঝুলছিল। কিন্তু মাঝখানে পৌঁছানোর পর যখন 'বালে রে চিনগিয়া' হতে থাকে অর্থাৎ পা ডাইনে-বাঁয়ে নাচার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে তখন আমরা যে রাবী নদীতে আছড়ে পড়ব না—এ বিশ্বাস হয় না। এই রকম মুহূর্তে 'যা হবে হোক', বলে এগিয়ে যাওয়াটাই ঠিক। সামনের গ্রামে শ্রীবিদ্যাধরজী লালার বাড়িতে কথা বলছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হলো। আবার আমরা রওনা হলাম। রাখ থেকে ১৬ মাইল গিয়ে দুরগডী পৌঁছলাম। এখানে ডাকবাংলো ছিল বলে ছার ও পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচার আশা ছিল। তা নইলে এখানে না ছিল কোনো দোকান, না কোনো স্বাচ্ছন্দ্য। ঘোড়া ছিল সরকারি। ছোলা সঙ্গেই ছিল। চৌকিদার মুখের কাছে

ঘাস এনে দিল। সহিসরা খাবারও বানালো। জনকলালজীকে উপোস করে থাকতে হলো না।

ভরমৌর—ভরমৌর এখন ১১ মাইল বাকি। আগের দিন আমরা বেশিটাই পায়ে হেঁটে এসে ছিলাম তাই আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। ১ মে সাড়ে পাঁচটায় ঘোড়াওলাদের তাড়াতাড়ি আসতে বলে আমরা এগিয়ে গেলাম। রাস্তায় একটি ভাল দোকান আর থাকার জায়গা দেখে মনে হলো গতকাল এখান এসে পড়লে ভাল হতো। আরও এগিয়ে রাবী পেরিয়ে তার ডানদিকের তটে আমাদের আসতে হলো। রাবী এখন ছুটছিল। বেদের এই খর নদীটি ওপরে অনেক দূর থেকে আসছিল আর ভরমৌরের নদী এখান থেকে নীচে রাবীতে গিয়ে মিশেছিল। ভরমৌরের নদী ছেড়ে এখানে পাহাড় পেরোনোর কারণ এটাই ছিল যে, নদী পাথকে এমনভাবে কেটে নিয়ে গিয়েছিল যে রাস্তা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজকের ডিনামাইটের যুগে বেচারা পাহাড় আর কী করতে পারে? সমস্যা হচ্ছে টাকার। হিমাচল সরকার ভরমৌর পর্যন্ত বাসরাস্তা বানানোর জন্য সমস্ত মাপজোক করে নিয়েছে।

পুল পেরোতেই চড়াই এল। অনেক বাঁক পেরিয়ে দুমাইল ধরে কঠিন চড়াই। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম ঘোড়াও আসছে। ভাবলাম পুরো চড়াইটা এদের ব্যবহার করতে হবে। ঘোড়া এল। তাতে চড়ে চললাম। চড়াই পার হয়ে যাওয়ার পর গেহরদের একটি ছোট গ্রাম পেলাম। কাদা জলের কুণ্ডকে আমরা কোনো কাজে লাগাতে পারতাম না। তার একদিকে ছিল ছেলেদের স্কুল আর অন্যদিকে এক শরণার্থী ভাই ছোটমতো দোকান খুলে রেখেছিল। আমরা সেখানে একটু চা-জল খেলাম। জানা ছিল না যে ভরমৌরে জিনিসপত্র পাওয়া খুব কষ্টকর, তা নইলে এখান থেকেই কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম। দেড় মাইল যাওয়ার পরে ভরমৌর গ্রাম দেখা গেল। ভরমৌরকে বরমৌরও বলে, তবে আসলে হচ্ছে ব্রহ্মপুরের বিকৃত রূপ। এই ভূ-খণ্ডের এটি রাজধানী ছিল। রাজধানী হওয়ার পর আজ থেকে হাজার-এগারশো বছর আগে এই রাজ্যের নাম হয়েছিল চম্বা। আগে কী নাম ছিল? সম্ভবত ব্রহ্মপুরই বলা হতো। এর পূর্বদিকের প্রতিবেশী কুলুর নাম কুলত তো প্রাচীনকাল থেকেই বিখ্যাত। এখন ভরমৌরে জরিপ হচ্ছিল। নিয়মমাফিকভাবে বোধ হয় এই প্রথমবার জরিপ হচ্ছিল। পথে দু-একটি গ্রাম পাওয়া গেল। বেশির ভাগ ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। বরমৌর-এর লোকদের গদ্দী বলা হয়। অঞ্চলটিকে বলা হয় গদিয়ান। গদ্দী কোনো ব্রাহ্মণ জাতির নাম নয়। এতে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেই রয়েছে। জীবকার্জনের একটি প্রধান উপায় হচ্ছে ভেড়া-ছাগল পোষা। ভরমৌরের জমি তাদের নিজেদের কাজ চলার মতো শস্য এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি আলু উৎপন্ন করে দেয়। ৭-৮ হাজার ফুট উচ্চতায় রয়েছে এখানকার গ্রাম। শীতের সময় এখানে চারদিকে বেশ কয়েক ফুট পুরু বরফ পড়ে। সে-সময় লোকে এখানে থাকাটা পছন্দ করে না। পশুদের খাবারের অসুবিধে দেখা দেয় এবং মানুষের কাজ থাকে না। এই জন্য মানুষ এবং পশুরা যথেষ্ট সংখ্যায় সমতলে চলে যায়। গরিব স্ত্রীলোকেরা ভটিয়াত (নিম্ন রাবী উপত্যকা)-এ গৃহস্থদের বাড়িতে চাল কোটে, কাজকর্ম করে দেয়। পুরুষরাও কিছু কাজ করে। অধিকাংশ পশুপালক তাদের পশুদের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে চরায়।

মে মাস এলে, ভরমৌর উপত্যকার অধিকাংশ জায়গা বরফমুক্ত হয়ে যায়। সেই সময় গদ্দী

পরিবার নিজের গ্রামের দিকে ফেরে। স্ত্রীলোকেরা পিঠে মালপত্র নেয়। পুরুষরাও এক-দেড় মণের বোঝা নিয়ে নিজের গরু বা অন্য পশুদের হাঁক দিতে দিতে ওপরে চলে। পথে আমরা তাদের পেয়েছিলাম তবে এটা ছিল সবচেয়ে প্রথম দল। গদ্দী অত্যন্ত ঠাণ্ডা জায়গায় অবস্থিত বলে স্ত্রী-পুরুষদের সমস্ত পোশাক হয় উলের। তাদের কোমরে ৪০-৫০ হাত লম্বা কালো দড়ি জড়ানো থাকে। কাছ থেকে দেখলে তার শিল্পগুণ বোঝা যায়। মনে হয় নরম কালো উলের গুচ্ছ, যা দেখতে লাগে মখমলের মতো। গদ্দীর শিশুরাও চোগা পরতে শুরু করেই দড়ি ছাড়া থাকতে পারে না। একজন গদ্দী বন্ধু জানাল, 'শিবজী মহারাজ বর দিয়েছেন যে যতক্ষণ কোমরে এই দড়ি বাঁধা থাকবে ততক্ষণ তোমার ভেড়া বশে থাকবে।' আমিও বললাম, 'হাজার হাজার ভেড়া একজনে কী করে সামলায়?' সে বলল, 'হ্যাঁ, এইজন্যই আমরা কোমরে দড়ি বেঁধে রাখি, না হলে তো হাজারটা ভেড়া হাজার দিকে চলে যেত আর আমরা বেকার হয়ে যেতাম।' গদ্দীরা তাদের শীতকালীন রোজগার দিয়ে বাসনপত্র বা অন্য কোনো জিনিস বদলে নেয়। অতীত যুগে হয়তো তাদের কাজকর্মের বেশি সুবিধে ছিল, কিন্তু এখন ভটিয়াতে ক্ষুধার্ত কাজের লোকরা মজুত রয়েছে। লোকজন এখনো নিজের ঘরে ফেরে নি তাই অনেক ঘরে তালা লাগানো ছিল। পথে আমরা বন-বভিাগের তৎপরতাও দেখলাম। এক জায়গায় চার-পাঁচ হাতের দেবদারুর হাজার হাজার চারার জঙ্গল ছিল। মানুষ বা পশুর বাচ্চাদের যেমন দেখতে ভাল লাগে এই চারাগুলিও তেমনি লাগছিল।

সাড়ে এগারোটার সময় আমরা গধেরন (গদিয়ান)-এর রাজধানীতে পৌঁছে গেলাম। এখানে ডাকবাংলো, হাসপাতাল, ডাকঘর, মিডিল স্কুল, পুলিস চৌকি, নায়েব তহসিলদারী আছে। তহসিলদারী পুরনো বাড়িতে। এত অফিস রয়েছে কিন্তু লোকের খাওয়া-পরার জিনিসের খুব অসুবিধে। হয়তো আমরা আগে এসে পড়েছিলাম। মে-মাসের শেষ নাগাদ যখন সব ঘরে লোক এসে যাবে তখন অবস্থাটা ভাল হবে। নাগাবাবা এখানে তাঁর সেবাকার্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। কিন্তু তিনি আগেরবার প্রয়াগের কুম্ভে গেছেন, এখনো ফেরেন নি। আমাদের কাছে জিনিস বলতে তো ছিল গায়ে দেওয়ার দু-একটি কম্বল। আবহাওয়ার কোনো ঠিক ছিল না বলে আগে মন্দির দর্শন আর ফটো তোলার কাজ শেষ করে নিতে চাইছিলাম। ভারতে ভরমৌরের মতো এমন জায়গা খুব কমই আছে যেখানে এত পুরনো ধাতুর মূর্তি সুরক্ষিত রয়েছে। এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, পথের দুর্গমতার কথা জেনে মূর্তিভঙ্গকারীরা এখানে কখনো এসে পৌঁছয় নি। মাঝে রয়েছে চূড়াওলা হরিহরের বিশাল মন্দির, যা আসলে শিবজীর মন্দির। তার সামনে নরসিংহর মন্দির, যা তার থেকে একটু ছোট। দুটির মাঝখানে শংকরজীর দিকে মুখ করে পিতলের ষাঁড় (প্রায় পাহাড়ী ষাঁড়ের সমান উচ্চতাসম্পন্ন) দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ওপর গুপ্তাক্ষরে একটি লেখ রয়েছে। অভিলেখটি থেকে জানা যায় এটি মেরুবর্মা বানিয়ে ছিল—

"ওঁ। প্রসাদমেরুসদৃশং হিমবন্তমূর্ধনি কৃত্বা স্বয়ং প্রবরকর্ম্মশুমৈরনেকৈঃ তচ্চন্দ্রশালরচিতং নবনাভ নাম প্রাগ্‌গ্রীবকৈর্ব্বি বিধমণ্ডপৈনেকচিত্রৈঃ।
তস্যাগ্রতো বৃষভপীনকপোলকায়ঃ সংশ্লিষ্টরক্ষককুন্দোন্নতদেবযানঃ
শ্রীমেরুবর্ম্মচতুরোদধিকীর্তিরেষা
মাতাপিতুঃ সততমাত্মফলানুবৃদ্ধৈঃ।।"

মেরুবর্মা সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। লক্ষ্মণাদেবীর মন্দিরে দেবীর লেখসহ পিতলের মূর্তি আছে। গণেশের পিতলের মূর্তিটিও খুব ভাবমণ্ডিত। একদা পাশুপত লকুলীশদের যে এখানে দুর্গ ছিল তা তার শিবলিঙ্গটিই বলে দিচ্ছিল। তহসিলদার সাহেব আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, যা এই জায়গার জিনিসপত্রের অভাব দেখে এটাকে অসুবিধেয় ফেলা বলেই মনে হলো। এমন জানলে আমরা চম্বা বা রাখ থেকে নিজেদের সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসতাম। ভরমৌর গ্রাম খুব বড় নয়। সকলেই গদ্দী, যার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর কর্মকার তিনটে জাত রয়েছে। ব্রাহ্মণরা হচ্ছে ভরদ্বাজ গোত্রের। জানা যায়, সগোত্রে বিবাহ এখানে আগে থেকেই চলে আসছে। বিশুদ্ধ খশ-মুখাবয়ব দেখা যায়। খশদের স্বচ্ছন্দ জীবনও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। কেন দেখা যাবে না, এখনো যখন লোকে মেষপালক হওয়ার ফলে অর্ধ-ঘুমন্ত জীবন কাটাচ্ছে? গদ্দীরা তাদের ভেড়া নিয়ে বুকয়াল (১২০০ ফুটের বেশি উঁচু পর্বতপৃষ্ঠ) খুঁজতে খুঁজতে জম্মু থেকে কুমায়ুন পর্যন্ত চক্কর কাটে এবং তা আজ থেকে নয়, কয়েকশো বছর ধরে। গ্রীষ্ম-বর্ষায় যখন তাদের ঘরে লোকজন থাকে তখনও ঘরের অর্ধেক লোক ভেড়ার সঙ্গে থাকে। ভেড়ার লোমের উল বিক্রি করাটা তাদের জীবিকার প্রধান উপায়। যখন থেকে ছাগলের দাম বেড়ে গেছে তখন থেকে তারা তাদের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে। ভয় থাকে, ছাগলগুলো ভেড়াগুলোকে না খেয়ে ফেলে! লাখ-লাখ ভেড়াপালক এই গদ্দীরা তাদের জাতকে উৎকৃষ্ট করে তোলার কাজ করতে পারে। তাদের দিকে যদি নজর না দেওয়া হয় তাহলে আর্থিক লাভ আর সংঘর্ষ তাদের মেষপালক থেকে ছাগপালক বানিয়ে দেবে।

ভরমৌর-উপত্যকা এই সময় তার সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করছিল না কারণ এখন শীতের শেষ এবং বসন্ত আসে নি। শীতের আগে বোনা গমের খেত মূর্ছা যাচ্ছিল। লোকে ত্রাহি ত্রাহি করছিল। এই সময় কিছুটা বৃষ্টি হওয়া দরকার। ভাগ্যক্রমে সেই রাতেই ওখানে একটু বৃষ্টি হয়ে গেল। কৃষকদের ধড়ে প্রাণ এল। আমাদের এখানে যা কিছু করার ছিল তা ১ মে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ২ মে আকাশে মেঘ ঘিরে ছিল তাই ফটো তোলার কাজ হলো না। গ্রাম তো কালই ঘুরে এসেছিলাম। ওখানকার বৃদ্ধদের কাছ থেকে কিছু কথাও সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। গদ্দী লোকেদের বিশ্বাস শংকর তাদের আর তাদের মতো তিনিও গদ্দী। একদিকে সেই হিমাচ্ছাদিত শিখরও দেখা যায় যাকে মণিমহেশ বলা হয়। সেখানে শংকর তাঁর গদিয়ানীর সঙ্গে সব সময় থাকেন। লোকে শ্রাবণ মাসে সেখানে মেলায় যায়। এখানকার শংকর ছাগ বলি গ্রহণ করে, কিন্তু সমতলের শংকরকে জোর করে নিরামিষাশী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গদ্দী লোকদের কাছে শংকর-পার্বতীর অনেক গান রয়েছে। সভ্যতা আর শিক্ষা থেকে দূরে থাকার ফলে মানবতত্ত্বীয় অনুসন্ধানের জন্য তাদের কাছে প্রভূত সামগ্রী আছে। নাচ-গানের খুব শখ তাদের। পুরনো যুগের মতো কন্যাশুল্ক খুব কড়াকড়ি করে উশুল করা হয়। নিজের ভাবী শ্বশুরকে যে টাকা দিতে পারে না সে শৈশব থেকেই বহু বছরের জন্য শ্বশুরের চাকর হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েকে বিয়ে করে সে নিজের বাড়ি যায়।

পুনরায় চম্বা—২ মে ছিল রোববার। আমাদের দয়ালু গৃহস্থকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমরা

পাঁচটার সময় বেরিয়ে পড়লাম। গেহরে পৌঁছে সঙ্গে আনা খাবার খাওয়ার জন্য শরণার্থী ভাইয়ের বাড়িতে উঠলাম। এতদূর ঘোড়ায় এসেছিলাম, উতরাইয়ে ঘোড়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমরা পৌনে একটায় বেরোলাম। সোয়া চারটের সময় রাখ পৌঁছে গেলাম। ভয় ছিল চম্বা যাওয়ার বাস আবার না চলে যায়, তাহলে রাতে আমাদের ওখানেই থেকে যেতে হবে। আমরা আসার পর বাস এল। এই ভূ-খণ্ডে পশুপালন প্রধান যাদের জীবিকা এমন দুটি জাতি আছে—গদ্দীরা হচ্ছে মেষপালক তথা শিবাজীর একনিষ্ঠ ভক্ত এবং গুজররা হচ্ছে মোষপালক, তারা সকলেই মুসলমান। সম্প্রতি গুজররা একটু একটু ঘর করে থাকতে শুরু করেছে, নইলে গ্রীষ্ম-বর্ষায় তারা ওপরের পাহাড়ী চারণক্ষেত্রে তাদের মোষ নিয়ে চলে যায়। শীতে নিচের জঙ্গলে থাকে। গাড়োয়াল, কুলু সব জায়গায় এই রকম। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় এদেরও কিছুটা ক্ষতি হয়েছে কিন্তু এরা পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে রাজি হয় নি। এদের কাছে ভাল মোষ থাকে। বেশি বড় মোষ হয়তো রাখাতেও পারে না কেননা তাদের দুর্গম পাহাড়ে যেতে হয়।
ছটায় বেরিয়ে আমরা সাতটায় চম্বা পৌঁছে গেলাম। এবার নেগি ঠাকুরসেন সাহেবের বাংলোয় উঠলাম। রাতে একটি বাংলোর দরজা দিয়ে যখন পেরোচ্ছিলাম তখন পাহারাদার বলল যে, এদিকে রাস্তা বন্ধ। জুডিসিয়াল কমিশনার সাহেবের জন্য লোকে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে না, এ তো বিচিত্র গণতান্ত্রিক রাজ্য।

এতদিনে চম্বার সাহিত্য অনুরাগীরা আমার আসার খবর ভালভাবে পেয়ে গিয়েছিল। তাই কয়েক ঘণ্টা তাদের মজলিসে কাটল। সন্ধের সময় সনাতন ধর্ম লাইব্রেরিতে বক্তৃতা দিতে হলো। এটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। কর্মকর্তাদের যদি নিষ্ঠা থাকে তাহলে ছোট করে শুরু হয়েও একটা সময়ে কাজ বড় হয়ে ওঠে। এর উদাহরণ এই গ্রন্থাগার। এখানে তিন হাজারের বেশি বই আছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর কিছু হাতে লেখা গ্রন্থ আছে যার মধ্যে 'তত্ত্বচিন্তামণি'-র 'ব্যুৎপত্তিবাদ' থেকে বোঝা যায় যে, এই পাহাড়েও লোকের উচ্চশিক্ষার প্রতি ঝোঁক ছিল। একটি ঘর থেকে ছন্দশাস্ত্রের বিষয়ে লেখা একটি তালপুঁথি এল। তালপুঁথি মানে মুসলিম-যুগের আগেকার পুস্তক। চম্বাতে আরও পুঁথি পাওয়া যেতে পারে। সুমনজী হচ্ছেন কবি। লোক-কবিতাও লেখেন আবার প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহেরও আগ্রহ রয়েছে। আজকের চম্বিয়ালী ভাষা দেখে ভ্রম হতে পারত যে, তা এখন খশ ভাষাবংশ থেকে আলাদা, তবে উর্দু অক্ষরের চম্বিয়ালী পুস্তকের অর্ধশতাব্দী আগে ছাপা হচীসন পাদরীর চম্বিয়ালী পুস্তক দেখে বোঝা গেল যে আগে এখানে কা-এর জন্য রা, এবং গা-এর জন্য লা ব্যবহার করা হতো। চম্বা থেকে নেপাল পর্যন্ত এলাকায় এখনও যেমন করা হয়। পাঞ্জাবীতে কা-এর জায়গায় দা এবং গা-এর জায়গায় গা থাকে। তা যে হিন্দির সহোদরা এটা বলার দরকার নেই। চম্বার নীচের ভটিয়াত অঞ্চলেও দা-গা-এর প্রয়োগ রয়েছে এবং কাঁংড়াতেও রয়েছে।

নেগীজী কৃষকদের মধ্যে মিশতে জানেন। তাদের কি করে উন্নত করা যায় সেদিকে সবসময় নজর রাখেন। এ জন্য তিনি খুব জনপ্রিয়। ঘুরে বেড়াতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই বলে দুর্গম পথের গ্রামেও তিনি পৌঁছে যান। তাঁর কাছ থেকে আমি আমার কাজে পুরো সাহায্য পেলাম আর শ্রীনিবাসজী তো যাবতীয় সাহায্য করতে প্রস্তুতই ছিলেন।

অমৃতসর—৪ মে পাঁচটার সময় স্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। বাস ছটার সময় রওনা হলো। সাড়ে আটটায় বনীখেত পৌঁছল। এখান থেকে পাঠানকোটের বাস ধরার ছিল। এমনিতে অসুবিধে হতো কিন্তু নেগী সাহেব টেলিফোন করে দিয়ে ছিলেন বলে বাস পেতে অসুবিধে হলো না। বনীখেতের আগে বাথড়ীর বেশ ভাল বাজার পাওয়া গেল। বাসে একটি বিয়ের কনেও বিদায় নিয়ে যাচ্ছিল। বেনের মেয়ে ছিল। হাত-পা খুব গুছিয়ে বসার কথা। কিন্তু বেচারা বমি করতে করতেই অস্থির হয়ে গেল। বনীখেতের আগে এক জায়গায় আমাদের একটুক্ষণ দাঁড়াতে হলো। সেখানে দুদিক থেকেই গাড়ি এসে থামে কারণ একই সময়ে একটি দিকের রাস্তাই খোলা হয়। যখন পাঠানকোট স্টেশন পৌঁছলাম তখন পৌনে একটা বাজে। মঈ কা আন পহুঁচা হ্যায় মহীনা/বহা চৌটী সে এড়ী তক পসীনা।'[১] —একথা বলার দরকার নেই। যেই শুনলাম অমৃতসর জনতা ট্রেন ছাড়ছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। স্টেশনে পা রাখতে না রাখতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। প্রত্যেক কম্পার্টমেন্টে দুটো করে পাখা ছিল যার ফলে প্রাণ বাঁচল। রেলের কিছুটা তো উন্নতি হয়েছে। পথে গুরুদাসপুর আর বটালাও পেলাম। গরমে খেতে ইচ্ছে করছিল না। যা খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল তা হলো ঠাণ্ডা জল। অমৃতসর ছিল মাত্র ৬৭ মাইলের পথ তাই চারটের সময় আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। পথে পাঞ্জাবের গ্রাম দেখা গেল—সেই গ্রাম যেখানে হাজার বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বসবাস করে আসছিল। আগেও কখনো কখনো দুপক্ষে ঝগড়া বেঁধেছে। কিন্তু ইংরেজরা তাদেরকে একে অন্যের রক্তপিপাসু বানিয়ে তুলেছে। মসজিদগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। অনেকেরই মিনার ভেঙে পড়ছে। মোষ এবং গরুর ভাল জাতের জন্য পাঞ্জাব প্রসিদ্ধ। এখনো সেখানে সবচেয়ে বেশি দুধ-ঘি খাওয়া হয়। এই সময় গরমের সমস্ত শ্যামলিমা ঝলসে গিয়েছিল। বড় বড় গাছগুলো ছাড়া আর কোথাও সবুজ পাতা দেখা যাচ্ছিল না। তবুও দুপুরের রোদে যত্রতত্র খেতে গবাদি চরছিল। নিজের শৈশবের কথা মনে পড়ছিল। সে সময় এমনি রোদে খালি পায়ে রানী-কী-সরাই স্কুলে পড়তে যেতাম। আজ কি তেমনটি করতে পারতাম?

অমৃতসর স্টেশনে কয়েকজন বোরখাপরা স্ত্রীলোককে দেখে সত্যি সত্যি আশ্চর্য হলাম। পাঞ্জাবে এখন মুসলমান দেখাটা স্বপ্ন হয়ে গেছে। পশ্চিম পাঞ্জাবে একই ব্যাপার হিন্দুদের সম্বন্ধেও খাটে। দুটি রিক্সায় মালপত্র রেখে আমরা দুজন প্রথমে পাঞ্জাব আয়ুর্বেদিক ফার্মেসি গেলাম কেননা কুকুর ঘুরে বেড়ানো গলিতে ভাইয়ার ঘর খুঁজতে বেশ সমস্যা হতো। ভাইয়া দিল্লী গিয়েছিলেন কিন্তু ভাবীজী ঘরেই ছিলেন। আমি আগেই চিঠি দিয়ে আসার কথা লিখে দিয়েছিলাম। এখন পুরো সময়টা পাখার নীচে কাটানোর ছিল। সূর্যাস্তের পর জল দিয়ে ছাত ধোয়া হলো। খানিকক্ষণ একটু গরম থাকল তারপর হাওয়া দিতে শুরু করল। রাত বড় মনোরম ছিল। আমার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না কিন্তু জনকলালজী সেদিনও অমৃতসর বেড়িয়ে এলেন।

৫ মে দশটার সময় একটু টুপটাপ বৃষ্টি হলো। সারাদিন মাটি আর আকাশ আগুন ওগরাতে লাগল। আজও আমি বাইরে কোথাও যাওয়ার নাম করলাম না। দুপুরটাতে একেবারে নীচের

[১] 'মে মাস এসে গেছে/ ঘাম ঝরছে আপাদমস্তক।'—স·ম

ঘরে পাখার তলায় কাটালাম। জনকলালজী শহর দেখতে লাগলেন। চা-খেতেও ইচ্ছে করছিল না। সাড়ে দশটার সময় ভাইয়াও দিল্লী থেকে এসে পড়লেন আর তাঁর সঙ্গে ভাবীজীর বোন কমলাও। এফ এস সি-র পরীক্ষা গত বছর দিয়েছিল। পাশ করে গেলে ডাক্তার হওয়ার পথ খুলে যেত। দেখাসাক্ষাতের জন্য আমি এখানে এসেছিলাম তা নইলে ঠাণ্ডা জায়গার বাসিন্দার কি এই ভাটায় আসাটা কখনো পছন্দ হয়? ছয় তারিখও কোনোরকম কাটালাম। ভাইয়া-ভাবীজীর সঙ্গে কিছু কথা বললাম। জনকলালজীর সঙ্গে কিছু। সারাদিন পাখা চলতে লাগল। আজ তাড়াতাড়ি করতে করতে ছটা বেজে ২৫ মিনিটে বেরোতে পারলাম। আমি ট্রেনের ব্যাপারে খুব সচেতন থাকি এবং এক ঘণ্টা আগে বেরোনোটা পছন্দ করি। এখানে রাস্তায় সত্যি সত্যি এত ভিড় ছিল যে, রিক্সা এগোনো মুশকিল হয়ে পড়ল। রেলের পুলে পৌঁছে মনে পড়ল দুটো ক্যামেরাই ফেলে এসেছি। জনকলালজী যদি আনতে যেতেন তাহলে ট্রেন ধরা যেত না। ভাবলাম এখন ওগুলোর বিশেষ দরকারও নেই। ভাই সাহেব নিজের সঙ্গে নিয়ে আসবেন। হাওড়া মেলে দেরাদুনের কামরা যুক্ত ছিল, তারই তৃতীয় শ্রেণীতে বসে পড়লাম। অম্বালা পর্যন্ত শোয়ার সুযোগ পাওয়া গেল, তারপর হরিদ্বার অব্দি ঠাসাঠাসি ভিড়। অমৃতসরে একজন লম্বা তিলকধারী আচারী সাধুবাবা কামরায় উঠলেন আর 'শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ' বলে এত জোরে চেঁচালেন যে, সারা স্টেশন মুখরিত হয়ে উঠল। মনে হয় বুড়ো হয়ে সাধু হয়েছিলেন সেজন্য আচার-আচরণ জানা ছিল না।

৭ মে সকাল সাতটায় এখনও টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। রাতেও কোথায় কোথাও বৃষ্টি হয়েছিল। হরিদ্বার পৌঁছে অন্ধকার কেটে গিয়েছিল। সওয়া সাতটায় আমরা দেরাদুন পৌঁছে গেলাম। শুক্লজীর বাড়িতে শ্রীমতী শুক্ল ম্যালেরিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কৃষ্ণকান্ত আর কমল এখন এখানেই ছিল। যদিও গরম এখানেও ছিল তবু যে ভাটা থেকে আমরা সদ্য সদ্য বেরিয়ে এসেছিলাম তার সঙ্গে এর কি তুলনা চলে? একটার সময় আমরা খলঙ্গা দেখতে গেলাম। এটা সেই খলঙ্গা যেখানে নেপালী বীর বলভদ্র নিজের বীরত্বে তাঁর শত্রু ইংরেজদের চমকে দিয়েছিলেন। শুক্লজীর বাড়ি থেকে এই জায়গাটি খুব দূরে নয়। প্রায় সবসময় শুকিয়ে থাকা নদী রিস্পনার বাম তীরে সামান্য উঁচু জায়গা রয়েছে যাকে টিলা বলা যায় না। এখানেই কিছুটা দুর্গ-পরিখার মতো করে বলভদ্রের নেতৃত্বে নেপালী সৈনিক প্রস্তুত ছিল। জেনারেল গিলেস্পীকে প্রাণ দিতে হলো এবং ইংরেজ সৈন্যদের পিছনে সরিয়ে নিতে হলো। শেষে ইংরেজরা খলঙ্গ অধিকার করতে পেরেছিল কিন্তু সে বহু কষ্টে। এখানে তারা একটি স্মারক রেখেছিল যাতে গিলেস্পীর সুখ্যাতি ছিল এবং বলভদ্রেরও। গিলেস্পীর সুখ্যাতি-সূচকটি কেউ লোপাট করে দিয়েছে।

ধোয়ার পর দেখা গেল পথযাত্রার ফিলম বেশির ভাগ ভাল হয়েছে। শ্রীসত্যেন্দ্রজী তাঁর সঙ্গে বদ্রীপুর নিয়ে গেলেন। তাঁর ৮৩-৮৪ বছরের বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই এখনও নীরোগ রয়েছেন এবং নিজের হাতে বাগানের কিছু কাজও করে থাকেন। তিনি দুটো পাকা পেঁপে দিলেন। বদ্রীপুর বাসমতী চালের জন্য আগে থেকেই বিখ্যাত। দেরাদুন শহরে কোনো বাসমতী হয় না। সবচেয়ে ভাল বাসমতী উৎপন্নকারী গ্রামগুলির মধ্যে বদ্রীপুরও রয়েছে। আজকাল আখচাষও এখানকার প্রধান জীবিকা হয়ে গেছে। ১১ বছর পর আমি বদ্রীপুর এসেছিলাম। মনে হচ্ছিল ঘর কিছু

বেড়েছে।

আট মে পৌনে দশটার বাস ধরলাম। কিংক্রেগ-এ নেমে একটার সময় আমরা দুজন হর্নক্লিফ পৌঁছে গেলাম।

ভ্রমণার্থীদের মরশুম

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ চলে এল। মুসৌরীতে ভ্রমণার্থীদের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে ড· বাচস্পতি আর শ্রীইন্দ্রপ্রভাও উপস্থিত ছিলেন। আমার ছোট ভাই শ্রীনাথ পাণ্ডেও এসেছিল আর ধূপনাথ বাবুকে তো আমি রেখেই গিয়েছিলাম। এক মাসের চিঠিপত্র নিয়ে তো আগে ঝামেলা পোহাতে হবে। তা খুব কঠিন ছিল না কিন্তু আর্থিক অনটন দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। এ তো তখন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল যখন আমি মুসৌরী এসেছিলাম। এমনিতে যেভাবে সময় কেটে যাচ্ছিল তাতে দুশ্চিন্তা করার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু যতক্ষণ ব্যাঙ্কে ছমাসের খরচ না থাকে মন কি করে শান্ত থাকতে পারে? অনিশ্চয়তা সবচেয়ে বেশি খোঁচা দেয়। শ্রীনাথ দশ তারিখে গেল। খুব লাজুক। দিল্লীতে অনেক বছর ধরে রয়েছে। তার কাজ হচ্ছে ওখানেই মিষ্টি বানিয়ে বাংলোয় বাংলোয় পৌঁছে দেওয়া। আমি একবার ২১০০ টাকা দিয়েও ছিলাম। তবে সে যদি কর্মদক্ষ হতো তাহলে এত বছর ধরে দিল্লীতে থেকে নিজের কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা কি করে নিতে পারত না? এখন আমি ওকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় ছিলামও না।

যদি মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত দোকানদারদের, বিশেষ করে শৌখিন দ্রব্য বিক্রেতাদের, বিক্রি ভাল না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তাদের পক্ষে সিজিন খারাপ। বেনারস হাউস-এর লোকেরা এ ব্যাপারে ছিল থার্মোমিটার। ভাল ভাল শাড়ি আর অন্যান্য দামী কাপড়ের তারা ছিল বিক্রেতা। বলছিল, জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে না। বহুদিন বাদে জমকালো উর্দিপরা রিক্সাওলাদের সঙ্গে ইন্দোরের পুরনো মহারাজা-মহারানীকে ঘুরতে দেখে অনেক লোক এই ভেবে খুশি হচ্ছিল যে, এবার মুসৌরীর ভাগ্য জেগে উঠবে, রাজা-রানী আবার কৃপা দৃষ্টি দিয়েছেন!

মুসৌরীতেও কখনো কখনো ভীষণ ঝড় ওঠে আর সেই সঙ্গে বৃষ্টিও। ১১ মে এমন আঁধি এল যে মনে হচ্ছিল ছাদ উড়ে যাবে। টিনের ছাদ উড়ে যাওয়াটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বাচস্পতিজী অত্যন্ত কর্মঠ যুবক। ইন্দু যদিও ছেলেবেলার মতো রোগা-পাতলা নেই কিন্তু তার শরীর অনেক সময়ই খারাপ থাকে। ড· বাচস্পতি অ্যাটমিক ফিজিক্সের পণ্ডিত ব্যক্তি। শরীর এবং বুদ্ধি—তাঁর দুইই চলতে থাকে। এইরকম মানুষ যদি সুযোগ পান তাহলে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন। এই সময় (মার্চ ১৯৫৬-তে) তিনি কানাডায় গবেষণা করতে গেছেন।

১৩ মে শ্রী জনকলালজী চলে গেলেন। তাঁর জন্য আমার হিমাচল-যাত্রা খুব ভাল হয়েছিল। তাঁর মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সারল্য রয়েছে, কিছুটা বাস্তবজ্ঞানহীনও কিন্তু স্বভাব খুব মধুর।

ঐতিহাসিক এবং পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে গভীর অনুসন্ধিৎসাও পোষণ করেন। এই কাজে তিনি নেপালের পশ্চিম প্রান্ত ভ্রমণ করে ফেলেছেন। সেখানকার বিষয় নিয়ে খুব কম অনুসন্ধান হয়েছে। এইরকম বন্ধুকে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে।

হরির আসা পাঁচ মাস হতে চলল। স্কুলে তার মন বসত না। রোজ এখান থেকে যেত। আমরা ভাবতাম পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু সে স্কুলে না গিয়ে অন্য জায়গায় নিজের সময় কাটিয়ে ফিরে আসত। অভিযোগ করত যে, ছেলেরা তাকে জ্বালাতন করে, একজন মাস্টার মশায়ও নেপালী দাই বলে ব্যঙ্গ করে এবং বলে যে তুমি তিন বছরেও ম্যাট্রিক পাস করতে পারবে না। এই রকম করা হলে স্কুলের পক্ষে তা খুবই খারাপ ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটা তা ছিল না। তার এখানে মনই টিকত না। একদিন পথে প্রিন্সিপ্যাল মালহোত্রাকে পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, 'হরি তো দু-মাস ধরে স্কুলে আসে নি। আমিই ইংরেজি ক্লাস নিই, আমি ওকে দেখি নি।' ২০ মে শেষ রহস্যটি প্রকাশ হয়ে গেল যখন সে প্রিন্সিপ্যালের নামে নিজে চিঠি লিখে নিয়ে এল। সে তার এতটা সময় নষ্ট করল। যদি আগেই বলত তাহলে ওকে কালিম্পং পাঠিয়ে দিতাম। লাজুক ছেলে, এখানে তার মন বসছিল না। যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন ভয়ের চোটে এখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেল। কমলার নানারকম চিন্তা হতে লাগল কিন্তু সন্ধেবেলায় কিদবাই-এর বাংলোর চাকরদের ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। পরে জানা গেল, এই ঘরেই কয়েক মাস ধরে তার স্কুল চলছিল।

জয়া ২০ মে নমাসের হয়ে গিয়েছিল। চলতে গিয়ে দুটো হাতই কাজে লাগাচ্ছিল, একটু-আধটু শব্দানুকরণও করছিল। আমরা ভেবেছিলাম, দাঁত ওঠার সময় ঝামেলা হবে কিন্তু দেখলাম তা নিজে নিজেই উঠে গেছে। তার স্বাস্থ্যও এখন ঠিক ছিল।

খরচাপাতির অসুবিধের জন্য এখন ব্যয় সংকোচ করার দরকার ছিল। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো যে হরি এবং ধূপনাথজীর সঙ্গে মঙ্গলও এখান থেকে চলে গেল। আমি এখানে আর দেরাদুনে চেষ্টা করলাম টাইপ করার কাজ যদি সে পেয়ে যায়। টাইপে ও খুব দক্ষ ছিল আর গতিও ছিল বেশি। আমার অনেক বই সে ডিকটেশন শুনে টাইপ করেছিল। আড়াই তিন ঘণ্টায় এক ফর্মা টাইপ করতে পারত। কিন্তু সব জায়গায় ম্যাট্রিক পাস হওয়া জরুরি ছিল। হিন্দি টাইপিস্টের জন্য এই যোগ্যতার কী দরকার? যে যোগ্যতা দরকার তা চোখের সামনে দেখা যেতে পারে। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল যার ফল বেরোল পরে। সব বিষয়ে পাস করে গিয়েছিল, শুধু অঙ্কে ন নম্বর কম ছিল। ফেল করে গেল। পরীক্ষা যে মানুষের জীবন নষ্ট করার জন্য, তা সামনে এগিয়ে দেওয়ার উপায় নয়, তা এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

ভ্রমণের মরশুমে কত পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। আর কত নতুন বন্ধু গড়ে ওঠে। শ্রীরুদ্রনারায়ণ শুক্ল ২৩ মে এলেন। তিনি ইংরেজ প্রকাশক ম্যাকমিলন কোম্পানির উত্তর-প্রদেশের ব্যবসার এজেন্ট। আমার জনা ছিল যে, সর্বরীদের মতো কনৌজিয়াদের মধ্যেও সাংকৃত্য গোত্রের মানুষ আছে। এটাও জানা ছিল যে কনৌজিয়া পরম্পরা অনুসারে তারা সর্বরিয়া থেকেই এসেছে। কিন্তু সর্বরিয়া সাংকৃত্য হয় পাণ্ডে আর কনৌজিয়া হয় শুক্ল। যাকগে, সগোত্রের বন্ধুত্ব তো আমাদের ছিলই। সেই দিন মণ্ডলেশ্বর স্বামী সর্বদানন্দজীও এলেন এবং মহাত্মাদের সঙ্গে এলেন। তাঁর সঙ্গে সাধুদের ভবিষ্যৎ তথা সংস্কৃত নিয়ে আলোচনা হতে লাগল।

আমি আমার ভাবনা জানিয়ে বললাম যে, সাধুদের সংখ্যা কমে যাবে এটা নিশ্চিত কিন্তু তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে না। সংস্কৃতের ভাগ্যও এখন তাদের ভাগ্যের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। আজীবন সংস্কৃতের বিদ্যার্থী হয়ে থাকা মানুষ এখন তাদের মধ্যে থেকেই পাওয়া যাবে।

পরের দিন স্বামী সত্যস্বরূপজী এলেন। 'তত্ত্বচিন্তামণি'-র্ নৌকা কতদূর এগোল সে সম্পর্কে কৌতূহল থাকারই কথা। এই কাজ তিনি করে যাচ্ছিলেন এবং এখন ততটা হতাশ মনে হচ্ছিল না। সেইদিনই বেনীপুরীও ঝড়ের মতো এলেন। মুসৌরীতে চার ঘণ্টার জন্য এসেছিলেন যার এক ঘণ্টা এখানেও দিলেন। শুনে খুব ভাল লাগল যে 'বেনীপুরী গ্রন্থমালা' স্বাগত জানানো হয়েছে। সাহিত্যিক যদি নিজের আয়ুষ্কালের শেষ দিনগুলিতে আর্থিক দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে তাহলে আমাদের দেশের পক্ষে সেটা একটা বড় ব্যাপার। বেনীপুরী এখন দুর্ভাগ্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। গ্রামে প্রাসাদ বানিয়ে নিয়েছেন এটা আমার ভাল লাগল না কারণ গ্রামের পাকাবাড়ি প্রয়োজনে একটা পয়সাও দেয় না। এটা নিশ্চিত যে বেনীপুরের প্রতি রামবৃক্ষের যত স্নেহ রয়েছে তার ছেলেদের ততটা থাকবে না। নাতি তো বোধহয় কখনো সেখানে উঁকি মারতেও যাবে না। নিজস্ব ধরনে প্রয়াস চালিয়ে কেউ গ্রামকে সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র বানাতে পারে না। সেটা দেশের শিল্পায়ন এবং কৃষির যন্ত্রনির্ভরতার ওপর নির্ভর করে, যা ভারতের পক্ষে এখন সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার বলে মনে হয়।

মরশুমের সময় মধ্যবিত্ত ভ্রমণার্থীরা মুসৌরীতে বেশি আসে বলে সভা-সম্মেলনও হতে থাকে। এবার শ্রীমানবেন্দ্র রায়-এর অনুগামী—র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টদের গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয় চলল যা ছিল এখান থেকে কাছেই—দেবদারু কোঠিতে। ওখানে আসা কয়েকজন বন্ধু আমার কাছেও এলেন। সবচেয়ে বড় সম্মেলন হলো দেরাদুনে। ৫-৭ জুন। কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্মেলনের গাড়ি তো স্বার্থের লড়াই-এর ফলে কাদায় ঢুকে গিয়েছিল। এ সময় প্রাদেশিক সম্মেলনকে জাগিয়ে রাখাটা জরুরি মনে করা হয়েছিল। উদ্বোধনী ভাষণের জন্য মন্ত্রী ড· উদয়নারায়ণ তিওয়ারী আমাকে লিখলেন। ওদিকে অভ্যর্থনা সমিতি ড· কাটজুকে দিয়ে উদ্বোধন করাতে চাইল। অভ্যর্থনা সমিতির অভ্যর্থনার জন্য টাকার দরকার ছিল, সেখানে ড· কাটজু এলে সুবিধে ছিল। পুঁজিপতিরা রাম-শ্যামের জন্য টাকা দেয় কি? আমি যদি আগে জানতে পারতাম তাহলে উদঘাটন করার ফাঁদ থেকে বেঁচে যেতাম। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু জানা গেল, দুজন উদ্বোধকই সেখানে আসবেন। আসল সময়ে ড· কাটজু এলেন না এবং আমাকে সেই কাজ করতে হলো। তাঁর জন্য যে অভিনন্দনপত্র তৈরি করা হয়েছিল তার ওপর কাগজ সেঁটে আমাকে দেওয়া হলো। সরকারের হিন্দি সম্বন্ধীয় বেয়াড়াপনার আমি কড়া সমালোচনা করতাম। সেজন্য আমাদের হিন্দি অনুরাগী বন্ধুরা চাইছিল যে আমিই উদ্বোধন করি।

পূর্ব-পাকিস্তান (পূর্ব-বাংলা)-এ মুসলিম লিগের ঘোর পরাজয় ঘটেছিল। হক মন্ত্রিসভা গঠন করলেন কিন্তু ওখানে তো গভর্নর জেনারেলের স্বেচ্ছাচারিতা ছিল। নীচ থেকে যখন সহায়তা পাওয়া গেল না তখন ওপর থেকে হুকুম বেরোল এবং মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া হলো। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের, যারা পাকিস্তানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের কি লাঠির তাদের জোরে দাবিয়ে রাখা যায়? পাকিস্তান সরকারকে নিজের থুতু আবার চেটে নিতে হলো কিন্তু সে অনেক পরে,

যখন নবাবজাদা মুহম্মদ আলীকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। পাকিস্তানের সংবিধানে হকের সহযোগিতা মুসলিম লিগকে নয়, তাঁকেই খুব বেশি মূল্য দিতে হলো। কিন্তু এর জন্য শুধু হককে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সুরাবর্দী প্রথমে মুসলিম লিগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করলেন যাতে হক এবং তাঁর দল রাজনৈতিক নির্বাসনে থাকে। বুড়োও এমন মার মারল যে সুরাবর্দী না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে গেল। এর ফল মুসলিম লিগের, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুদের পক্ষে খুব ভাল হলো। হকের দল তাদের নির্বাচনে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা অস্বীকার করল। পাকিস্তানের সংবিধানে না সংযুক্ত নির্বাচনকে মানা হলো আর না গণরাজ্যের সঙ্গে ইসলামিক গুণবাচক উক্তিকে সরানো হলো। নিজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং ওখানে অসুবিধে বেশি দেখে পূর্ব-বাংলা থেকে প্রচুর সংখ্যায় হিন্দু ভারত চলে আসছে। যদি সব হিন্দু ওখান থেকে চলে আসে তাহলে আর পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকবে না ।

৩১ মে ঘোরার সময় পথে স্যার সীতারামের সঙ্গে দেখা হলো। প্রতি বছরই তার দর্শন পাই। এ বছরে বিগত বছরগুলির পরিচিত মুখ খুব কম দেখা যাচ্ছিল। তাদের অভাব খোঁচা দিচ্ছিল। পৌরসভার লোকজন বলছিল, এ বছর অনেক লোক এসেছে। কিন্তু দোকানদাররা অভিযোগ করছিল যে বিক্রি হচ্ছে না।

২ জুন চিনী (কনৌর)-র হেডমাস্টার শ্রীসেমুবালজী এলেন। কনৌর হচ্ছে হিমালয়ের সেই স্থানে অবস্থিত যার প্রতি আমার বিশেষ ভালোবাসা রয়েছে। মিডিল স্কুল এখন হাইস্কুল হয়ে গেছে শুনে ভাল লাগল। সেমুবালজীর মতো কর্মঠ ও যোগ্য ব্যক্তি ওখানে গেছেন তা জেনেও ভাল লাগল, যদিও তিনি ওখান থেকে বদলি চাইছিলেন। গাড়োয়ালের লোক হওয়ায় পাহাড় তাঁর কাছে অরুচিকর ছিল না কিন্তু বলছিলেন যে খাওয়া-দাওয়ার জিনিসের খুব অসুবিধে। যদি ডাক-ব্যবস্থা থাকত তাহলে কলকাতা-বোম্বাই থেকে চিনীর যতটা মাশুল, রামপুর থেকেও ততটাই মাশুল লাগার কথা, কাজেই ডাকের সাহায্যে অনেক রকম খাবার জিনিসও আনানো যায়। কিন্তু জানা গেল তারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ বছর দুই সিনেমা তারকা প্রেমনাথ আর বীণা রায় মুসৌরীকে সৌভাগ্যবান করে তুলতে এসেছেন। যেদিকে যেতেন লোকের চোখ সেই দিকে ঘুরে যেত। আমি একদিন যাচ্ছিলাম, কেউ তাঁদের কথা বলল। বছরে এক-আধবার আমি কখনো কোনো ফিল্ম' দেখি বলে সিনেমা জগতের নক্ষত্রদের সঙ্গে পরিচিত না হওয়াটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

দেরাদুন—৫ জুন সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য দেরাদুন গেলাম। দেখলাম অনেক ভ্রমণার্থী নীচে পালিয়ে যাচ্ছে। কাল রাতে যে বৃষ্টি হয়েছিল। তারা ভাবল এবার তাদের ওখানেও বর্ষা পড়ে যাবে তাই গরমের ভয় নেই। বর্ষা যদিও ধোঁকা দিয়েছিল এবং এ বছর আসল বৃষ্টি প্রায় সারা জুন মাসে হলো না। মরশুম শুরু হলো ৪ জুলাই। কিন্তু এই সময় লোককে বিভ্রান্ত করে এই বৃষ্টি মুসৌরীকে বরবাদ করে দিল।

শুক্লজীর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় পৌঁছে গেলাম। পাঁচটায় সম্মেলনের সময় সেখানে গেলাম। এখনও রোদ ছিল। বাগানে গাছের ছায়া যথেষ্ট ছিল না। তবু রাতের বৃষ্টির

ফলে তাপমাত্রা একটু কম অবশ্যই ছিল। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ আমি দিলাম। সভাপতি ছিলেন হিন্দির প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রী বৃন্দাবনলাল বর্মা। তাঁর ভাষণ হলো, ট্যান্ডনজীও বললেন। লোকজনের উপস্থিতি যথেষ্ট ছিল, যদিও তা শহরের জনসংখ্যার সমান নয়। এই রকম হওয়ার কারণও আছে—শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের অধিকাংশ হচ্ছে শরণার্থী যারা হিন্দির সঙ্গে পরিচিত নয়। তাদের পরের প্রজন্ম হিন্দি পড়ছে কিন্তু সমাজে স্থান পেতে তাদের এখনও দশ-পনের বছর লাগবে। শিক্ষিত হলেও তাদের সাংস্কৃতিক মান উঁচু নয় বলে তারা সোৎসাহে এই রকম সমারোহতে অংশ নিতে পারে না। উদ্বোধন যদি নাও করতে হতো তবু আমি অবশ্যই এখানে আসতাম, কেননা এখানে সমস্ত প্রদেশ থেকে আসা সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা হতো। ড· উদয়নারায়ণ, বাচস্পতি পাঠক, শান্তিপ্রিয় ত্রিবেদী, গুরুভক্ত সিংহ 'ভক্ত', কমলেশ, শ্রীকমলাদেবী চৌধুরী ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হলো। সম্মেলন কর্তৃপক্ষ শিল্প এবং সাহিত্য-প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন। দেরাদুন জেলার সমস্ত সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম যতটা সম্ভব বেশি সেখানে রাখতে চেষ্টা করা হয়েছিল। আমারও বইগুলি সেখানে ছিল। দেরাদুনের চিত্রশিল্পী শ্রী সাক্‌সেনা চিত্র-প্রদর্শনীর খুব ভাল ব্যবস্থা করে ছিলেন।

৬ জুন টাউন হলে শ্রীবিশ্বম্ভরনাথ প্রেমীর সভাপতিত্বে কৌরবী ভাষা সম্মেলন হলো। হিন্দির মূল ভাষার এই নামটি আমি প্রচার করেছিলাম। কিন্তু আবিষ্কার করার ভাবনা নিয়ে নয়, আসলে মূল ভাষাটির কোনো নাম দেওয়া প্রয়োজন ছিল। আমিও তার অনেক নাম ব্যবহার করেছি। কখনো 'আদি হিন্দি' বলেছি, কখনো 'মিরাঠী', কখনো অন্য কিছু। শেষে 'কোরবী'ই মনে হলো তার সবচেয়ে উপযুক্ত নাম, কেননা এই ভাষা কুরু এবং কুরু জাঙ্গল (হরিয়ানা)-এ বলা হয়ে থাকে। আমাদের সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যের ইতিহাসে কুরুর স্থান খুব উঁচুতে। আমি গত পঁচিশ বছর ধরে খুব আগ্রহী ছিলাম যে কৌরবী লোক-সাহিত্যের একটি বৃহৎ সংগ্রহ করা হোক। বহু বছর ধরে তা অরণ্যে-রোদন হয়ে ছিল কিন্তু এখন তরুণ কুরুপুত্র সেদিকে বেশ মনোযোগ দিচ্ছেন জেনে খুব খুশি হলাম।

৭ জুন সাহিত্যসভা হলো। সম্মেলনে সাহিত্যসভার দিকে বেশি নজর দেওয়াটা দরকার। বৃহৎ অধিবেশন দ্বারা জনগণের কাছ পর্যন্ত হিন্দির খবর অবশ্যই পৌঁছে যায় এবং এটা উপেক্ষার বস্তু নয়। সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারকেও জানানো যায় যে তুমি বেশি দিন হিন্দিকে উপেক্ষা করতে পারো না। কিন্তু হিন্দি সাহিত্য নির্মাতা তো সাহিত্যকরা, তাঁরাই তার মাথা উঁচু করে তুলতে পারেন। যখন কোনো সম্মেলনের ফলে তাঁদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ মেলে তখন তাঁদের সমাগমে তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেকটা লাভবান হয়ে উঠতে পারেন। সভায় ড· দেবরাজ, শান্তিপ্রিয়জী আর কমেলশ্বরজীও বললেন। কয়েকজন তরুণ তাদের গল্প কবিতা আর একাঙ্ক নাটক শোনাল। মধ্যাহ্ন ভোজন হলো কংগ্রেস নেতা শ্রীলক্ষ্মণদেবের বাড়িতে। সেখানে ট্যান্ডনজী, তিওয়ারীজী এবং আমিও উপস্থিত ছিলাম। এর আগের দিনের মধ্যাহ্ন ভোজন অভ্যর্থনা সমিতি খুব সুন্দরভাবে করেছিল। দেরাদুনের মহিলারা সব কাজ নিজেদের দায়িত্বে নিয়েছিল। বুঝতে পারা যায় অন্যদের তুলনায় কুরু-কন্যারা বেশি দক্ষ। এখানেই দেরাদুনের বড় জমিদার শেঠ রামকিশোরের স্ত্রীও সেই মেয়েটির সঙ্গে এসেছিলেন যার সম্বন্ধে বলা হয় যে, সে তার পূর্বজন্মের মাকে চিনতে পেরেছিল এবং শেঠজীর বাড়ি গিয়ে

অনেক কিছু জানিয়ে দিয়েছিল। যে কন্যার অবতার বলে তাকে মনে করা হতো তাকে আমি ১৯৪৩ সালে দেখেছিলাম। সম্ভবত হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে সে এম এ পড়ছিল। কে জানে কী কী আকাঙ্ক্ষা আর উচ্চাশা তার ছিল? দেরাদুন তার মাধ্যমে অনেক সেবিকা পেত কিন্তু বেচারা যৌবনেই মারা গেল। তাতে বাবা-মায়ের দুঃখ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারপর যদি অবতারদের গল্প মিলে যায় তাহলে তা ডুবন্ত মানুষের কাছে খড়-কুটোর মতো অবলম্বন হয়ে উঠবে না কেন? ভারতবর্ষে এই রকম প্রত্যক্ষ পুনর্জন্মের গল্প কাগজে অনেক বেরোয়। এর মধ্যে অনেক তো নিছক ধোকাবাজি। যদি কোনোটিতে সত্যতার লেশ মাত্র থাকে তাহলে এটুকু বলা যেতে পারে যে, ভাবনার আদান-প্রদান কখনো কখনো ভাষা ছাড়া হয়ে যায়। বড় মানুষের ভাবনা ছোট বয়সের বাচ্চার মনে ঢুকে পড়তেই পারে।

৭ জুনই ড· তিওয়ারী, শ্রীবাচস্পতি পাঠক, শ্রীদেবনারায়ণ দ্বিবেদী এবং বন্ধুদ্বয় শ্রী জয়গোপাল-শিবগোপাল মিশ্রও মুসৌরী এলেন। দুদিনের জন্য হর্নক্লিফ নিজেকে 'অহোভাগ্য' মনে করল। আমিও তাঁদের শুভাগমনে কাজ থেকে মুক্তি নিলাম এবং মুসৌরী দেখিয়ে সময় কাটালাম। বাচস্পতিজী খুব আমুদে লোক। কত চুটকি যে তাঁর মনে থাকে কে জানে। তাঁর কলম দুর্বল নয় কিন্তু অন্য কাজের জন্য তিনি তাকে এখন বিশ্রাম দিয়ে রেখেছেন। একজন শিল্প-অনুরাগীর কথা বলছিলেন। পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ চতুর্বেদীর কাছে কিছু পুরনো সুন্দর ছবি ছিল। তিনি তা জানতে পেরে আটটি ছবি দেখার জন্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন। দেখার পরে খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে চতুর্বেদীজীর কাছে ফেরৎ দিতে গেলেন। সংখ্যায় ঠিকই ছিল কিন্তু চতুর্বেদীজী দেখলেন একটি ছবি বদলে নেওয়া হয়েছে। শিল্প-অনুরাগী ভুল স্বীকার করলেন এবং ফিরিয়ে দেবার জন্য সেই যে সেখান থেকে বেরোলেন তারপর প্রয়াগেও আর কোনো স্টেশন বসলেন না, গঙ্গা পেরিয়ে ঝুসীতে গিয়ে গাড়ি ধরলেন।

বন্ধু-সমাগমের এই আনন্দ ৮ জুন অব্দিই থাকল। ৯ জুন সবাই চলে গেলেন। আমার দেরাদুনে অনুপস্থিত থাকার সময় শাস্ত্রী বৈদ্য বাচস্পতি শ্রীঈশ্বরদত্ত বর্মা এসেছিলেন। পাঞ্জাবের মানুষ, কিন্তু তাঁর ইচ্ছে ছিল সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা পাহাড়ী লোকদের সেবা করার, এ জন্য নিজের স্ত্রীর সঙ্গে জৌনসার চলে গেলেন। বৈদ্যও বটেন আবার গল্প লেখকও। সেখানে দোকান এবং বাজার থেকে দূরে একটি গ্রামে তাঁকে নিযুক্ত করা হলো। দু-এক বছর পর্যন্ত তাঁর আদর্শবাদ তাঁকে সাহায্য করল। লোকজনের মধ্যে মিলেমিশে গেলেন। কিন্তু সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান মানুষ কতদিন বনবাস ভোগ করতে পারে? তিনি আবার সমতলে নিজের বদলি করিয়ে নিলেন।

মরশুমের সময় ড· সত্যকেতুর কাছেও আত্মীয়-অতিথিরা আসতে থাকে। এবার তার কন্‌খলের বোন ছেলে-মেয়ের সঙ্গে এসেছে। তারা ষাট প্রজন্মের নিরামিষাশী অগ্রবাল অথচ এখানে ভাইয়ের বাড়িতে সবাই মাংস খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করে মানুষ। সে আসার ফলে বাড়িতে মাংস বানানো মুশকিল ছিল। পিসির এই অবস্থা আর ভাগ্নী উষা হাড় চুষছিল। সামনের প্রজন্ম পুরনো প্রজন্মের আচার-বিচারের ওপর কিভাবে বুরুশ বুলিয়ে দেয় এটি ছিল তার উদাহরণ। এমন বোনের সামনে বাড়িতে মাংস কি করে রান্না করা চলে? তরুণ কমিউনিস্ট বেরিলির শ্রীবাস্তবজী এসে ছিলেন। তিনি আজ বিশেষ রকমের মাংস রান্নার কৌশল দেখিয়ে

ছিলেন। শ্রীশান্তিপ্রসাদ, বেদকুমারী, সত্যকেতু-পরিবার এবং আমরাও শ্রীবাস্তবজীর ভোজে সামিল হয়েছিলাম। বেদকুমারী গণিতে এম এ। বিকানীরে মেয়েদের স্কুলে পড়ান। তাঁর লোকগীতেরও শখ আছে। তিনি পাঞ্জাবী আর রাজস্থানী কিছু লোকগীত শোনালেন। গলা ভাল। গাওয়ার ভঙ্গীও ছিল স্বাভাবিক।

নমাসে পৌঁছে জয়া এবার তালি বাজাতেও শুরু করে দিল। 'ছাম নানী ছাম-ছাম' বললে আনন্দে তালি বাজাত, কাশিও নকল করত। খাওয়ার সময় অনেকদিন পর্যন্ত তার অভ্যাস ছিল ডান কানে হাত রেখে খাওয়া। বিস্কুট কোথায় থাকে তাও জানত। মানুষের সন্তান পৃথিবীতে এসে কিভাবে ধীরে ধীরে নিজের ভেতরের শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করে তা বাচ্চাদের দেখলে ভালভাবে বুঝতে পারা যায়।

১৩ জুন রোববার ছিল। আজ অনেক অতিথি এলেন। অন্ধ্রের চিত্রকর তরুণ কুমারিল স্বামী তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এলেন। আমাদের প্রতিবেশী ড· রামও সপরিবারে উপস্থিত হলেন। তাঁর ছোট ছেলে বিজ্জু গত বছর খুব অসুস্থ ছিল, এখন ভাল হয়ে গিয়েছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই ভাইয়া আর ভাবীজীও এসে পড়লেন। ভৃত্য সুখরামাকে ভাবীজী একটি হীরের টুকরোর মতো পেয়েছিলেন। সে তাঁর লাথি-ঝাঁটা সব চুপচাপ সইতে রাজি ছিল এবং কাজ করত মেশিনের মতো। আরাম-বিশ্রামের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল না—যা বদরাগী মালকিনের পক্ষে ভালই ছিল। খুব ভোরে উঠে রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করেই যেত। যে কাছে সে অভ্যস্ত ছিল তা নিজের মনেই করত, কিন্তু নতুন কাজ বলে দিতে হতো। সেদিন সুখরামা খুব সাহায্য করল। নইলে একজন চাকরের কাজ ছিল না তা। মুসৌরী যে খুব জমজমাট তা দেখার সুযোগ আমার কমই মিলত কিন্তু যখন তার এক প্রান্তে অবস্থিত আমার ঘরের অতিথি এসে পড়ত তখন বুঝতে পারা যেত যে, মুসৌরীর এখন আনন্দের সীমা নেই। আজ ইটাবার জেলা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি ঠাকুর সাহেবও এলেন। যমুনার তীরে ঔরৈয়ার কাছে কয়েক প্রজন্ম আগে তাঁদের এক রাজ্য ছিল। ৫৩ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরল এবং রাজ্য হস্তচ্যুত হলো। এঁদের বংশেরই পাঁচজন জগম্মনপুর ইত্যাদি জায়গায় রাজা হয়েছিলেন। রাজধানী প্রথমে চম্বল আর যমুনার সংগমস্থলে অবস্থিত ছিল। তাঁদের সন্তানরা এখানেই ইউরোপীয়ান স্কুলে পড়ে বলে স্ত্রী সবসময় এখানেই থাকেন এবং শীত-বর্ষায় ঠাকুর সাহেবও চলে আসেন।

১৫ জুন আগ্রা থেকে ড· গুপ্তর তার এলো যা থেকে জানা গেল কমলা বি এ পরীক্ষায় পাস করে গেছে। সে এবার ধীরে ধীরে শেষ সিঁড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। দুঃখ নিশ্চয়ই ছিল যে সব বিষয় সে নেয় নি, তবে এখন এম এ-র পথ খোলা ছিল।

১৮ জুন কম্যুয়ুনের শ্রীচন্দ্রশেখর শাস্ত্রী এলেন। তিনি বেনারসে সায়েন্স পড়ান। কয়েক বছর ধরে নেপাল আর তিব্বতের বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছিলেন। শ্রীবালকৃষ্ণ শর্মা সেটার সম্বন্ধে আমাকে বলেছিলেন। নেপালের রাজা অংশুবর্মার কন্যা 'ভৃকুটি' তিব্বতের প্রতাপশালী সম্রাট স্রোংগচন গম্বোকে বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়ে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করায় খুব কাজে লেগেছিল। 'ভৃকুটি' তাঁর উপন্যাসের নায়িকা ছিল। তিনি উপন্যাসের অনেক জায়গা পড়ে শোনালেন। এমনিতেই উপন্যাস জিনিসটা সোজা নয়, তার ওপরে ঐতিহাসিক উপন্যাসে তো খুব ধৈর্য ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বর্তমান সমাজ

আমাদের সামনে আছে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমরা জানি। তাই আজকের সম্বন্ধে উপন্যাস লেখার অনেক সুবিধে রয়েছে। বিগত যুগের সমাজের উল্লেখ আমরা খুব কম পাই, তার উপযুক্ত তথ্যও দুর্লভ। এই সব কিছু একটি একটি করে সংগ্রহ করতে হয়। খুব সাবধানে কলম ধরতে হয় যাতে কোথাও এরকম কোনো ব্যাপার না লেখা হয়ে যায় যা সেই সময়ের দেশ-কাল-পাত্রের প্রতিকূল।

১৯ জুন শ্রীজগদীশ চন্দ্র মাথুর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এলেন। মাথুরজী হিন্দি নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন, সেই সঙ্গে হিন্দি-সাহিত্য তথা লোকশিল্পের প্রতিও তাঁর অসাধারণ অনুরাগ রয়েছে। বিহারের শিক্ষা-সচিব হয়ে তিনি লোক-রঙ্গমঞ্চের জন্য অনেক কাজ করেছেন। হিন্দিতে সৃজনশীল কাজের জন্য বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদের মতো একটি সম্পন্ন সংস্থা তৈরি করে দিয়েছেন। ভোজপুরীর গণনাট্যকার ভিখারীকে আমাদের সাহিত্যিকরা গ্রাম্য মনে করে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখত। আমি আগে থেকেই ভিখারী ঠাকুরের ক্ষমতা স্বীকার করতাম। মাথুর সাহেবের কাছে শুনে খুব আনন্দ হলো যে, তিনি ভিখারীর সব নাটক সংগ্রহ করে ফেলেছেন এবং নাট্যকার তাঁর জীবনীও পদ্যে লিখে দিয়েছেন। জন্মভূমি সুরজার কাছে হওয়ায় তাঁর পক্ষে দিল্লী অনুকূল ছিল কিন্তু বিহারের লোক তাকে ছাড়তে রাজি ছিল না। তবে শেষকালে দিল্লী তাঁকে আকৃষ্ট করল। তিনি সেখানে রেডিওর মহাসঞ্চালক হয়ে এলেন। রেডিওর খুব লাভ হলো কিন্তু বিহারের হলো বড় ক্ষতি।

২০ জুন হিন্দির প্রসিদ্ধ গল্পকার বিষ্ণু প্রভাকর এলেন কুমারিল স্বামীর সঙ্গে। আমি বিষ্ণুজীর কাছে অভিযোগ করলাম, 'আপনি কুরুপুত্র হয়ে নিজের গল্পে কৌরবী ভাষা কেন ব্যবহার করেন না?' উপন্যাস আর গল্প এমনই মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে আমরা হিন্দির মূলভাষা কৌরবীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। প্রেমচন্দজী বহু ভোজপুর শব্দ খুব সুন্দর ভাবে তাঁর গল্পগুলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বিষ্ণু প্রভাবকরজীর মতো গল্পকার নিজের জায়গার জীবন চিত্রিত করতে গিয়ে খুব সহজেই কৌরবী বাগধারা এবং শব্দ আনতে পারেন। এর ফলে নিজের মূলস্রোতের সঙ্গে হিন্দির সজীব সম্বন্ধ গড়ে উঠবে, যা তার পক্ষে খুব মঙ্গলজনক।

শ্রীনগর গাড়োয়াল থেকে ২১ তারিখে ড· উদয়নারায়ণ তিওয়ারীর চিঠি এল। মুসৌরীতে আসায় মনে হয়, হিমালয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মেছিল। স্ত্রীকে হয়তো বলেছিলেন। তিনি আগ্রহ দেখালেন না। আমিও জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, কেদার-বদ্রী যাওয়া এখন খুব সহজ, অনেক দূর অব্দি গাড়ি চলে গেছে। দুজনে সেই যাত্রাতে বেরিয়ে ছিলেন।

২৩ জুন ব্যারিষ্টার শ্রী মুকুন্দীলালজীও এলেন। আগের সাক্ষাতের পর থেকে মধ্যবর্তী সময় এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে দু-ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হতে লাগাল। আনন্দের ব্যাপার যে, এইরকম বিদ্যানুরাগী পুরুষের সঙ্গে বছরে দু-তিনবার সাক্ষাত হতো।

পরেরদিন একজন আমেরিকান মিশনারির সঙ্গে এক তরুণ এলেন। মিশনারি জৌনপুর এলাকায় ধর্মপ্রচার করতেন। ছ-বছর ধরে ভারতে ছিলেন। হিন্দি বলতে পারতেন। আগে আলমোড়া জেলায় জোহার অঞ্চলে থাকতেন। আমেরিকান মিশনারিদের তিব্বতের সীমার কাছাকাছি থাকাটা রহস্যপূর্ণ কোনো ব্যাপার নয়। আমেরিকা থেকে উদারভাবনা সম্পন্ন কোনো লোকের ভারতে এসে কাজ করার অনুমতি কখনো মিলত না। ওখান থেকে এমন লোককেই

পাঠানো হতো যে আমেরিকান পুঁজিবাদের সমর্থক। ভারত তিব্বতের সীমার ৫০ মাইল পর্যন্ত বিদেশী মিশনারিদের যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বিদেশী মিশনারিদের যে প্রায় সবাই আমেরিকান তা বলার দরকার নেই। তারা অভিযোগ করছিল যে জোহারে তাদের থাকতে দেওয়া হয় নি।

আমাদের রান্নাঘরে আগে সাত-আটটা গর্তওলা একটা উঁচু উনুন বানানো ছিল। যারা বানিয়ে ছিল তারা কেমন করে বানিয়েছিল কে জানে। ধুঁয়োর চিমনি থাকা সত্ত্বেও ঘর থেকে ধুঁয়ো বেরোত না। আমি একাধিকবার ভেঙে ধুঁয়ো বেরোনোর রাস্তা থাকবে এই রকম উনুন বানালাম কিন্তু সফল হলাম না। ৬০ টাকা দিয়ে এই বছরও উনুন বানালাম কিন্তু যেমনকার তেমনি থাকল।

আর্থিক চিন্তা দূর করার একটিই রাস্তা—আয় নিশ্চিত করা। একজন প্রকাশকের সঙ্গে কথা হলো। তিনি অগ্রিম দিতে রাজি হলেন এবং কিছুটা দিলেনও। আরো জানা গেল যে এবার কথা পাকা হয়ে যাবে কিন্তু শেষে সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। আরো কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে এই রকম হলো। হিন্দি সাহিত্যিকদের অসুবিধে আমি বেশ বুঝতে পারতাম। আমার বইগুলির ভাল বিক্রি আছে তবু যখন এই রকম অবস্থা তখন নতুন সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আর কী বলব? আমাদের এখান থেকে তিনটে বই আমরা প্রকাশ করে ছিলাম। ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বইয়ের জন্য দু-আড়াই হাজার করে টাকা দেনা হয়ে গেল। অথচ বিক্রির কোনো ব্যবস্থা করতে পারলাম না। এক ভদ্রলোককে এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫০-৬০ টাকা আমি দিলাম। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো যে, ড· সত্যকেতুকেও গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে বললাম। আমার প্রতি বিশ্বাসে তিনি তা দিয়েছিলেন কিন্তু সেই ভদ্রলোক খেয়ে উড়িয়ে বসে থাকলেন।

সম্প্রতি ভারতে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এসেছিলেন। ভারতীয় জনগণ সর্বত্র তাঁকে উদারভাবে স্বাগত জানাচ্ছিল। চীনের ব্যাপারে ভারত সরকারও নিজের সদ্ভাব দেখাতে কারু থেকে পিছিয়ে থাকে নি। তিনি যেখানে গেছেন, লোকে তাঁকে মাথায় করে রেখেছে। ভারত আর চীনের দু-হাজার বছরের সম্বন্ধ দুটি দেশের পক্ষেই অবিস্মরণীয় ব্যাপার, তাই চীনের প্রধান মন্ত্রীকে এই রকম স্বাগত জানানোই উচিত। ২৯ জুন তিনি ভারত যাত্রা শেষ করে বর্মার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

এশিয়ার খুব বড় অংশে সুখ-সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে। ওদিকে পৃথিবীর রাহু আমেরিকা নিজের চালবাজি থেকে বিরত থাকতে রাজি নয়। গুয়াতেমালায় একটু উদার সরকার গড়ে উঠল, যারা আমেরিকান ডাণ্ডাবাজি বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে কি হলো,ডলার বর্ষণ করে সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের সমর্থক পাঠাল। অস্ত্র দিল। এই সমস্ত কাজ নির্লজ্জের মতো করার জন্য আমেরিকা গর্ব করছিল। শেষকালে আমেরিকান সমর্থকরা সেখানে সরকারের কাজকর্ম সামলাল। পরের বছর আমেরিকা আর্জেন্টিনাতে এই ব্যাপার ঘটাল এবং সবচেয়ে ক্ষমতাশালী প্রতিক্রিয়াশীল তথা পুঁজিবাদ-সমর্থকদের শাসনের লাগাম সামলানোর জন্য সাহায্য করল। যতদিন যাবৎ আমেরিকান পুঁজিবাদ পৃথিবীতে উৎপাত ঘটাতে থাকবে ততদিন মানবতার অভিশাপ চলতে থাকবে।

২ জুলাই লক্ষ্ণৌয়ের চিত্রকর শ্রীরামচন্দ্র সাথী এলেন কুমারিলের সঙ্গে। সাথী উদীয়মান

চিত্রকর। ওস্তাদির নামে আমি যেরকম সংগীতের দুর্গতি বরদাস্ত করতে পারি না, সেই রকমই নানান ভণ্ডামির নামে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং প্রকৃতির একেবারে বিপরীত চিত্রকলাও আমি পছন্দ করতাম না আর আমার এই ভাবনা প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা করতাম না। নবীন-প্রবীণ এরকম অনেক ওস্তাদ আমাদের দেশে রয়েছে এবং যখন থেকে বিদেশে নাক-উঁচু লোকেরা এদের মাথায় তুলতে শুরু করেছে তখন থেকে আমাদের এখানকার লোকদেরও সাহস বেড়ে গেছে। সাথীর ছবি দেখে এটা ভাল লাগল যে, তাঁর পা রয়েছে শক্ত মাটির ওপর। কঠিন পৃথিবীতে পা রেখেও মানুষ যে কল্পনার পাখনা মেলে আকাশে পৌঁছতে পারে তা অজন্তার চিত্রকলা থেকে আমরা বুঝতে পারি। সাথীর কয়েকটি কল্পনাময় ছবি এইরকম ছিল।

৩ জুলাই কিতাব মহলের রয়্যালটির হিসেব এলো। জানা গেল, গতবছর ১৭০০ টাকা আয় হয়েছে অর্থাৎ তার ভরসায় আমি মাসিক দেড়শো টাকাও খরচ করতে পারি না। কখনো কখনো ভাবতাম, এমন সময়ও গেছে যখন পঞ্চাশ টাকাতেও আমার কাজ চলে যেত। তবে সে-সময় আমি ভবঘুরে ছিলাম, নির্ঝঞ্ঝাট ছিলাম, নিজের চাদর অনুযায়ী পা ছড়াতে পারতাম। এখন তো সে রকম ব্যাপার নয়। জয়া রয়েছে সামনে। সে প-প-, অঁ-অঁ বলতে শুরু করেছিল। নমস্তে, তা তা আর ভু (ভূত)-ও বলছিল। অন্যের মুখভঙ্গি দেখে সে তার মনোভাবও বুঝে যেত। এমনিতে কাঁদত না, হাসত এবং হাসাত। জয়াকে এই পৃথিবীতে আনার জন্য দায়ী ছিলাম আমরা, এটি ভেবে মন আরো ভারি হয়ে যেত। তার সামান্য সর্দি হয়েছিল। পরের দিন একটু জ্বরও হলো। ভাইয়া পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দিতে চাইলেন কিন্তু ছুঁচ ঢোকানো গেল না। বেচারার শুধু শুধু কষ্ট হলো।

সামান্য রাগ হলেই সুখরামার গায়ে হাত তোলাটা ভাবীজীর কাছে সাধারণ ব্যাপার ছিল। তিনি ভাবতেন ও নিরেট বুদ্ধু, বুদ্ধির ছিটেফোঁটা নেই। সে মার খাওয়া সহ্য করে আসছিল বলেও ঐ ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল। ৫ তারিখে সে পালিয়ে গেল। এবার বোঝা গেল, কত ধানে কত চাল। কড়া মেজাজের মালকিনের জন্য এমন চাকর সহজে পাওয়া যায় না। ভাইয়াও পছন্দ করতেন না যে, তাকে নিরেট পশু ভাবা হোক।

আজকের খবর থেকে জানা গেল যে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বেচ্ছাচারী শাসন কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল। কমিউনিজম কোথায় আর আইনের ছায়ায় পালিত হয়েছে? ইন্দো-চীনে ভিয়েতনামীদের হাতে ফ্রান্স বিচ্ছিরিভাবে মার খাচ্ছিল। আমেরিকার সাহায্য কোনো কাজে আসছিল না।

৬ জুলাই আমার অনুজ শ্যামলালের দ্বিতীয় পুত্র রামবিলাসের চিঠি এলো। সে লিখেছিল ৫ তারিখে। চিঠির কিছু অংশ ছিল—'বাবার অবস্থা এখন সেইরকম, যেমনটি মারা যাওয়ার কিছু আগে দাদুর হয়েছিল। তিনি কেবল একটি নরকংকালের মতো রয়েছেন। যে জমি আর সম্মান তিনি নিজের রক্ত দিয়ে তৈরি করেছিলেন, তা তাঁর সামনেই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এইরকম অবস্থায় দাদুর মতো তাঁর পাগল হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্যজনক নয়। ঘর প্রায় ভূমিসাৎ হয়ে পড়েছে। এই বর্ষায় হয়তো আর বাঁচানো যাবে না। গরুর সংখ্যা দুটি, তারাও স্বাস্থ্যবান নয়।...বর্তমান পরিস্থিতিতে এ বছর ধান ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব নয়, বোঝা যাচ্ছে। এমন হতে পারে, ঐ সব জমি খোয়াতে হলো। সে অবস্থায় কনৌলার সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে

যাবে।' হয়তো পরিস্থিতির ফলে কিছুটা অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটি যে দুঃখজনক, তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু উপায় কী? আমাদের আর্থিক অবস্থা কোনো রকম সাহায্য করার মতো ছিল না। দেশের কঠিন পরিস্থিতি আমার সামনে মূর্ত ছিল। ভারতে এরকম লাখ লাখ ঘর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কালকের ভালভাবে খাওয়া-পরা করা পরিবার আজ অসহায় হয়ে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে ধ্বংস চারপাশে হচ্ছে কিন্তু সৃষ্টি কোথাও নেই।

অপরাহ্নে শ্রীমতী রজনী পনিক্কর তাঁর স্বামী কপ্তান পনিক্করের সঙ্গে এলেন। পাঞ্জাবী নৈয়র শ্রেণীর লোকেরা নিজেকে নায়র বানিয়ে মালাবারীদের ভ্রম তৈরি করেছে। হিন্দি গদ্য লেখিকা রজনীজী মালাবারীকে বিয়ে করে সত্যি সত্যি মালয়ালী হয়ে গেছেন। ছ-বছর আগে যখন তাঁকে সিমলায় দেখেছিলাম তখন রোগা পাতলা ছিলেন। এখন অতিরিক্ত মোটা হয়ে গেছেন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন। খবর পেলাম শ্রীপ্রভাকর মাচবে রেডিও ছেড়ে এখন সাহিত্য অকাদেমিতে চলে এসেছেন। তাঁর পক্ষে এটা ছিল বেশি উপযুক্ত স্থান।

পরের দিন বিকেলে ঘুরতে গেলাম। ২২ বছর পর মাদাম মোরাঁর দর্শন পেলাম। ১৯৩২ সালে প্যারিসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখন দিল্লীতেই থাকেন। সেখানে অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে কাজ করেন। চলতে চলতে কিছুক্ষণ কথা হলো।

৪ জুলাই রাত থেকেই বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ৮ তারিখও রাত থেকে শুরু হলো আর পরের দিন দুপুর পর্যন্ত টানা চলতে লাগল। তারপরে কখনো জোরে কখনো টিপটিপ করে হতে লাগল। আকাশ কদাচিৎ মেঘহীন ছিল। বর্ষা এবার তার অভাব পূরণ করতে চাইছিল। সাধারণ ভ্রমণার্থীরা চলে গিয়েছিল এবং পাঞ্জাবের ভ্রমণার্থীরা এখন তাদের জায়গা নিচ্ছিল।

মুসৌরীর হিতৈষীদের মধ্যে বৈদ্য শম্ভুনাথজীও আছেন। তিনি ডি এ বি ফার্মেসির পরিচালক। গ্রীষ্ম-বর্ষায় এখানে থাকেন, শীতে দেরাদুন আর দিল্লীতে নিজের কাজ দেখতে দেখতে প্র্যাকটিস করেন। তাঁর দুটি মেয়ে। ৯ তারিখে জানতে পারলাম, তিনি একটি পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। আজকালকার যুগে কোনো শিক্ষিত লোক মেয়ে থাকা সত্ত্বেও ছেলে দত্তক নিচ্ছেন এটা ভাবাও যায় না। নামের জন্য? সে তো নিজের প্রপিতামহর নামও খুব কম লোকই জানে।

১১ জুলাই রোববারে শ্রীমতী সুধা তাঁর স্বামী শ্রীপ্রতাপসিংহর সঙ্গে এলেন। ডা· মঙ্গলদেবের কন্যাকে তার সব ভাইবোনসহ আমি ছোটবেলা থেকেই জানতাম। সবসময় দেখতে থাকলে মানুষ আশ্চর্য হয় না কিন্তু দশ-বারো বছরের মেয়েকে যখন বারো বছর পরে দেখার সুযোগ মেলে তখন কেন আশ্চর্য হবে না? জানলাম তার এক ভাই ডাক্তার, এখন আসামে আছে। ড· মঙ্গলদেবজী এখন ভারমুক্ত। ছেলেরা কাছে ঢুকে গেছে আর মেয়েরা বিয়ে হয়ে তাদের স্বামীর সংসারে চলে গেছে।

১৪ তারিখে কোনো একটি পত্রিকায় ড· রামবিলাস শর্মার লেখায় চোখ পড়ল। মতভেদ হওয়াটা কোনো খারাপ ব্যাপারে নয়। দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে তাকেও আমি স্বাগত জানাই। তিনি সম্মানহানিকরভাবে এই কাজটি করেছিলেন, আমাকে উত্তেজিতও করে দিয়েছিলেন কিন্তু তার জবাব দিতে আমার ভাল লাগে নি, অন্যেরাই তার জবাব দিয়েছিল। এবার দেখলাম তিনি লিখেছেন—'সরকার রাহুলজী আর ড· রঘুবীরকে লাখ লাখ টাকা দিয়ে পরিভাষা বানাচ্ছেন।' এই পরিষ্কার মিথ্যার কি কোনো শেষ আছে? এরকম মানুষ কি করে বিপ্লবের সমর্থক হতে

পারে? একজন প্রতিভাশালী লোকের এই রকম অধঃপতনে আমার খুব দুঃখ হলো। পরিভাষার কাজ সরকার মন দিয়ে করাতে চাইলে আমি সহযোগিতা করতে সম্মত ছিলাম। সংবিধানের পরিভাষাগুলি নির্মাণে আমি না করেও ছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম শিক্ষা-মন্ত্রাণালয় তাতে বাধা দিতে চাইছে তখন আমি তার থেকে সরে গেলাম। ড· রঘুবীর এবং আমার পরিভাষা নির্মাণ সম্বন্ধীয় নীতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করাতে এটাই বোঝা যাচ্ছিল যে, শর্মাজী অত্যন্ত নীচে নেমে গেছেন।

১৫ জুলাই জামা কাপড় রাখার আলনা ধরে জয়া দাঁড়াল, র‍্যাক তার ওপর পড়ে গেল। আঘাত লাগল। ভীষণভাবে কাঁদতে শুরু করল। বাচ্চাদের যতই আগলে রাখা হোক এইরকম কোনো না কোনো ঘটনা ঘটেই যায়। বিশেষ করে সে যখন তার হাত-পা ব্যবহার করতে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠে। দশ মাস বয়সে জয়া হাত-পায়ের ওপর ভয় করে মাটিতে ভালভাবে হামাগুড়ি দিত। এই সময় খাট থেকে নীচে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। চারটে দাঁত উঠেছিল। কয়েকটি শব্দের অনুকরণও করত।

যদিও ভাষা-বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন যে, হিন্দির মূল ভাষা হচ্ছে কৌরবী অর্থাৎ সেই ভাষা যা গঙ্গা-যমুনার মাঝের সাহারানপুর, মুজফ্ফরনগর, মীরাটের সম্পূর্ণ অংশ, বুলন্দ শহরের অর্ধেক জেলা, গঙ্গার পূর্বে বিজনৌর জেলা এবং যমুনার পশ্চিমে পাঞ্জাবী-মারোয়াড়ী-ব্রজ-এর সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশে বলা হয়ে থাকে। শ্রীঅম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী তাঁর একটি লেখায় এই ধারণাটি একেবারে ভুল বলেছেন। 'কৌরবী হী হিন্দী কা মূল বোলী হ্যায়'-এই বিষয়ে একটি বড় লেখা আমি 'সম্মেলন-পত্রিকা'র জন্য লিখে ফেলেছি।

ইন্দোচীনে ফ্রান্স আমেরিকার প্ররোচনায় লড়ছিল এবং চাইছিল এখনও সেখানে পুরনো উপনিবেশ বহাল থাকুক। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়ার মানুষ ইউরোপের জোয়াল কাঁধে তুলতে রাজি ছিল না। কোরিয়াতে সিঙ্গমনরীর দলকে আমেরিকা উসকানি দিল এবং তার চামচাদের কাছ থেকেও সাহায্য পেতে চাইল কিন্তু পরিণাম হলো এই যে, আমেরিকান তরুণদের নিয়ে গিয়ে প্রচুর সংখ্যায় মৃত্যুর মুখে ফেলতে হলো। ইন্দোচীনে কোরিয়ার মতো তারা সোজাসুজি আসতে চাইছিল না। ঘরপোড়া গরু ছিল, ফ্রান্স কতদিন তার তরুণদের রক্তে হোলি খেলবে? আমেরিকা জোর করতেই লাগল কিন্তু ফ্রান্স স্থায়ী সন্ধি করে নিল। সারা পৃথিবীতে সেদিন আনন্দ প্রকাশ করা হচ্ছিল এবং আমেরিকান পুঁজিপতিদের ঘরে মৃত্যুর বিষণ্ণতা ছেয়ে গিয়েছিল।

কয়েকটি চাইনিজ খাদ্যে আমার আর কমলার রুচির মিল আছে। কালিম্পঙে কমলার আশেপাশে চীনা ভোজনালয় ছিল যেখানে ছেলেবেলা থেকেই সে অনেক রকম জিনিস খেয়ে পরিচিত। আমার মোমোর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তিব্বতে। ডিম দেওয়া সেমুই এবং কিমার মিশ্রণ গ্যা-থুক্ (চীনা স্যুপ)ও খুব ভাল লাগত। মুসৌরীতে কুল্‌হড়ীর 'কোয়ালিটি'-এর ভোজনালয় সব রকম খাবারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। ২২ জুলাই ভাইয়ার বাড়ি যাওয়ার সময় আমরা সেখানে ঢুকে পড়লাম, ভাবীজী হয়তো খাবার বানিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু কোয়ালিটি তার ভেতরে আমাদের টেনে নিল। খাবারের দাম ছিল বেশি। চাউচাউ আমার পছন্দ হলো না তবে গ্যা-থুক্ সুস্বাদু লাগল। ভাবীজীর বাড়িতেও কিছু খাওয়া দরকার ছিল তা নইলে তাঁর রান্না

করা খাবার নষ্ট হতো।

আমার পরামর্শে শ্রীসদানন্দ মেহতা পি এইচ ডি-র জন্য ভারতীয় ভৌগোলিক গবেষণাকারীদের নিয়ে থিসিস লিখতে রাজি হয়েছিলেন। প্রথমে আমি চেয়েছিলাম দেরাদুনে ডি এ বি কলেজের কোনো প্রফেসরের তত্ত্বাবধানে উনি কাজ করুন, কেননা মেহতাজী এখন ওখানেই সার্ভে বিভাগে কাজ করছিলেন। দু-তিনজনের কাছে চিঠিপত্র লেখালেখি করলাম। কখনো তমুক বাধা আসে আবার কখনো তমুক বাধা। ২৪ জুলাই সন্ধেতে মেহতাজী এলে জানা গেল আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সুপারভাইজার করেছে।

ভাইপোর চিঠি পেয়ে খুবই চিন্তা হয়েছিল যদিও তেমন কোনো সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ২৬ জুলাই শ্যামলালের চিঠি এলো। সে ঘরের অভাব-অভিযোগের কথা কখনো আমাকে বলত না। ঘরের জমিদারীতে মাত্র কয়েকজন ভাগচাষী এখন জমির মালিক হয়ে গিয়েছিল। সেই ক্ষতিপূরণ বাবদ আমার নামে ৮২ টাকা প্রাপ্য ছিল, যা নেওয়ার জন্য লেখার ব্যাপারে সে কোনো কাগজ পাঠিয়েছিল। এখনো ৩৫-৪০ একর খেত তার কাছে ছিল। পুরনো দিনের মতো অন্যের ভরসায় এখন কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। বড় ছেলে এম এ পাস করে এখন বাইরে স্কুল-মাস্টারি করছিল। অন্য ছেলেটি দিল্লীতে ক্লার্কের কাজে ঢুকেছিল। বাড়িতে আরও দুটি ছেলে ছিল যারা ডীহা হাই স্কুলে ম্যাট্রিক পড়ছিল। আমার ছেলেবেলায় এখানে প্রাইমারি স্কুল ছিল তবে আমাদের গ্রামে পড়ুয়া ছেলে থোড়াই ছিল যে তিন মাইল হেঁটে তারা এখানে আসবে। শ্রীনাথের দুই ছেলে তার সঙ্গে দিল্লীতে ছিল। পরের প্রজন্মের কেউ চাষবাস দেখতে ইচ্ছুক ছিল না কেননা সবাই শিক্ষিত হয়ে গেছে, আর চাষবাস নিজের বাহুবলেই হওয়া সম্ভব।

২৭ তারিখে বন্ধু পৃথিবী সিংহজী এলেন। সর্দার পৃথিবী সিংহের সঙ্গে আমার যে খুব ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তা জীবন-যাত্রার দ্বিতীয় খণ্ড থেকে বোঝা যাবে। এখন তাঁর শরীরে বয়সের ছাপ চোখে পড়ছিল। স্বাস্থ্যের কারণেই কাশ্মীর যাওয়ার পথে তিনি এখানে এসেছিলেন। তাঁর জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণে আমি আরো কিছু কথা যুক্ত করতে চাইছিলাম, কেননা তা লেখা দশ-এগারো বছর হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ-ছটা দিন ভাল কাটল আর জীবনীর জন্যে অনেক তথ্যও পেয়ে গেলাম। এই দ্বিতীয় সংস্করণটি বেনারসের 'জ্ঞানমণ্ডল' প্রকাশ করেছে। সর্দার পৃথিবী সিংহের সারাটা জীবন দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে কেটেছে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর যখন তিনি আমেরিকার সুখের জীবনকে লাথি মেরে বিপ্লব করার জন্য ভারতে এলেন। তাঁর বয়স কম দেখেই তাঁকে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেওয়া হলো তা নইলে তরুণ করতার সিংহের মতো তাঁকেও ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হতো।

প্রতি সপ্তাহে দু-তিনবার ভাইয়ার (স্বামী হরিশরণানন্দ) আগমন ঘটতে লাগল। আমাদের আর্থিক সমস্যার কথা তিনি কোনোরকমে জানতে পেরে গেলেন আর যখন এটাও শুনলেন যে আমি হয়তো দেশের বাইরে যাওয়ার কথা ভাবছি তখন একদিন (৩ আগস্ট) গম্ভীর অথচ সহজভাব নিয়ে বললেন, 'বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। আমার কাছে যথেষ্ট আছে।' আমি তাঁর সহৃদয়তা ও উদারতা বুঝতে পারতাম, আর এটাও বুঝতাম যে, আমাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। তবু, আমি তো নিজের পায়েই দাঁড়াতে চাই, তা না করে অন্য রাস্তা ধরা আমরা

পছন্দ ছিল না।

এখন পর্তুগীজ ও ফ্রেঞ্চ অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলির স্বাধীনতার আন্দোলন চলছিল। ভবিতব্যতা সম্বন্ধে ফ্রেঞ্চ খানিকটা ভাবতে পারছিল। একমাস ধরে পর্তুগীজ স্বেচ্ছাচারীরা আমেরিকা আর ইংলন্ডের বলে বলীয়ান হয়ে বড়াই করছিল। কিন্তু ফ্রেঞ্চ গ্রামগুলিও কোনো বলিদান ছাড়া খালি করানো যাবে না, এটা নিশ্চিত ছিল।

এবার পুরনো বই বিক্রেতাবদের কাছ থেকে যেসব বই কিনে এনেছিলাম তার মধ্যে একটিতে এক জায়গায় দার্জিলিঙের এক মাড়োয়ারী শেঠের দক্ষ ম্যানেজার পণ্ডিত নগনারায়ণ তিওয়ারী সম্বন্ধে পড়েছিলাম। পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল। নগনারায়ণ তিওয়ারী যোগ্য লোক ছিলেন। রোজগার করে ঘরের অবস্থা সবে একটু ভাল করতে শুরু করেছেন, এমন সময় তাঁর দুটি চোখ নষ্ট হতে বসল। কিছুটা ইংরেজি পড়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের বিরোধী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতেই তিনি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর তারপর যতদিন বাঁচলেন ততদিন জাতীয় আন্দোলনে অংশ নিতে লাগলেন। বারে বারে জেলে যেতে লাগলেন। ১৯২১ সালে আমি একমা (ছাপরা)-তে কংগ্রেসের কাজ শুরু করলাম, সেইদিনই তিনি আমার সঙ্গী হলেন। আমরা সবসময় গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম। তিওয়ারীজী তাঁর নিজের ভাষায় (ভোজপুরী) ভাল বক্তৃতা দিতেন এবং গান বানিয়ে গাইতেন। সম্ভবত 'ময়লা আঁচল'-এর লেখক রেনুজীর জেলা পূর্ণিয়াতেও তিনি স্বরাজের প্রচারে ঘুরেছিলেন, কেননা তাঁর এই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের এক জায়গায় তিওয়ারীজীর নামোল্লেখ করে পদের একটি পংক্তি উদ্ধৃত ছিল। তাঁর নাম মনে পড়তেই মন বলল, যে মানুষ চোখের অক্ষমতা সত্ত্বেও স্বাধীনতার কথা বারংবার উচ্চারণ করে তার জন্য দুঃখ সইতে সইতে মারা গেছেন, তাঁর স্মৃতি নতুন প্রজন্মের মধ্যে আরো একবার সঞ্চারিত করা দরকার। তাই আমি একটি লেখা লিখে ফেললাম।

ইংরেজদের সময় ধনীরা সর্বত্র দেশের স্বাধীনতার চিন্তা না করে, রাজভক্তির চিন্তা নিয়ে থাকত। এখন তো কংগ্রেসে যোগদান করা বিপজ্জনক ব্যাপার নয় এবং নিজের পক্ষের বেশি মেম্বার বানানোটাও বাঁ হাতের খেলা। মুসৌরী কংগ্রেস সভাপতি তথা মন্ত্রী এই রকমই ছিলেন। পুরনো যুগ থেকে কংগ্রেস করা লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন। একদিন শুনলাম অনেক সই করিয়ে লোকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির কাছে আবেদন পত্র পাঠাচ্ছে যে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোক। কত সরল এই লোকেরা? এদের বুদ্ধি দেখে ভয় হয়। বুঝতে পারছে না কংগ্রেসের গুণগত পরিবর্তন হয়ে গেছে, তা একেবারে পাল্টে গেছে। তার বড় বড় নেতারা এখন ক্ষুধার্ত মানুষের জমায়েতে নেই, ওদের সঙ্গে এদের কোনো স্বার্থও জড়িত নেই। এখন তো উচ্চবর্গের ধনী-মানী লোকেরা তাদের হিতৈষী বন্ধু, তা শুধু মৌখিক বা শিষ্টাচার হিসেবে নয়। বরঞ্চ এখন তাদের বৈবাহিক সম্বন্ধও লক্ষপতি কোটিপতির নীচের লোকদের সঙ্গে হচ্ছে না। তারা মুসৌরীর কংগ্রেসীদের শোরগোল কেন শুনবে?

নেহেরু আওয়াজ তুললেন, 'কাম, কাম, কাম' আর তারপর 'আরাম হারাম হ্যায়।' গোপন স্বার্থান্বেষী আর তার পক্ষপাতীদের আওয়াজ ফাঁপা হয়। তাদের কাজ হলো জনতার মনোযোগ লঘু করে দেওয়া। সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেও জানে যে ভারতে, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত, গ্রামের হোক বা শহরের, সকলেই চেঁচাচ্ছে, 'কাজ দাও, কাজ দাও' বলে। ভোরবেলায় ওঠা

থেকে রাত অব্দি তারা এটাই আওড়াতে থাকে। লেখাপড়া জানা লোকেরা অফিসে অফিসে ঘোরে, অফিসার আর শেঠদের খোসামুদি করতে থাকে, যাতে হাড়ে চামড়াটুকু জড়িয়ে রাখার জন্য কোনো একটা কাজ পাওয়া যায়। অনাহারে থেকে থেকে গ্রামের গরিব মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন ঘর ছেড়ে চার-পাঁচশো মাইল দূরে দূরে কাজের খোঁজ করতে চলে যায়। কত লোক খোঁজ করতে করতে সেখানেই মরে যায়, অনেকে ধাক্কা খেয়ে আবার নিজের ঘরেই ফিরে আসে। আচ্ছা, এইসব লোকদের কাছে 'আরাম হারাম হ্যায়' বলাটা সম্পূর্ণ প্রতারণা নয় কি? আজকের ব্যবস্থায় তাদের কি করে কাজ দেওয়া যেতে পারে? যখন পুঁজিবাদের শিরোমণি দেশ আমেরিকাতেও লাখ লাখ লোক সর্বদা বেকার থাকছে তখন ভারত সেই সমস্যার সমাধান কীভাবে করতে পারে? বেকারির উচ্ছেদ হয়েছে শুধু সমাজবাদী দেশগুলিতে। চীনে চুটকি বাজাতে বাজাতে অতি সহজেই এই কাজ করা গেছে। এরকম কেন হয়েছে? ওইসব দেশে মানুষের বুদ্ধিধর্মী এবং শারীরিক শ্রমকে খুব মূল্যবান পুঁজি বলে মনে করা হয়, তাকে বেকার না রেখে কাজে লাগানোটা রাষ্ট্র নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। এ জন্য বড় বড় পরিকল্পনা বানিয়ে মানুষকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও জলাধার তৈরি হচ্ছে, নালা কাটা হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হচ্ছে, নতুন নতুন কারখানা তৈরি হচ্ছে। এইভাবে সকলে কাজ পাচ্ছে। ভারতে, মুখে যাই করুক না কেন কাজে আমলাদের খুশি রাখা, তাদের স্বার্থে যতটা সম্ভব কম আঁচ লাগতে দেওয়াটা সরকারের কর্তব্য। চোখের সামনে ভ্রষ্টাচার চলছে। শতকরা ৯৯ ভাগ মন্ত্রী গলা পর্যন্ত সেই নোংরামির কাদায় ডুবে আছে। তারাই অন্যদের ভ্রষ্টাচার থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়, তাদের ধ্বংস করার জন্য কমিটি গড়ে আর অফিসার নিযুক্ত করে। সত্যিই যদি পৃথিবীতে কোনো ভগবান থাকত তাহলে এইরকম প্রতারকদের জিভ উপড়ে ফেলত, তাদের ভস্মীভূত করে দিত। ইংরেজ যখন ছিল তখনও লোকের অবস্থা খারাপ ছিল, তখনও ঘুষ আর ভ্রষ্টাচার ছিল, কিন্তু তখন তা এতটা ছিল না যা আজ সাত বছর পর দেখা যাচ্ছে। একদিন ড· সত্যকেতুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, ৫০ শতাংশ লোক অন্নের জন্য ত্রাহি ত্রাহি করছে। আমি তাঁর সঙ্গে একমত ছিলাম না। ফসল কাটার সময় হয়তো ত্রাহি ত্রাহি করা লোকের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যেতে পারে কিন্তু বছরের বেশির ভাগ দিনগুলোতে তাদের সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশের কম নয়। এখন এদের মধ্যে তারাও সামিল হয়ে গেছে সাত-আট বছর আগেও যাদের অবস্থা বেশ ভাল মনে করা হতো।

সরকারের কর্ণধারদের ভণ্ডামি আর বঞ্চনা কি একটি-দুটি যে গুণে শেষ করা যাবে? আমাদের দেশের এক অত্যন্ত আমেরিকা-ভক্ত সাহেব বন মহোৎসব আরম্ভ করলেন। এখন প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে শেঠদের কাগজে বন-মহোৎসব সম্বন্ধে প্রচার করা হয়, কোটি কোটি গাছ লাগানোর হিসাব দেওয়া হয়। লাখ লাখ টাকা এর পেছনে নষ্ট করা হয়। কিন্তু এই মহোৎসব কতখানি সফল হচ্ছে তার উদাহরণ মুসৌরীতেই পাওয়া যায়। কাগজে ছাপা হয়েছে যে মুসৌরীতে ১০ হাজার বৃক্ষ লাগানো হয়েছে। আমার মনে হয় সংখ্যার দিক দিয়ে খুব অতিশয়োক্তি করা হয় নি। কিন্তু সেগুলি কী বৃক্ষ? এখানে পাহাড়ে দু-এক আঙুল চওড়া, খুব বেশি হলে এক হাত লম্বা একটি বনস্পতি হয়। তা এমন বেহায়া যে মূল থেকেও উপড়ে গেলেও সেখান থেকে সরে যাবার নাম করে না। তাতে ফুলও ধরে কিন্তু সুন্দর নয়। ব্যস,

রাস্তার ধারে দু-হাত অন্তর তাই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য জায়গার চেয়ে এখানে বন-মহোৎসব পালনকারীদের বেশি সৎ মনে করা হবে কারণ আর সব জায়গায় গাছ লাগানোটুকুই লোকের দায়িত্ব। তারা সেখান থেকে সরে যেতেই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো গাছের চিহ্নও আর থাকে না। কিন্তু এই বেহায়া বনস্পতিগুলোর অনেকই দু-বছর পর আজও আপনার চোখে পড়বে।

১৪ আগস্ট অগ্রবালদের বিবাহ-পদ্ধতি নিয়ে ড· কিরণকুমারী গুপ্তর ছাপা বই পেলাম। আমি জনা ছয়েক মহিলাকে এ ব্যাপারে উৎসাহী করেছিলাম। তাঁরা রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু কিরণজীই সেটি সম্পন্ন করতে সফল হলেন। বইটি খুব ভালভাবে লেখা হয়েছে। তিনি সমস্ত অগ্রবাল নয় কেবল সনাতন অগ্রবাল পর্যন্তই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং তার মধ্যেও তাদেরই নিয়েছেন যাদের মাতৃভাষা হচ্ছে ব্রজভাষা। এই বই দ্বারা শুধুমাত্র বৃদ্ধাদের কণ্ঠ এবং স্মৃতিতে থাকা বিবাহের রীতি-রেওয়াজ আর প্রায় দুশোটি গীত সংগৃহীত হয়েছে। প্রতিটি ভাষা-এলাকার দু-তিনটে জাতিসম্বন্ধে এই রকম ব্যাপক অনুসন্ধানপূর্ণ গ্রন্থ যদি তৈরি করা যায় তাহলে নৃতাত্ত্বিক তুলনামূলক অধ্যয়নের কাজ কত এগিয়ে যেতে পারে? আমাদের শিক্ষিতা তরুণীদের এদিকে মনোযোগ নেই। যখন মনোযোগ দেবে ততদিনে হয়তো বৃদ্ধারা নানারকম বিধি-বিধান আর গীত তাদের সঙ্গে নিয়ে মরে শেষ হয়ে যাবে।

১৯৩৭ সালে রাশিয়া যাওয়ার সময় ইরানের রাজধানী তেহরানে কিছুটা সময় ছিলাম। সেই সময়ই সর্দার রামসিংহর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি কোনো সৈনিক ঠিকাদারের ম্যানেজার ছিলেন। কোটা থেকে ট্রেনে যাওয়ার সময় আমাদের পরিচয় হয়েছিল। এক-দেড় মাসের বেশি হয়তো আমরা দুজন একে অন্যের সংস্পর্শে ছিলাম না তবে সম্পর্কটা অবশ্যই এমন ছিল যে, একে অন্যকে ভুলতে পারতাম না। এক সেনা-অফিসার বন্ধুর কাছ থেকে তিনি আমাদের খবর পেয়েছিলেন। চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। সেদিন ১৬ আগস্ট, হঠাৎ চলে এলেন। বাড়ি ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে কিন্তু শরণার্থী হওয়ার আগেই ব্যবসার ব্যাপারে এখানে এসে ঝাঁসিতে থাকতেন। ১৭ বছরে কালো দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। দাড়ি-ঝুঁটির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না, তবে বাবা এবং দাদু শিখ ছিলেন বলে দাড়ি রাখাটা চলে আসছিল, তাই তিনি সেটা বইতে রাজি ছিলেন। আমি কখনো কখনো ভাবি যে, পাঞ্জাবে দাড়ি-ঝুটি কিরকম অসভ্যতার ঝড় তুলে রেখেছে? আগে শুধু ঋষি-মুনিরাই নয়—সমস্ত মানুষ জন্ম থেকেই তাদের চুলের চাষ মৃত্যু পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখত। তারপর বৃদ্ধদের এই কাজটি সঁপে দেওয়া হলো এবং তরুণরা দাড়ির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। আজ থেকে সাত আটশো বছর আগে অব্দি কেশ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল। লম্বা কেশ সাজিয়ে রাখাটা পুরুষরাও জরুরি মনে করত। জয়চন্দ্রের দরবারী কবি 'দ্বিফকালবদ্ধাঃ চিকুরা' (দু-ভাগ করে বাঁধা কেশ)-এর প্রশংসা করতে ক্লান্ত ছিলেন না। তারপর এলো নির্ভীক তরুণরা যারা মাথার তিন-চতুর্থাংশ কেশ থেকে মুক্ত করে দিল। পুজোর সময় খোলা চুলে গিঁট বেঁধে নেওয়া হতো যা কয়েকশো বছর পর ধর্মীয় আচার হয়ে উঠেছিল। যদি সমস্ত কেশ পরিষ্কার করে দেওয়া হয় তাহলে পুজোর সময় গিঁট কি করে বাঁধবে? সেই জন্য মাঝখানে বেশ কিছুটা চুল ঝুঁটি বাঁধার জন্য রেখে দেওয়া হতো। নিয়ম করা হয়েছিল যে, ঝুঁটি গরুর ক্ষুরের মতো হবে। জানি না গুজরাটী গরুর ক্ষুরের মতো নাকি একদিনের বাছুরের মতো।

মাদ্রাজের ব্রাহ্মণরা এখন অব্দি এই বচনটি পালন করার চেষ্টা করেছে। পিছন থেকে দেখলে কারো কারো টিকি তো মহিলাদের কেশের মতো মনে হয়। টিকি থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপার সবার আগে রয়েছে বাঙালীরা। ধীরে ধীরে এই রোগ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। এখন নবশিক্ষিত হিন্দু তরুণদের কাছে টিকি স্বপ্নের ব্যাপারে হয়ে গেছে। আমাদের এখানে কেশের এই হলো ইতিহাস। শিখদের মধ্যে কেশ-দাড়িকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করা হয় কিন্তু নতুন আলো থেকে বঞ্চিত তরুণও দাড়ি কেটে ফেলাটা সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করে। এখন তো ছুরি নয়, কাঁচি দিয়ে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে দাড়ি ছোট করা হয়। কত লোক তো চুলও মাঝখান থেকে কেটে নেয়। অনেক শিক্ষিত তরুণ এখন তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়ে গেছে। ইসলামদেরও দাড়ির ওপর খুব জোর ছিল। তেহরানে আমাদের বন্ধুদের দেখে একজন ইরানীকে বলতে শুনেছিলাম—

'হমাঁ মর্দুমা আদম শবন্দ, ই রীশিয়াঁ তাহনোজ আদম ন মীশবন্দ। (সব পুরুষরা মানুষ হয়ে গেছে, এই দাঁড়িওলারা এখনো মানুষ হয়নি।) পৃথিবীতে কেশ নিয়ে সব জায়গায় বিপদ দেখা দিয়েছে।

এবার ১৫ আগস্টের সমারোহতে আমি যোগদান করি নি। কমলা গান্ধীচকে সমারোহ দেখতে গিয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। ঘটনাচক্রে আশেপাশে পরিচিত লোকও ছিল, তারা সাহায্য করল। টাউন হলে সভা হলো। সেখানে কংগ্রেসী আর অকংগ্রেসীদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। কংগ্রেসীদের ভেতরেও যেখানে নেতৃত্বের জন্য ঝগড়া নেই সেখানে ধনীদের নতুন নেতৃত্বের প্রতি ঘৃণা তো রয়েইছে, সেজন্য তারাও অকংগ্রেসীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে। বলছিল দেড় ঘণ্টা ধরে সভায় চেঁচামেচি হচ্ছিল,অনেক লোক উঠে চলে গেল। এই দিনটি তো আমাদের জাতীয় উৎসবের দিন হিসেবে পালন করা উচিত। কারণ এই দিনটিতে দুশো বছর ধরে কায়েম থাকা বিদেশী স্বেচ্ছাচারিতার সমাপ্তি ঘটল। মনের ঝাল মেটানোর জন্য আরো অবসর পাওয়া যেত। কিন্তু তা বুঝবে কে?

মুসৌরী আর দেরাদুন নিয়ে লেখার কথা মনে হওয়ায় এখানকার পুরনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। আমাদের বাড়ির কাছে বড় হোটেল চার্লবিল সম্বন্ধে কেউ কথায় কথায় বলেছিল যে, উইলসন নামের এক ইংরেজ তার ছেলে চার্লবিলের নাম এটি করেছিল। এটাও জানিয়েছিল যে, এ সেই উইলসন যে সর্বপ্রথম গঙ্গায় কাঠের গুড়ি ভাসিয়েছিল এবং টেহরী এস্টেটের বড় ঠিকাদার ছিল। তখন আমার ১১ বছর আগে দেখা হর্সিল-এর বাংলো মনে পড়ল। আমি তার পিছনে লেগে পড়লাম। খবরগুলো একত্রে পেলাম না। একটু একটু করে সংগ্রহ করার পর জানা গেল যে, তার নাম ছিল ফ্রেডরিক উইলসন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে সে স্থায়ীভাবে ভারতে চলে এসেছিল এবং অনেক বছর ধরে শিকারই তার জীবিকার মাধ্যম ছিল। গঙ্গোত্রীর আশেপাশের জায়গা সে তার নিবাস-স্থল বানিয়েছিল। সেখানেই মুখবা-এর এক মেয়েকে বিয়ে করল। তারপর হর্সিলে সেই বাংলোটি বানাল যা আজ একশো বছর পরেও সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দুই ছেলের মধ্যে চার্লি বড় ছিল। উইলসন পরে জঙ্গলের ঠিকা নিয়ে লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে গিয়েছিল। জায়গায় জায়গায় তার বাড়ি হয়েছিল। তার সঙ্গে ছ-সাতটা করে হাতি থাকত, ইংরেজ এবং এদেশীয়

অনেক অফিসার ছিল। পরের শতাব্দির চতুর্থ পাদের শুরুতেই তার মৃত্যু হয়। চার্লি প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট করেছিল। তার সত্তরোর্দ্ধা স্ত্রী এখনো দেরাদুনে থাকে। তাকেও আমি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। উইলসন একান্তে শিকারী জীবনের আনন্দ উপভোগ করেছিল এবং যতদিন পায়ে জোর ছিল ততদিন পশ্চিম এবং মধ্য-হিমালয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল। সে একজন আদর্শ ভবঘুরে ছিল, তাই শিকারী উইলসনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা আমার পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। আমি তার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখলাম।

দূর থেকে দেখলে পোষা জানোয়ার রাখাটা খুশির ব্যাপার বলে মনে হয়, কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম নয়। কুকুর যেহেতু ঘরে একসঙ্গে শোয়াবসা করে, সে বাইরে থেকে অসুখ নিয়ে আসতে পারে। তাকে সব সময় ধুইয়ে মুছিয়ে রাখার দরকার হয়। ভূত অ্যালসেশিয়ান, তাই তার লোম ঘন। লোমের জঙ্গলে কত পোকা থাকে। পোকার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ত। দু-এক সপ্তাহ পর পর ওষুধ দিয়ে ধুলেও পোকাদের কিছুই ক্ষতি হতো না। ডি ডি টি-র শুকনো পাউডার ভূত লাগাতে দিত না। সে কে জানে কোথা থেকে গায়ে উকুন সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল। কাছাকাছি অন্য কুকুর তো আছেই, হয়তো তাদের কাছে থেকে অথবা মরশুমের সময় বিভিন্ন জায়গায় বাংলোর বাইরে গরু-মোষ থাকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। কিছু পোকা ঘরেও ঘুরে বেড়াত, আর কিছু রক্ত খেয়ে গোল মটরের মতো হয়ে কানের কাছে ঝুলত, যাদের সরিয়ে দেওয়াটা ভূত নিজের সৌন্দর্যের হানি বলে মনে করত।

লক্ষ্ণৌর ক্যাপ্টেন শুক্লা খামখেয়ালী লোক। ঘোরার শখ আছে। তিনি এখন জীবনের চতুর্থ দশায় পা রেখেছেন। শরীর হাল্কা নয়, তবু মনে করেন 'আমাকে দুর্গম পাহাড়ে চড়তে হবে।' প্রতি বছর গরমে এখানে চলে আসেন। আমাকেও দর্শন দিয়ে যান। তবে বেশির ভাগ বর্ষার শেষ মাসে আসেন। তার আগে হিমালয়ে কোথাও ভ্রমণ সেরে ফেলেন। ২৩ আগস্ট তিনি এলেন। এবারে দু-তিন মাস হর্সিলে ছিলেন। উইলসনের বাংলো তাঁকেও আকৃষ্ট করেছিল। তিনিও উইলসন সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেছিলেন। বলছিলেন, 'লোকে বলে, উইলসন আগে মুখবার এক ব্রাহ্মণ মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল। সেখানকার লোকজনদের সঙ্গে সে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিল। লোকে তার উদারতায় খুব খুশি ছিল। কিন্তু যখন মেয়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠল তখন পাণ্ডারা বিগড়ে গেল। তখন সে ধরৌলীর এক ক্ষত্রিয়র মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল। তাতেও ব্যর্থ হয়ে মুখবার ঢোলী (হরিজন)-র পরম সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে এবং তার মা-বাপকে সন্তুষ্ট করে। পরে জঙ্গলের ঠিকা নিয়ে লাখপতি হয়।' ব্যারিস্টার শ্রীমুকুন্দীলাল অনেক বছর ধরে টেহরীর চিফ-জজ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও অনেক কথা জানলাম। উইলসন তার ছেলেদের ভালভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল কিন্তু তারা বিগড়ে গেল। যতদিন শিকারী উইলসন জীবিত ছিল ততদিন সব লোক তাকে সম্ভ্রম করত। তারপর চার্লি আর হেনরি তাদের স্বেচ্ছাচারী হয়ে উপদ্রব শুরু করল। কাউকে খুনও করে বসল। রাজা ইংরেজ রেজিডেন্টের কাছে এর অভিযোগ করল। তিনি এই আধা-গোরা তরুণদের কেন উৎসাহ দেবেন? তাদের টেহরী থেকে বার করে দেওয়া হলো। ক্যাপ্টেন শুক্ল বলছিলেন, উইলসনের বাংলো এখন সরকার নিয়ে নিয়েছে।

আমাদের হ্যাপিভ্যালি এলাকার সবচেয়ে বৃদ্ধ হচ্ছেন শাদীলাল, যার বয়স হবে প্রায়

৭০ বছর। যখন দশ-বার বছর বয়স তখনই দেশ থেকে মুসৌরী চলে এসেছিলেন। অনেকগুলি ছেলে আছে। ছেলেদের থেকে আলাদা থাকেন। পুরনো মুসৌরী বিশেষ করে হ্যাপিভ্যালির অনেক পুরনো কথা তাঁর মনে আছে। তিনি জানালেন, চার্লবিলের প্রথম নাম ছিল হাগ্‌সন। হাগ্‌সন চার্লি আর বিলী দুটি ছেলে ছিল যাদের নামে তিনি এই বাংলোর নাম রেখেছিলেন এবং বিক্রির সময় এই শর্ত করে নিয়েছিলেন যে, এর নাম যেন বদলে না যায়। হের্সি পরিবারও মুসৌরীর একশো বছরের পুরনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার। সেই পরিবারের মেয়ে বৃদ্ধা মিসেস বাইট জানালেন যে, শিকারী উইলসন বা তার ছেলে চার্লি উইলসনের সঙ্গে চার্লবিলের কোনো সম্বন্ধ নেই। লালা শাদীলাল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে, নিজের কাকার দোকানে টেকারী-কোঠীর নীচে কাজ করতেন। তিনি বলছিলেন, টেকারী কোঠীর জায়গায় আগে মোষশালা ছিল। সওয়াশো বছর আগে, আশেপাশের গ্রামবাসীরা গ্রীষ্মবর্ষায় মুসৌরীর জঙ্গলকেই তাদের পশুদের চারণক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করত। যেখানে-সেখানে মোষশালা বা গরুদের ঝুপড়ি থাকত।

হের্সি পরিবারের লোকেরা বার্লোগঞ্জে থাকে জেনে আমি ২৪ আগস্ট সেখানে উপস্থিত হলাম। লাইব্রেরিতে 'হের্সি'র ওপর একটি বই দেখে ছিলাম, যার থেকে জানলাম যে, টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল যে ইংরেজ অফিসাররা হের্সি তাদের মধ্যে একজন ছিল। সে টিপুর হারেমের কোনো বেগমকে নিয়ে পালিয়েছিল। সেই পরিবারেরই এক হের্সি টেহরীর রাজার পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এবং রাজা তাকে অনেক জায়গীর দিয়ে এখানে রেখেছিল। সে-ই ওয়াজিদআলি শাহর মেয়ের থাকার জন্য বার্লোগঞ্জে এই বাংলোটি বানিয়েছিল। শাহজাদী আর তরুণ হের্সির মন মজে গিয়েছিল এবং সে শাহজাদীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সফল হয়েছিল। মিসেস বাইট খুব গর্বের সঙ্গে বলছিলেন, 'আমার শিরায় রাজরক্ত আছে।' তাঁর ভাই হের্সি এখনো এখানেই একটি ঝুপড়ি বানিয়ে থাকত। একলা মানুষ, খানিকটা জমি ছিল, তাতেই চালিয়ে নিত। মিসেস বাইটের অনেক জমি ছিল। একশো বছর আগে বানানো বাংলো এখন ভেঙে পড়ার মুখে তবে এখনো তা বুড়িকে আশ্রয় দেওয়ার মতো ছিল। বুড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে কয়েকজন ইংল্যান্ড চলে গেছে আর সবচেয়ে ছোটটি এখানে ছিল, যাকে দেখলে শতকরা একশো ভাগই ইংরেজ মনে হতো এইজন্য অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডে সহজেই তার জায়গা হয়ে যেত। লখিমপুরে হের্সি পরিবার এতদিন পর্যন্ত তালুকদার হিসেবে টিকে ছিল। এখন জমিদারি উঠে যাওয়ায় তাদের কি অবস্থা হয়েছে বলা যাচ্ছে না। হের্সি আর উইলসন-পরিবারের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পর একটি পুরনো যুগ চোখের সামনে নাচতে শুরু করে। ইংরেজরা ভারতে বণিক হিসেবে এসেছিল। সে সময় তাদের মনেও ছিল না যে তারা দিব্যজাতির মানুষ। তারা ভারতীয়দের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করত যেমনটি ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে করে থাকে। কেউ সেপাই হয়ে ভারতের রাজা আর নবাবদের পল্টনে কাজ করত, কেউ মোসাহেব হয়ে উঠত। কেউ শিকারী হয়েই কোনো জায়গায় থেকে যেত। ভারতীয় খাবার তারা ভালবাসত, পোশাকও সেই রকম থাকত। কিন্তু যখন শাসনভার হাতে এল তখন তারা ধীরে ধীরে নিজেদের রূপ চেনাল। তবে সম্পূর্ণভাবে দিব্যপুরুষ হয়ে উঠতে তাদের কয়েক শতাব্দি সময় লেগেছিল।

ভাইয়া দিল্লীতে (ফৈজবাজার) তাঁর দোকানের দোতলা তৈরি করে নিয়েছিলেন, তিনতলা

বানানো বাকি ছিল। বলছিলেন, সামনের বছর সেটা বানাবেন। প্রয়োজনানুযায়ী টাকাও রোজগার করেছিলেন। আর্থিক দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি কখনোই অর্থের দাস হয়ে যাননি, যদিও অর্থের মূল্য তিনি বুঝতেন। এবার মাথায় খেয়াল জেগে উঠছিল যে, আয়ুর্বেদের গবেষণা আর প্রচারের জন্য এই বাড়িটাতেই আয়ুর্বেদিক সঙ্গম স্থাপিত করা হোক। একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজের সঙ্গে পাকা কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছিল। তিনি বৃদ্ধ অবস্থায় এই পূণ্যের কাছে সময় দিতে রাজি ছিলেন। প্রেসও অমৃতসর থেকে এনে এখানেই চালাতে চাইছিলেন। দুশো টাকা মাসিক বেতনে একজন অভিজ্ঞ ম্যানেজার খোঁজ করছিলেন। আমি বললাম, 'প্রেস আর ম্যানেজার কোনো ব্যাপার নয়, তবে সঙ্গমের ব্যাপারে দয়া করে তাড়াহুড়ো করবেন না।' আমার মনে হচ্ছিল এটা খাল কেটে কুমির ডাকা গোছের ব্যাপার হবে। সঙ্গমের পেছনে মাসিক দু-এক হাজার টাকা খরচ দরকার। একবার ফেঁসে গেলে বেরোন মুশকিল। কেউ নিজের সোনালি স্বপ্নের কথা বলছেন আর অন্যজন কোনো ভূমিকা ছাড়াই যদি সেই সোনার মহলে নিষ্ঠুর প্রহার করতে শুরু করেন তাহলে কেমন লাগবে? আমি সেইরকমই করেছিলাম কিন্তু ভাইয়া কিছু মনে করেননি। পরে সেই খেয়াল ধীরে ধীরে নিজে থেকেই মুছে গিয়েছিল।

আগস্টের শেষে জয়ার এক বছর হতে মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি ছিল। এখন সে খুব চালাক হয়ে গিয়েছিল। নিজের ছবি চিনতে পারত। মুখ খুলতে বললে মুখ খুলত, দাঁত দেখাত। এখন সে পা, বা, মা এই তিনটে অক্ষরই বলতে পারত। এক বছরের হওয়ার পর সে নিজে নিজে দাঁড়াতে পারত কিন্তু চলতে পারত না। নমস্তে, টাটা, সেলাম হাত দিয়ে করত। ভূতের ডাকও নকল করত। না দেওয়া খাবারও লুকিয়ে মুখে তুলতে চাইত, নাচতও। তার জন্মদিন উপলক্ষে কমলা ছোটমতো পার্টি দিল, যাতে শীলাজী, সত্যকেতুজী, বাচ্চারা, মেহতাজী এবং আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন।

৩ সেপ্টেম্বর রাতে কোনো কাজে বাথরুমের বাইরের দিকের দরজা খুলতে হয়েছিল। ভূত বেরিয়ে গেল। পাশেই আমাদের কাঠ-নাশপাতির গাছ। ও সেখানে গিয়ে ভেউ ভেউ করতে লাগল, তারপর চুপ করে গেল। ভেতরে চলে এলো। মনে হচ্ছিল যে নাশপাতির ওপর খর্-খর্ আওয়াজ হচ্ছে। বন্দুক নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হলো। কিন্তু শিকারী-ব্যারিস্টার সাহেব বলে দিয়েছিলেন, আপনার রাইফেলের গুলি মেরে ঘায়েল করতে পারবেন না, জানোয়ারটা আবার লড়তে পারবে। কাজেই বাইরে গেলাম না। ভাবলাম হয়তো কোনো ভালুক এসেছে, নাশপাতি খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কখনো ফল পড়ার ধুম-ধাম আওয়াজ সে কথাকেই সমর্থন করছিল।

সকালে উঠে দেখলাম, গাছে একটাও নাশপাতি নেই। একটা ছোট ডাল ভাঙা। মন নির্বোধ জ্ঞানীর মতো বলল, নিশ্চয় ভালুক এসেছিল। কিন্তু আবার ভাবলাম, ভালুক যদি এসেছিল তাহলে ভূত কেন দু-একবার চেঁচিয়েই চুপ করে থাকল? এটা বুঝতে দেরি হলো। এ ব্যাপারে জন ল্যাডলির মতামতও সাহায্য করল যে, নাশপাতি ভালুকে পাড়েনি, এলাকারই কোনো লোক পেড়েছে যাকে ভূত চেনে। আচ্ছা, রাতে চুরি করার কী দরকার ছিল? নাশপাতি আমাদের কাজে লাগত না। টক-টক বিস্বাদ। চাইলে আমরা এমনিই দিয়ে রেহাই পেতাম। যদি সে-রাতে রাইফেল চালিয়ে দিতাম? ভাবলে লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছিল।

আমি শিকারী-উইলসনের পিছনে লেগে ছিলাম। এবার জানা গেল, উইলসনের প্রথম পুত্র

চার্লি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিল এবং ১৯৩২ সালে মারা গিয়েছিল। শিকারী নিজে মারা গিয়েছিল ১৮৮৬ সালে।

৬ সেপ্টেম্বর কোম্পানি বাগে বনভোজন ছিল। এখান থেকে আমরা, কুল্‌হড়ী থেকে ভাইয়া আর ভাবীজী এবং সেই সঙ্গে আচার্য যাদবজী ত্রিকমজীও স্ত্রী এবং তিন মেয়ের সঙ্গে এলেন। এখানেই আমাদের খাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যাদবজী খেয়ে এসেছিলেন। সামান্য খাবার তিনি নিলেন। মহিলারা সব বল্লভ কুলের শিষ্যা ছিলেন বলে তাঁরা রান্না করা খাবারও খেতে পারতেন না। গত বছরের মতো এই বছরও বৃষ্টি বাধা সৃষ্টি করতে চাইল আর আমরা চায়ের রেস্তোরাঁর জন্য বানানো পড়ে থাকলাম। আচার্য ত্রিকমজী একজন সফল বৈদ্য। চাইলে ধন-কুবের হয়ে যেতেন কিন্তু লক্ষ্মীকে তিনি শুধু সসম্মানে পুজো করতেই জানতেন। চিকিৎসা করা ছাড়াও আয়ুর্বেদের গ্রন্থ্ উদ্ধার করাটাও তিনি নিজের কর্তব্য মনে করতেন। বৃষ্টি থামলে আমরা চা খেয়ে পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরলাম।

৭ সেপ্টেম্বর কমলার এম এ-র (প্রথম)-ফর্ম ভর্তি করার জন্য রমা দেবী উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল মালহোত্রাজীর কাছে গেলাম। মালহোত্রাজী এখানে পৌরসভার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন যা আমি পছন্দ করতাম না, তবে রুচি নিজের নিজের। তিনি এখানকার সবচেয়ে যোগ্য প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর স্কুলে পরীক্ষার রেজাল্ট সবসময় সবচেয়ে ভাল হয়। লোকেরও তাঁর ওপর বিশ্বাস আছে। ধনানন্দ ইন্টার কলেজ যথেষ্ট নয় বলে এই স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে মালহোত্রাজীর মতো প্রিন্সিপ্যাল পাওয়া গিয়েছিল। ছেলের সংখ্যা সব সময় বাড়তে বাড়তে গেছে আর সেইসঙ্গে স্কুলবাড়িও বেড়েছে। তিনি স্কুলের বিল্ডিং বানালেন। নতুন বাড়িতে সায়েন্সের প্রয়োগশালাও বানানো হয়েছে। ছেলেদের শারীরিক ব্যায়ামের জন্যও একটি ছোটমতো মাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন যা তিনি শেষে বানালেন। পাহাড়ে সমতল ভূমি পাওয়া মুশকিল তাই স্কুলকে বিস্তৃত করা সহজ নয়। এই বছর কমলার বোন গঙ্গাও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। মেয়েদের স্কুল তিন মাইল দূরে ছিল, সে জন্য গঙ্গাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল। কমলা তাকে বাড়িতেই পড়াত। মুসৌরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়া ফর্ম পূরণ করতে সাহায্য করলেন।

আমলাতন্ত্র দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। ফর্ম পূরণ করার জন্য দু পৃষ্ঠা কি যথেষ্ট ছিল না? কিন্তু এখন তাতে এক ডজন পৃষ্ঠা রয়েছে। উত্তর-প্রদেশে বোর্ডের পরীক্ষাগুলোতে পৌনে দু-লাখ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। কাগজের কত অপব্যয়! যে দিকে তাকাও দেখবে আমলাতন্ত্রের জয়জয়কার। কাগজ কালো করার জন্যই শুধু লাখ লাখ লোককে বেকার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীরা বা দিল্লীর মহাদেব লাল-শাসনের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করে শুধু বিড়ম্বনাই সৃষ্টি করেন।

৯ সেপ্টেম্বর ভাইয়া আর ভাবীজীর মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ভাবীজীর তো মহিলাদের বিদ্রোহী দলের নেতা হওয়া উচিত ছিল। তিনি পুরুষদের বিরুদ্ধে বিষ ওগরাচ্ছিলেন। আমি দার্শনিক বনে গিয়েছিলাম। ভাবতে লাগলাম—১· বৃদ্ধের তরুণীকে বিয়ে করা উচিত নয়। ২· সংসারের দায়িত্ব যে পঞ্চাশ বছর বয়স অব্দি বুঝল না তাকে তো 'নৈব চ নৈব চ।' ৩· এতদিন পর্যন্ত সংসারের বন্ধনে না জড়ানোর অর্থ তার সামনে কোনা আদর্শ ছিল। এইরকম

মানুষের তো এই ফাঁস গলায় জড়ানো আরো উচিত নয়। ৪· যে দীর্ঘ ভবঘুরের জীবন কাটিয়েছে তার তো বিবাহের কাছে ঘেঁষাই অনুচিত। ৫· যদি সেই সঙ্গে বিদ্যার শখ থাকে তাহলে—তোবা তোবা।

১৩ সেপ্টেম্বর শ্রীমুকুন্দীলালজী এলেন। এবার তিনি পাটনাও গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আমার ছবির সংগ্রহ দেখেছিলেন। বলছিলেন, 'তিব্বতের বাইরে এত সুন্দর চিত্রপটের সংগ্রহ কোথাও নেই।' পাটনা মিউজিয়ামে এখনো আমার সমস্ত চিত্রগুলি প্রদর্শিত করা যায়নি। আমিও তিব্বত থেকে আনার সময় সেগুলির গুরুত্ব বুঝতাম না। সে সময় হয়তো কিছুটা এদিক-ওদিকও হয়ে যেত, কিন্তু ১৯৩২-৩৩ সালে লন্ডন আর প্যারিসে প্রদর্শনী হওয়ার পর তাদের মূল্য যখন বুঝলাম তখন আমি সেগুলিকে সুরক্ষিত করে রাখা স্থির করলাম এবং এটা বুঝতে দেরি হলো না যে, কোনো সরকারি মিউজিয়ামেই এগুলিকে রক্ষা করা যায়। ড· জয়সওয়ালের সঙ্গে তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। চিত্রগুলি সংগ্রহালয়ে দেওয়ার জন্য আমি ওখান থেকেই চিঠি লিখি। সেগুলো ইউরোপ থেকে সোজা পাটনা চলে আসে।

১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যাহ্নভোজন হলো ঔরৈয়ার ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তাঁর পিতামহ-প্রপিতামহরা রাজ্য হারিয়েছিলেন, তবু জনগণ তাকে 'রাজাসাহেব'ই বলত। কমলা আর আমি গেলাম। ক্যাপ্টেন শুক্ল আর ডা· গৈরোলাও ছিলেন। অতিথিরাও সময় মতো আসেনি। খাওয়ার এত দেরি হতে দেখে পেটে ছুঁচো ডন দিচ্ছিল। রানী সাহেবা নিজেই খাবার বানানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কমলা তাঁর দ্বারা খুব প্রভাবিত হলো। মাংসও ছিল রাজপুত ঘরের। খাবার তো সুস্বাদু ছিলই সেইসঙ্গে আমাদের কথা বলারও অনেক সুযোগ পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন শুক্লার ওপর বার্ধক্যের কিছুটা প্রভাব রয়েছে. খানিকটা রহস্যবাদ আর নতুন আবিষ্কারের খেয়াল মাথায় চেপে থাকে। তিনি গঙ্গোত্রীর কাছে কোথাও সুমেরু শিখর দেখে এসেছিলেন এবং তাই নিয়ে জোর দিয়ে কথা বলছিলেন। আমিও আমার ভুল স্বীকার করি, কেননা হিমালয়ের পরিচয় সম্পর্কিত গ্রন্থ যদি না লিখতে হতো এবং তার দ্বারা হিমালয়ের প্রতিটি অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার সুযোগ না মিলত তাহলে আমার কাছেও তার অনেক শিখর এবং স্থান রহস্যময় মনে হতো। হ্যাঁ, দূরের অদ্ভুত ভূ-খণ্ডটি দেবতাদের নিবাস নয়।

১৫ সেপ্টেম্বর শ্রীবলভদ্র ঠাকুরের চিঠি পেলাম। শিব শর্মা আর ঠাকুর একবার মানস সরোবর যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন। শিব শর্মা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, ঠাকুর তা করতে রাজি হননি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ভবঘুরের যোগ্যতার বিচারে পিছিয়ে ছিলেন। শিব শর্মার স্বভাব হচ্ছে ঝাঁপিয়ে পড়া, আর ঠাকুর মশাই হচ্ছেন গম্ভীর। তিনি ভবঘুরেও, আবার সংস্কৃতের বড় পণ্ডিতও এবং সেই সঙ্গে কলমেরও জোর আছে। এবার তিনি মানস সরোবর ঘুরে এসেছেন এবং মণিপুরও ঘুরেছেন। মানস সরোবর না গিয়ে তার আনন্দ আমি আমার লাসার দিকের যাত্রায় করতে পারতাম কিন্তু পূর্বোত্তর ভারত আর মণিপুরের পাহাড়ে যাত্রা করার লোভ তো মনের ভেতরেই থেকে গেছে। ঠাকুর মশায় লিখেছিলেন, 'আমি তিনটে উপন্যাস লিখেছি।'

সরহপা-র চরণে

১৯৩৪ সনে আমি দ্বিতীয়বার তিব্বত গিয়েছিলাম। আমার প্রিয় বন্ধু গেশে ধর্মবর্মনের সঙ্গে তালপুঁথি খোঁজার জন্য সাক্যা গেলাম। সাক্যার মোহান্তরাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী অফিসার চাংগোবা দোনী ছেন্‌বো-র ঘরে উঠলাম। মোহান্তরাজ থেকে শুরু করে তাঁর অফিসাররা পর্যন্ত সবাই আমাকে সাহায্য করতে তৈরি ছিলেন। অনেক তালপুঁথির খোঁজ তো তৃতীয় যাত্রায় পেয়েছিলাম। সে-সময়ও কিছু অমূল্য পুস্তক দেখতে পেয়েছিলাম। এ সম্বন্ধে আমি 'যাত্রা'র দ্বিতীয় গ্রন্থে লিখেছি। পূজারীর ঘরে তালপুঁথির পাতার বাণ্ডিল কেটে কেটে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ হিসেবে বিতরণের জন্য রাখা ছিল। তার মধ্যেই আদিসিদ্ধ সরহপার দোঁহাকোষের পাতাও ছিল। দোঁহাকোষ প্রথমে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং পরে আরো ভালভাবে ড· প্রবোধচন্দ্র বাগচী দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। সাক্যা থেকে আনা এই পাতাগুলো কুড়ি বছর ধরে আমার কাছে পড়েছিল। প্রথম পাতাটি ছিল না। তবে তার ফলে শুধু একটি পৃষ্ঠারই ক্ষতি হয়েছিল, কেননা শুরুর পাতার আগের পৃষ্ঠাটি খালি রাখা হয়। প্রথম পাতার অক্ষর ঘষে ঘষে পরের পাতার অনেক অংশ অপাঠ্য হয়ে গিয়েছিল। একদিন এই পাতাগুলো এমনি এমনিই দেখছিলাম। মনে হলো এগুলো মেলানো দরকার। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কপিটি আমার কাছে ছিল। দেখতে পেলাম তাতে ৫০টির বেশি দোঁহা নেই, এই তালপুঁথিতে যেখানে ১৬০টির বেশি রয়েছে। ড· বাগচীর কপি মেলানোর পর বুঝতে পারলাম যে, আমার কপিটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাগচীর দোঁহাকোষে ১১২টি, তিব্বতী অনুবাদে ১৩৪টি এবং এর মধ্যে ১৬৩টি দোঁহা আছে। আমি তালপাতা থেকে সেগুলি লিখে নিতে শুরু করলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, এগুলি সম্পাদনা করা দরকার। সে-সময় তো এটাই মনে হয়েছিল যে, একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার সঙ্গে এটি প্রকাশ করে দেওয়া হোক। কিন্তু যখন তাতে ঢুকে পড়লাম তখন কাজটি নিজেই আমাকে অনেক দূর টেনে নিয়ে গেল। অপভ্রংশ ভাষা, সরহ-র কবিতা এবং দার্শনিক ভাবনার ওপর ছোট ভূমিকা লেখা যায় না। তা যথেষ্ট বেড়ে গেল। তারপর মনে পড়ল সরহ-র ১৪-১৫টি অপভ্রংশ গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হয়েছে। তাহলে সরহ-র সব অপভ্রংশ কবিতাই হিন্দিতে অনুবাদ করে দেওয়া যাক না কেন? তখন সে কাজটিও হাতে নিলাম। প্রকাশ করার জন্য বিশ্বভারতী, জয়সওয়াল ইন্‌স্টিটিউট আর বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ—এই তিন জায়গা থেকেই আবেদন এল। ইন্‌স্টিটিউট আর পরিষদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে গেল। আমি শ্রীজগদীশচন্দ্র মাথুরের ওপর ভার দিলাম এবং শেষে পরিষদ থেকেই প্রকাশিত হবে বলে স্থির হলো। এই পঙ্‌ক্তিগুলি লেখার আগেই তা ছাপা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা এমন প্রেসের কবলে পড়ল যেখানে 'নেপাল' বহু বছর ধরে পড়ে থাকার পরও মুক্তি পাচ্ছে না।

সেপ্টেম্বরের শেষে 'নয়া সমাজ'-এ কমলার গল্প 'ডায়ন' ছেপে এলো। কমলার গল্পে কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। সে শব্দ পরখ করতে এবং ঘটনাগুলি সঠিকভাবে বেছে নিতে জানে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দোষ হলো, কলম চালাতে তার খুব আলস্য। শুরুর গল্পগুলিতেও আমার সামান্যই ভাষা-সংশোধন করার দরকার হয়েছিল আর এখন তো তা আরো কমে যাচ্ছে।

আমি কতবার বলেছি, ১৬টি গল্প লিখে ফেলো। তাহলে গ্রন্থাকারে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সে এখনো নয়ে গিয়ে থেমে আছে।

জয়া এখন সানন্দে নিজের পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে পারত। ওপরের অনেকগুলি দাঁত উঠে গিয়েছিল। খুব চঞ্চল। আছাড় খাওয়া আর চোট লাগাকে পরোয়া করত না।

৮ অক্টোবর বিহারের কমরেড কার্যানন্দ শর্মা এলেন। শর্মাজীর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯২১-এর অসহযোগের সময় থেকে। 'নয়ে ভারত কে নয়ে নেতা' বইয়ে আমি তাঁর একটি ছোট জীবনী লিখেছি। যৌবন থেকেই কণ্টকাকীর্ণ পথে তিনি পা বাড়িয়েছেন এবং আজও সে পথেই অবিচল হেঁটে যাচ্ছেন। বহু মানুষের কল্যাণ সব সময় তাঁর কাছে আদর্শ হয়ে রয়েছে। যখন তিনি বুঝলেন যে, সাম্যবাদের দ্বারাই তা হওয়া সম্ভব তখন ১৯৩৮ সালে বিহারে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেম্বার হয়ে গেলেন। কৃষকদের হয়ে অনেক লড়াই করলেন। যদি তিনি কণ্টকাকীর্ণ পথ ছেড়ে সুখের রাস্তা ধরতেন তাহলে আজ বিহারের অন্য কংগ্রেসী নেতাদের চেয়ে অনেক সুখে থাকতেন। ঘর-দুয়োর ছেড়ে একলা জীবন কাটানো ততটা আত্মত্যাগের ব্যাপার নয় যতটা ত্যাগের জীবন হচ্ছে শর্মাজীর মতো লোকেদের, যাঁরা নিজেকে, নিজের পরিবারের লোকজনদের সকলকেই সুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাঁর শরীর এখন খারাপ যাচ্ছিল। দিল্লী এসেছিলেন, সেখান থেকেই অল্প সময়ের জন্য এখানে চলে এসেছিলেন।

অক্টোবর মুসৌরীতে শরতের সিজন। মন্ত্রীদেব ডেকে এবং আরো নানারকমভাবে মুসৌরীর ভাগ্য শোধরানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। রাষ্ট্রপতির ঘোড়ারা পোলো ময়দানে তাদের কাজ দেখাল। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে কিদবাই,জৈন, মহাবীর ত্যাগী এবং কেসকর এলেন। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পন্তজীও উপস্থিত হলেন। মন্ত্রীদের আগমন আনন্দের ব্যাপার কিন্তু তাতে মুসৌরীর কী লাভ? তার তো দরকার পাঁচ-সাত হাজার ক্লার্কের দু-একটি অফিস। দিল্লীতে তার জন্য বাড়ি বানাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হবে, বাড়ি পাওয়া মুশকিল। এখানে থাকার লোকের অভাবে ভাল ভাল বাড়ি ভেঙে পড়ছে। মন্ত্রীরা হচ্ছে আমলাদের হাতের পুতুল—'সবৈ নচাবেঁ রামগুসাই।'[১] অফিস এখানে পাঠানোর কথা বলে চলে যায়। ধূর্ত আমলারা তার বিরোধিতা করে। সব নিষ্ফল হয়ে যায়। দিল্লীর অফিসে থাকলে আমলাদের ইহকাল-পরকাল তৈরি হয়ে যায়, তারা ওখান থেকে কেন সরবে?—পরকালের অর্থ তাদের ছেলে-নাতি, এমন কি মেয়ে-বৌমাও বলা যায়, কারণ আইন তাকে তুলে রেখেও মেয়ে-বৌদের ভাল বেতনে চাকরিতে রাখা যায়।

১৪ অক্টোবর লণ্ঢৌর গেলাম। এবছর মানস সরোবর-কৈলাসে তিব্বতীদের কুম্ভ মেলা ছিল। সেখানে আমার কয়েকজন খম্বা বন্ধুও গিয়েছিলেন। বলছিলেন এখন লুঠপাট হয় না, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারো তবে জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি। দু-টাকায় এক রাতের খাবারও হয় না। সত্যিই এখানকার টাকা ওখানকার তুলনায় পিছিয়ে ছিল। তিব্বতে এখন কোনো মজুর একদিনে যা রোজগার করে আমাদের টাকায় তার মূল্য ন-দশ টাকা, সে জন্য ওখানকার

১ 'রাম গুসাই নাচাচ্ছেন সবাইকে।'—স·ম·

মজুরের কাছে যে সব জিনিসের দাম বেশি বলে মনে হয় না তা আমাদের লোকজনের কাছে অবশ্যই বেশি। তার কারণ এখানে পাঁচ টাকা রোজগার করার জন্য ৬ ঘণ্টা নয়, বরঞ্চ তিনচার দিন কাজ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে কাজের অনিশ্চয়তাও রয়েছে।

প্রয়াগ—নির্জনে বসবাস করার এটাও একটি অসুবিধে ছিল যে, কোথাও আসা-যাওয়া করা মুশকিল। শর্মাজী এসে পড়েছিলেন, আমি ভাবলাম দু-সপ্তাহ কোথাও চক্কর মেরে আসি—গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারেও কিছু কাজ ছিল আর বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করার ছিল।

১৬ অক্টোবর দেরাদুন পৌঁছলাম। চার্লি উইলসনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। বৃদ্ধার কাছে পুরনো জিনিস ছিল না। বাবার বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়িতে চিররোগী বোনের সঙ্গে নিজের শেষ দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী অনেকদিন আগে তাঁর বাবার সম্বন্ধে স্টেটসম্যানে একটি লেখা লিখেছিলেন, যার কাটিং তিনি দিলেন। সেইদিনই রাতে এলাহাবাদ পর্যন্ত যাওয়ার ট্রেনের কামরায় বসে পড়লাম। ভোর হওয়ার সময় আমাদের ট্রেন মুরাদাবাদে পৌঁছল। আমাদের কামরাতেই পূর্ণিয়া জেলার মনিহারীর মোহান্তজী ছিলেন। মোহান্তজী ছিলেন হাথরস জেলার তুলসীসাহেব সম্প্রদায়ের মানুষ। সাধুদের পথ কত দ্রুত দূর-দূরান্ত অব্দি ছড়িয়ে যায়। কোথায় হাথরস আর কোথায় মনিহারী। তুলসী সাহেবের ভক্ত অনেক জায়গায় আছে এবং মনিহারীর মোহান্ত তাদের সম্মানীয় গুরু। হাথরস গিয়ে তিনি মুরাদাবাদের ভক্তদের কাছে এসেছিলেন। অনেক ভক্ত তাঁকে ট্রেনে তুলতে এসেছিলেন। কামরায় লোক একটু বেশি ছিল কিন্তু বসতে তাঁর কোনো অসুবিধে হলো না। তবু একজন ভক্ত বলছিলেন, 'খুব বড় মহাত্মা, এনার সঙ্গে যাওয়াটা অনেক ভাগ্য বলে মনে করবেন।' আমি সত্যিই নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছিলাম, কেননা তুলসীসাহেবের বচনের কিছু কিছু আমি পড়েছিলাম কিন্তু তাঁর কোনো অনুগামী বা মোহান্তের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। মোহান্তজী শিক্ষিত এবং আমার কিছু বই পড়েছিলেন এজন্য আমরা দুজনেই নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করলাম। 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস'-এর অনেক প্রুফ আমার কাছে ছিল যেগুলি দেখে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে ডাকবাক্সে ফেলার ছিল, তাই আমার পুরো সময়টা সৎসঙ্গে লাগানো সম্ভব ছিল না। লক্ষ্ণৌতে তিনি অন্য কামরায় চলে গেলেন এবং আমার কামরা কেটে প্রয়াগগামী ট্রেনে লাগিয়ে দেওয়া হলো। সন্ধে সাতটার সময় সেখানে পৌঁছলাম।

আমি শ্রীনিবাসজীকে চিঠি লিখেছিলাম, তবে অনেক দেরি করে। আমি শনিবার পৌঁছলাম। পরের দিন রোববার চিঠি পাওয়া সম্ভব নয়, সোমবারে পেয়েছেন তবে বন্ধুদের খবর দেওয়া যায় নি। এখন দশহরার ছুটিও চলছিল। কাগজে যদি খবর বেরোত তাহলে দেখা-সাক্ষাতের সুবিধা হতো। সোমবারে আমি প্রয়াগেই থাকলাম আর নিজেই ঘুরে ঘুরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম। সম্মেলনের কর্ণধার লক্ষ্ণৌ চলে গিয়েছিলেন। ড· উদয়নারায়ণ তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছেয় অলোপী বাগের পুরনো বাড়ি ছেড়ে একটি বাংলোয় থাকছিলেন। কিন্তু পুরনো বাড়ির ঘরগুলো তাঁকে এত সহজে রেহাই দিতে রাজি ছিল না। এত তাড়াতাড়ি ছাড়া তাঁর ঠিক হয়নি। শেষে সেগুলোকেই মেরামত করে সেখানে থাকতে হলো। সোমবারে শ্রীক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। আমি আমার পরের ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য ঋগ্বেদের

দাশরাজ্ঞ-যুদ্ধকে বেছেছিলাম। সে সম্পর্কে কিছুটা পড়াশোনাও করেছিলাম। চট্টোপাধ্যায়জীর তো সারাটা জীবন একরকম বেদ অধ্যয়নেই নিয়োজিত ছিল। তিনি ধর্মীয় ভাবনার দিক দিয়ে চরম গোঁড়া কিন্তু গবেষণার কাছে পরম নাস্তিক। তাঁর শিষ্য ড· রামনারায়ণ রায় ঋগ্বেদের ঋষিদের ওপর ডি লিটের জন্য নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেটাও চট্টোপাধ্যায়জী দেখালেন। এখনকার সমাজ সম্বন্ধে লিখলে কট্টরপন্থীরা আপত্তি তুলবে বলে আমি স্থির করেছিলাম যে, আগে ঋগ্বৈদিক সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ওপর আলাদা আলাদা সপ্রমাণ প্রবন্ধ লিখি। আমি চেয়েছিলাম—চট্টোপাধ্যায়জী সেগুলি দেখে কিছু মতামত দিন, কিন্তু লিখে মতামত দেওয়ার ব্যাপারে তিনি এক নম্বরের অলস। বসে আপনি চাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কাছ থেকে শুনুন, মনে হবে জ্ঞানের অপার সমুদ্র আপনার সামনে ঢেউ তুলছে। এই জ্ঞানের সমুদ্রের এক শতাংশও যদি কাগজে না লেখা হয়, বিশেষ করে এমন বিষয়ের ওপর যা নিয়ে এখনও লেখা হয়েছে, তাহলে চট্টোপাধ্যায়জীকে পরের জন্মে অবশ্যই ব্রহ্মরাক্ষস হতে হবে, কেননা তিনি ঋষি-ঋণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হননি।

পরের দিন নিরালাজীর দর্শনের জন্য দারাগঞ্জ গেলাম। অসংলগ্ন কথা বলা তো তাঁর স্বভাব। কোনো মানুষ অসংলগ্ন কথা বলবে তখনই যদি তার স্বপ্ন আর জাগরণের আল ভেঙে গিয়ে থাকে। আজ তাঁর মুখ দিয়ে এই প্রথম দু-একটি অশ্লীল শব্দ শুনলাম কিন্তু তা ছিল তাঁর কথার মুদ্রাদোষ, একটু রাগ হলে অনেক প্রকৃতিস্থ লোকেরও মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে আসে। তিনি ইংরেজিতে কথা বলতেন, কখনো উর্দুতেও বলতেন—আমি নিরালা নই, আমি ডা· মুহম্মদ হুসেন। নিরালাকে দেখে আমার সরহপাকে মনে পড়ে গেল। আমি এই সদ্য সদ্যও তাঁর লেখা পড়ছিলাম। সরহপা আজ থেকে ১২০০ বছর আগে জন্মেছিলেন। তিনিও মহান কবি ছিলেন, তিনিও অসংলগ্ন-প্রলাপভাষী ছিলেন। আবার যখন সংলগ্ন কথাবার্তা বলতেন তখন মুখ থেকে মুক্তো ঝরত। নিরালা সিদ্ধ পুরুষের পথ ধরেননি যদিও সিদ্ধপুরুষের সব গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। যদি সে-পথ ধরতেন তাহলে কে বলতে পারে যে তিনি পণ্ডিচেরী আর তিরুবন্নামলের সিদ্ধপুরুষদের চেয়েও এগিয়ে যেতেন না? এই রকম নিরংকুশ অথচ মহান পুরুষদের অধিক সংযত করার জন্য পুরাণগুলি একটি উপায় বের করেছিল। বলা যায় সিদ্ধরা নিজেরাই উপায় বের করে নিয়েছিলেন। সরহ নালন্দায় অধ্যয়ন করে মহাপণ্ডিত হয়েছিলেন, সেখানেই কয়েক বছর অধ্যাপক-ভিক্ষু হয়ে ছিলেন। যখন নিজের সময়ের বেদবিরুদ্ধ আচার মিথ্যে মনে হলো তখন এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। ভিক্ষু বেশ ও আড়ম্বর ছুঁড়ে ফেললেন। পাণ্ডিত্যের সম্মানকে নমস্কার জানালেন। লোকে যাতে তাকে আরো বেশি ঘৃণা করে তার জন্য তৈরি থাকলেন। মদ খেতে শুরু করলেন। তারপর তীরের ফলা বানায় এমন একজন লোকের (সিকলীগড়ের) যুবতী কন্যাকে সঙ্গে নিলেন। নিজেও তীর বানাতে শুরু করলেন। শর বানাতেন বলে লোকে তার নাম সরহা দিয়েছিল। তিনি তাঁর যুবতী সঙ্গিনীকে, সিদ্ধের ভাষায় যাকে মহামুদ্রা বলে, নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে লাগলেন। বুদ্ধিমানেরা বলল, এ কোনো এলোমেলো কথা বলা পাগল। কেউ বলল, দুরাচারী, মদ্যপ, বৌ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিক থেকে প্রথমে ছি-ছি শব্দ শোনা যেতে লাগল। সরহ এটাই চাইতেন। তিনি খুশি হতেন। তবে পৃথিবী বেশিদিন তাঁকে উপেক্ষা করতে পারল না। সাধারণ মানুষ তাঁকে মহাত্মা বলতে

লাগল। সরহ তাঁর পাণ্ডিত্য কোনো কাজে লাগাচ্ছিলেন না। সংস্কৃত ত্যাগ করেছিলেন। কখনো কখনো কথ্য ভাষায় কথা বলতেন, যা দোঁহার রূপ নিত। তাঁর ভাষা এত সরল ছিল যে, সে-সময়কার সাধারণ মানুষও বুঝতে পারত কিন্তু তাঁর অর্থ এতই গভীর যে, তা বুঝতে পণ্ডিতও হাবুডুবু খেত। সরহকে সবার মাথার ওপরে তুলে নিতে বহু বছর অপেক্ষা করতে হলো না। বড় বড় পণ্ডিতরা তাঁর চরণধুলি নেবার জন্য দৌড়তেন। বড় বড় মুকুটধারীরা তাঁর চরণে নিজেদের মুকুট খুলে রাখত। সরহর বৈভবের প্রয়োজন ছিল না, সম্মান দরকার ছিল না, তিনি তাঁর অপভ্রংশ কবিতা দ্বারা অমর হয়ে থাকার ইচ্ছেও পোষণ করতেন না। ভারতে অনেক শতাব্দী ধরে তিনি মৃতও হয়ে গিয়েছিলেন। তিব্বত তাঁকে রক্ষা করেছে। সেখানে তিনি এখনও জীবিত এবং পরম সম্মানিত হয়ে রয়েছেন। শেষে আমাদের দেশও তাঁকে বিস্মৃত হওয়ার জন্য অনুতাপ করতে শুরু করেছে।

সরহ সমাজের ভণ্ডামি আর কপটাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ সেসব ছেড়ে সহজ জীবন কাটাক। ধর্মের নামে যত আগড়ুম বাগডুম জিনিস ঢুকে পড়েছিল। তার ওপর তিনি প্রবল আঘাত করেছিলেন। গোরখ, কবীর এবং অন্যান্য সাধু-সন্তরা তাঁরই পথে চলে ভণ্ডামি-খণ্ডন করে গেছেন। নিরালা কাব্যদেবীর আরাধনা করেছেন। কখনো কখনো আমার মনে হয় তিনি যদি সিদ্ধের মার্গ গ্রহণ করে মহামুদ্রাযুক্ত হয়ে থাকতেন তাহলে বেশি ভাল হতো। যেমন-তেমন তরুণী মহামুদ্রা হতে পারে না। সিদ্ধ-সম্প্রদায়ে তার যে আপাদমস্তক বর্ণনা রয়েছে তাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সামান্য কয়েকজন পদ্মিনী নারীই। যদি কোনো পদ্মিনী নিরালাজীর জন্য আত্মোৎসর্গ করতেন তাহলে তাঁকেও ধন্য-ধন্য করা হতো।

সম্মেলনের পক্ষ থেকে ইংরেজি-হিন্দি শব্দকোষ তৈরি হচ্ছিল। তার দপ্তরে একসঙ্গে ড· বাবুরাম সাক্সেনা, ড· বীরেন্দ্র বর্মা, ড· বাহরী, শ্রী রামচন্দ্র ট্যান্ডন ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেখানেই পণ্ডিত রামনরেশ ত্রিপাঠীর সঙ্গেও দেখা হলো। পরের দিন শ্রদ্ধেয় ট্যান্ডনজীকে দর্শন করলাম। তিনি চাইলেন যে আমি প্রয়াগে থাকি। কিন্তু প্রয়াগের গ্রীষ্ম-বর্ষা আমি সহ্য করতে পারতাম না আর কাজের জন্য দুটি জায়গা তৈরি করা সম্ভব ছিল না। সেইদিন অমৃত পত্রিকার দপ্তরে একটি ছোট চায়ের পার্টি হলো। সেখানে সরহপার দোঁহাকোষের ওপর আমি বললাম। পত্রিকা তালপাতার ফটোর সঙ্গে আমার অনেক কথাও ছাপল। এবার এক যুগের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। ১৯১৫-১৬ সালে আমি আগ্রায় আরবী পড়তাম। সে সময় ওখানকার ব্যাপটিস্ট হাইস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীস্যামুয়েল আইজ্যাকের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং তাঁর সৌহার্দ্যে আমি এতই প্রভাবিত হয়েছিলাম যে জীবন-যাত্রার প্রথম খণ্ডে তার উল্লেখ করেছিলাম। তাঁর পুত্র শ্রীজগদীশকুমার সংস্কৃত আর হিন্দির পণ্ডিত হয়ে প্রয়াগের ক্রিশ্চান কলেজের দুটি ভাষার বিভাগেরই অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আমার বই পড়তে পড়তে সেই পঙ্‌ক্তিগুলিও দেখলেন যেখানে আমি তাঁর পিতাকে স্মরণ করেছিলাম। জগদীশকুমারজী আমাকে চিঠি লিখেছিলেন এবং নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার খুব আনন্দ হলো। তিনি পুরনো বন্ধুর যোগ্য পুত্র ছিলেন। এর জন্য তো আনন্দ হওয়ারই কথা, সেই সঙ্গে এটা জেনেও আনন্দ হলো যে, জগদীশকুমার সেই আদর্শ স্থাপন করেছেন যা নতুন ভারতে খ্রিস্টান তরুণদের হওয়া উচিত। ধর্মে বাইবেল, যিশুখ্রিস্টকে মানলে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সংস্কৃতিতে সমস্ত

ভারতীয় হচ্ছে এক, সে আস্তিক হোক বা নাস্তিক, হিন্দু হোক বা খ্রিস্টান অথবা মুসলমান। খ্রিস্টান তরুণদের জগদীশকুমার পথ দেখিয়ে দিলেন। যখন তিনি জানালেন যে, তাঁর বাবাও এখানে এসেছেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম। সন্ধেতে সেখানে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে চায়ের পার্টি হলো। স্যামুয়েল—শ্যামলাল থেকে বদলে যাওয়া নাম—সাহেবের ছিল সাদা বড় বড় গোঁফ। সাদা রঙের দেশী পোশাকে ছিলেন। সম্ভবত ধুতি পরেছিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সেইদিনই আমার প্রথম উড়ানের কলকাতার কমরেড শ্রীমহাদেব প্রসাদের সঙ্গেও দেখা হলো। এটা ৪৭ বছর আগেকার কথা। তবে মহাদেব প্রসাদের সঙ্গে এলাহাবাদে মাঝেমাঝেই দেখা হয়ে যেত। তাঁকে বৃদ্ধই মনে করা উচিত। তিনিও আমার বয়সী ছিলেন।

প্রয়াগ থেকে এবার শ্রীজয়গোপাল মিশ্রর সঙ্গে বেনারস যাওয়ার ছিল। যদিও মুসৌরীতে এটাই স্থির হয়েছিল যে, কৃষ্ণ বৈরীর বাড়িতে আমরা উঠব কিন্তু প্রয়াগে শ্রীদেবনারায়ণ দ্বিবেদীর চিঠি চলে এসেছিল। তাতে বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত আর আমার বিষয়ে উল্লেখ করে জোর দিয়ে লিখেছিলেন যে, সেবা উপবনে শ্রীসত্যেন্দ্রজীর বাড়িতেই যেন আমরা উঠি। সত্যিই বাবু শিবপ্রসাদজীর ভালবাসা ও সম্মান আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। যখন আমি সারনাথে উঠতাম তখন তিনি সেখানে দেখা করতে আসতেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আর সংস্কৃতির তিনি ছিলেন অনন্য সাধক। যেহেতু আমি বৃহত্তর ভারতের প্রাচীন সম্পর্কগুলি জাগ্রত করার কাজে লিপ্ত ছিলাম তাই আমার প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। এই রকম কাজে সাহায্য করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ছাউনিতে স্টেশন থেকে বেরোতেই দেখি দ্বিবেদীজী আর বেরীজী দুজনেই উপস্থিত। এত তাড়াহুড়োর মধ্যে চিঠি পেয়েছিলাম যে বেরীজীকে আমি জানাতেও পারি নি। খুব দ্বিধায় পড়লাম। বেরীজীকে বুঝিয়ে সেবা-উপবন চলে গেলাম। এর ফলে বেরীজীর যদি রাগ হয়েছিল তো সেটা হওয়া স্বাভাবিকই। কিন্তু কী করতাম? দুপুরের স্নান-খাওয়া করার আগে, স্টেশন থেকে আসার রাস্তায় আমার ছাত্রজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত মোতিরামের বাগান দেখতে গেলাম। বেনারস এলে এটা দেখতে আমি ভুলতাম না। বাগান শেষ হয়ে গেছে। যেখানে কুইরীরা চাষ করত, সেখানে গোয়েঙ্কা সংস্কৃত ছাত্রাবাস গড়ে উঠেছে। ভেতরে এখনো জমি খালি পড়ে ছিল। ব্রহ্মচারী চক্রপাণির কুটির এখনো ছিল। পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে এখন কেউই আর ছিল না।

সেবা-উপবনে গিয়ে স্নান-খাওয়া এবং একটু বিশ্রাম করলাম। এরপর আবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোলাম। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীকে বাড়িতেই পেলাম। ছেলেরা অভিযোগ করল, 'এখানে কেন উঠলেন না?' বাসুদেব শরণজীর বাড়ি গেলাম। তিনি এ সময় কলকাতা গিয়েছিলেন। ফিরে এসে উপবনে খানিকক্ষণ থাকলাম। পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লের নাতি আগেই কথা নিয়ে নিয়েছিল যে তাদের বাড়িতে শুক্লজীর প্রতিকৃতি উদ্ঘাটন করতে হবে। যে জমিতে শুক্লজী তাঁর বাড়ি বানিয়ে ছিলেন সেটা আমার পরিচিত ছিল। আরও পরিচিত ছিল রানী বড়হরের বাড়ি আর মন্দির। সেখানে গিয়ে প্রতিকৃতি উদ্ঘাটন করলাম। যদি বেশি সময় ধরে কাজ হতো তাহলে প্রোগ্রাম কোথাও না কোথাও ভাঙতো। তাই অনুরোধ না মেনে ঠিক সময়েই উদ্ঘাটন ও ভাষণ হলো। শুক্লজী তাঁর নিজের

এলাকায় হিন্দির বিষয়ে কত বড় কাজ করেছিলেন তা এ থেকেই বোঝা যায় যে, এখনও তাঁর হিন্দির ইতিহাসকে পরাস্ত করতে পারে এমন কেউ জন্মায় নি। সেখান থেকে পাঁচটার সময় ভদৈনীতে তুলসী গ্রন্থাগারে স্বাগত জানানোর কথা ছিল। অসী, সংগম, গুদরদাসের আখড়া, মোতিরামের বাগান—কাশীতে এগুলি ছিল সেই সব স্থান যেখানে আমি শুধু সংস্কৃতই পড়ি নি, সেখানে নগর এবং সাহিত্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও পেয়েছিলাম। তুলসীঘাট এখানেই। কিন্তু আমার সময়ে তুলসী দাসের নামে কোনো গ্রন্থাগার হয় নি। পণ্ডিতদের মধ্যে এখন আমার পরিচিতদের কেউ ছিলেন না। খুব কম পণ্ডিতই বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত কাশীবাসের জন্য থেকে যান। বিশেষ করে তাঁর বাড়ি যদি বেনারসে না হয়। সেখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কিছুক্ষণের জন্য 'আজ'-এর কার্যালয় হয়ে বেরীজীর 'হিন্দি প্রচার পুস্তকালয়' এবং তাঁর 'বিদ্যামন্দির প্রেস'-এ গেলাম, যেটা ছিল মানমন্দিরের পাশেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রেস যে এগিয়ে চলছে এবং আধুনিক উপায়ে মুদ্রণসম্পন্ন হচ্ছে তা বেরীজীর এই প্রেস দেখে বুঝতে পারলাম। এখানেই শ্রীপরমেশ্বরী লাল গুপ্ত, ত্রিভুবননাথ, শ্রীঠাকুর প্রসাদ সিংহ এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরা এসে দেখা করলেন। সেখান থেকে কচৌরী গলি হয়ে আদিবিশ্বেশ্বরের নিকটে পণ্ডিত শিবগোপাল মালব্যর বাড়ি কিছুক্ষণের জন্য গেলাম। এত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে খুব আত্মতুষ্টি হলো। নটার সময় উপবনে ফিরলাম।

২২ তারিখ সাড়ে সাতটাতেই জয়গোপালজী আর শ্রীদ্বিবেদীজীর সঙ্গে সারনাথে পৌছলাম। কাশী-যাত্রায় এখানে আসাটা অনিবার্য। মহাবোধি স্কুলের বাড়ি অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। লাদাখের এক বৈদ্য অনেক তরুণ সাধুকে নিয়ে লাসা যাচ্ছিলেন। তিনি ওখানকার খবরা-খবর জানালেন। মন্দির আর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য বর্মী ধর্মশালায় মহাস্থবির কিত্তিমার সঙ্গে দেখা করলাম। জীবনের চতুর্থ দশায় যদি শরীর শুকিয়ে যায় তাহলে তাকে আবার কীভাবে সজীব করে তোলা সম্ভব? কিত্তিমাজী তাঁর সারাটা জীবন ভারতে এবং তাও ভারত ও বর্মার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। আমার ভাইপো উদয়নারায়ণ পাণ্ডে এখন এখানেই মহাবোধি স্কুলের শিক্ষক ছিল। সে থাকত কিত্তিমাজীর কাছে। তার দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। স্ত্রীও এখানেই থাকে। শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান জীবনের উপযুক্ত স্থান আজ গ্রামে কোথায়? আগে জীবিকার যে উপায়গুলি ছিল এখন তাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই এই শ্রেণীকে তো আজ হোক কাল হোক গ্রাম থেকে পালাতেই হবে, নইলে অন্যদের বশীভূত হয়ে থাকতে হবে।

উদয়প্রতাপ কলেজে বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ওদিকে কাশী বিদ্যাপীঠেও বারোটায় সময় দিয়েছিলাম, তাই কলেজে সাত মিনিটের বেশি বলতে পারলাম না। বিদ্যাপীঠে ভাষণ দেওয়ার পর ড. মঙ্গলদেবজীর বাড়ি গেলাম। সব জায়গাতেই তাড়াহুড়ো ছিল। বেরীজীর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন করার ছিল। যতই তাড়াতাড়ি করি না কেন কিন্তু পৌছলাম নির্দিষ্ট সময়ের দেড় ঘণ্টা পর। তাঁর বাড়ি বেনারসের ঘোরানো-প্যাঁচানো গলিতে যেখানে নিজেকেই পথ-প্রদর্শক হতে হলো।

সেখান থেকে আবার কমরেড রুস্তম সেটিন ও মনোরমাজীর বাড়ি চা খেতে গেলাম। তারপর চারটের সময় নাগরী প্রচারিণী সভাতে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হলাম। এখানে অনেক

পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। পণ্ডিত চন্দ্রবলী পাণ্ডেও ছিলেন, পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদজীও ছিলেন। তারপর গাড়িতে করে ছুটলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্য সহকার সমিতি'তে। অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত হতে হলো। সভা ছিল পণ্ডিত মন্নন দ্বিবেদীর ভাই অবধ দ্বিবেদীর বাড়িতে। শ্রীমন্নন দ্বিবেদীর নাম শুনলে হৃদয়ে ব্যথা লাগে। হিন্দির এই প্রতিভাশালী লেখক এবং কবি যৌবনেই তাঁর সব ক্ষমতা থেকে হিন্দিমাতাকে বঞ্চিত করে মারা গেছেন। তাঁর ভোজপুরীতে লেখা বসন্তকাল সম্বন্ধীয় কবিতার পঙ্‌ক্তি এখনও আমার কানে গুনগুন করে। সরকারি চাকরির জন্য তাঁর লেখা ছদ্মনামে 'প্রতাপ'-এ বেরোত। এবং আমার মত যুবকরা তাঁর এক-একটি অক্ষর নিঃশেষে পান করত। এরকম মানুষকে এত দ্রুত কেন চলে যেতে হলো? তাঁর দীর্ঘজীবী হওয়া দরকার ছিল। তাঁর ভাইও সাহিত্যের একজন গভীর মর্মজ্ঞ। ইংরেজির অধ্যাপক কিন্তু হিন্দির প্রতি ভালবাসা পেয়েছেন তাঁর দাদার কাছ থেকে। বলা যায়, অন্নগ্রহণ করেন ইংরেজির কিন্তু কাজ করেন হিন্দির। কয়েক বছর থেকেই চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তবু তাঁকে সদাপ্রসন্ন দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবার শেষ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার জন্য আবার গোধুলিয়ায় সরস্বতী প্রেসে পৌঁছলাম। যদিও শ্রীপতিজী আর অমৃতজী এখন প্রয়াগে তাঁদের স্থান বদলে নিয়েছেন তবু এই বাড়িটি এখনও নিজের কাছে রেখেছেন। এখানে মার্কসবাদী ক্লাবে বলতে হলো। রাত সাড়ে নটায় নিজের বাসস্থানে ফিরে এলাম।

বেনারসের কাগজে আমার আসা এবং কোথায় আছি সে খবর বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই বন্ধুরা জানতে পেরেছিল। ২৩ তারিখের অর্ধেকটা দিন আমার এখানে থাকার ছিল। সকাল সাতটা থেকেই বন্ধু-বান্ধবরা দর্শন দিতে শুরু করল। বেশির ভাগ এলেন এমন বিদ্বানরা যাঁদের সঙ্গে অনেক কাজের কথা বলার ছিল। প্রিন্সিপ্যাল রাজবলী পাণ্ডে, ড· হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেজী, শ্রীপরমেশ্বরীলাল গুপ্ত, শ্রীমহেন্দ্র শাস্ত্রী ন্যায়াচার্য, শ্রীদলসুখভাই মালবনিয়া, স্বামী সত্যস্বরূপজী এবং স্বামী যোগীন্দরানন্দর সঙ্গে নটার পরেও কথাবার্তা চলতে লাগল। সকলেই নিজের নিজের কাজে মগ্ন হয়ে আছেন জেনে খুব ভাল লাগল।

এই যাত্রার একটি নিজস্ব প্রয়োজনও আমার ছিল। তা হলো আমার বইগুলি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা। একজন প্রকাশক আগে চিঠির মাধ্যমে আশা দিয়েছিলেন, 'আমরা অনেক বই ছেপে দেব এবং কিছু অগ্রিমও দেব।' যখন চলে যাওয়ার আর দু-তিন ঘণ্টা বাকি তখন অক্ষমতার কথা জানালেন। তিনি যদি আসার দিনই বলে দিতেন তাহলে আমার বই প্রকাশনের ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে সুবিধে হতো। কয়েকটি বই শ্রীসত্যেন্দ্রজী প্রকাশ্য করতে চাইছেন জেনে আনন্দ হলো।

দশটার সময় ভারত কলাভবনে গেলাম। রায়কৃষ্ণদাস নাগরী প্রচারিণী সভার তত্ত্বাবধানে এটা আরম্ভ করেছিলেন। এখন তা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রকৃত স্থানে চলে এসেছিল। শ্রীপরমেশ্বরীলালজী তার কিউরেটর ছিলেন। সংগ্রহালয়ের মূর্তি, চিত্র আর মুদ্রাগুলি আমার দেখার ইচ্ছে ছিল। মিউজিয়ামের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, আপাতত তা অস্থায়ীভাবে একটি বাংলোতে ছিল। পরমেশ্বরীলালজী স্কুলের পড়াশুনো ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একবার পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়ার পর আবার তাতে ফিরে আসাটা খুবই মুশকিল। কিন্তু যার নিষ্ঠা রয়েছে সে আবার নিজের পথ ধরে নেয়। পরমেশ্বরীলালজীর মনোযোগ প্রথমে

ছিল সাংবাদিকতার প্রতি। তারপর পুরাতত্ত্ব আর প্রাচীন মুদ্রাগুলি তাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে তিনি সেই বিষয়েরই লোক হয়ে গেলেন। আজমগড়ে থাকার সময় তাঁর কাছে প্রায় এক মণ কুষাণ যুগ তথা প্রাচীনকালের মুদ্রা দেখেছিলাম। উচ্চ শিক্ষণ সংস্থাগুলি তাঁকে ধিক্কার জানাত কারণ তাঁর কাছে সেই বিষয়ে প্রবেশ করার কোনো প্রমাণপত্র ছিঁল না। কিন্তু যার ক্ষমতা রয়েছে তাকে কতদিন দূরে রাখা সম্ভব? তিনি তাঁর লেখা দিয়ে নিজের জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। তিনি সোজা এম এ-তে ভর্তি হয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। এখনকার যুগে ডক্টরেট উপাধি টাকা সের করে দেওয়া হয়েছে, ফলত তার কোনো আকর্ষণও নেই। কিন্তু পরমেশ্বরীলালজীর কাছে সেটা কোনো দুর্লভ বস্তু নয়। কাশী থেকে আবার তাঁকে বোম্বের মিউজিয়ামে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ড· মোতিচন্দের সঙ্গে তিনি এখন কাজ করছেন।

কাশীতে এবারের থাকাটা কীরকম ব্যস্ততাপূর্ণ ছিল তা ওপরের বর্ণনা থেকেই বোঝা যাবে। ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করলাম। শ্রীসত্যেন্দ্রজীর সঙ্গে ছাউনি স্টেশনে পৌছলাম। বাবু শিবপ্রসাদজী তাঁর দুই নাতিকে বাঘ আর ভালুক বলতেন, তাদের শরীর দেখে যা উল্টো মনে হতো। সত্যেন্দ্রজীর তাঁর দাদুর সঙ্গে বেশি মিল ছিল কিন্তু তাঁর ভাই ছিলেন রোগা-পাতলা।

পাটনা—আমি যখন কামরায় উঠলাম গাড়ি তখন ছাড়বার মুখে। প্রায় একটা বাজছিল। মুসৌরীতে আমি ভাবলাম যে, অক্টোবরের শেষে এখন সমতলে গরমের ভয় থাকবে না। বেশির ভাগ সময় পাখার সাহায্য নিয়েই কাটল। ট্রেন সোজা পাটনা যেত। বক্সারে কয়েকজন তরুণ দেখা করতে এলো। তারা কাগজ থেকে জানতে পেরেছিল যে, আমি এই ট্রেনেই যাচ্ছি। আরা-তেও সামান্য কথা হলো। ছটা বেজে পঁচিশ মিনিটে আমি পাটনা জংশনে পৌ।ছে গেলাম। জয়গোপালজী বেনারস থেকেই ফিরে গিয়েছিলেন এবং আমি একলাই ছিলাম। স্টেশনে শ্রীদেবেন্দ্রজী, কুসুম, বীরেন্দ্রজী আর অদ্‌ভুতজী এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দেবেন্দ্রজীর বাড়িতে গেলাম। দেবেন্দ্রজী রুশ ভাষা পড়ার জন্য দু-বছর লন্ডনে ছিলেন। সংস্কৃতের সাহিত্যাচার্য এবং মেধাবী পুরুষ তিনি। রুশ ভাষা পড়তে তাঁর মনও বসে গেল। আরও সাত-আট মাস থাকতে দিলে ওখান থেকে বি এ করার জায়গায় ডক্টরেট হয়ে চলে আসতেন। তিনি চেয়েছিলেন, এক বছরের অ-বেতন ছুটি যদি পাওয়া যায় কিন্তু আজকাল চাকরিতে খুব যোগসূত্র কাজ করে। লন্ডনের ডক্টরেট অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যাবে এ ভাবনাও ছিল। তিনি তাঁর স্ত্রী কুসুম, ছেলে দীপক এবং মেয়ে দীপ্তিকেও ওখানে আনিয়ে নিয়েছিলেন। কুসুম তার দুটি বাচ্চা নিয়ে একলাই লন্ডন চলে গিয়েছিল, এটা কম সাহসের কথা নয়। বাবা (পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদী) তাঁর সময়ে সায়েন্সের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি যদি সায়েন্সের উচ্চ শিক্ষার জন্য জার্মানি যেতেন তাহলে এক প্রজন্ম আগেই এই ভাবনা জেগে উঠত যে, সমুদ্র পার হলে ধর্ম নষ্ট হয় না। কিন্তু এটা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন আর এখন আকাশ-পাতালপার্থক্য। এখন তো ব্রাহ্মণ হোক বা যে কোনো জাতি হোক, বিলেত ফেরত হলে সম্মান বেড়ে যায়, জাত থেকে বের করে দেওয়ার সাহস কার? দেবেন্দ্রজীর বাবা সংস্কৃতের দিগ্‌গজ পণ্ডিত। আজ জীবিত থাকলে পুত্রবধুর এই কাজ কেমন ভাবে নিতেন কে জানে। দশ মাস থাকার ফলে বাচ্চাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন এসেছে দেখা যাচ্ছিল। তারা যেমন

শুদ্ধ ইংরেজি বলছিল তেমনই ইংরেজ শিশুদের পরিচ্ছন্নতা আর ব্যবহারও স্বাভাবিকভাবেই শিখে এসেছিল।

২৪ অক্টোবর রোববার ছিল। শিবপূজনবাবু সম্মেলন ভবনেই থাকেন শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এমন সরল ও মধুর স্বভাবের সাহিত্যিক খুব কমই দেখা যায়। তিনি টি বি স্যানিটোরিয়ামে গেলে সমস্ত হিন্দি অনুরাগীদের খুব দুঃখ হয়েছিল। এখন সেখান থেকে চলে এসেছিলেন, কিন্তু শরীর খুব দুর্বল ছিল। সারা জীবনের সাহিত্য-সাধনাকে তিনি গলায় বিঁধে থাকা জিনিস বলে মনে করেন নি। যখন গোনাগুনতি টাকা পেতেন তখনও তিনি একই রকম তন্ময়তা নিয়ে সাহিত্য-সেবা করতেন। এই সময় স্বাস্থ্যের কথা ভেবেও পরিশ্রম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। সবাই বলত, 'পরিশ্রম কম করুন, অন্যদের দিয়ে করান।' কিন্তু শিবজী মহারাজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে চান। অনেকে বোধ হয় তাঁকে লেকচার শুনিয়েছিল। আমিও শোনালাম, তাতে খারাপটা কী? পরের দিন জানতে পারলাম, তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর নাগার্জুনজীর সঙ্গে মিউজিয়াম গেলাম। জয়সওয়াল প্রতিষ্ঠান থেকে তঞ্জুরের সেই অংশগুলো নেবার ছিল যেগুলোতে সরহ-এর কবিতার অনুবাদ ছিল। ওখানেই ফ্রেজার রোডে পার্টির অফিস ছিল। যদিও আমি এই পার্টির মেম্বার ছিলাম না কিন্তু আমি এই পার্টিরই ছিলাম। তাই তার কর্মীদের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হওয়াটাও স্বাভাবিক ছিল। পুরনো কমরেডদের সঙ্গে দেখা হলো—ইন্দ্রদীপ, চন্দ্রশেখর, যোগেন্দ্র, রামাবতার। কিছুক্ষণ ধরে তাদের সঙ্গে কথোপকথন হলো। বাড়ি ফিরে দেখলাম শিবজী সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আনন্দ আর দুশ্চিন্তা দুইই হওয়ার কথা ছিল। দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলে তিনি বললেন, 'না না, আমি রিক্সোয় করে এসেছি।' সরহ-গ্রন্থাবলী আর 'মধ্য-এশিয়া কে ইতিহাস' সম্বন্ধে কিছু কথা বলার ছিল। সেই দিন সন্ধেতে ধূপনাথজীও এসে পড়লেন। বিহারে প্রগতিশীল শক্তিগুলি যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তা দুঃখেরই ব্যাপার। সোস্যালিস্ট-কমিউনিস্টদের ছায়াও মাড়াতে চাইছিল না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মনোবৃত্তি দূর হবে ততক্ষণ কোনো বড় কাজের আশাও চট করে করা সম্ভব নয়।

২৫ অক্টোবর জয়সওয়ালজীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর কন্যা ধর্মশীলা নিজের বাংলো বানিয়েছিল। জয়সওয়ালজীর সন্তানদের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ পুত্র চেতসিংহ ছিলেন হীরের টুকরো। আমি আগেই তাঁর কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম। কি উদার ছিলেন এই মানুষটি! ব্যারিস্টারি পাস করার সময় ওখান থেকে ইংরেজ তরুণীকে বিয়ে করে এনেছিলেন। বাবা আগেই ছেলের বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন তাই এটা তাঁর পছন্দ হলো না। নতুন ব্যারিস্টার এত দ্রুত কী করে নিজের পায়ে দাঁড়াতেন? চেতসিংহ ফিরে গিয়ে তাঁর প্রেমিকাকে লন্ডন নিয়ে গেলেন এবং সেখানে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে তার কাছ থেকে মুক্তি নিলেন। কয়েক বছর ভারতে থাকার পর চেতসিংহ মালয় দেশে ব্যারিস্টারি করতে চলে গেলেন। ১৯৩৫ সালে জাপান যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল। তখনই তাঁর ব্যারিস্টারি জমে উঠেছিল। মহাযুদ্ধের সময়ে খবর না পাওয়ায় নানা রকমের আশংকা হচ্ছিল। এখন চেতসিংহ জয়সওয়াল মালয়ের বাসিন্দা হয়ে গেছেন। সেখানেই পরিবার আছে, ঘরবাড়ি আছে, এরকম

অবস্থায় তাঁর কী প্রয়োজন ছিল কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে ভাইদের উদ্ধার করার? জয়সওয়ালজীর বাংলো নিয়ে ভাই-বোনদের মামলা চলছিল। ভাইরা বলছিল, আমাদের সম্পত্তি। বোনেরা বলছিল, আমাদেরও অংশ আছে। জয়সওয়ালজী কোনো উইল করেছিলেন। কিন্তু আমি সেটার খবর জানতাম না। যদিও আমি তাঁর একজন বাড়ির লোকের মতোই ছিলাম কিন্তু ঘরোয়া কথাতে না আমার আগ্রহ ছিল আর না তিনি আমাকে সে-ব্যাপারে কিছু বলতেন। আমাদের কথা বলার অন্য অনেক বিষয় ছিল। জয়সওয়ালজীর দ্বিতীয় পুত্র বিট্টু কৃষি-বিভাগের ভাল পদে ছিলেন। নারায়ণও ডাক্তার ছিলেন কিন্তু চতুর্ভুজ আর দীপ সেই বাংলোতেই মদের হোটেল খুলে জীবিকা নির্বাহ করত। বাংলোটি স্টেশনের কাছে ছিল। আগের বার দেখা হওয়ার পর এটাই চিন্তা হচ্ছিল যে, যদি বোনেরা জিতে যায় আর তারা বাংলো ভাগ করতে চায় তাহলে জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে। এখন তারা তাদের বড় ভাইকে মনে প্রাণে আশীর্বাদ করছিল। নতুন প্রজন্ম কীভাবে সমাজের পুরনো বন্ধন ভেঙে এগিয়ে যায় তা এখানে দেখা যাচ্ছিল। ব্যারিস্টার ধর্মশীলার এখন তার স্বামীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সব চেয়ে ছোট বোন জ্ঞানশীলার বিয়ে হয়েছিল এক প্রফেসরের সঙ্গে। ভবেচিন্তেই বিয়ে করেছিল কিন্তু পুরনো প্রবাদ সত্যি হলো—'মন যদি মেলে তো ভাল না মিললে একলা থাকাই ভাল।' সে এখান থেকে ডাক্তার হয়ে উঁচু ডিগ্রি নেবার জন্য লন্ডন গিয়েছিল। বোন বলছিল, তার ওখানে মন বসছে না।

সন্ধে ছটার সময় সম্মেলন ভবনে বৈঠক হলো। প্রায় একশোজন সাহিত্যিক এসেছিলেন। সভার চেয়ে সাহিত্যিকদের বৈঠক ভাল হয় কারণ এখানে লোকে মিলেমিশে বসে, নিজের ভাবনা-চিন্তাগুলি ব্যক্ত করে। কিন্তু বৈঠকের সংখ্যা সীমিত হওয়াটাও দরকার। আমি ভাষা ও লিপি নিয়ে বললাম। গোটা দেশের সম্মিলিত ভাষা হওয়ার ফলে এবং আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির বাহন হওয়ার জন্য হিন্দি আমাদের প্রেমাস্পদ। কিন্তু এটা মানতে আমি রাজি নই যে, আমাদের ভোজপুর, মাগহী, মৈথিলী ইত্যাদি ভাষাগুলিকে উপেক্ষা করা হোক। ওখানে উপস্থিত সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে কারুরই মাতৃভাষা হিন্দি ছিল না। আর কয়েকজন তো খাস ভোজপুরী ছিলেন যাঁদের প্রায় সব কথাবার্তাই নিজের মাতৃভাষায় হয়ে থাকে। কয়েকজন বন্ধু খুব জোরালো ভাষায় আমার মত খণ্ডন করলেন। কয়েকজনের ভাব ছিল এই যে, কবরস্থ মৃতদেহকে কেন টেনে তোলা হচ্ছে? আমি কী করে মেনে নেব যে ভোজপুরী হচ্ছে 'কবরস্থ মৃতদেহ'? আমার নিজের মাতৃভাষাকে এই রকম বলাটা আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমি নিজেকে খুব সংযত করলাম কিন্তু প্রতিবাদ করার সময় নিজের গলাকে কোমল রাখতে পারলাম না। এর জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুতাপ হলো। আমার ভাবনা যাইহোক তা তর্ক এবং যুক্তি দিয়েই অন্যের সামনে পেশ করতে হবে। অন্যে তার উত্তর যেভাবেই দিক না কেন, তা ঠাণ্ডা মাথায় শুনতে হবে। এটাই আমার নীতি। আমি নিজেই যদি তা উল্লঙ্ঘন করি তাহলে দুঃখ হবে না কেন?

নালন্দা—২৬ অক্টোবর দেওয়ালি ছিল। দুপুরে শ্রীজগদীশচন্দ্র মাথুরের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভাল করি নি। কেন না ততক্ষণে আমাদের নালন্দা থেকে ফিরে আসার

কথা। ভোর সাড়ে পাঁচটাতেই দেবেন্দ্রজী, দীপক, দীপ্তি এবং যোগেন্দ্রজীর ছেলে মুন্নার সঙ্গে গাড়ি করে চললাম। তখন অন্ধকার ছিল। আকাশে মেঘ ছেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছিল। ফতুহা, বখ্তিয়ারপুর, বিহার-শরীফ হয়ে দেড় ঘণ্টায় নালন্দা পৌছলাম। ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইল গতি ছিল। নালন্দার পুনরুজ্জীবনের জন্য যে সাকার প্রচেষ্টা তা দেখতে প্রথমবার অনেক বছর পর এসেছিলাম। বড় পুকুরের সামনে পালি-প্রতিষ্ঠানের একতলা বাড়ি প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কাশ্যপজী সব কিছু দেখালেন। গ্রামের একটি পাকা দোতলা বাড়ি ভাড়ায় নিয়ে তাকে গ্রন্থাগার করা হয়েছিল। নালন্দাকে কখনো ভোলা যেতে পারে? পুরনো ইমারতের স্তূপ খনন করে শুধু তক্তা বসিয়ে দিলেই কি সন্তুষ্ট হওয়া যায়? এই নালন্দা ধর্মকীর্তির মতো বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি করেছে। শত শত বছর ধরে অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার মহান কাজটি করেছে। এখানে কত দেশের ভিক্ষু আর বিদ্যার্থী উপস্থিত ছিল। নালন্দা তার বাড়ি বানানো আর অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে সরকারকে বাধ্য করছে। বৈদ্যুতিক নলকূপের প্রস্তুতি চলছে। পরিদর্শন করে ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপজীর ঘরে মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম। কাশ্যপজী ইন্‌স্টিটিউটের অনারারি ডাইরেক্টর। বলছিলেন, 'আমি ডাইরেক্টরের পদ থেকে ইস্তফা দিতে চাইছি, যাতে কাজ করার ব্যাপারে আমার বেশি স্বাধীনতা থাকে।' আমি বললাম, 'তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।' নালন্দা থেকে রাজগৃহ যাওয়ার এখন আর সময় ছিল না। তাই সিলাও গিয়ে বিখ্যাত চিঁড়ে আর খাজা কিনলাম। তারপর গাড়ি পিছনে ঘুরে ছুটল। একটার সময় দেবেন্দ্রজীর বাড়িতে অন্যদের ছেড়ে আমি সোজা মাথুর সাহেবের বাংলোয় গেলাম। খেতে খেতে কথা হলো। তারপর চা-পানের জন্য অল্‌তেকর সাহেবের বাড়ি গেলাম।

রাতে সারা শহরে দীপমালা জ্বলল। মুসৌরীতেও দীপমালা হয় কিন্তু আমি কখনো তা দেখতে যাই নি। রাত্রেই ড· বাঁকেবিহারী মিশ্রর সঙ্গে দেখা হলো। আমাদের দেশে গান্ধিজী 'লৌটো গুহা-মানব কী ওর'[১]—শ্লোগান তুলেছেন। তিনি তুলেছিলেন সদিচ্ছা নিয়েই,কিন্তু এখন আমাদের ভাগ্যবিধাতা তা দিয়ে জনতার চোখে ধুলো দেওয়ার কাজটি করে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হচ্ছে, কলেজ বানাতে হচ্ছে। কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে উচ্চ শিক্ষণ সংস্থা। উচ্চ শিক্ষণ সংস্থা গ্রামে কীভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে? সেখানে একটি নতুন নগর পত্তন করার জন্য টাকা খরচ করার সামর্থ্য কোথায়? নগর না থাকলে ছাত্র আর অধ্যাপকদের সাংস্কৃতিক জীবনের সুযোগ-সুবিধে থাকবে না এবং এটা ছাড়া সেগুলি সেখানে টিকে থাকতে পারবে না। তারপর এই সংস্থাগুলির জন্য বড় গ্রন্থাগার, সংগ্রহালয় এবং যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র দরকার। আমার তো এখন নালন্দার পালি ইন্‌স্টিটিউটকেও অনুপযুক্ত বলে মনে হয় কিন্তু নালন্দার একটি নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে, যাকে স্বেচ্ছায় বিস্মৃতির গর্ভে চলে যেতে দেওয়া যায় না। ধীরে ধীরে এটা বড় সংস্থা হবে, ওখানে নগরের পরিবেশও গড়ে উঠবে।

বিহার সরকার গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের কাজে ড· বাঁকেবিহারী মিশ্রকে নিযুক্ত করেছিলেন। আমি বললাম, 'যদি গ্রামে করতেই হয় তাহলে এই রকম বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দায়

[১] 'গুহামানবের কাছে ফিরে চল।'—স·ম

করুন। ওখানে একটি ইন্‌স্টিটিউট আছেই, এটাও হোক এবং সেই সঙ্গে একটি কৃষি-কলেজ থাকুক তাহলে অনেকগুলি সংস্থা মিলে তাদের অন্য অভাবগুলি পূরণ করবে।' কিন্তু শেষে সেটা মুজফ্‌ফরপুর জেলার তুরকী গ্রামে করা হলো। ১৯৫৬ সালের যাত্রায় যখন ড· মিশ্রকে দেখেছিলাম তখন তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি খুব বিদ্যানুরাগী মানুষ। যে-মানুষ একটা নামকরা হাই স্কুলের হেডমাস্টারি ছেড়ে কৃষক সত্যাগ্রহে আমার জায়গায় যেতে রাজি হয়ে যান তাঁর সাহস সম্বন্ধে কী আর বলব? তবে ড· মিশ্র ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস বিষয়ে খুবই পণ্ডিত। তাঁর নাড়ি-নক্ষত্র তিনি জানেন। লন্ডনে থেকে তিনি এর ওপর শুধু পি এইচ ডি আর ডি লিটই করেন নি, উপরন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সেই বিশাল সামগ্রীর ভেতরেও অবগাহন করেছিলেন, যেখানে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসের মূল রেকর্ড প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রয়েছে। ভারতের ঐতিহাসিক রেকর্ডের দেখাশোনা করাটাই তাঁর কাজ হওয়া উচিত ছিল।

রাতেই দিনকরজী, নাগার্জুনজী, শ্রীরামখেলাবন পাণ্ডে এবং অন্যান্য সাহিত্যিক বন্ধুরা এলেন। তাঁদের সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল। দিনকরের ভাবনায় এখনো কোনো পরিবর্তন হয় নি। তিনি একদিকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে অগ্নিবীণা বাজাচ্ছিলেন আর অন্যদিকে ইংরেজের অধীনে চাকরি করছিলেন। এখন নতুন প্রভুদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব রাখার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লোকে ভালমন্দ বলত। আমি দিনকরের কবিতাগুলি দেখি। সে-কবিতায় নির্ভীকতা রয়েছে। তিনি এখনও জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো শব্দ দিয়ে লেখেন। আমি দিনকরের প্রশংসাকারী।

লক্ষ্ণৌ—পাটনা থেকে পশ্চিমে আসার সময় গাড়ি অসময়েই ধরতে হয়। রাত তিনটে কি ওঠার একটা সময়? নিজে ওঠার অর্থ ঘরশুদ্ধ লোককেও ওঠানো। চারটের সময় ধূপনাথ আর বীরেন্দ্রজী স্টেশনে পৌছতে এলেন। পাঞ্জাব মেল ধরলাম কারণ সেটাই সোজা লক্ষ্ণৌ পৌছত। কম্পার্টমেন্টে মুসৌরী যাচ্ছে এমন দুজন তরুণ-তরুণীও ছিল। আজকাল মুসৌরীতে তারাই যায় যারা সেখানে পড়ে। এরা ওখানকার ছাত্র-ছাত্রী। পথে এবং পাটনাতেও টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। তবে বেনারসের দিকে তার কোনো চিহ্ন ছিল না। রেলযাত্রার সময় ইনসুলিন নেওয়ার নিয়মটি স্থগিত থাকে, তা না নিয়েই খাবার খেলাম। আড়াইটের সময় লক্ষ্ণৌ পৌছলাম। কমরেড শিব বর্মা আর যশপালজীর মেয়ে মণ্টাকে তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখতে পেলাম। ভিক্ষু প্রজ্ঞানন্দও এসেছিলেন। তিনি খুব খুশি হতেন যদি আমি রিসালদার বাগ বৌদ্ধ বিহারে উঠতাম। কিন্তু যশপালজীর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুবিধে থাকে বাড়িতে। এই জন্য তিনি এবং প্রকাশবতীজী অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর বাড়িতেই উঠলাম। শ্রীমতী মোহিনী জুত্‌শী আর জুত্‌শী সাহেবও এলেন। অন্য বৌদ্ধ বিহারে মাঞ্চু ভিক্ষু মঙ্গলহৃদয়কেও পেলাম। দুর্গা ভাবীর বাড়ি গিয়ে তাঁর ছেলে সতীশকে প্রথম দেখলাম। সতীশ অনেক বছর পর পড়াশুনো করে আমেরিকা থেকে ফিরেছিল এবং কোনো সার্ভিসে যুক্ত ছিল।

যদিও মা-বাবা ছিল না তবু মন্টা আর নন্দু আতিথ্য-সৎকারে কোনো রকম ত্রুটি হতে দেওয় নি। দুজনে নাটকও দেখাল।

পরের দিন ন্যাশন্যাল হেরল্ড প্রেস গেলাম। 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড

এখানে দ্বিধার মধ্যে ছিল। তবে এবার শ্রীসীতারাম গুণ্ঠের ম্যানেজার হয়ে আসার কথা, তাই তাঁর এই বইয়ের উদ্দেশ্যের ওপর আস্থা ছিল। আমি প্রথম খণ্ডও ওখানেই দিয়ে এলাম। ন্যাশন্যাল হেরল্ড আমাদের দেশের খুব বড় একটি প্রেস কিন্তু তার ব্যবস্থা শিল্প যুগের উপযোগী নয়, মনে হয় যেন সামন্ত যুগের মতো। প্রেসটি নিজের খরচও তুলতে পারে না আর ঋণের বোঝায় চাপা পড়ে যায়। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন রফী আহমদ কিদবাই-এর মতো কর্মঠ পুরুষ। তিনি চাইতেন না যে নিজের হাতে লাগানো এই গাছটি শুকিয়ে যাক বা কোনো পুঁজিপতির হাতে তা চলে যাক। প্রচুর কাজের চাপের জন্য রফী সাহেবের সময় বের করাও মুশকিল কিন্তু হাতি যখন ডেকে উঠল, ভগবানও তখন নগ্ন গায়ে দৌড়তে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। প্রেসকে ঠিকঠাক করার জন্য তিনি গুণ্ঠেজীকে আনলেন। কিন্তু গুণ্ঠেজী আসার ব্যাপারে সব কথা ঠিক-ঠাক হওয়ার পর এক সপ্তাহও কাটে নি এমন সময় রফী সাহেব অগণিত মানুষকে কাঁদিয়ে চিরবিদায় নিলেন। গুণ্ঠেজীর কাছে তখনও কিছু হওয়ার আশা ছিল কিন্তু গোটা মানবযন্ত্রটি যেখানে যক্ষ্মায় আক্রান্ত সেখানে একটি মানুষ কী করবে? আমি তখনই গুণ্ঠেজীকে বলে দিয়েছিলাম যে সম্মেলন-প্রেসকে ছাড়বেন না। সম্মেলনের লোকরাও তাঁকে ছাড়তে রাজি ছিল না। গুণ্ঠেজীর আর কি, যখন দেখলেন এখানে কিছু হচ্ছে না তখন প্রয়াগ ফিরে গেলেন। ওখানে কাজও ছিল, নিজের বাড়িও ছিল।

বিকেল চারটেয় বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধের জীবন ও কাজ নিয়ে কিছু বললাম। ছটার সময় সাথী প্রেস (নিবাস-স্থান)-এ সাহিত্যিকদের বৈঠক হলো। এখানেও হিন্দি-ইংরেজি এবং হিন্দি-এলাকার মাতৃভাষাগুলির সমস্যার ওপর বলতে গিয়ে আমি মাতৃভাষাগুলিকে খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন করলাম। কিন্তু লক্ষ্ণৌ-এর বন্ধুরা পাটনার বন্ধুদের মতো কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করল না। কেউ যদি সন্দেহ প্রকাশ করত তাহলে আমি পাটনার মতো আমার ভাষায় উত্তাপ আনতে প্রস্তুত ছিলাম না। শ্রীমতী রাজিয়া বেগমও এলেন। কমরেড সজ্জাদ জাহীরের স্ত্রী হওয়ার ফলে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। তাঁর সেই মূর্তি আমার মনে আছে যখন নতুন নতুন বিয়ে হয়ে এসেছিলেন এবং শুনে শুনে ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি উর্দুবিরোধী, তাই খুব রাগতভাবে আমার কাছে নিজের মতামত প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু আমি তো কখনোই উর্দুর বিরোধী ছিলাম না। উর্দু সাহিত্য হিন্দি অক্ষরেও ছাপা হোক, একে বিরোধিতা বলা যায় না এবারে তিনি বললেন, 'আপনার ভাইপো-ভাইঝিদের দেখার জন্যেও অন্তত আসুন।' চেষ্টা করেও যখন আমি তার জন্য সময় বের করতে পারলাম না তখন খুবই আফসোস থেকে গেল ওখানে আধঘণ্টা সময়ও বের করার সুযোগ ছিল না কিন্তু মুসৌরী এসে মনে হচ্ছিল আমি সময় বের করতে পারতাম আর আমার অবশ্যই যাওয়া উচিত ছিল। কমরেড সজ্জাদ জাহীর বহু বছর যাবৎ পাকিস্তানের জেলে বন্দী আছেন। এই বীর মহিলা নিজের শক্তিতে বাচ্চাদের সামলে এখানে রয়েছেন। রাজিয়া গল্প লেখেন। হিন্দিতেও লিখতে শুরু করেছেন। আসলে মনের ভ্রম তা নইলে তো হিন্দির লোকদের উর্দুতে আর উর্দুর লোকেদের হিন্দিতে লেখার জন্য বিরাট কোনো প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার নেই। দুটি রীতির বই-ই যদি দেবনাগরীতে ছাপা হতে শুরু করে তাহলে তো আরো সুবিধে হতে পারে।

২৯ অক্টোবর কমরেড শিব বর্মার সঙ্গে 'জনযুগ' কার্যালয়ে গেলাম। কমরেড রমেশ আর

অন্যদের সঙ্গেও দেখা হলো। কোনো ঢাল-তরোয়াল ছাড়াই দেশ ও জনগণের সেবা করছে যে সংস্থা এবং ব্যক্তিরা তাদের কী রকম কষ্ট সহ্য করতে হয় আর কত প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা আমি তখন থেকেই জানি, যখন ছাপরা জেলার কংগ্রেসে কাজ করতাম। কাজের সবচেয়ে বড় দায়িত্বটি ছিল আমার ওপর। আন্দোলন কখনো জোরদার হলে সব জিনিস দ্রুত জোগাড় হয়ে যেত। যখন তা ঠাণ্ডা মেরে যেত তখন লোকের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে যেত, তখন চিঠি লেখার জন্য ডাক টিকিট জোগাড় করাও মুশকিল হয়ে উঠত। মাসের পর মাস বাড়ি ভাড়া মেটানো যেত না। কিন্তু যে-কাজটি করা দরকার তা করার লোক যদি থাকে তাহলে তা বন্ধ হতে পারে না। 'জনযুগ'-এর প্রয়োজন ছিল। তাতে কাজ করার জন্য কমরেডরাও ছিল। নিজেদের প্রেস ছিল না। সস্তায় ছাপানোর জন্য শুধু কম্পোজটুকু নিজেদের এখানে করিয়ে নিতেন, তারপর অন্য প্রেসে ছাপিয়ে নিতেন।

মধ্যাহ্ন ভোজন হলো শ্রীমতী মোহিনী জুত্শীর বাড়িতে। নিজের বাড়ি ভাড়াটেদের কাছ থেকে খালি হচ্ছিল না, এজন্য তাঁকে হোটেলে থাকতে হচ্ছিল।

মুসৌরী—২৯ তারিখ রাত্রে কানপুর থেকে আসা দেরাদুনের কামরায় বসে পড়লাম। পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় দেরাদুন পৌঁছে গেলাম। স্টেশন থেকে সোজা মুসৌরী আসায় সুবিধে রয়েছে কারণ ওখানেই বাস বা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে যেহেতু বক্তৃতা দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম তাই শুক্লজীর বাড়ি গেলাম। সেই দিনই এগারোটার সময় কমরেড কার্যানন্দ আর মেহতাজীও মুসৌরী থেকে এসে পড়লেন। খবরাখবর পেলাম। চারটের সময় দয়ানন্দ কলেজের হিন্দি বিভাগ আর সাড়ে পাঁচটায় ইতিহাস সমিতির পক্ষ থেকে ভাষণ দিলাম। এখানকার প্রফেসরদের মধ্যে প্রফেসর মুখার্জির বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের বিষয় ইতিহাসে তাঁর অসাধারণ অনুরাগ রয়েছে। তিনি পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশে 'বিদ্রোহ' নিয়ে ডক্টরেট করার জন্য আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে চাইলেন, আমি সম্মতি দিলাম আর এটাও জানালাম যে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এ সম্বন্ধীয় যে সব সামগ্রী আছে তা পাওয়ার উপায় বলে দিতে পারেন ড· বাঁকেবিহারী মিশ্র। চিঠি লিখলে ড· মিশ্র তা জানালেনও। সমস্ত সংস্থাতে এখন যোগ্যতা নয়, বরং জাতপাত আর সম্পর্ককে দেখা হয়। এখানকার ইতিহাস-বিভাগের অধ্যক্ষ থার্ড-ডিভিসনের এম এ ছিলেন। যদি তাঁর তত্ত্বাবধানে দু-একজন ডক্টরেট পেয়ে যেত তাহলে তাঁর মহিমা বেড়ে যেত, এজন্য পরে প্রফেসর মুখার্জিকে তা করতে বাধ্য করা হলো। তাঁর আমার কাছে আসতেও খুব সংকোচ হলো। আমি যখন তা জানলাম তখন বললাম,'আমার তো এজন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হওয়ার কথা নয়। আমি তো আপনার ইচ্ছেয় রাজি হয়েছিলাম। আমাকে দিয়ে যা সাহায্য হওয়া সম্ভব তা আপনি নিঃসংকোচে নেবেন।' প্রফেসর মুখার্জির ছাত্ররা তাঁর নিরলস প্রশংসা করত। কলেজের পলিটিক্সের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না, নিজের কাজ নিয়ে কাজ। ভয় হতো যে এইরকম যোগ্য মানুষের সেবা থেকে কলেজ না বঞ্চিত হয়ে যায়। এজন্য কলেজের ধনীদের আর অনুশোচনা হবে কেন? তারা নিজেদের অন্য কোনো লোককে এনে বসাবে।'শিক্ষণ সংস্থার এই স্বজন-পোষণ দেখে দম বন্ধ হয়ে আসে। তবে এই দেশে কোথায় আর দম বন্ধ না হয়? সমস্ত আবর্জনা আর সমস্ত দমবন্ধ অবস্থা দূর করার

একটিই পথ আছে, তা হলো—লালভবানী, সাম্যবাদী বিপ্লব।

৩১ অক্টোবর প্রফেসর মুখার্জির বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন হলো। বাঙালী খাবার ছিল। অনেক রকমের মাছ রান্না হয়েছিল। একটার সময় ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। তারপর বাসও চলে গেল। তিনটের বাস ধরে আমি কিংক্রেগ গেলাম। পৌনে ছটায় ঘরে পৌছলাম। যাওয়ার সময় এখনও মুসৌরীর পথে অনেক লোক দেখা যেত। কিন্তু এখন মুসৌরী শূন্য ছিল।

জয়া তো একেবারে ভুলে গিয়েছিল, তবে শিগগিরই স্মৃতি আবার জেগে উঠল। মাত্র দু-সপ্তাহ বাইরে ছিলাম কিন্তু তাতেই ওকে বড় আর মোটা মনে হচ্ছিল। এর কারণটি ছিল মনোবৈজ্ঞানিক। কালিম্পঙের আরও একজন তরুণ এসেছিল যার সঙ্গে নেপালে আমার দেখা হয়েছিল। ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগ থেকে নিমন্ত্রণ এলো—এখান থেকে বর্মার সংগীতিতে তিন-চারজন বৌদ্ধ বিশেষজ্ঞ পাঠানো হচ্ছে তাতে আমিও যেন যাই। আমি রাজি হয়ে গেলাম। এভাবে হলে পাসপোর্টও সহজেই পাওয়া যায়, এটাও মনে ছিল। কিন্তু পরে প্রতিনিধিদলের যাওয়ার দরকার হলো না।

এদিকে হ্যাপিভ্যালিতে একটি দুর্ঘটনার খবর পেলাম। ১৯ অক্টোবর এক মদ্যপ গুণ্ডা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। মুসৌরীর বাইরের পাহাড়ী গ্রামে মদ বানানোয় ছাড় রয়েছে তাই তা সস্তায় পাওয়া যায়। মাতালরা সেখানে গিয়ে মদ খেয়ে আসে। গুণ্ডাটাও খেয়ে এসেছিল। প্রথমে সে কল্যাণ সিংহর বাচ্চাকে ধমকায়। চিৎকার করলে চৌধুরী হুংকার ছাড়ে এবং এখান সে থেকে পালায়। ফের রতিলালার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখান থেকে চার্লবিল হোটেলের ফটকের পরে প্লেজানস-এর সামনে পৌছলে সে স্যালকোট নিবাসী শর্মা আর ড· রঘুনন্দন লালকে পেল। তাঁদের সে ছুরি দেখাল। শর্মাজীর কাছে একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা ছিল। তা ছিনতাই করে সেখান থেকে সে হাওয়া হয়ে গেল। শর্মাজী প্রভাবশালী ব্যক্তি। স্যালকোটে নিজের লাখ টাকার ব্যবসা ফেলে এখানে এসেছেন এবং এখনও তাঁর বড় ব্যবসা রয়েছে। ড· রঘুনন্দনলাল মেডিক্যাল কলেজের উঁচু পদ থেকে পেনশন পেয়ে অধিকাংশ সময় এখানেই থাকেন। তাঁর সঙ্গে এই রকম ঘটল আর পুলিস কিছু করতে পারল না? এমন কি এটাও জানা গিয়েছিল যে, সে এখানকার এক হিন্দু সবজি ও ফল বিক্রেতার আত্মীয়। তাহলে আর পুলিস কোন রোগের ওষুধ? কেন তাদের পিছনে আগের চেয়ে তিন গুণ চারগুণ করে খরচ করা হচ্ছে? বোঝাই যাচ্ছে যে, এখন তারা শুধু শাসকদলের আত্মরক্ষার সশস্ত্র উপায় মাত্র। নাগরিক-স্বাধীনতার প্রতিটি ব্যাপারকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়া তাদের কাজ!

ড· সত্যকেতু এখন একমাসের জন্য চীন গিয়েছিলেন। ১০ নভেম্বরে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য চায়ের পার্টি দেওয়া হলো। আমাকে সভাপতির আসনে বসতে রাজি হতে হয়েছিল। মুসৌরীর পঞ্চাশোর্ধ সব গণ্যমান্য লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ড· সত্যকেতু চীনের প্রগতি দেখে খুব প্রভাবিত হয়েছেন। এই তো মাত্র পাঁচ বছর হলো কমিউনিস্টরা সেখানে শাসনভার হাতে নিয়েছে। চীনে বেকারত্ব নেই। সেখানে ভ্রষ্টাচার একেবারেই নেই। এই দুটি জিনিস ভারত থেকে যাওয়া যে কোনো বুঝদার লোককে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করতে পারে। তিনি বলছিলেন, উচ্চশিক্ষা সেখানে অবৈতনিক। যে কলেজে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকশো, সেখানে এখন তার সংখ্যা কয়েক হাজার হয়ে গেছে। চিকিৎসাও বিনে পয়সায়।

অন্‌শনের লোহা কারখানা ১৯৪৯ সালে পাঁচ লাখ টন লোহা উৎপন্ন করত এখন তা বিশ লাখ টন উৎপন্ন করছে। ডা· সত্যকেতু রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিত তাই তিনি প্রতিটি জিনিসের পরিসংখ্যান নিয়ে এসেছিলেন। তিনি কাগজে তাঁর যাত্রা সম্বন্ধে অনেক লেখা লিখেছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে যাদের আর্থিক সমস্যা নেই, ড· সত্যকেতুর কথা শুনতে শুনতে তাদেরও জিভে জল আসছিল।

আমি সরহপার কবিতা নিয়ে লেগে পড়লাম। যে কবিতার মূল নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে তিব্বতী থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করছিলাম। যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ। এই সময় মনে হতো যে, মুসৌরীর জায়গায় আমি যদি কালিম্পঙে থাকতাম তাহলে খুব ভাল হতো। সেখানে কোনো না কোনো তিব্বতী পণ্ডিতকে পেয়ে যেতামই যিনি সাহায্য করতেন।

১৪ নভেম্বর ড· শ্রীলক্ষ্মীধর শাস্ত্রী এলেন। সতেরো-আঠারো বছর তিনি লন্ডনে থেকেছেন। সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, সেখানে গিয়ে ডক্টরেট হলেন। মাঝে মাঝে অর্থকষ্টেও তাঁকে পড়তে হয়েছে। তবু এখানকার চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় ছিলেন। নিশ্চিন্ত জীবন কাটাচ্ছিলেন। ইংরেজিতে লিখিত আইনগুলির হিন্দিতে অনুবাদের জন্য ভারত সরকার স্পেশাল অফিসারের চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তিনি আইনেরও ছাত্র ছিলেন। ইংরেজিতে তৈরি আইন হিন্দিতে অনুবাদ করার পুরো ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু শুধু বিজ্ঞাপন থেকে থোড়াই চাকরি পাওয়া যায়? ওখান থেকে লিখে নিঃসন্দেহ হয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে সন্দেহতেই রাখা হলো। ঝুঁকি নেওয়া উচিত ছিল না কিন্তু স্বাধীন দেশের প্রতি আকর্ষণ ছিল ভীষণ। কয়েক হাজার টাকা বিমান খরচ দিয়ে এখানে এলেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে গেলেন। তিনি বলছিলেন, এখানে তো আগে থেকেই সব ঠিক হয়ে ছিল, ইন্টারভিউয়ের জন্য এমনিই ডাকা হয়েছিল। 'নৌকো ভগবানের ভরসায় ছেড়ে দিয়ে, নোঙর ছিঁড়ে ফেলে' এসেছিলেন, এখন পস্তাচ্ছিলেন। ফিরে যাওয়ার টাকা ছিল না। ওখানে যে চাকরি ছিল তাতে ইস্তফা দিয়ে এসেছিলেন। এখানে দিল্লীতে কেউ ঘুরে তাকানোরও ছিল না। ড· পাণ্ডের সঙ্গে মানবভারতীতে উঠেছিলেন। বিপদ একলা আসে না—বেচারা পড়ে গেলেন। খুব আঘাত পেলেন আর একমাসের ওপর খাটে পড়ে থাকলেন।

২০ নভেম্বর আমাদের এলাকায় রতিলালার মেয়ে রুক্মিনীর বিয়ে হলো। বরযাত্রী এলো গাজিয়াবাদ থেকে। বর গ্র্যাজুয়েট এবং বেশ হৃষ্টপুষ্ট। এখানকার লোকজন দেখে খুব প্রশংসা করছিল। লালা বলছিলেন, 'শুনে শুনে পাঁচ হাজার তো নিয়েছে তবে বর দেখে আমি সন্তুষ্ট।' মেয়েও ছিল স্বাস্থ্যবতী আর ভালভাবে ম্যাট্রিক পাশ। আমাদের এখানে বিয়ের সময় কী ধরনের বাজে খরচ হয় তার উদাহরণ আমার চোখের সামনে ছিল। যত টাকা ওখানে দিয়েছে এখানে তার চেয়ে কম টাকার জিনিস বোধহয় দেয়নি। তার ওপর প্রায় একশোজন ঘরের লোক, বরযাত্রী ও অতিথির তিনদিন ধরে ভোজ চলল। এখন মুসৌরীর সব ব্যবসায়ীরা তাদের ভাগ্যের জন্য চোখের জল ফেলছে। বুড়ো লালা শাদিলালের ছেলে রতিলালার সংসারে এক ডজনের বেশি লোক আছে। সেই ভারের সঙ্গে সঙ্গে এত খরচ। বিদায়ের দিনের ভোজে আমরাও উপস্থিত ছিলাম। নানান রকমের খাবার ছিল। এখনো সব ভাইদের মিলে আধ ডজন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আছে। এটি ছিল সবচেয়ে বড় মেয়ে। প্রত্যেকের বিয়ের জন্য দশ হাজার করে

টাকা কোথা থেকে আসবে?

দিল্লী—দিল্লীতে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী সংঘের সম্মেলন হচ্ছিল। আমি তাতে যোগদান করার জন্য ২৪ নভেম্বর মুসৌরী থেকে গেলাম। আমার বন্ধু শ্রীহরনারায়ণ মিশ্রর পুত্র প্রফেসর রূপনারায়ণ মিশ্র আগ্রা ইউনিভার্সিটিতে পি এইচ ডি-র জন্য আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে চাইছিলেন। আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। আমি ভাবলাম, দিল্লী থেকে দেরাদুন রেলের যাত্রা তো অনেকবার করেছি, এবার গাড়িতে একটু কুরুক্ষেত্রে ঘুরে যাই। কয়েক সপ্তাহ যদি কুরুক্ষেত্রে কাটাতে পারতাম তাহলে খুব ভাল লাগত, যদি তা সম্ভব না হয় তো তাই সই।

২৫ তারিখে দেরাদুন থেকে সোজা দিল্লী যাওয়ার বাস ধরলাম। সওয়া দশটায় সেটা রওনা হলো। আগেও একবার বাসে শিবালিক পার হয়েছিলাম। এবার দ্বিতীয়বার যাচ্ছিলাম। এখানে পথে পড়া শিবালিক শুকনো নয়। রুড়কি, মুজফ্ফর নগর আর মীরাটে বাস একটু করে দাঁড়াল। কুরুর শ্যামল-সবুজ ভূমি খুব প্রিয় মনে হতো। মনে হতো লোকে এক আঙুলও জমি চাষ না করে ছাড়েনি। একশো বছর হলো গঙ্গায় নালা বেরিয়েছে। কুরুক্ষেত্রকে সবুজ করে তুলতে তা আরো বেশি সাহায্য করেছে। আমাদের বাস সাড়ে চারটেয় দিল্লীর আজমীরী দরজায় পৌঁছল। আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে এক শিখ দম্পতি তাদের ছ-সাত বছরের দুটি বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছিল। তারা ইংরেজিতে কথা বলার যেন শপথ নিয়েছিল। যদি কয়লার মতো কাল রঙ না চোখে পড়ত তাহলে মনে হতো কোনো ইংরেজ দম্পতি কথা বলছে। বাচ্চারা সম্ভবত মুসৌরীর কোনো কনভেন্টে পড়ত। ওখানে শেখা ইংরেজি পাছে ভুলে যায়, তাই মা-বাবার দুশ্চিন্তা ছিল। তাদের সঙ্গেই তিনটে বাচ্চাসহ আরও একটি পাঞ্জাবী দম্পতি ছিল। বাবার রঙ ছিল একেবারে ইটালিয়ানদের মতো। পোশাক-আশাক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। বোঝা যাচ্ছিল তারা শিক্ষিত কিন্তু তারা তাদের বাচ্চার সঙ্গে একবারও ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করেনি। এর জন্য কি শিখ দম্পতিকে দোষারোপ করা যায়? এটা যে আমাদের জাতীয়তার ভীষণ অপমান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর জন্য অপরাধী তারা যারা এই অপমান করাচ্ছে। এরা জানে যে ইংরেজির যোগ্যতা ছাড়া উঁচু পদের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। নেহেরু ইংরেজির বড়ি খেয়েই মহান হয়েছেন। তাঁর পায়জামা-পাঞ্জাবী দেখে ভুললে চলবে না যে তাঁর প্রতিটি লোমকূপ ইংরেজিয়ানায় সিক্ত। এইজন্যই স্বাধীন ভারতে ইংরেজি আরো নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে। যতদিন তাঁর বরদহস্ত রয়েছে ততদিন উচ্চপদের চাকরির দরজা তাদের জন্যই খোলা থাকবে যারা ইংরেজদের সম্পূর্ণভাবে নকল করতে পারে।

সিবালিক পেরিয়ে ছুটমনপুরের খুব বড় বাজার পেলাম। নাম থেকে মনে হচ্ছিল আমরা পূর্বদিকের কোনো জেলায় আছি। রুড়কীতে ছাউনির কাছে বাস দাঁড়াল। ম্যাঙ্গালোরও ভাল বাজার। এই নামটি আমাদের পূর্বজদের কত প্রিয় ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাত অঞ্চলে ম্যাঙ্গালোর আছে, এখানে কুরুক্ষেত্রে ম্যাঙ্গালোর আছে আবার দক্ষিণ কর্ণাটকেও আছে। সে-সময় মঙ্গলপুর নামটির খুব চাহিদা ছিল। খতৌলী একটি বেশ প্রসিদ্ধ মফস্বল শহর। মুজফ্ফরনগর আগের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। মীরাট সম্পর্কে তো কিছু বলারই নেই। কুরুক্ষেত্রে আখের চাষ খুব হচ্ছে, আর চিনির মিলও প্রচুর আছে। নালা এই কাজের সুবিধে

করে দিয়েছে। বাসস্ট্যান্ডে টাঙ্গা পাওয়া গেল না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কুলির মাথায় জিনিসপত্র তুললাম আর তারপর ভাইয়াজীর বাড়ি ২২ ফৈজবাজারে পৌঁছে গেলাম।

২৮ তারিখে সকাল দশটায় দিল্লীর কন্‌স্টিটিউশন ক্লাবে পৌঁছলাম। আজ এখানে সিমপোজিয়াম ছিল। আমাদের ভাষায় জোর করে কিছু শব্দকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেমিনার, সিমপোজিয়াম, রিপোর্টাজ সেই রকমই শব্দ। এখন তো চাপানোই মনে হচ্ছে। গ্রহণ করা না-করা পরবর্তী প্রজন্মের কাজ। সিমপোজিয়ার অর্থ হলো লিখিত সভা—যেখানে লোকে নিজের নিজের লেখা পড়বে এবং অন্যেরা তার সম্বন্ধে মতামত দেবে। আমাকেই তার অধ্যক্ষ হতে হলো। হিন্দি এবং পাঞ্জাবী সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি লেখা পড়া হলো। বরান্নিকোফের 'রামচরিতমানস'-এর রুশ অনুবাদের ওপর ড· রামবিলাস শর্মা তাঁর প্রবন্ধ পড়লেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুজন যোগ্য প্রফেসর জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে রুশ সাইন্টিস্টদের কাজকর্মের ওপর আলোকপাত করলেন। আমিও বরান্নিকোফের অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু বললাম। একটা পর্যন্ত সভা চলল।

দিল্লী শহর লম্বায় কুড়ি মাইল আর চওড়াতেও কুড়ি মাইল পর্যন্ত চলে গেছে। যদি আধুনিক যাতায়াতের সুবিধে না থাকত তাহলে সত্যিই আসা-যাওয়া করতে খুব কষ্ট হতো। ঘোড়ার টাঙ্গার ভাড়া খুব বেশি। তাদের অনেকের জীবিকা মোটরের টাঙ্গা, লোকে যাকে ফটফটিয়া বলে, খেয়ে ফেলেছে। সাইকেল-রিকশা খুব কম জায়গাতেই চলতে পারে। কনাট সার্কাসে আমরা চার-আনায় মোটর-রিকশাতে বসলাম এবং বাড়িতে এসে নেমে পড়লাম। যদি ঘোড়ার টাঙ্গা হতো তাহলে দু-তিন টাকার কম কী করে নিত? আজ ভাইয়াজীর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন হলো মোতিমহলে। পাঠান ভাইরা কোনো চাল-চুলো ছাড়াই এখানে তাদের ভোজনালয় খুলেছিল। শুরু থেকেই তারা পুষ্টিকর, সুস্বাদু খাবার ন্যায্যদামে বিক্রি করার ব্রত নিয়েছিল। এখন তো মোতিমহল গোটা দিল্লীতে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। শত শত লোক মাসিক হিসেবে এখান থেকে খাবার আনিয়ে খায় আর তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক লোক এখানে বসে খায়। ভোজনালয়ের দুটি ভাগ আছে। একটিতে নিরামিষাশী আর অন্যটিতে আমিষাশীরা বসে। গরমাগরম তন্দুরী রুটি তো সুস্বাদু হয়ই কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে এখানকার তন্দুরে ভাজা মুর্গমুসল্লম। আমরা বেশ করে খেলাম। ফিরে এসে বাড়িতে শ্রীপ্রভাকর মাচবে শরদজীর সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হতে লাগল। সন্ধেতেও অধিবেশন ছিল কিন্তু আমি তাতে গেলাম না। আজ পুরো পরিবার সার্কাস দেখতে গেলাম। ভাবীজী বহু বছর ধরে সিনেমা দেখতেন না কিন্তু সার্কাসে ভয় ছিল না। আমরা সাতজন ছিলাম। খেলা শুরু হওয়ার দুঘণ্টা আগে, ছটার সময় পৌঁছলাম। টিকিট ঘর থেকে অনেকটা দূর অব্দি অনেকগুলি লাইন ছিল। টিকিট পাওয়া সহজ ছিল না। দেড় ঘণ্টা পর কোনোরকমে টিকিট এলো। সওয়া তিন ঘণ্টা ধরে সার্কাস দেখতে লাগলাম। জানোয়ারদের অনেক খেলা ছিল। বাঘ শিক লাগান খাঁচার মধ্যে এসে তার খেলা দেখাচ্ছিল।

২৯ নভেম্বর আরও কয়েকজন কবীরপন্থী মহাত্মার সঙ্গে নরসিংহ দাস এলেন। 'মহাত্মা-কবীর' ফিল্ম হয়েছিল। ফিল্ম করিয়েরা সৌন্দর্য আর শৃঙ্গার পুরোমাত্রায় না আনলে কী করে সফল হয়? কবীরপন্থী সাধুদের মধ্যে এ নিয়ে খুব অসন্তোষ ছিল এবং তারা চাইছিল যে

এই ফিল্মটি বন্ধ কবর দেওয়া হোক অথবা তার থেকে সেই ব্যাপারগুলি বাদ দেওয়া হোক যা থেকে কবীরের অনুগামীদের মনে আঘাত লাগবে। বাবা নরসিংহ দাসের সঙ্গে দেখা করে খুব আনন্দ হলো। অসহযোগের সময়ে জেলের সাথী ছিলেন। তিনি সরকারকে একটি আবেদনপত্র দিতে চাইছিলেন। যে-সময় মহাত্মাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হচ্ছিল তখন তথ্য দপ্তরের সেক্রেটারি শ্রীলাড এসে পড়লেন। ফিল্মের অভিযোগও তাঁর কাছেই যেত, তাই সুপারিশ করার জন্য দূরে যাওয়ার দরকার ছিল না। মহাত্মার সামনে লাড সাহেবের সঙ্গেও কথা হলো। তিনি বলছিলেন যে যদি চরিত্রের ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তাহলে সে-জিনিসটি বাদ দেওয়ার জন্য আমরা বলতে পারি। কবীর সাহেবের জীবনী সম্বন্ধে যেখানে দুটি মত রয়েছে সেখানে একটি মতকে বাদ দেওয়ার ইচ্ছেকে মেনে নেওয়া যায় না।

মুসৌরী—২৯ নভেম্বরই আমরা গাড়িতে উঠলাম। যদিও গাড়ির দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসেছিলাম কিন্তু জায়গা পেতে বা শুতে কোনো অসুবিধে হয়নি। দেরাদুনের কাছে পৌছনোর সময় মুসৌরীতে মেঘ দেখা যাচ্ছিল। স্টেশনে মেহতাজীকে পেলাম। স্টেশন ওয়াগনে দু-টাকায় সিট পেয়ে গেলাম। ড্রাইভার ছিলেন পরিচিত এবং ভালমানুষ। পৌনে নটায় রওনা হয়ে আধঘণ্টায় আমরা কিতাবঘর পৌছে গেলাম আর পৌনে এগারোটায় হর্নক্লিফ। জ্বর চারদিন আগেও আসতে পারত আর তাহলে যাত্রায় বিঘ্ন ঘটত। তার খুব দয়া যে মুসৌরী পৌছে যাওয়ার পর ২ ডিসেম্বর এল। আমি দুদিনের জন্য খাটে শুয়ে আরাম করতে লাগলাম আর ঠিক করলাম যে, যতক্ষণ ভালভাবে খিদে না পাবে ততক্ষণ খাব না। ৩ তারিখে জলও খেলাম না। এইরকম সময়ে হালকা বইপড়ার বেশ সুযোগ থাকে। চাণক্যর ওপর একটি উপন্যাস এসেছিল। বলতেই হয়—উপন্যাসটি চিত্তাকর্ষক। ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে অনুচিত ব্যবহার অনেক লেখকই করে থাকেন। এখানে পদে পদে ঐতিহাসিক উল্লেখ আর ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। পাটনার কাছে পাহাড় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাণক্যর এক-আধটি নাটকে যা কিছু বর্ণনা এসেছে তাই দিয়ে নিজের কল্পনা ও কালিকলমের ভরসায় এই গ্রন্থটি লিখে ফেলা হয়েছে। কোথাও কোথাও তো অসহ্য ধৃষ্টতা দেখানো হয়েছে।

কল্যাণ সিংহের ছেলে অসুখে পড়েছিল। ওষুধ-বিষুধও দেয় কিন্তু এখনো তাদের মতো লোকের ওঝার ওপর বিশ্বাস বেশি। ওঝা ডাকা হলো। সে তার মন্তর-তন্তর আওড়াল। সত্যনারায়ণের কথা পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল।

৮ তারিখে একটা বড় সুখবর পেলাম। 'কিলডের' বাইশ হাজারে বিক্রি হয়ে গেছে। যদিও মিস পুসঙ্গ আর তাঁর বোনের মুসৌরী থেকে চলে যাওয়াটা আমাদের ভাল লাগছিল না। অত্যন্ত সহৃদয় প্রতিবেশী। কিন্তু বৃদ্ধার পক্ষে মুসৌরীর ঠাণ্ডা খুব বিপজ্জনক ছিল। তাঁর পক্ষে এটা খুব ভাল হলো। পাঁচ-সাত বছর আগে হলে তিনি এর জন্য ৬০ হাজার পেতেন কিন্তু এখন এক-তৃতীয়াংশ পেয়েও খুব খুশি ছিলেন। বহু জিনিস সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ছিল যার জন্য রেলের বগি ঠিক করা হয়েছিল। সে-সময় তখনও আমার মনে হয় নি যে আমাকেও একদিন এইভাবে জিনিসপত্র বেঁধে মুসৌরী থেকে চলে যেতে হবে।

এখন আমি ৬২তম বছরের শেষ ভাগে ছিলাম। তিনবছর আগেও শরীরে যতটা বল অনুভব

করতাম এখন তা ছিল না। সামান্য হাঁটাচলা করলেও ক্লান্তি বোধ হতো, বুকের ভেতরে ব্যথা শুরু হতো।

১২ ডিসেম্বর শ্রীসেমুবালজী এলেন। এখনও তিনি চিনী হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। নিজের বদলী করাতে সফল হননি। বলছিলেন, খাবার জিনিসের ততটা অসুবিধে নেই। ডাকব্যবস্থা আগের চেয়ে ভাল হয়েছে এবং রোজ ডাক যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তিব্বতের সীমার কথা চিন্তা করে এখানে একশো সশস্ত্র পুলিস রাখা স্থির করা হয়েছে। চিনী উপযুক্ত স্থান নয় মনে করে এখন স্কুল এবং অন্য সব দপ্তর কোঠীতে নিয়ে যাচ্ছে। কোঠী কিছু দিন আগেও রাজধানী ছিল। সেটা এখানকার পাথরের সুন্দর মূর্তিগুলি জানিয়ে দিচ্ছিল। ৭০০০ ফুট উঁচুতে হওয়ায় তা সিমলার মতো। তিনি এটাও বলছিলেন যে রোগীর নীচ দিয়ে কোঠী পর্যন্ত মোটরগাড়ির রাস্তা হাত চলেছে। জায়গায় জায়গায় বাস রাস্তার কাজও শুরু হয়েছে। চিনীতে এখন অনেক দোকান হয়ে গেছে। চা এবং খাওয়ার হোটেলও আছে। ১৯৪৮-এর যাত্রার পর এখন কত পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ভূত আমাদের বাড়ির পাহারা দেওয়ার কাছে খুর সহায়ক ছিল। কিন্তু তার ঘুরে বেড়ানোর কামাই ছিল না। হ্যাঁ, চৌধুরীর টাইগারের মতো সে লণ্ঢৌর পর্যন্ত দৌড় দিত না, এখানেই আশপাশে আর জঙ্গলের ভেতর অব্দি যেত। সন্ধের সময় নেকড়ের আহার হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে ঘরের ভেতর রাখাটা জরুরি ছিল। ১৫ ডিসেম্বর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল, ওকে ডেকে নিয়ে এলাম। ফটকের ভেতর এলো। তখন কি জানি কী জিনিস দেখল। সে উল্টোদিকে ধোপানীর বাড়ির দিকে দৌড়ল আর একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ভূতকে আনার দিন কমলা খুব রাগ দেখিয়েছিল। বলেছিল, 'কেন এনেছ?' আর এখন যখন খানিকক্ষণ ধরে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তখন সে অধীর হয়ে পড়েছে এবং পাগলের মতো এদিকে-ওদিকে খুঁজতে শুরু করেছে। অন্ধকারে যেভাবে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তাতে ক্ষতি হওয়ার খুব আশঙ্কা ছিল। কমলা তো নিরাশ হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল, নিশ্চয় তাকে নেকড়ে নিয়ে গেছে। তারপর চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। আমারও ভূতের জন্য দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু আমি এতটা অধীরতা দেখায়নি। যাক্‌গে, আরও কিছুক্ষণ ধরে জায়গায় জায়গায় 'ভূত, ভূত' করে ডাকা হলো এবং সে ভালভাবেই বাড়ি ফিরে এল।

২২ ডিসেম্বর রাতে বুকে ব্যথা হতে লাগল। গরম জলের বোতল রাখলাম কিন্তু তাতে খুব কম লাভ হলো না। মন বলতে লাগল, সামনের বছর থেকে ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত কয়েক মাসের জন্য মুসৌরী ছাড়তে হবে। ভাবতে লাগলাম, বাংলো না নিলে ভাল হতো। এখন কোনোরকমে যদি বিক্রি হয়ে যায় তাহলে আট মাসের জন্য এখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকব আর চারমাস থাকব দেরাদুনে।

পরের দিন শহর গেলাম। ডা· জ্বালাপ্রসাদ রক্তচাপ দেখলেন। ১৮৫ ছিল, হওয়ার কথা ১৬২। তবু খুব বেশি ছিল না।

একটি দাঁত বাঁধানোর ছিল। কুল্‌হড়ীতে একজন দাঁতের ডাক্তারকে দেখলাম। শীলাজী বললেন তাঁর পরিচিত, তাই ভাবলাম, ভালই হলো, দাঁত বাঁধিয়ে নিই। আগে টাকার কথাও কিছু শুধোইনি। তিনি বাঁধিয়ে দিয়ে বললেন ১৫ টাকা। এটা একেবারে অনুচিত, কিন্তু এখন তো ভুল

কবে ফেলেছি আর ঝগড়া করার অভ্যেস ছিল না। যাক্‌গে, তাতেও কোনো আফসোস হতো না কিন্তু সে তো পুরো ঠক ছিল। সে এমন ওষুধ দাঁতে ভরে দিল যে তা চিরদিনের জন্য কালো হয়ে গেল। এখন কেউ দেখলে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার একটা দাঁত ভেঙে গেছে?' সে-সময় নিজের বোকামি আর সেই ঠকের চেহারা মনে পড়ে।

বোম্বাই থেকে একটি বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ এসেছিল। সেখানে বড় বড় হৃদরোগবিশেষজ্ঞ থাকেন তা জানতাম, তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারার কাজ ছিল। আমি রাজি হয়ে গেলাম। আগে দিল্লী গেলাম আর সেখান থেকে ৩১ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের উদ্দেশে রওনা হলাম।

দশম পর্ব

শেষ পরিক্রমা

জেতার জন্ম

বোম্বাই যাত্রা—আমাদের ট্রেন ১ জানুয়ারি সাড়ে ছটায় বোম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌছল। তখনো অন্ধকার ছিল। স্টেশনে রাষ্ট্রভাষার শ্রীযোশীজী, বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন যিনি সেই শ্রীঅরবিন্দ দেশপান্ডে এবং শ্রীপোদ্দারজীর বড়ছেলে উপস্থিত ছিলেন। ওখান থেকে সোজা মালাবার হিলে শ্রীপোদ্দারজীর বাড়ি পৌছলাম। এখনো অন্ধকারই ছিল। মুসৌরীতে গরমে কখনো সপ্তাহে দু-বার স্নান করি, তা নইলে সপ্তাহে একবার সাবান দিয়ে শরীর ধোওয়াটাই যথেষ্ট মনে করি। তবে বোম্বাইতে তো ঠাণ্ডা কখনো পড়েই না। এখানে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতেও পাখার দরকার হয়, এজন্য দিনে দুবার স্নান করার ইচ্ছে হতেই পারে। স্নান আর চা-পানের পর সাড়ে দশটায় গাড়ি করে বেরোলাম। বড় শহরে আরাম আর সময় বাঁচানো এই দুইয়ের জন্যই গাড়ির খুব উপযোগিতা রয়েছে। কিন্তু আমি তো আঘাত লাগার ভয়ে গাড়ির খুব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মনে করতাম। ফোর্টে গিয়ে ডায়েরি কিনলাম। দেখলাম দেশী কোম্পানি উইলসন নামে একটি ফাউনটেন পেন বানিয়েছে যার প্রায় পুরোটাই দেশী। লোভ হলো। স্বদেশী জিনিসের প্রতি অনুরাগ তো আমার রয়েইছে। সওয়া আট টাকা দিয়ে তা কিনে নিলাম। সেটা দিল্লী কা লাড্ডু প্রমাণিত হলো—যে খায় সেও পস্তায়, যে না খায় সেও পস্তায়। যদি না কিনতাম তাহলে মন খচ খচ করত—স্বদেশী জিনিস তুমি নিলে না? আর কত সস্তা ছিল? এখন কিনলাম বলে বোঝা গেল যে লেখার জন্য সেটা বানানো হয় নি, বানানো হয়েছে শুধু ভক্তি-প্রদর্শনের জন্য। কখনো লেখার জন্য যখন বাধ্য হতে হয় তখন নিব উল্টে লিখি। খুব সাবধান থাকা সত্ত্বেও কালির একটা বড় ফোঁটা সে কাগজের ওপর ফেলে দেবেই। তখন মনে পড়ে 'সস্তার তিন অবস্থা'।[১] যাকগে, এসব অভিজ্ঞতা তো সেদিন হয়নি।

মিউজিয়াম গেলাম। আজ নববর্ষের ছুটি ছিল। লোকের কাছে খোঁজ নিয়ে মাটুঙ্গায় ড· মোতিচন্দজীর কাছে গেলাম। আমি তো একজনের দর্শন পেলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম কিন্তু সেখানে ড· বাসুদেব শরণ আর রায় কৃষ্ণদাসকেও পেয়ে গেলাম। ড· বাসুদেব শরণ তো কবির্মনীষী পরিভূঃ সয়ম্ভুঃ। সারাটা সময় অধ্যয়নে ব্যয় করেন আর আমাদের জন্য নতুন নতুন জিনিস খোঁজ করেন। দেড়-দুঘণ্টা তাঁদের সুসঙ্গেই কাটল। এখন বোম্বাই প্রদেশের

[১] *মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত লোকোক্তিটি হলো—সস্তা রোয়ে বার-বার, মহঁগা রোয়ে এক বার, যার আক্ষরিক অর্থ—সস্তা বার বার কাঁদে, দামী কাঁদে একবার।—স·ম·*

সরকার হিন্দির ব্যাপারে একটি নতুন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। আগে হিন্দুস্থানীর নামে হিন্দির বিরুদ্ধে উর্দুকে দাঁড় করানো হতো। তাতে সফল হলো না। এখন হিন্দুস্থানী ভাষা দরজা দিয়ে আনা না গেলে জানলা দিয়ে আনতে চায়। এখানকার কিছু লোকের মাথায় ঢুকে গিয়েছিল যে, সংঘের ভাষা হিসেবে যে-হিন্দি স্বীকৃত হয়ে গেছে তা সেই হিন্দি নয় যা হিন্দি এলাকার লোকেরা ব্যবহার করে। অর্থাৎ এইভাবে নতুন হিন্দি গড়ার সুযোগ হয়ে যাক এবং হিন্দুস্থানীকে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হোক। হিন্দির পথ এখনও পরিষ্কার নয়, তা তো এই লোকদের কৌশল থেকে বোঝাই যাচ্ছিল কিন্তু পৃথিবীতে কোথাও নির্দেশানুযায়ী ভাষা গড়া যায় নি, বরং যা ব্যবহার করলে কার্যসিদ্ধি হয় লোকে তাকেই মান্য করে।

২ জানুয়ারি আন্ধেরী গেলাম। সর্দার ভাবনগরে ছিলেন। প্রভাবতী বোন, অজিত আর প্রজ্ঞার সঙ্গে দেখা হলো। সেখান থেকে আবার ড· জগদীশচন্দ্র জৈনের কাছে গেলাম। দু-একদিনের মধ্যে তাঁর আসার কথা ছিল। তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে চক্রেশের সঙ্গে দেখা হলো। তারপর আমার বইয়ের মারাঠী অনুবাদক ও প্রকাশক মোডক সাহেবের কাছে গেলাম। প্রকাশনা দিয়ে কাজ চলছিল না তাই এখন তিনি নির্ণয় সাগর প্রেসে কাজ করছেন। খাওয়ার পর সওয়া চারটের সময়ে প্রার্থনা সমাজে বিজয় মণ্ডল দ্বারা পরিচালিত হিন্দিবিদ্যালয়ে গেলাম। শ্রীএস কে পাটিল প্রমাণপত্র বিতরণ করলেন, আমাকেও বলতে হলো। পাটিল হচ্ছেন বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী বাঘ। যাবতীয় গোপন স্বার্থের সমর্থক হওয়ায় তিনি শেঠদের বিশ্বাসভাজন হয়েছেন। যদিও মাঝে মাঝে কাটজুর মতো আসল রূপ দেখাতে তিনি সামান্যও ইতস্তত করতেন না, কিন্তু কূটনৈতিক ভাষাতেও তাঁর দখল রয়েছে। বোম্বাইতে আগে থেকেই হিন্দির প্রচার রয়েছে, কেননা ভারতের সেখানেই অনেক ভাষা একত্রিত হতে থাকে যেখানে যেকোনো একটি ভাষাকে সম্মিলিত ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দরকার পড়ে। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিয়েছিল যে মধ্যদেশের ভাষাই তা হতে পারে। কলকাতাতেও তাই হয়েছে, আর বোম্বাইতেও সেই একই ব্যাপার। মাদ্রাজে খুব কম হয়েছে, কারণ সেখানে উত্তরের ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে এমন ভাষাভাষী লোক যথেষ্ট যায় নি।

যে ভাষণের জন্য আমি বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম তা হওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রভাষা সমিতির জ্ঞানসত্রের পক্ষ থেকে। সরহপার বিষয়ে আমার দুদিন ভাষণ দেওয়ার ছিল। যা সরহ-র দোঁহাকোষের ভূমিকা হিসেবে পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা। এখানে হিন্দি-সাহিত্য জগতের অনেক বন্ধুও এসেছিলেন এবং মহারাষ্ট্রের মহিলা ও পুরুষদের তো এটা সভাই ছিল। সেদিন দেড় ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিলাম। সাড়ে নটার পর থাকার জায়গায় ফিরলাম।

৩ জানুয়ারি মধ্যাহ্নভোজনের পর প্রথমে শ্রীনাথুরাম প্রেমীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এখন তিনি গৃহ-সন্ন্যাস নিয়েছেন। চারতলায় থাকেন। সেখান থেকে নামা-ওঠা করা হৃদরোগীর পক্ষে বিপজ্জনক। ভানুচন্দ্রজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর ঘরে গেলাম। ভানুচন্দ্রজী প্রকাশনার কাজ বেশ জোরদারভাবে শুরু করেছিলেন, পোদ্দারজীর বড় ছেলে বলছিলেন, অনেক টাকা লাগিয়ে ফেলেছেন আর এখন বইগুলো বিক্রি হচ্ছে না। ভানুচন্দ্রজী কিছুদিন ধরে বোম্বাইয়ে অনুপস্থিত থেকে এখন আবার নিজের বইয়ের দোকান সামলে নিয়েছেন। প্রেমীজীর বাড়ি গিয়ে এক জায়গাতেই অনেক মহাত্মাকে পেয়ে গেলাম। অপভ্রংশের দিগ্‌গজ পণ্ডিত ড· হীরালাল জৈন

এবং প্রফেসর উপাধ্যে (কোলাপুর)-ও ওখানেই উপস্থিত ছিলেন। ত্রিমূর্তির সঙ্গে দেখাশোনা আর কথা বলার সুযোগ পেলাম। ড· জৈন এখন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর পেয়ে গেছেন। জৈন ধর্মের অদ্ভুত গ্রন্থ 'জয় ধওলা'-এর প্রকাশনায় যুক্ত ছিলেন। প্রেমীজীর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে কিছুটা খারাপ ছিল কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে এখন তিনি জরাকে জয় করে রেখেছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নামার পর জৈনেন্দ্রজীর সঙ্গে দেখা হলো। আবার ফিরলাম, আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হতে লাগল।

গিরীশজী পোদ্দারজীর বাড়িতে পড়ানো এবং অন্য কাজ করেছেন। তাঁকে নিয়ে কিছু কেনাকাটার কাজ করলাম। কয়েকটা শাড়ি কেনার ছিল আর কিছু অম্লান লোহার (স্টেইনলেস স্টিলের) বাসন। হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করানো সম্পর্কে পোদ্দারজীর সঙ্গে পরামর্শ করা হয়ে গিয়েছিল। বোম্বাই হাসপাতালে পোদ্দারজীর পরিবারের যথেষ্ট অবদান আছে। মাড়োয়ারী শেঠরা এই বিশাল হাসপাতাল খুলেছে যার ম্যানেজার ছিলেন শ্রীজয়দেব সিংহানিয়া। তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে পোদ্দারজীর সঙ্গে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ হার্ট স্পেশালিস্ট ডা· দাতের কাছে গেলাম। তিনি এক্স্‌রে করলেন, কার্ডিয়োগ্রাম নিলেন। রক্তচাপ বললেন, ১০৫-২১০, যা খুব বেশি। তারপর তিনি বললেন, রক্তমূত্রাদিও পরীক্ষা করা দরকার। শ্রীসিংহানিয়াজী পরের দিন নটার সময় তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

৪ জানুয়ারি উপোষ করে, চা-ও না খেয়ে, নটার সময় হাসপাতাল পৌঁছলাম। আধঘণ্টা পর পর পাঁচবার চিনির সরবৎ খেয়ে শিরার রক্ত আর প্রস্রাবও পরীক্ষা করা হলো। পরীক্ষার রিপোর্ট পরের দিন পাওয়ার ছিল। ভারতীয় বিদ্যাভবনে ড· ভয়ানীর সঙ্গে দেখা করা গেল না। সন্ধে ছটার সময় হিন্দি ছাত্রদলের তত্ত্বাবধানে একটি ছোটখাটো বৈঠক হলো চার্চ গেটে। এখানেই সুদর্শনজী আর প্রদীপজীকেও পেলাম—ফিল্ম জগতে হিন্দির এই দুজন লেখক এবং কবি থাকতে পেরেছেন। হিন্দির অন্যান্য লেখকরা কেন পারেন নি সে-ব্যাপারে আমি প্রদীপজীর সঙ্গে একমত। তাঁরা পন্ত এবং প্রসাদের ভাষা ফিল্মে আনতে চাইছিলেন, যা বোঝার মতো লোক ছিল গোনাগুনতি। প্রাচীন প্রবাদটি তাঁদের মনে পড়ে নি—কেশবদাস তাঁর কবিতায় বেছে বেছে কঠিন শব্দ ব্যবহার করতেন। অনেকের কাছেই তা পড়ার অর্থ ছিল 'বেনা বনে মুক্তে ছড়ানো'[১]র মতো। সুতরাং কবিতায় রস সৃষ্টি না হলে অন্যের পকেটে কী করে হাত ঢোকানো সম্ভব? এখানে ফিল্মেও একজনের নয় বরং লাখ লাখ লোকের পকেটে হাত ঢোকাতে হয়। গানের ভাষা এমন হওয়া দরকার যা বুঝতে লোকের বেশি অসুবিধে হবে না। আমি পন্ত-প্রসাদের ভাষা আর তাঁদের কবিতার প্রশংসাকারী। বিশেষ করে প্রসাদজীকে তো আমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে বচ্চনের ভাষাই সবচেয়ে ভাল আর তাঁকেই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কবি বলে মানা যেতে পারে। বচ্চন সিনেমায় যান নি, সেটা খারাপ করেন নি। উর্দু কবিতাতেও অনেক শব্দ শ্রোতারা বুঝতে পারেন না, কিন্তু চলতি ভাষা, চলতি উর্দুর ছন্দ আর সেই সঙ্গে সিনেমার নায়ক-নায়িকার নাচন-কোদন—সব

[১] এই ভাবার্থে মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত লোকোক্তিটি হলো—*ভৈঁস কে সামনে বীন বজানা,* যার আক্ষরিক অর্থ—মোষের সামনে বীণা বাজানো।—স·ম

মিলিয়ে কাজ চলে যায়।

ট্রেনে গুজরাট পৌঁছনোর পর ৩১ ডিসেম্বর থেকে বুকের ব্যথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, ঠাণ্ডাই হয়তো তার কারণ। ড· দাতে জানালেন, ঠাণ্ডা এর কারণ নয়, ছ-সাত হাজার ফুট উচ্চতার কোনো খারাপ প্রভাবও পড়ে নি হৃদযন্ত্রের ওপর। ৫ তারিখে এই কথাটিই সত্যি মনে হলো যখন আবার ব্যথা শুরু হয়ে গেল। শিল্পী স্বেতস্লাব রোয়রিকের কথা আমার সঠিক মনে হলো। তিনি বলেছিলেন, হৃদযন্ত্রে কখনো কখনো এই রকম হয়েই থাকে, তারপর তা আবার নিজে নিজেই স্বাভাবিকও হয়ে যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে শীতের অনেকটা সময় আমি মুসৌরীতে কাটিয়েছিলাম। ভেবে ছিলাম, বুকের ব্যথা আবার ফিরে আসবে, কিন্তু তা হয়নি। সেই ব্যাপারই ঘটল ১৯৫৫-৫৭ সালেও।

৫ জানুয়ারি সকাল নটার সময় বিহারী এ্যাসোসিয়েশনে গেলাম। সাধারণভাবে বোম্বাইতে ভোজপুরীদের সংখ্যা প্রায় কয়েক লাখ। তারা প্রায় বেশির ভাগ মজুর। সভা-এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনিই হোলি-দেওয়ালিতে দেখাশোনা হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী এবং অতি অল্প ব্যবসায়ীও আছে। তারা নিজেদের এ্যাসোসিয়েশন গড়েছে। বিহারী এ্যাসোসিয়েশন রাজনৈতিক সীমা অনুযায়ী শুধু বিহারেরই হতে পারে না। তার কারণ আরা-ছাপরা এবং গাজীপুর-বালিয়া-গোরখপুরের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। আমার ভাইদের পেয়ে আমার খুব আনন্দ হলো এবং তাদেরও হলো।

দুপুরে সর্দার পৃথিবী সিংহ এলেন। তাঁর স্বাস্থ্য আগের বার যেমন দেখেছিলাম তেমনিই ছিল। ভাবনগরে অনেকটা জমি নিয়ে তিনি একটি কৃষি-ফার্ম খুলেছিলেন। কিন্তু আজকের যুগে মানুষ যতক্ষণ নিজে না কৃষক হচ্ছে ততক্ষণ কৃষিকাজ সম্ভব হয় না। তার ওপর এদিকে সৌরাষ্ট্রে দু-তিন বছর ধরে ঠিকমত বর্ষা হয় নি, তার প্রভাবও পড়েছিল। ভাবছিলেন, এর থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায়? আসলে রাজনৈতিক জীবন থেকে ফুর্সৎ পাওয়ার সুযোগ তো সর্দারের ছিল না, উপরন্তু তা তাঁর কাছে পুরো সময়টাই দাবি করত। পার্টি অফিসে গেলাম। স্যান্ডহর্স্ট রোডের সেই রাজভবনে। সেখানে আগে ভারতের কেন্দ্রীয় পার্টির কার্যালয় ছিল, এখন আছে মহারাষ্ট্র পার্টি। কেন্দ্রীয় পার্টি দিল্লী চলে গেছে। দিল্লী রাজধানী হওয়ায় সেখানে সদস্যদের আসা-যাওয়ার সুবিধে রয়েছে। অনেক বড় বড় নেতাই পার্লামেন্টেরও সদস্য তাই দিল্লী ছেড়ে এক কোণায় পার্টিকেন্দ্র রাখা সম্ভব ছিল না। সাথী অযোধ্যাপ্রসাদ ঝাঁসির খুব পুরনো বিপ্লবী এবং পার্টি মেম্বার। এখন তিনি এখানেই মজুরদের মধ্যে কাজ করেন। তিনি বেলগাঁও নিয়ে গেলেন। সেখানে শিক্ষার মাধ্যমের বিষয়ে বলতে গিয়ে আমি বললাম, প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই মাতৃভাষাগুলি হওয়ার দরকার। সেখান থেকে মাড়োয়ারী গ্রন্থাগারে ভাষণ দিলাম। এটাই বোম্বাইয়ে সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার।

আমাদের অতিথি-সৎকারক শ্রীঘনশ্যামদাস পোদ্দারের সরল ও মৃদু স্বভাবের কথা আগেই বলেছি। অনেক ব্যাপারেই তাঁদের এই প্রজন্ম মাড়োয়ারী না থেকে ভারতীয় হয়ে গেছে। শেঠগিন্নিও হিন্দি বই পড়তে ভালবাসেন। আর বড় ছেলে তো বাবার চেয়েও এগিয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর মাদ্রাজের দিকে ঘুরে·বেড়ানোর গল্প খুব চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বলছিলেন। তাঁর মিলের

কোনো তরুণ কর্মচারীকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে তাঁকে কী সাহায্য করবে কী, হোটেলে উঠত আর মদ খেয়ে চুর হয়ে যেত। মদ আর মাংস আজকের প্রজন্মের কাছে ঘৃণার বস্তু নয়। কিন্তু অনেক প্রজন্ম ধরে মাংসের প্রতি যে ঘৃণা মাথায় গেঁথে দেওয়া হয়েছিল তা এখনো অনেক শেঠপুত্রের মধ্যে দেখা যায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশ ডিম খাওয়া অব্দি যেতে পারে। তরুণ পোদ্দার অনেক শহরে গেছেন, কিন্তু মদ-মাংস তাঁর ভাল লাগেনি। সঙ্গীটি তাঁকে পদে পদে বিরক্ত করেছে আর সেই সঙ্গে হাসাহাসি করেছে। ঘনশ্যামদাসজীকে এমনিতে দেখলে অসুস্থ মনে হতো না কিন্তু ডাক্তাররা তো কোটিপতি শেঠদের অবলম্বন করেই বেঁচে আছে। যদি দেখেশুনে লোকের চেহারা সুস্থ মনে হয় তাহলে বলে দেয় হার্টের অসুখ, রক্তচাপ আছে। পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ফীজ পাওয়া যায়। আমাদের ভারত-সোভিয়েত সংঘের প্রধান ডা· বালিগার ভুরি ভুরি প্রশংসা করছিলেন। তিনি এখন বোম্বাইয়ের সবচেয়ে বড় সার্জন। দিল্লীতে এবার তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কিন্তু তিনি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন না বলে আমি তাঁর কাছে গেলাম না। তিনি পোদ্দারজীর খুব সফল অপরারেশন করেছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমি ফীজ দেওয়ার জন্য মাসের পর মাস ব্যগ্র হয়েছিলাম কিন্তু তিনি বিল পাঠাচ্ছিলেন না। পোদ্দারজীর দিল্লীতেও একটি বাড়ি আছে যার অনেকটা অংশ ভাড়া দিয়ে রেখেছেন, তবে দু-তিনটে ভাল ঘর নিজের জন্য রেখেছেন। তিনি বললেন, 'দিল্লীতে এলে ওখানে উঠবেন।' তিনি তাঁর লোককে চিঠিও লিখে দিলেন। তাঁর বড়ছেলে চিঠিতে এটাও লিখে দিলেন যে, যদি রাহুলজীর টাকার দরকার হয় তবে দিয়ে দেবে। কিন্তু ধার নেওয়া আমার স্বভাবের বিরুদ্ধ।

৬ জানুয়ারি রাতে তরুণ পোদ্দার আর গিরিশজী স্টেশনে পৌছতে এলেন। ওপরের সিট পাওয়া গিয়েছিল যা সামান্য কষ্টদায়ক তো অবশ্যই কিন্তু শুতে কোনো অসুবিধে ছিল না। ৭ তারিখ সকালে আমাদের ট্রেন ছিল রতলামে। শ্রীমাচবেজীও এই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন। আমাদের নীচের সিটে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি রতলামেই নেমে গেলেন। একজন তরুণ সেনা-অফিসার ডিসুজা দিল্লী পর্যন্ত সঙ্গী থাকলেন। কোটার পরে কম্পার্টমেন্টে আমরা দুজনই শুধু রয়ে গেলাম। ফ্রন্টিয়ার মেল ছিল, তাই দূরের দূরের স্টেশনে দাঁড়াত। সন্ধে সাড়ে সাতটায় দিল্লী পৌছলাম এবং রিকশা নিয়ে ভাইয়াজীর বাড়ি পৌছলাম।

৮ তারিখে সারাদিন দিল্লীতে থাকলাম। পার্টির সাথীদের সঙ্গে দেখা হলো। সাথী ঘাটে কুড়ি বছর ধরে হৃদযন্ত্রের রোগী। বলতেন যে এ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না আর একে ভয় করাও উচিত নয়। ভয় করা যে উচিত নয় তার প্রমাণ হিসেবে তিনি স্বয়ং সামনে উপস্থিত ছিলেন। দেওলীতে আমরা এক বছর একসঙ্গে থেকেছিলাম। সেই বছরও এই অস্থি-চর্মসার মানুষটি তাঁর এইটুকুনি শরীরের মধ্যে হৃদরোগ পুষে রেখেছিলেন আর এখনও তিনি একেবারে সেইরকম ছিলেন, তাঁর স্বাস্থ্য না বেড়েছে না কমেছে। তিনি জানালেন, 'খাওয়া-দাওয়ায় একটু সংযম দরকার, দু-চারটে ওষুধ খেতে হবে আর বিখ্যাত ডাক্তারদের পিছনে দৌড়নো চলবে না। সবাই নতুন লোকের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।' আমিও ভুক্তভোগীর চিকিৎসা বেশি পছন্দ করি, ডায়াবিটিসের অভিজ্ঞতা সেটাই শিখিয়েছে। ভাইয়া সর্পগন্ধার বড়ি দিলেন আর আঙুরের মদ পান করার জন্য বললেন। আমি অনেকদিন ধরে তাই করতে লাগলাম।

রাত দশটায় দেরাদুনের গাড়ি ধরলাম। সকাল নটার সময় দেরাদুন পৌছে গেলাম। সামান্য

অসাবধানতার জন্য ট্যাক্সি পেলাম না। বাসও চলে গেল। এখন দুপুরের বাস ধরতে হবে। শুক্লজীর বাড়ি গেলাম। স্বামী-স্ত্রী দুজনে কোনো উৎসবে গিয়েছিলেন। খাওয়া হলো পণ্ডিত হরনারায়ণ মিশ্রের বাড়িতে। ফের এসে একটার বাস ধরলাম আর দুটোয় কিংক্রেগ পৌঁছলাম। কোনো রিকশা পেলাম না বলে লাইব্রেরি অব্দি হেঁটে যেতে হলো। চড়াইও ছিল, খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম তবু খুব শরীরের খারাপ অবস্থা ছিল। মনের মধ্যে শুধু এই কথাটাই ঘুরছিল যে, হৃদরোগের পক্ষে চড়াইয়ে ওঠাটা খারাপ। লাইব্রেরি থেকে রিকশা নিয়ে ঘরের কাছ পর্যন্ত চলে এলাম। পুসঙ্গ বোনেরা ডিসেম্বরেই এখান থেকে চলে গেছেন। কি সহৃদয় ছিলেন তাঁরা। জয়াকে দেখতে পেলাম সবার আগে। এবার ও চিনে ফেলল। লাল সেলাম, নমস্তে, প্রণাম, আদাব অর্জ—চাররকম ভাবেও নমস্কার করতে জানে।

ইগরের চিঠি এসেছিল। আমি তা দেখানোর জন্যই এনেছিলাম। কমলা আগেই দেখে নিয়েছিল। আবার সেই জোরাজুরি। ইগরকে কখনো চিঠি লিখবে না। আমি যদিও মনে করতাম যে, কমলার ভাবনাকেই সবচেয়ে বেশি মনে রাখতে হবে। শুধু তার জন্যই নয়, বাচ্চাদের জন্যেও। কিন্তু এটা বুঝতে পারতাম না যে, ইগরের চিঠি তাতে কী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে? আমি জানি, জয়া আর তার যে অনুজ আসছে তাকেই আমার বাকি জীবনটা দিতে হবে, কারণ তারা এমন দেশে জন্মেছে যেখানে শিশুদের রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নেই। মা-বাবাই তাদের সর্বস্ব। কিন্তু ইগরও আমার প্রিয় পুত্র, বাবার সঙ্গে শলা-পরামর্শের আশা সে-ও তো করে? সে সাম্যবাদী দেশে জন্মেছে। সেখানে সময় হলে সে নিজে নিজেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী অবাধে লেখাপড়া করবে এবং কাজও পেয়ে যাবে। আমি যদি চিঠিরও উত্তর না দিই তাহলে আমার কাছে তা খুব কলংকের ব্যাপার হবে। কী করব? 'ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, কমলার কথাই মানতে হবে'—এটাই মনে হচ্ছিল।

১০ জানুয়ারি পূর্বাহ্নে দুবার বুকে ব্যথা হলো। ডা· দাতের বলা ওষুধ আর আঙুরের মদও নিয়মপূর্বক খেতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল এবার শীতে মুসৌরী থেকে চলে যেতেই হবে। কয়েকদিন ধরে তো এই ভাবনাই মাথায় ঘুরতে লাগল যে, মুসৌরীর বাড়ি যদি বিক্রি হয়ে যায় তাহলে আট-দশ হাজারে দেরাদুনে অন্য বাড়ি কিনে নেব। দেরাদুন ছেড়ে ২৫-২৬ হাজার শরণার্থী যখন থেকে চলে গেছে তখন থেকে সেখানে বাড়ির দাম পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে, ভবিষ্যতে বাড়ি কেনাবেচার যা কাজ হবে তা কমলার ওপর ছেড়ে দেব।

১১ জানুয়ারি রাজেন্দ্রবাবুর চিঠি এলো। তাতে আমার 'প্রত্যক্ষ শরীর কোষ'-এর শব্দগুলি উদ্ধৃত করে ড· সুন্দরলাল যে আক্ষেপ করেছিলেন তাও পাঠিয়ে ছিলেন। উত্তরে আমি লিখে দিলাম, 'অন্যান্য ব্যাপারে যেরকম শব্দই ব্যবহার করুন না কেন কিন্তু পরিভাষাগুলির ব্যাপারে ভারতের সমস্ত ভাষা—অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কন্নড়, মারাঠী, নেপালী, গুজরাটী ইত্যাদি সমান অংশীদার। বিগত দু-হাজার বছরে ভারত আর বৃহত্তর ভারতে একই রকমের পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। যতক্ষণ এই পরম্পরাকে ভাঙার জন্য প্রস্তুত না হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পরিভাষাগুলি সরল তৎসম শব্দ দিয়ে তৈরি করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। যদি সুন্দরলালজীর কথানুসারে 'খোলী' (মন্ত্রীসভা) আর 'বিচবিন্দী' (কেন্দ্র)-র মতো শব্দ

তৈরি হতে থাকে তাহলে সেগুলিকে হিন্দি-এলাকার বাইরে একেবারেই স্বীকৃত দেওয়া হবে না। দুটি মাত্র পথ আছে। হয় উর্দুকে গ্রহণ করে আরবী থেকে শব্দ নেওয়া অথবা বাকি ভারতীয় ভাষাগুলির পরম্পরাকে গ্রহণ করে তৎসম শব্দ নেওয়া।

আমি 'ভোল্‌গা' (ইংরেজি), 'রাজস্থানী-রনিবাস' আর 'বহুরঙ্গী মধুপুরী' তিনটে বই ছাপিয়ে প্রকাশনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। যদিও সেগুলোতে লগ্নীকৃত টাকা উঠে আসার আশা ছিল, তাই এই অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত বলা যায় না, তবু ব্যর্থ এটা নিশ্চিত। প্রকাশনা সেই করতে পারে যার কাছে যথেষ্ট পুঁজি আছে এবং পুরো সময়টা সে-কাজে দিতে পারে। আমার কাছে দুটোর কোনোটাই ছিল না। কত লেখক নিজের প্রকাশনা খুলেছে এবং তার মধ্যে যশপাল আর অশোকজীর মতো কিছু লোক অসফলও হন নি। কিন্তু লেখকদের পক্ষে এটাই ভাল যে, তারা যদি কলম তুলে রাখতে না চায় তাহলে যেন প্রকাশনায় হাত না দেয়।

দিল্লী—কমলা অন্তঃসত্ত্বা ছিল। ভ্রমণের মরশুমের সময় হলে মুসৌরীতে সেন্ট মেরি হাসপাতাল প্রসবের জন্য সবচেয়ে ভাল ছিল। তেমন ব্যবস্থা তো দিল্লীতেও ছিল না। কিন্তু এখন শীতে তা বন্ধ ছিল, সে জন্য দিল্লী যাওয়াটাই ভাল মনে হলো।

১৫ জানুয়ারি জয়া আর কমলাকে নিয়ে আমি ট্যাক্সি করে সোজা স্টেশন পৌছলাম। সন্ধের খাবার কমলা সেখানেই খেল। এক টাকায় মাংস আর দেরাদুনের বাসমতী চালের সুন্দর ভাত দেখে মনে হলো সত্যযুগ ফিরে আসতে চাইছে। কমলার ইচ্ছে ছিল যে আমি শুক্লজীর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে ফিরে যাই, কিন্তু পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় তাকে এইভাবে ছেড়ে দেওয়াটা আমার মনঃপূত হলো না। সিট আগে থেকে রিজার্ভ করা যায় নি, কিন্তু রিজার্ভ করবে যে-যুবক সে আমার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল। সে একটি খুব ভাল কম্পার্টমেন্টে নীচের সিট রিজার্ভ করে দিল। জয়া প্রথম রেল আর রেলের প্লাটফর্ম দেখল। সে তো প্লার্টফর্মে অনেক দূর অব্দি হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। আশপাশে অনেক লোক হাঁটাচলা করছিল। সে ওসব পরোয়া করছিল না। প্রতিটি জিনিস ভাল করে দেখে। কুকুর দেখলে 'ভূত ভূত' বলতে শুরু করে। যাওয়ার আগে মেহ্‌তাজী আর তার স্ত্রীও এলেন।

১৬ জানুয়ারি পৌনে ছটায় আমরা দিল্লী পৌছলাম। সামান্য বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ভাইয়া স্টেশনে এসেছিলেন। টাঙ্গা নিয়ে আমরা তাঁর বাড়িতে পৌছলাম। শীতের রাত বড় হয় তাই এখনো অন্ধকার ছিল। ওপরে থাকার জায়গায় গেলাম। জয়া শিগ্‌গিরই একটি নিজের ঘর বানিয়ে নিল এবং ভাবীজী, তাঁর মা আর ভাইয়া সবার সঙ্গে মিলেমিশে গেল। মুন্নার (ভাবীজীর বোনের ছেলে) সঙ্গে ভাব করতে চাইছিল কিন্তু সে দু-একবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, তারপর দূরে দূরে থাকতে লাগল। 'হিত অনহিত পসু পংছিউ জানা'—বাবা ঠিকই বলেছেন। বোম্বাই থেকে ডাক্তারের রিপোর্টও পোদ্দারজী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে ওষুধের নাম ছিল। বিশেষ ওষুধ বলতে ছিল ওই সর্পগন্ধা, যা ইংরেজি নাম দিয়ে খুব দামে বিক্রি করা হতো। ভাই সাহেব তাঁর ফার্মেসিতে এর বড়ি বানিয়ে রেখেছিলেন।

কমলার জন্য কোন হাসপাতাল ভাল হবে তা খোঁজ করার ছিল। হাজরা বেগমের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি মহিলাদের নিয়ে কাজ করতেন। তিনি ড· সুশীলা দুগ্গলের নাম বললেন,

যাঁর নিজের হাসপাতাল ছিল।

পরের দিন (১৮ জানুয়ারি) ডা· সুশীলার বাড়ি খান মার্কেটে (নতুন দিল্লী) গেলাম। তিনি বললেন যে, প্রসবের সময় ২৫ তারিখের কাছাকাছি আর এটিও মেয়ে হবে। আমি বললাম, 'আমার ভবিষ্যৎবাণী তো এখনও পর্যন্ত মিথ্যা হয়নি। আগের সন্তানের সময় আমি কমলার সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম এবং আগে থেকেই 'জয়া' নাম রেখে দিয়েছিলাম। আবার সেই ব্যাপার হয়েছে আর আমি ছেলের নাম আগে থেকেই 'জেতা' রেখে দিয়েছি। যাকগে, এটা বোঝা গেল যে, এ মাসের শেষেই প্রসব হয়ে যাবে। সেখান থেকে কাছেই শ্রীনাথের পুরনো থাকার জায়গায় গেলাম। কিন্তু তিনি ওখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। শিবশর্মাজী সকালেই এসে গিয়েছিলেন। তিনি নেপাল অতিক্রম করতে চাইছিলেন কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ রাস্তা যাওয়ার পর ম্যালেরিয়া হয়ে গেল এবং তাঁকে ফিরে আসতে হলো। অসম্পূর্ণ যাত্রা সম্পূর্ণ করার ইচ্ছে তাঁর এখনও ছিল।

ডাক্তার অনেক জিনিসের লিস্ট বানিয়ে দিয়েছিল যার বেশির ভাগ চাঁদনী চক থেকে কিনে আনলাম। জুম্মা মসজিদের কাছে কিছু পুরনো উর্দু বই পেলাম। উর্দুর খদ্দের এখন কমই। অনেক বই তো ৫০ শতাংশ ছাড়েও দিতে রাজি ছিল। বুক সেলার হা-হুতাশ করছিল।

একদিন অটো-রিকশায় করে কোথাও যাচ্ছিলাম। সঙ্গে বসা দুজনে ভদ্রলোক বলছিলেন, 'দেখো, ১৯৫৭ সাল আসছে। ভয়ংকর ঘটনা এবার ঘটবে।' আমাদের দেশ আধুনিক যুগে ততক্ষণ পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ জ্যোতিষী এবং এই ধরনের কথায় বিশ্বাস থাকবে। ১৮৫৭-তে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছে, ১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বিজয়ী হয়েছে, তাই এই নির্বোধদের কাছে সব ৫৭ সালই কোনো না কোনো ভয়ংকর ঘটনা আনবে বলে মনে হয়। ১৬৫৭, ১৫৫৭, ১৪৫৭, ১৩৫৭…সবই কি দুর্ঘটনা এনেছে? যাদের স্বার্থে এখন ঘা লাগছে এবং যারা নিজেদের পেটোয়াদের স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করার স্বপ্ন দেখছে, বস্তুত তারাই ৫৭-র ঘটনাবলীর জোরদার প্রচারক।

২০ তারিখ সন্ধেতে শ্রীনাথ এল। কনৈলার খবরাখবর বিস্তারিতভাবে জানাল। তার থেকে বোঝা গেল যে, ঘরের অবস্থা ততটা খারাপ নয় যতটা রামবিলাস চিঠিতে লিখেছিল। হ্যাঁ, চুরি হয়। পুরনো মজুররা এখন তাদের বাপ-ঠাকুরদার মতো নেই। হাজার বছর ধরে মানুষকে কী করে গোলাম বানিয়ে রাখা যায়? তাদের গোলামিতেই যাদের মঙ্গল ছিল তাদের এখন শিক্ষা পেতে হবে।

২১ জানুয়ারি ভাইয়া, ভাবী এবং আমি ড· সত্যকেতু এবং শীলাজীর বাড়ি গেলাম। তাঁরাও ঠাণ্ডার জন্য মুসৌরী থেকে এখানে চলে এসেছিলেন। পার্লামেন্টের বৈঠক যতদিন শুরু না হয় ততদিন সংসদ সদস্যদের বাড়ি খালি পড়ে থাকে। এই রকমই একটি বাড়িতে তাঁরা রয়েছিলেন। পার্লামেন্টের সদস্যদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে বলে তাদের থাকার জায়গা বাড়াতে হয়েছে। এই ভবনটি ছিল ওইরকমই। সেখানে আরামের দিকে এবং জায়গাটিকে কাজে লাগানোর দিকে পুরো দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। ড· সত্যকেতুর 'আচার্য চাণক্য' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাসটিকে কলকাতার একটি সংস্থা এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছিল, সেজন্য তাঁর কলকাতা যাওয়ার ছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি ন্যায় তিনিই করতে পারেন যিনি সেই সময়কার ইতিহাসের

সমস্ত প্রাপ্য তথ্যগুলি সংগ্রহ এবং মন্থন করতে প্রস্তুত এবং তাঁর নিজের দায়িত্বও যিনি বোঝেন। ড· সত্যকেতু যে এ ব্যাপারে যোগ্য ছিলেন তা বলা বাহুল্য।

২২ জানুয়ারি কিছু হিন্দি বই আর কালি-পেন্সিল ইত্যাদির জন্য আমি ফৈজবাজারের বইয়ের দোকানে গেলাম। এক ভদ্রলোক বললেন, 'উই ডোন্ট কিপ স্টেশনারি।' তারপর 'সাপ্তাহিক হিন্দুস্তান' সম্বন্ধে শুধোলে বললেন, 'উই ডোন্ট হ্যাভ হিন্দি পেপার।' শুধু ইংরেজি বলার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আমাদের দেশে যে ইংরেজ-শাসন নেই বলে ইংরেজির রাজ্য থাকতে পারে না—এটা যদি তাঁরা বিন্দুমাত্র না জানতেন তাতে তাঁদের দোষ কোথায়? তাঁরা তো দেখছিলেন এখনো আমাদের মহাপ্রভুদের জন্য দিল্লীতে ইংরেজিরই রমরমা।

২৩ জানুয়ারি শ্রীনাথ আর তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য ২০ নম্বর কিংসওয়েতে গেলাম। ২০ নম্বর বাড়ি তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। সেখানে আবার শ্রীনাথের জন্য কী করে জায়গা হবে? তার পিছনে চাকরদের কোয়ার্টার ছিল। বাড়ির মালিকদের অত চাকর ছিল না। অনেক ঘর খালি পড়েছিল। শরণার্থীদের গোলমালের সময় অনেকে সেখানে এসে থাকতে শুরু করেছে। ডামাডোলের সময়ে শ্রীনাথের মতো অ-শরণার্থীরাও সেই সুযোগ নিয়েছিল। ছোট ছোট কুঠরীতে নারী-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা ভর্তি ছিল। তারই একটিতে শ্রীনাথ, তার স্ত্রী আর দুটি বাচ্চা থাকত। বড় ছেলে ১৪ বছরের, স্কুলে পড়ছিল। ছোটটি (জয়প্রকাশ) ছিল ৬ বছরের। আমি গিয়ে খাটিয়ায় বসে পড়লাম। নিজের বড় ভাইকে নিয়ে তো গর্ব হওয়ারই কথা। ঐ কুঠরীগুলিতে থাকা আরও কিছু লোকও আমাকে জানত, তাই তারাও নমস্কার জানাতে এল। ইদানিং শ্রীকে সি নিয়োগী বাড়িতে থাকতেন। শ্রীমতী নিয়োগী জানতে পেরে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীনাথজীকে বলেছিলেন। কিন্তু আমি সময় বের করতে পারলাম না। শ্রীনাথের জীবিকার উপায় হচ্ছে মিষ্টি বানিয়ে ফেরি করে বিক্রি করা। খরচ নিশ্চয় খুব কম করত কিন্তু দিল্লীতে চারটে প্রাণীর জীবননির্বাহ তো করতেই হতো। ওই পরিবারটিকে দেখে আমি বুঝতে পারতাম দেশের বিশাল জনসংখ্যা কী অবস্থায় রয়েছে।

২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা এবং গণরাজ্য দিবস ছিল। দিল্লীতে তার খুব প্রস্তুতি চলছিল কিন্তু তার বেশির ভাগই ছিল সরকারের পক্ষ থেকে। ফৈজবাজারের রাস্তাটি খুব বড় রাস্তা। এই বাজারটিরও এখন বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যত বাস এই রাস্তা দিয়ে যায় তা দিল্লীর আর কোনো রাস্তা দিয়ে বোধহয় যায় না। সেদিন নটা থেকেই যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হলো। রাষ্ট্রপতিকে সেলাম জানিয়ে সমস্ত সৈনিকদের শোভাযাত্রা এখান দিয়ে লালকেল্লার দিকে যাওয়ার ছিল। আমাদের ঘরের বারান্দার নীচে কিন্তু উল্টো দিক দিয়ে তাদের যাওয়ার কথা। সাড়ে এগারোটায় শোভাযাত্রা এলো দেড় ঘণ্টায় এখান দিয়ে পার হলো। সেনা, শিল্পকলা, হস্তশিল্প, শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির প্রদর্শনী ছিল কিন্তু আমাদের দেশের অসহনীয় দারিদ্রকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তার শুধু মৌখিক হিসেব-নিকাশ করা টুকুই কংগ্রেসের নেতাদের কাজ ছিল। তারা কখনো গান্ধীজীর নাম দিয়ে লোকের চোখে ধুলো দিত। এবার আবডী কংগ্রেসে সমাজবাদের কথা উঠছে এবং দরকারে-অদরকারে তার দোহাই দেওয়া হচ্ছে।

সেদিন সন্ধেতে মাচবেজী আর শরদজী এলেন। তাঁদের সঙ্গে আমরা তাঁদের বাড়ি গেলাম। ডা· সুশীলার বাড়ি গেলে তিনি জানালেন, 'আরও চার বা পাঁচদিন দেরি আছে।ব্যথা উঠলে

চলে আসবেন।' ফেরার সময় খুব ঝামেলায় পড়লাম। প্রদর্শনী দেখার লোকেরা নিজেদের ঘর-দুয়োর ছেড়ে প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে চলে এসেছিল। ট্যাক্সি এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। ট্যাক্সিওলা আর যেতে রাজি হচ্ছিল না। কী করি? সাড়ে'চার টাকার জায়গায় নটাকা দিতে রাজি হলাম এবং বহু ঘুরে ঘুরে নটার সময় আমাদের বাড়ি পৌছলাম। ট্রাফিকের ব্যবস্থা কি আমাদের পুলিস কখনোই করতে পারবে না? যেখানে থামা উচিত সেখানে কেউ থামবে না আর যেখানে চারদিক থেকে গাড়ি এসে পড়ে সেখানে থামার ফলে গাড়ি-ঘোড়ার লম্বা লম্বা সারি দাঁড়িয়ে পড়ে।

শ্রীঋষিজীর সঙ্গে আগে থেকেই চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। তিনি রুশ-হিন্দি শব্দকোষের কাজে লেগে রয়েছিলেন। রাশিয়ায় দু-বছর ভারতীয় দূতাবাসে থেকে এসেছিলেন, সেজন্য ভাষা বলাও অভ্যাস করেছিলেন। তাঁর হিন্দি খুব ভাল ছিল না আর সংস্কৃতের সঙ্গেও পরিচয় ছিল না। কিন্তু তিনি এখন তরুণ, পড়াশোনা করে নিজের যোগ্যতা বাড়াতে পারবেন। খুব পরিশ্রমী, এ কথা বলার প্রয়োজন নেই। তিনি মহাকবি পুশকিনের বিখ্যাত কবিতা 'সিগান' (রোমনী) রুশ থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন এবং তাতে যথেষ্ট সফল হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলে আমি বলেছিলাম, 'রুশ থেকে হিন্দি অনুবাদের কাজটি নাও এবং তার অংশগুলি প্রকাশ করে যাও।' কাগজওলারা ছাপাবে কি না তাই নিয়ে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু হিন্দি পত্রিকাগুলো যখন ছাপাতে শুরু করল তখন তাঁর সাহস বেড়ে গেল। শেষ করাটা খুব বড় কাজ ছিল। চাইছিলেন যে সেটা খুব ভালভাবে ছাপা হোক। আমার সাহায্যও নিতে চাইছিলেন। আমি বললাম, 'এটাই সময়, সন্ধেতে আসতে শুরু করো।'

২৮ জানুয়ারি উর্দু বাজারে বুক-সেলারদের দোকানে খুব ঘুরতে থাকলাম। এক জায়গায় 'তারিখ তিবরী' (ফারসী) দেখলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাতে হাত দিলাম। বুক-সেলার বলছিল, 'এখানে তো এটার খোঁজ করবার কেউই নেই। আমরা পাকিস্তান পাঠিয়েই দিতাম।' এটা অত্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস বইয়ের একটি, যাতে আরবদের ইরান ও মধ্য-এশিয়া বিজয়ের বিষয়ে অনেক কিছু লেখা আছে।

আজ ন্যাশন্যাল স্টেডিয়াম (জাতীয় আখড়া)-এ লোকনৃত্য হওয়ার কথা। আমিও সেখানে গেলাম আর সওয়া ছটা থেকে নটা পর্যন্ত থাকলাম। আখড়ায় যতলোক বসতে পারে খুব জোর তার এক চতুর্থাংশ লোক ছিল। পাঙ্গী (হিমাচল-চম্বা), কাশ্মীর, পাঞ্জাব, পেপ্সু, বুন্দেলখণ্ড, ভরতপুর, মারওয়াড়, সৌরাষ্ট্র, বোম্বাই, গোয়া, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, উড়িষ্যা, মধ্য-ভারত, মধ্য-প্রদেশ, সিকিম, নাগা, মণিপুর ইত্যাদি প্রদেশের লোকনৃত্য দেখানো হলো। কিছু নৃত্য নকল শিল্পীরা দেখাল এটা খারাপ লাগারই ব্যাপার। দর্শকদের চোখে ধুলো দেওয়াটা ভাল কথা নয়। সবচেয়ে ভাল নাচ ছিল মণিপুর, পাঙ্গী, নাগা, ব্রজ আর রাজস্থানের। বোম্বাইয়ের সিংহনৃত্যও ভাল ছিল। রাষ্ট্রপতিও এসেছিলেন।

সাথী যজ্ঞদত্ত শর্মা আগ্রহ প্রকাশ করলেন যাতে আমি কোনো প্রতিনিধি-দলে থেকে বিদেশে যাই। আমি বললাম, 'আমি শুধু চীনই যেতে পারি। আর তাতেও আমার তিব্বত যাওয়ার লোভ আছে।'

এবার আমার বইয়ের বদলে বুক-সেলারদের কাছ থেকে দেড়শো বই নিলাম। প্রকাশনার

এই সুযোগটি তো থাকা উচিতই। সময় পেলে বইগুলির কিছু কিছু পড়তেও লাগলাম। নাগার্জুনের 'বলচনমা' শেষ করলাম। গ্রামীণ জীবনের অতীব সজীব চিত্র। কষ্ট হয় যে, পাঠক অতৃপ্তই থেকে যায়।

জেতার জন্ম—রাত দেড়টা থেকে কমলার ব্যথা শুরু হয়েছিল। প্রথমে ১৫-২০ মিনিট পর পর, তারপর ঘন ঘন। ৩১ জানুয়ারি সাড়ে চারটে পর্যন্ত কোনো রকমে কাটল। সে-সময় ট্যাক্সি পাওয়ারও অসুবিধে ছিল আর ডাক্তারের জন্যও হয়রান হতে হতো। যেতে হতো অনেকটা দূর। তখন আমি আর ভাইয়া কমলাকে নিয়ে ডা· সুশীলার কাছে গেলাম। তিনি চট করে সব সামলে নিলেন। পৌনে ছটার সময় বললেন, 'এখন ব্যথার সবে শুরু। সন্ধে নাগাদ হয়তো প্রসব হবে।'

সওয়া দশটায় ফোন করলে ডা· গিল জানালেন যখন দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি তখন ছেলে হয়েছে। রমন ভাই তার গল্পে বলেছে, অনেকগুলি বোনের পর আমার যখন ভাইয়ের জন্ম হলো তখন আমার পিঠে আখের গুড়ের চাকতি ভেঙে প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছিল। ভাবীজী আর আম্মাও তা অনুমোদন করে সঙ্গে সঙ্গে গুড় আনালেন আব জয়ার পিঠে তা ভাঙলেন। ভাবীজী, তাঁর মা, ভাগ্নে-ভাগ্নী, আমি আর জয়া সবাই মিলে ঢোলক নিয়ে ডা· সুশীলার হাসপাতালে পৌঁছলাম। এবার খুব কষ্ট সহ্য করতে হয় নি। কমলা লেডি ডাক্তারের প্রশংসা করছিল। এখানে সেন্ট মেরির মতো সবরকম সুবিধে ছিল না তবু নার্স খুব ভাল ছিল।

পরের দিন গিয়ে দেখলাম জেতা চোখ খুলেছে। জন্মের সময় জয়ার চেয়েও জেতার ওজন বেশি ছিল অর্থাৎ সাড়ে আট পাউন্ড। ডাক্তারের ফীজ ১৫০ টাকা, আট দিন থাকার খরচ ৬৪ টাকা আর চাকর-বাকরদের জন্য কিছু সব মিলিয়ে ২৫০ টাকা দেওয়ার ছিল। ৭ ফেব্রুয়ারি কমলা হাসপাতাল থেকে চলে যাবে, এটাও ডাক্তার জানিয়ে দিলেন।

সেদিন 'আজকাল' কার্যালয়ে গেলাম। চন্দ্রগুপ্তজী, সত্যার্থীজী, মন্মথজী এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা হলো। ডাইরেক্টর সিনহা সমস্ত বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি শুধু ইংরেজিতেই কথা বলতে পারেন এবং সে-কারণেই এই পদে আছেন। তিনি বুদ্ধ-শতাব্দী সম্বন্ধে প্রকাশিতব্য বইয়ের জন্য একটি লেখা চেয়েছিলেন। আমি 'দীপংকর শ্রীজ্ঞান' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, 'আজকাল' তা ছেপে দিয়েছিল, এখন অন্য লেখা চাইছিলেন। বলে দিলাম 'শান্ত রক্ষিত'-এর বিষয়ে লেখা পাঠাব। এখান থেকে কুমারিলজীর সঙ্গে হরিজন-নিবাস গেলাম। বিয়োগী হরিজী ওখানে ছিলেন না। সেখানে কিছুক্ষণ ঘুরে চলে এলাম।

মাকে ছেড়ে থাকা তিনদিন হয়েছে আর এরই মধ্যে জয়া মাকে ভুলে গেছে। ভালই হয়েছিল নইলে কেঁদে কেঁদে বিরক্ত করত। বাচ্চাদের ভালবাসা যদি সবার মধ্যে ছড়ানো থাকে তাহলে ভাল। ৩ ফেব্রয়ারি জয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। সে জেতাকে খুব ভাল করে দেখল। নমস্তে, সেলাম করল। চুমু খেল। ভাল বাসল। জেতা দিনের বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে থাকত। এখনও জন্মানোর পরে ওর ডায়রিয়া হয় নি। পেট পরিষ্কার করার জন্য প্রকৃতি তার নিয়ম করে রেখেছে। এই দিনই রাজেন্দ্রবাবুর চিঠি মুসৌরী থেকে ফেরৎ এলো। তিনি লিখেছিলেন যে আমার চিঠি সুন্দরলালজীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভাষার ব্যাপারে আমার সঙ্গে পণ্ডিত সুন্দরলালের মতভেদ খুবই পুরনো। কিন্তু সে-কারণে আমাদের সম্পর্কে কখনো কোনো প্রভাব

পড়ে নি। পরের দিন দুপুরের পর জৈনেন্দ্রজীও এলেন। ফৈজবাজারের এই সারিতেই ৮ নম্বর ঘরে তিনি থাকেন। আমিও সেখানে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলো।

পাঁচ ফেব্রুয়ারি পার্টি-অফিসে সাথী অজয়ের সঙ্গে কথা হলো। আমি আবার পার্টি-মেম্বার হওয়ার কথা বললাম। তিনি বললেন, 'খুব ভাল, স্বাগত জানাচ্ছি।' তখনই আমি আবেদনপত্র দিয়ে দিলাম। এটা তো সকলেই জানত যে মেম্বার না থাকার সময়েও আমি পার্টিরই লোক ছিলাম আর আমার কলম দিয়ে তার কাজও করতাম। এখনও কলম দিয়েই কাজ করতে পারি তা আমি বলে দিয়েছি। স্বাস্থ্যের এই অবস্থায় চলাফেরার কাজ করা সম্ভব নয়। আমার সেদিন খুব আনন্দ হলো। আমি ভয় পেতাম যে, পার্টি মেম্বার না হয়ে যেন মহাপ্রয়াণ না ঘটে! চিরকাল ধরে পোষণ করা আমার আদর্শগুলির প্রতীক হচ্ছে পার্টি। আমার পুরনো সাথীদের সঙ্গে আমি সবসময় মন খুলে মিশতাম কিন্তু এক ধরনের দূরত্ব দেখে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। আমি বললাম, 'এখন সারা জীবনের জন্য পার্টির মেম্বার হলাম।'

শ্রীলাড কোংকড় হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, যিনি মারাঠী ব্রাহ্মণদের মধ্যে শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। শ্রীধর্মানন্দ কোশাম্বীর কাছে তিনি বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করেছিলেন। সংস্কৃতের শুধু বড় অনুরাগীই নন, তা অধ্যয়ন করাতেও তাঁর খুব আগ্রহ আছে। এখনও, প্রৌঢ়াবস্থায় পৌঁছেও, দর্শনগ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য গুরুর কাছে যান। সেই সঙ্গে তিনি মারাঠী কবিও। ধম্মপদ আর ভর্তৃহরি শতক তিনি মারাঠী ভাষায় পদ্যবদ্ধ অনুবাদ করেছেন। সন্ত তুকারামের রচনার ওপর একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ লিখেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু পুরনো ধরনের আই সি এস নন। কেসকরের মন্ত্রণালয়ের তিনি দক্ষ সচিব। এইরকম লোকের সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে কথা বলতে ভাল লাগে। বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়নে তাঁর আগ্রহ আছে। মাচবেজী তাঁর পক্ষ থেকে বললেন, 'দিল্লীতে তাঁর বাড়িতে থাকুন।' কিন্তু যখন ভাইয়াজীর বাড়ি হয়ে গেছে তখন অন্য জায়গায় থাকাটা আমার পছন্দ নয়। লাড সাহেবের একটি দুঃখও আছে—সমস্ত ভাষার ছোট ছোট খেলাঘরগুলি ভেঙে দিয়ে হিন্দিই একমাত্র ভারতীয় ভাষা হওয়া উচিত। এটা যে অবাস্তব তা তো এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি মারাঠী সাহিত্যের সেবা করেছেন এবং এখনও করছেন। তিনি তাঁর এই ভাবনাগুলি তাঁর ড্রয়িং রুমে কারো কাছে বলেন নি, মারাঠী সাহিত্যকদের কাছে এর ওপরে বলেছিলেন। তাঁদের কাছে এটা কতখানি অসহ্য মনে হয়েছিল, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। এর প্রয়োজনীয়তা হলো যে মারাঠী-গুজরাটী বা ভারতবর্ষের আর সব ভাষা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এবং তাদের চিতার ওপর হিন্দি বিকশিত হোক।

৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীভরত মিশ্র রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সচিব শ্রীবাল্মীকি চৌধুরীর সঙ্গে এলেন। ভরত মিশ্রকে ছাপরার লোকেরা সোহং স্বামী বলতে শুরু করেছে। পণ্ডিত রামাবতার শর্মার শিষ্য এবং অনুগামী, অর্থাৎ নাস্তিক, কিন্তু হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, নাস্তিকতা-আস্তিকতার সমন্বয় করতে জানে। বাল্মীকিবাবুর সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে পরিচয় ছিল, কারণ চক্রধরবাবুর মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ার পর এখন তিনিই রাষ্ট্রপতির নিজস্ব চিঠিপত্র লেখা এবং অন্যান্য কাজের দায়িত্বে ছিলেন। আমি আগের চিঠিতে রাজেন্দ্রবাবুকে লিখেছিলাম—আমি দিল্লী যাব কিন্তু অকারণে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করায় আমার কখনো

সংকোচ হতো না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর দর্শনার্থীদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে তাই আমি তার আরো একটি সংখ্যা বাড়াতে চাইতাম না। যখন বাল্মীকিবাবু বললেন, ১১ ফেব্রুয়ারি সাড়ে পাঁচটায় আপনি দেখা করতে আসুন তখন আমার চিঠি লেখার জন্য অনুশোচনা হতে লাগল। আমি কেন এটা লিখলাম যে, আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। এখন তো যেতেই হবে।

এই সময় ফৈজবাজারের ডাকঘরে একটি ঘটনা ঘটল। আজকাল আমি প্রায়ই টাকা দিয়ে জিনিস নেওয়ার পর বাকি পয়সা নিতে ভুলে যাই। সেদিন টিকিট নিলাম আর ওখানকার টিকিট বিক্রেতা শ্রীচেতরামের কাছে একটাকা দশ আনা ভুলে চলে এলাম। পরের দিন গেলাম। সে পয়সা ফেরৎ দিয়ে দিল। এখনও, আর এই দিল্লী শহরে, সৎ লোক যে আছে এটা তার উদাহরণ।

সরহপা-র দোঁহাকোষের যে (দশম-একাদশ শতাব্দীর) তালপুঁথি আমি তিব্বতে পেয়েছিলাম এবং যা এখন আমি সম্পাদনা করছি, প্রকাশকদের ইচ্ছে হয়েছে যে সমস্ত তালপুঁথির ব্লক বইয়ে দিয়ে দেওয়া হোক। দিল্লীতে ব্লকমেকার প্রচুর আছে। অনেক জায়গায় দেখে-টেখে আমি চাওড়ী বাজারের এক্সপ্রেস ব্লকওয়ালাদের পছন্দ করলাম। দশ বছর আগে একজন তরুণ এই ব্যবসাটি শুরু করেছিল। সে চেষ্টা করেছিল যাতে কাজে কোনো ত্রুটি না হয় এবং খদ্দের সন্তুষ্ট থাকে। এতদিনে তার কাজ-কারবার জমে উঠেছিল। আমার পুঁথির অনেক ব্লক করানোর ছিল। আমিও চাইছিলাম আর আমার চেয়েও বেশি সেই তরুণের চিন্তা ছিল, যাতে কোনো প্লেট অস্পষ্ট না হয়ে থাকে। কারু কারু দু-তিনটে করে প্লেট সে আবর্জনায় ফেলে দিয়েছিল, যতটা ভাল হওয়া সম্ভব ততটাই ভাল ব্লক বানিয়েছিল। তার কাজ যথেষ্ট বেড়ে গেছে এবং আরও বাড়ানোর কথা বলছিল। আমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দরের কথা মনে পড়ত। যদি তিনি কাজ বাড়ানোর জন্য এতটা পাগল হয়ে না পড়তেন তাহলে তাঁর নিজের হাতে লাগানো চারা— লা জার্নাল প্রেস থেকে দুধে পড়া মাছির মতো তিনি বহিষ্কৃত হতেন না। আমি সাবধান করলাম, 'কাজ বাড়ানোর চিন্তা নিয়ে শেঠদের কাছে যেও না।'

রাজকমল-এর কার্যালয়ে গেলে দেবরাজজী একটি বই তুলে বললেন, 'এটা একজন নতুন লেখকের খুব ভাল উপন্যাস।' আমার সময়ও ছিল আর আমি এই সময় প্রচুর বই সংগ্রহ করছিলাম। আমি 'ময়লা আঁচল'ও নিয়ে নিলাম। সেটা নিয়ে জৈনেন্দ্রজীর কাছে যেতে হলো। জৈনেন্দ্রজী দার্শনিক না হলে ভাল হতো কিন্তু কারও ইচ্ছাকে আর কি করে বাধা দেওয়া যায়? তিনি 'ময়লা আঁচল' দেখে বললেন, 'আমি এটাকে দি বেস্ট তো বলব না তবে দি গুড' বলতে পারি। জৈনেন্দ্রজীর এটুকু সার্টিফিকেটও নতুন লেখকের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দার্শনিক তার প্রতিটি শব্দ ওজন করে বলতে জানে। আমি সেই বইটি আদ্যপান্ত পড়ে ফেললাম। সত্যিই তা পড়ে প্রেমচন্দের কোনো মহান সৃষ্টির কথা মনে হচ্ছিল। আমি ফণীশ্বরনাথ রেণুর কলমের ভক্ত হয়ে পড়লাম। আমি তো মনে করি বড় উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রেমচন্দের পর এমন সুন্দর উপন্যাস কেউ লেখে নি। আমি তার সম্পর্কে নোটও করেছিলাম—'ভাল লিখেছে। বৈচিত্র্যময়, সৌন্দর্যপূর্ণ যথার্থ চিত্রণ। কলমে খুব সম্ভাবনা রয়েছে।'

১১ ফেব্রুয়ারি সকালে শিব শর্মার সঙ্গে লাজপত নগরে তাঁর কলাভবনে গেলাম। কলাভবন

বলতে হিন্দি সাহিত্য বিদ্যালয়। সেটা দিল্লীর একপ্রান্তে। সেখানে তরুণ-তরুণীরা পড়ে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির প্রভাকর, রত্ন এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিত। পাঞ্জাবে এই ধরনের নিজস্ব বিদ্যালয় স্থাপনের খুব রেওয়াজ আছে। কিছু লোক নাক সিঁটকে বলে' এগুলি শিক্ষণ-সংস্থা নয়, শিক্ষণ-দোকান। আমি মনে করি না যে, কোথাও শিক্ষণ-সংস্থার লোকেরা হাওয়া খেয়ে থাকে, সকলেই বেতন নেয়। এখানেও যদি বেতন নিয়ে পড়ায় তাতে খারাপটা কী? এখানে পড়াশোনা করা ছেলেমেয়েরা যদি পরীক্ষায় পাস না করত তাহলে কেন পড়তে আসত? আর যখন নিয়মমাফিকভাবে স্থাপিত কলেজ ও স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বসে তারা পরীক্ষায় পাস করে যায় তখন তাদের প্রতি অভিযোগ কেন? শিব শর্মার উৎসাহ কখনো কখনো তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন তার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হতে শুরু করে। কিন্তু এখানে দিল্লীতে তিনিই এই ভবনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধানাচার্য ছিলেন! তিনি সাহিত্যরত্ন ভালভাবে পাস করেছিলেন, হিন্দি সাহিত্যে তাঁর যোগ্যতা বেশ ভাল। সামান্য সংস্কৃতও পড়েছেন। ইংরেজি পড়ারও ইচ্ছে হতো কিন্তু 'ন চং মে প্রবৃত্তিঃ' (সেদিকে মনই যেত না)। তাঁর সহ-শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজিতে গ্র্যাজুয়েটও ছিলেন। এই সংস্থাটি চালিয়ে তিনি তাঁর ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছিলেন। এতসব সত্ত্বেও তিনি হচ্ছেন ভবঘুরে। তাই মাঝে মাঝে কয়েক মাসের জন্য সরে পড়েন। তাঁর মা-বাবাও সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা মনে করতেন যে আমার প্রেরণাতেই তাঁদের সন্তান মা-বাবাকে কাছে টেনেছে।

দু-দিন আগে আমি পণ্ডিত ভগবতদত্তজীকে বলে দিয়েছিলাম যে, ১১ তারিখে আমি আপনার বাড়িতে আসব। আমি ভেবেছিলাম প্যাটেলনগর আর লাজপত নগর পাশাপাশিই। এখন জানলাম দুটির মধ্যে দূরত্ব ২০ মাইলের। জায়গা দুটি হচ্ছে দিল্লীর দুই প্রান্তে। তাই যাওয়ার চিন্তা ত্যাগ করলাম। লাজপত নগরে শরণার্থীদের জন্য সরকার বাড়ি বানিয়েছিল। আগে ৬ হাজারে যে বাড়ি বিক্রি হয়েছিল, এখন নীলামে সরকার তাঁর জন্য ১০-১৫ হাজার পেয়েছে। সরকার যদি এইভাবে বাড়ি দিতে শুরু করে তাহলে সব বাড়ি বড়-বড় ধনীদের হাতে চলে যাবে এবং সাধারণ বিত্তসম্পন্ন লোকেরা গৃহহীন হয়ে পড়বে। এটা ঘোর অন্যায় কিন্তু কে বোঝাবে?

আজই পার্টির মুখপত্র 'নিউ এজ'-এ বেরিয়েছে যে আমি আবার কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হয়েছিল। যখন পার্টির বাইরে ছিলাম তখনও গোয়েন্দা পুলিস ছায়ার মতো পিছনে লেগে থাকত, তাই তাদের কাজের কোনো পরিবর্তন ছিল না। ঘটনাচক্র কেমন দেখুন, সেই দিনই সাড়ে পাঁচটায় রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। ট্যাক্সি সেখান পর্যন্ত পৌঁছে দিল। দিল্লীর আকবরের মতো অন্য কোনো বাদশাও এতবড় রাজ্যের প্রধান ছিলেন না। সম্ভবত ইতিহাসে ভারতে এমন কোনো রাজ্য-অধিষ্ঠাতা হন নি। তাই সেখানকার চাকরবাকরদের জাঁকজমক দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। তারপর আবার রাষ্ট্রপতি ভবন ছিল সেই বাড়িটি যাকে আগে 'ভাইসরয় ভবন' বলা হতো এবং যা বানাতে ইংরেজরা নির্দয়ভাবে প্রজাদের কঠোর পরিশ্রমের উপার্জনকে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমি সময়মতো পৌঁছেছিলাম বলে একটুক্ষণের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে গেলাম। রাজেন্দ্রবাবু সেই রকমই সাদাসিধা ভাবে বসেছিলেন। আমিও বলসলাম। স্বাস্থ্য, সাহিত্য আর তিব্বত সম্বন্ধে

কথাবার্তা হলো। সরহপার তালপুঁথি তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো সাহায্যের দরকার আছে?' আমি বললাম, 'যদিও আমার স্বাস্থ্য আগের মতো নেই তবু তিব্বতে এখন পুরনো মঠ আর গ্রন্থাগারগুলি খোলার যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাঁর জন্য আমি তিব্বত যেতে চাই। এজন্য পাসপোর্টের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে হবে।' সে সময় আমি জানতাম না যে, উত্তর-প্রদেশ সরকার পাসপোর্ট দিতে নাকচ করে দিয়েছে। রাজেন্দ্রবাবু পাসপোর্টের জন্য চেষ্টা করলেন। শেষমেশ তাঁর নামেই তো পাসপোর্ট মেলে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার আর কেন নাকচ করবে?

রাজেন্দ্রবাবু সর্বদাই লাজুক ছিলেন। তার মানে এই নয় যে তিনি প্রতিভাতেও পিছিয়ে ছিলেন। একেক জন মানুষের একেক রকম স্বভাব। এত লজ্জা তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন? বড় ভাই মহেন্দ্রবাবুর তাঁর ছোট ভাইয়ের ওপর এমন নিবিড় ভালবাসা ছিল যা খুব কম দেখা যায়। রাজেন্দ্রবাবু তাঁর সামনে সবসময় নিজেকে ছোট বালক বলে মনে করতেন, সেই রকমই সম্মান আর ভালবাসা ছিল। সম্ভবত সংকোচের সূত্রপাত সেখানেই। যাইহোক, নিজের মতামত প্রকাশে সংকোচ করাটা ভাল নয়। তিনি ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি। কত শতাব্দী পরে ভারতে প্রথম গণরাজ্য স্থাপিত হলো এবং তার গণপতি হওয়ার সুযোগ তিনি পেলেন। তিনি যে-পথ দেখাবেন দীর্ঘদিন যাবৎ তা অনুসৃত হবে। নেহেরু জন্মেছিলেন চাকচিক্যময় পরিবারে। সারা জীবন ছিলেন ঝলমলে। না তাঁর নিজের টাকা খরচ করতে কখনো কষ্ট হয়েছে, আর না হয়েছে অভুক্ত-নগ্ন জনসাধারণের সঞ্চিত টাকায় আগুন লাগাতে কোনো দ্বিধা। এর উদাহরণ হচ্ছে তাঁর বৈদেশিক বিভাগ। তাঁর রাজদূত এই ধরনের হৃদয়হীনতার জন্য বিখ্যাত। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তো শাহাজাদী। মস্কোর দুতাবাস সাজানোর ফার্নিচার কিনতে তিনি যদি বিমানে করে সুইডেন যান তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাঁর বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকা উচিত। যে দূতাবাসেই তিনি উঠবেন তাকে মুঘল দেওয়ান-ই-খাস বানিয়ে ছাড়বেন। মস্কোতে এই রকমই করেছেন, ওয়াশিংটনেও এই রকম করেছেন, লন্ডনে এই রকমই করছেন। যতদিন বড় ভাই আছে ততদিন রাজদূতী হয়ে এইভাবে তাঁর গরিব দেশের প্রকৃত অবস্থার ওপর পর্দা চাপা দিয়ে দূতাবাসের চমক বাড়াবেন। মেনন সাহেবের কাছে আশা ছিল যে তিনি সংকোচ করবেন কিন্তু তিনিও লন্ডনে রাজদূত হওয়ামাত্র রোলসরয়েসের মতো অত্যন্ত ব্যয়বহুল মোটর কেনার লোভ সামলাতে পারলেন না। এইসব লোকদের সম্পর্কে কী অভিযোগ করা যেতে পারে? তবে রাজেন্দ্রবাবুর তাদের ব্যাপারে জড়ানোটা উচিত ছিল না।

এটা ঠিক যে তিনি খুব বাড়াবাড়ি করেন নি। এখনো তাঁকে খদ্দরের সেই পুরনো ধুতি-পাজামা পরে দেখা যায়। বেশির ভাগ তিনি তাঁর এই পোশাকেই থাকেন। কিন্তু নেহেরু শিখিয়ে দিয়েছেন যে সম্মান রাখার জন্য পাঞ্জাবি আর চুড়িদার পায়জামা খুব দরকার, সেজন্য রাষ্ট্রপতিকে সে পোশাকেও দেখা যেতে পারে। ব্যাপারে তাঁর ড· রাধাকৃষ্ণণকে অনুসরণ করা উচিত। তিনি কোনোদিন তাঁর ধুতি ত্যাগ করেন নি। কিন্তু আমি তো বলেছি, একেক সময় তাঁর সংকোচ তাঁকে খারাপ করে দেয়। নেহেরু ভোজপুরী প্রবাদের মতো—'বাগু বাগু গইল বিত্তা ভর পগহো লে গইল।'[১] সাদাসিধে রাজেন্দ্রবাবুকেও কত জায়গাতে তিনি পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। রাজেন্দ্রবাবু সবসময় জনগণের লোক ছিলেন। জনগণের মধ্যে মিলেমিশে থাকাতেই

তিনি সন্তুষ্ট হতেন এবং তা লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং তাঁর স্বভাবই কিছুটা এরকম হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি দেহরক্ষীদের পল্টন না নিয়ে কোথাও যেতে পারেন না। এটা ঠিকই যে, তাঁর সময়ের অংশীদার হাজার লোক আর হাজার কাজ কিন্তু তার মধ্যে থেকেও কখনো কখনো দু-এক ঘণ্টা সময় তিনি বের করে নিতে পারেন। সে-সময় তিনি যদি গাড়ি দূরে ছেড়ে দিয়ে একা একা তাঁর পুরনো পোশাকে দিল্লীর গলিগুলোতে ঘুরতেন তাহলে কী ক্ষতি হতো? তিনি তো গণপতি, প্রাচীন রাজাদের মধ্যে কতজন এরকম করেছিলেন। এতে কি লাভ হবে? তাঁর পক্ষে ভালই হবে আর গরিব জনতারও ভাল লাগবে। তাঁরা তাদের মনের কথা বলার সুযোগ কখনো কখনো পাবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হবে যে, পরবর্তী রাষ্ট্রপতিদের পথ তৈরি হবে এবং নেহেরুর প্রতাপ কমে যেতে থাকবে।

আমাকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে রাজেন্দ্রবাবু বললেন, 'এর জন্য ভাবতে হবে না।' কিন্তু কাজের কথা তো হয়ে গিয়েছিল। আর মাত্র কয়েক মিনিটই বসলাম। আধ ঘণ্টা পর সেখান থেকে চলে এলাম।

১২ ফেব্রুয়ারি ড· হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী ও রাজবলী পাণ্ডে এলেন। বলতে লাগলেন, 'নাগরী প্রচারিণী সভা হিন্দি বিশ্বকোষ প্রকাশ করার একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের কাছে দিয়েছে। ছ-লাখ টাকা খরচ করে পাঁচ বছরে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। ভারত সরকার এটা মঞ্জুর করেছে এবং মাসিক আরো পাঁচ হাজার টাকা দেবে স্থির করেছে। প্রধান সম্পাদক এবং চারজন সহ-সম্পাদক থাকবে। আমাদের কাজের বড় বাধাও দূর হয়ে যাবে যদি আপনি প্রধান সম্পাদক হতে রাজি হন।' আমি সরকারি চাকরি করতে কি করে সম্মত হতাম? সে সময় তো কিছু বলতে পারিনি কিন্তু পরে আমার মতামত লিখে পাঠালাম। তাঁরা আবার তাঁদের অসুবিধের কথা জানালেন আর বললেন যে, অন্য কাউকে প্রধান সম্পাদক করতে গেলে অনেক প্রার্থী হয়ে যাবে এবং বিবাদ হওয়ারও ভয় আছে। তখন শিক্ষা-মন্ত্রণালয় তা মানতে ইতস্তত করবে। বন্ধুরাও ভাল-মন্দ বোঝাল। এটাও বলল যে, এই কাজটি তো সভা করছে, সরকার তো শুধু অনুদান দেয়। কয়েক মাস পরে শেষমেশ আমি সম্মতি পাঠিয়ে দিলাম।

১৩ ফেব্রুয়ারি জেতার জন্ম উপলক্ষে চায়ের পার্টি হলো। এই সুযোগে দিল্লীর সাহিত্যিকদের দেখার সৌভাগ্য হলো। ড· সত্যকেতু, চন্দ্রগুপ্তজী, মন্মথনাথজী, সত্যার্থীজী, বাচস্পতি, পাঠকজী, দেবনারায়ণ, দ্বিবেদীজী, ভগবতীপ্রসাদ বর্মা, নরেন্দ্র শর্মা, জৈনেন্দ্রজী, মাচবেজী, নওলপুরী, সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি ঘরের ও বাইরের নিয়ে ৩৬ জন পুরুষ এবং মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ওপরের বারান্দায় জায়গা দেখা গেল যথেষ্ট। চা-পানের সঙ্গে সাহিত্য চর্চাও হলো। রোববার ছিল, তাই প্রায় সকলেই কাজ থেকে বিরত ছিল। শীলাজী, ভাবীজী, কমলা ইত্যাদিরা ব্যবস্থাপনার ভার হাতে নিয়েছিল। শ্রীনাথ আর তাঁর পরিবারও ভাইপোর উৎসবে অংশগ্রহণ

১৪ ফেব্রুয়ারি আমি চাওড়ী বাজারে ব্লকের কপি আনতে গিয়েছিলাম। চাঁদনী চক আর চাওড়ী বাজারে প্রায়ই ভিড় থাকে। এক জায়গায় ভিড় জমে গেল। মনে হলো, একজন ইচ্ছে

[১] 'গরু তো গেলই, সেই সঙ্গে এক বিঘৎ গলাসিও নিয়ে গেল।'—স·ম·

করে রাস্তা আটকে রেখেছে। আমি তাঁর ওপর রাগ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সে-সময় অন্য দিকে খেয়াল করি নি। সামনে এগিয়ে কোনো জিনিস কিনে যখন পয়সা দিতে গেলাম তখন দেখলাম চামড়ার গোল মানিব্যাগটা হাওয়া হয়ে গেছে। ভাগ্যক্রমে আমি সব টাকা এক জায়গায় রাখি নি, দশটাকার নোট আলাদা ছিল বলে টাকা দিয়ে দিলাম। বটুয়ায় চার-পাঁচ টাকা তো অবশ্যই ছিল। তবে তার চেয়েও বেশি মোহ ছিল আমার বটুয়াটির প্রতি। ১৯৪৯ সালে শান্তিনিকেতনে এটা কিনেছিলাম। এটা আমার ওখানে থাকার স্মৃতি ছিল। পুরনো প্রাচীন পন্থীদের কথায় তা ছিল খুব শুভ। কখনো এমন হন নি যে তাতে টাকা ছিল না। আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে কতটা দক্ষতার সঙ্গে সে জ্যাকেটের ওপরের পকেট থেকে তা তুলে নিয়ে গেছে। তবে এখানে পকেটমারাও সাধারণ কোনো ব্যাপার ছিল না। পকেটমাররা কয়েকজন মিলে কাজ করে। যে লোকটি ভিড়ের ছুতো করে পথ আটকেছিল সেও এই দলেরই ছিল। অন্যজন বগল থেকে ব্যাগ বের করার জন্য তাক করছিল। এগারো-বারো বছর আগে ব্যাঙ্গালোরে এই রকমই হয়েছিল। অনেকজন মিলে পরিকল্পনা করেছিল। একজন আমার স্যাফার ফাউন্টেন পেন তুলে নিল। সে অন্য কারু হাতে দিয়ে দিল, তাদের একজন সঙ্গী দৌড়ে পালাতে শুরু করল। আমার সারলাই বলতে হবে যে আমি তাঁর পিছনে দৌড়লাম আর সামনে গিয়ে তাকে ধরেও ফেললাম। সে দিব্যি খেতে লাগল, আর কৈফিয়ত দিতে লাগল, 'আমি কলম চুরি করি নি। আমি তো নিজের কাজে দৌড়চ্ছিলাম।' সত্যিই সে যদি কলম নিত তাহলে ধরা পড়ার জন্য এভাবে কেন দৌড়াত? দিল্লীর পকেটমাররা তাদের চেয়েও বেশি হুঁশিয়ার ছিল। যাক্ গে, জীবনে দু-তিনবার এমন অভিজ্ঞতা খারাপ নয়, যদিও তা থেকে কোনো লাভ হয় কি না তাতে সন্দেহ আছে।

সেদিন তিনটের সময় শ্রীরামলাল পুরী আমাকে উপলক্ষ করে সাহিত্যিকদের একটি চা-পার্টি দিলেন। সেখানে ড· নগেন্দ্র, শ্রীবাঁকেবিহারী ভাটনাগর, মাচবেজী ইত্যাদি প্রায় ত্রিশজন সাহিত্যিক বন্ধু এলেন।

সেই রাতেই (১৪ ফেব্রুয়ারি) আমাদের দেরাদুনের ট্রেন ধরার ছিল। সন্ধেতে ভাইয়া-ভাবীজী, শিবকুমারজী, শ্রীনাথ ইত্যাদিরা স্টেশনে পৌঁছতে এলো। ট্রেন দশটার সময় ছাড়ল। পরের দিন আটটা নাগাদ দেরাদুন পৌঁছে গেল।

মুসৌরীর আকর্ষণ শেষ

১৫ ফেব্রুয়ারি আমরা দেরাদুনে থেকে গেলাম। শুক্লজীর স্ত্রী নতুন নাড়ুগোপালটিকে দেখে খুব খুশি হলেন। আমার এখন কমলার পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা ছিল। সে এ বছর খুব কম পড়তে পেরেছে, মাত্র এক মাস সময় পেয়েছিল। যেটুকু সময় ছিল তা পড়াশুনোতে লাগাতে হতো।

পরের দিন (১৬ ফেব্রুয়ারি) আমরা ট্যাক্সি করলাম আর আমাদের ফটকের একশো গজ

অব্দি তা নিয়ে গেলাম। কুড়ি টাকা ভাড়া এবং পাঁচ টাকা পৌরসভার আজ্ঞাপত্রের জন্য দিতে হলো। সাড়ে নটায় আমরা আমাদের বাড়িতে ছিলাম। ঠাণ্ডা জায়গাগুলোতে এখনও বরফ ছিল। এই বছর ভাল বরফ পড়েছিল কিন্তু আমাদের তা দেখার সৌভাগ্য হলো না। প্রথমে বুকের ব্যথায় দৌড়াদৌড়ি করলাম। তারপর এখন মাসখানেকের জন্য দিল্লী চলে গেলাম। এখন সওয়াই হোটেল বিশ্ব ফোটোগ্রাফি (ভূচিত্র-নির্মাণ) সম্মেলন হচ্ছিল। তাতে ভারতীয় প্রতিনিধিরা চীন গণরাজ্যকে সদস্য বানানোর প্রস্তাব করল কিন্তু আমেরিকা আর তার চামচারা তা কেন পছন্দ করবে? সব জায়গাতে তাদেরই সংখ্যা বেশি। তুর্কীদের কোনো প্রতিনিধি না থাকা সত্ত্বেও তাকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। ভারতীয় প্রতিনিধিরা তাদের প্রস্তাবের ব্যাপারে সফল হয় তো হলো না কিন্তু তারা খুব কড়া করে শুনিয়ে দিল। আমেরিকা সময়ে সময়ে নিজেকে নগ্ন করে দেখিয়ে দেয়। পৃথিবীর জনমতকে তারা পরোয়া করে না। তারা তাদের ডলার আর আততায়িতা নিয়ে মেতে উঠেছে। একদিন এই নেশা অবশ্যই ছুটে যাবে।

১৮ ফেব্রুয়ারি বিন্ধ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেব পুরস্কারের জন্য আসা বইগুলি দেখে আমার মতামত দিলাম। যদিও আগে জানানো হয়েছিল যে, যদি অন্য কোনো বইও চোখে পড়ে তো তার জন্য আমি যেন ওদের লিখি। তখনো পর্যন্ত 'ময়লা আঁচল' আমি দেখি নি তা নইলে নিঃসন্দেহে আমি তাকে প্রথম স্থান দিতাম।

কমলাকে এখন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পুরো সময়টা দিতে হবে। আমি বললাম অন্তত দেরাদুন যাওয়া অব্দি দু-সপ্তাহের জন্য কাজের লোক রাখা হোক কিন্তু তার সেটা ইচ্ছে ছিল না—খরচ বাড়বে। হ্যাঁ, খরচ তো দশ-পনের টাকা বাড়বেই কিন্তু সে বাচ্চার কাপড় ধোবে, তাকে খাওয়াবে। আমার কোনো কথা শুনল না।

ফেব্রুয়ারির শেষে জয়া দেড় বছরের হতে যাচ্ছিল। এখন সে ক, চ, ত, প, ব অক্ষরগুলো বলতে পারত। ট বর্গ আর মহাপ্রাণ[১] অক্ষরগুলি বলতে পারত না। এগুলি বাচ্চারা অনেক দিন পর শেখে। আমি আমার উপন্যাস 'সপ্তসিন্ধু'-র জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম। পড়ার পর বহু জায়গা থেকে অন্ধকার দূর হতে লাগল। ভারতে আসার তিন শতাব্দি পরে সপ্তসিন্ধুর আর্যদের অনেক ঘটনাই ঋগ্বেদের ছড়ানো সামগ্রী পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। উপন্যাস এক্ষুণি লেখার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু লেখাটা লিখে ফেলতে চাইছিলাম।

দেরাদুন—পরীক্ষা দেওয়ার এক সপ্তাহ আগেই জয়া-জেতাকে নিয়ে কমলা আর আমি ৯ মার্চ দেরাদুন গেলাম। আগে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু হোলির উপদ্রবের ভয় ছিল বলে মুসৌরীতেই সে ল্যাঠা চুকিয়ে এলাম। এখন তিনি আমার কাজ ছিল জয়াকে দেখাশোনা করা আর কমলার কাজ ছিল পাঠ্যপুস্তক পড়া। মাঝে মাঝে প্রফেসর বৃহস্পতি শাস্ত্রী, পণ্ডিত হরনারায়ণ মিশ্রর সঙ্গে আড্ডা হতো। ১৬ তারিখে পণ্ডিত কিশোরী দাস বাজপেয়ীও এলেন। এখন তিনি হিন্দি ব্যাকরণ লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন যা নাগরী প্রচারিণী সভার পক্ষ থেকে লেখা হচ্ছিল। অনেক অংশ বাজপেয়ীজী লিখেও ফেলেছিলেন, তার টাইপ কপিগুলি বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো

[১] অধিক প্রাণ বা বায়ুর সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণ, অর্থাৎ প্রতি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ।— স·ম·

হয়েছিল। আমিও দেখে পরামর্শ দিচ্ছিলাম।

১৮ মার্চ নাগাদ গরম কাল বলে মনে হতে লাগল। সবচেয়ে বিরক্তিকর ছিল মাছি। গরম বাড়তেই তারা হঠাৎ এসে পড়ত। মাছি আর মশাদের সর্বনাশ হবে তখনই যখন সারা শহরে নোংরা থাকবে না। কিন্তু তা এই আমলাদের রাজ্যে হবার নয়।

ঠিক দেড় বছরের হওয়ার পর জয়া অনেক জিনিসের নাম দিয়েছিল, যেমন গায়-বা খানা-জবা, বকরী-মা, বিল্লি-মা, মোটর-পোপো। অক্ষরের মধ্যে কা, চা, জা, তা, না, পা, বা, মা বলতে পারত। তার ঘোরার খুব শখ ছিল। ঝট করে আমার আঙুল ধরে রাস্তায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যেত।

মুসৌরী—২১ মার্চ কমলার পরীক্ষা (এম এ প্রিভিয়স) শেষ হলো। পরের দিন আমরা ফিরে এলাম। এই সময় মহাদেব ভাইও কলকাতা থেকে চলে এসে ছিলেন। তিনি গঙ্গার পড়াশুনোর ব্যাপারেও সাহায্য করলেন।

দিল্লী—২৩ মার্চ আবার দিল্লীর উদ্দেশে রওনা হতে হলো। সেখানে পরের দিন সকালে পৌঁছলাম। সেনা-বিভাগের বিদেশী ভাষা স্কুলে তিব্বতীর পরীক্ষা নেওয়ার ছিল। খবর থেকে খানিকটা এইরকম মনে হলো যে, হয়তো কালিম্পঙ থেকে ড· জর্জ রোইরিকও আসবেন। এই লোভেই ওখানে গিয়েছিলাম। ২৫ মার্চ ধৌলপুর হাউসে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসে গেলাম। ড· জর্জ রোইরিক নয়, তাঁর অনুজ স্বেতস্লাব রোইরিক এলেন। তিনি, শিবায়েফ, আমি আর বিদেশী ভাষা স্কুলের পরিচালক মুখার্জি সাহেব ওখানে ছিলাম। সেনা-বিভাগের বিদেশী ভাষা স্কুলের জন্য রুশ ভাষার অধ্যাপনার পদে প্রার্থী দেখার ছিল। তাতিয়ানা বোসই সব চেয়ে যোগ্য প্রমাণিত হলেন। তাঁর মাতৃভাষাই শুধু রুশ নয় উপরন্তু তিনি রুশ ভাষার কবি এবং লেখিকাও ছিলেন। অন্য তরুণীটি কথাবার্তায় খুব ভাল ছিল। কিন্তু তার ভাষার জ্ঞান ততটা গভীর ছিল না। সকলে তাতিয়ানাকেই মনোনীত করল।

২৬ মার্চ আমি আবার মুসৌরী ফিরে এলাম। মহাদেবজী সেইদিনই গেলেন। আনন্দজী তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে কাল এসেছিলেন। ঘটনাচক্রে আমি আজই এসে পড়েছি কারণ পরের দিন তাঁর ফেরার কথা ছিল। শুনে খুব ভাল লাগল যে 'জাতক'-এর হিন্দি অনুবাদও শেষ হয়ে গেছে এবং শেষ খণ্ড ছাপা হচ্ছে। এখন তাঁর বয়স ৫০ বছর হয়ে গেছে। আমি সর্বপ্রথম ১৯২৬ সালে মীরাটে তাঁকে দেখেছিলাম। সেই থেকে এখন ২৯ বছর হলো। বার্ধক্যের প্রভাব দেখা যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করছিলেন, 'অন্য কোন কাজে হাত দেব?' আমি দু-একটা পরামর্শ দিলাম। সেইদিনই মাঞ্চু ভিক্ষু টশী ঞিং পো (মঙ্গল হৃদয়)-এর সঙ্গেও দেখা হলো। তাঁর সঙ্গে মুসৌরী আর সিমলায় দেখা হয়েছিল। তিনি প্রকৃত মাঞ্চু ছিলেন। এখন শুদ্ধ মাঞ্চু খুব কমই আছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ ভাষায় ও পোশাকে চীনা হয়ে গেছে। এমনিতে জাতিগত ও ভাষাগত দিক দিকে মাঞ্চু হচ্ছে মঙ্গোলদের খুব কাছের এবং তাদেরই মতো অনেকে তিব্বতে এসে পড়াশুনো করে। মঙ্গল হৃদয় আমাদের কাছে আসতে চাইছিলেন। রান্নাঘরের ওপরের ঘরটিই শুধু খালি ছিল। আমি বললাম যে সে ঘরটা রয়েছে। বেশ কিছুদিন সেখানে থাকলেন। তারপর তিনি

'আর্টন'-এ উপযুক্ত জায়গা পেয়ে এখান থেকে চলে গেলেন। তিনি সংস্কৃত পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। আমি বললাম যে ভাল কথা। যদিও জানি, একটা বয়সের পর অন্তত ভাষা শেখাটা মানুষের পক্ষে বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে। তাতে মন বসে না আঁর পরিশ্রমও করা যায় না।

আনন্দজী যেদিন তাঁর জন্মস্থান থেকে চলে এসেছিলেন তারপর থেকে আর সেখানে যান নি। তাঁর গ্রাম ছিল আম্বালা জেলার খরড তহসিলে। তাঁর বাবা আম্বালার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আনন্দজীর (আগের নাম হরিদাস) অধিকাংশ সময় সেখানেই কেটেছে। সেখানেই ম্যাট্রিক পাস করলেন এবং কলেজে না গিয়ে অসহযোগে যোগ দিলেন। তারপর কিছুদিন পর লাহোরের কৌমী বিদ্যালয়ে নিজের পড়াশুনো সম্পূর্ণ করলেন। তিনি প্রথমে পণ্ডিত বলদেব চৌবে ও পরে স্বামী সত্যান্দের সহপাঠী ছিলেন। মীরাটে সহপাঠীর বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। সে-সময় কে জানত যে আমাদের এত ঘনিষ্ঠতা হবে। এখন তিনি নিজের জন্মভূমি দেখতে চাইছিলেন। আমি সমর্থন করলাম। তাঁর একটিই ছোট ভাই ছিল যে পাটিয়ালার কোথাও পাটোয়ারগিরি করত। কিছু রোজগার করল, তা দিয়ে সাবান বানানোর ব্যবসা শুরু করল, পুঁজি ফুরিয়ে গেল। এখন আবার যে পাটোয়ার সেই পাটোয়ার।

মঙ্গল হৃদয়ের কাছ থেকে আমি আমার সরহপার দোঁহাকোষের হিন্দিতে অনুবাদ করার কাজে সাহায্য নিতে চাইছিলাম। কিন্তু তিব্বতী অনুবাদেও সিদ্ধদের ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মঙ্গল হৃদয় তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলে বেশি সাহায্য করতে পারলেন না।

৫ এপ্রিল বিকেলে চণ্ডীগড়ের সরকারি কলেজের তিনজন প্রফেসর এলেন। ওখানকার কথা বলছিলেন। জানতে পারলাম, চণ্ডীগড় স্টেশন হিন্দি ভাষা-এলাকার মধ্যে আছে। একটি ছোটমতো শুকনো নালা আছে, সেটিই হচ্ছে পাঞ্জাবী আর হিন্দি ভাষার সীমা। আমাদের প্রভুদের ভাষার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? তাদের মত খাটলে বাঙলার রাজধানী আসামে বানানো যেতে পারে। ইতিহাস আর সংস্কৃতের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল রোপড়ে সদ্য যে খনন কার্য হয়েছে তাতে ধূসর রঙের বাসন পাওয়া গেছে। সেগুলিকে বৈদিকযুগের বলা যায়। কিন্তু এই ধরনের বাসন তো হস্তিনাপুরেও বেরিয়েছে যা ঋগ্বেদের সময়কার কখনোই নয়। আমি আগ্রহী ছিলাম ঋগ্বেদ-এর সময়কার বাসন এবং অন্যান্য জিনিস দেখবার জন্য। যে সমস্ত জিনিস সেই সময় থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত চলে এসেছিল তা থেকে সপ্তসিন্ধুর আর্যদের ওপর সম্পূর্ণ আলোকপাত করা সম্ভব ছিল না।

কমলা আমার জন্মদিন স্মরণ করিয়ে দেবে স্থির করেছিল। ৯ এপ্রিল ১৯৫৫ আমার ৬৩-তম জন্মদিন ছিল। সেদিন কর্নেল হরিচন্দ, ল্যাডলি দম্পতি, মেহতাজী এলেন। শীলাজী এবং ড· সত্যকতু গুরুকুল কাঙ্গড়ী চলে গিয়েছিলেন বলে এবার আসেন নি। চার-পাঁচ দিনের জন্য সাথী খাডিলকরও এসেছিলেন। আজ চায়ের পর তিনি চলে গেলেন। চা-পান হলো। ড· হরিচন্দ পেনসনপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন। তিনিই মিস পুসঙ্গের কাছ থেকে 'কিলডের' কিনেছেন। বাড়ি সম্বন্ধে আর কী অভিযোগ থাকতে পারে? কিন্তু এখনকার নির্জন জীবন তাঁর ভাল লাগছিল না। সিজিনের আগেই এসেছিলেন তাই আরও বেশি নির্জন ছিল। বললেন, 'কোনো খদ্দের থাকলে খুঁজুন।' সে সময় মনে হচ্ছিল ২২ হাজারের জিনিস একটু লোকসান করেও বিক্রি করে দেবেন। কিন্তু যখন বছর খানেক কেটে গেল তখন লোকসান করে বিক্রির

ভাবনা ত্যাগ করলেন। একলা মানুষ, ইংরেজ স্ত্রী মারা গেলেন। এক ছেলে আছে যে ভারতীয় ফৌজে সেনাবাহিনীতে তোপখানার মেজর। একটি মেয়ে ইংরেজকে বিয়ে করে বিলেতে থাকে। এত বড় বাংলোতে একা কি করে মন টিকবে? ৭০-এর ওপর বয়স কিন্তু এখনও সুস্থ। ঘুরে-ফিরে বেড়ান। এমন প্রতিবেশী থাকলে আমাদের তো খুব লাভ। কখনো তিনি নিজেই ঘুরতে ঘুরতে খোঁজ নিতে চলে আসেন। কোনো দরকারে আমরাও তাঁর কাছে চলে যাই।

১৩ এপ্রিল নেপাল থেকে শ্রীকলানাথ অধিকারী অন্য একজন গায়ক যোশীর সঙ্গে এলেন। কলানাথ ভাল চাকরিতে লাথি মেরে স্বাধীন নেপালে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রায় জনা বারো লোকের পরিবার কি রকম আর্থিক অসুবিধেয় পড়েছিল তা দেখেও দুঃখ হতো। অধিকারীজী লোকগীতের ভাল গায়ক। সঙ্গীতে তাঁর পুরো পরিবারের অনুরাগ আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ লোকগীতের চেয়ে নিজেদের বানানো লোকগীত গাইতে তিনি বেশি ভালবাসেন, বিশুদ্ধ লোকসুরের জায়গায় নিজের সুরও ঢোকাতে চান। এটাকে তিনি দোষ বলে মনে করেন না। বস্তুত এই দোষটি যদি না থাকত তাহলে তাঁর গলা খুব মিষ্টি। তিনি খুব সুন্দর গাইতে পারেন। বয়সে তরুণ, ঘোরা-ফেরায় অলস নন, যদি দু-চার হাজার নেপালী লোকগীত সংগ্রহ করে ফেলতেন তাহলে একটি অমর কীর্তি হতো। কিন্তু তার গুরুত্ব নিজে বুঝলে তবে না? তিনি বলছিলেন, নেপালের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়ে পড়ছে। এখানে কিছুদিন থেকে মুসৌরী দেখে দুই তরুণ চলে গেলেন।

এখানে থাকাকালীন ভারতীয় ভাষাগুলিতে আমার বইয়ের অনেক অনুবাদ হয়েছে। মাদ্রাসীজী চার-পাঁচটি বই, বেশির ভাগ উপন্যাস আর গল্প, গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করেছেন। কেরল ছোট প্রদেশ কিন্তু সেখানে সবচেয়ে বেশি সাক্ষর আছে বলে বইও বেশি বেরোয়। অনেক শিক্ষিত লোক তো সেখানে অনুবাদ করার প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছেন। 'ভোল্গা সে গঙ্গা'-র অনুবাদ করার দিকে আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক। এখন তো ভারতে এমন কোনো সাহিত্য-ভাষা নেই যাতে তা অনূদিত হয় নি। অসমীয়া আর কন্নড়ে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি কিন্তু অনেক পত্রিকায় গল্পগুলি বেরিয়েছে। মালয়ালম ভাষীরা 'বিশ্ব কি রূপরেখা' বইটি সমস্ত ছবিসহ ছাপার সাহস দেখিয়েছে। এর থেকে আমি বুঝেছি যে, তাদের ভাষার বইয়ের খুব কাটতি এদিকে আছে। দুই বিদ্বান 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' অনুবাদ করে ছাপা শুরু করে দিয়েছেন। আমার এতে দোষ ছিল না। আমি বলেছিলাম তিন মাসের মধ্যে তার কয়েকটি ফর্মা ছাপিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। যখন একজন তা করল না এবং অন্যজন অনুমতি চাইল তখন তাকে আমি অনুমতি দিয়ে দিলাম। এই ঘটনার এক থেকে সওয়া এক বছর পরে অনেকগুলি ফর্মা ছেপে অভিযোগ করছেন যে, কেন এমন হলো?

২৮ এপ্রিলও থেকে থেকে ফুসফুসে সূঁচের মতো ব্যথা হচ্ছিল। পরের দিন কর্নেল চাঁদ আমাকে দেখলেন। তিনি বললেন, 'এটা ভেতরের ব্যথা নয়। ওপরের মাসল্‌সের ব্যথা, মালিশ করলে ঠিক হয়ে যাবে।'

১ মে হরিদ্বার থেকে সর্দার যশবন্ত সিং এলেন। তিনি শরণার্থী-সাহিত্যিক। একটি ছোটমতো প্রেস চালান। সমার্থক শব্দকোষ তৈরির দিকে তাঁর ভাবনা গেল। প্রথমে বোধহয় পাঞ্জাবীতে করতে চাইছিলেন, তারপর মনে হলো হিন্দিতে এর জন্য বেশি জায়গা রয়েছে। এই রকম কোষ

বানানোর জন্য শুধু হিন্দি আর ইংরেজির জ্ঞানই যথেষ্ট নয় উপরন্তু সংস্কৃত ভাষাতেও কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। এর অভাব অবশ্যই তাঁর আছে কিন্তু সর্দার তাঁর একাগ্রতা এবং সংগ্রহের পরিশ্রম দিয়ে তা পূরণ করে নেন। আসলে ঋষিজীর মধ্যেও রুশ-হিন্দি শব্দকোষ বানানোর ব্যাপারে এই অভাবটি ছিল। কিন্তু আমি মনে করি তাঁর শব্দকোষটি ভাল হবে। তিনি নিজের অক্ষমতা অন্যদের সাহায্য নিয়ে পূরণ করে ফেলছেন। সর্দারের এই কাজটিতেও আমার আগ্রহ ছিল। যে কোনো সময় তিনি আমার সাহায্য চাইলে আমি তা দিতে প্রস্তুত থাকতাম।

হর্নক্লিফ বিক্রি করা আমি স্থির করে নিয়েছিলাম। মে মাসে 'স্টেটসম্যান'-এ একটি বিজ্ঞাপনও দিয়ে দিয়েছিলাম। ৮-১০ জন ক্রেতার চিঠি এল কিন্তু বাড়ি বিক্রি করার সুযোগ এল না। অর্ধেক দামেও বেচে ফেলতে রাজি ছিলাম, দেখি কে এগিয়ে আসে? সে-সময় আমার ইচ্ছে ছিল যে মুসৌরীতে আট মাস ভাড়া বাড়িতে থাকব আর চারমাসের জন্য দেরাদুন চলে যাব। পরে কমলা পরামর্শ দিল যে তার চেয়ে ভাল হবে কালিম্পঙে চলে যাওয়া। ওখানে ৪০০০ ফুট উচ্চতা হওয়ায় শীত-গ্রীষ্মে আলাদা জায়গা খোঁজার দরকার হবে না। কমলার বাপের বাড়ির প্রতি প্রেমই শুধু এর কারণ নয় উপরন্তু ওখানে সে কাজও করতে পারে। তাছাড়া বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তাকেই তো বাচ্চাদের সামলাতে হবে।

৯ মে ড· সত্যনারায়ণের জিনিসপত্র ওপরে হর্নহিলে যাচ্ছে দেখলাম। তিনিও জানতেন না যে আমি পাশের বাংলোয় থাকি আর আমিও জানতাম না যে তিনি ওপরের বাংলোয় তাঁর স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে আসছেন। তাঁর বিয়ের কথাও আমার জানা ছিল না। ড৽ সত্যনারায়ণের সঙ্গে আমার পরিচয় বহু পুরনো, এমন কি সামান্য অতিশয়োক্তি করে বলা যায় যে, সেই সময় থেকে যখন তাঁর দুধ দাঁত ভাঙে নি। তাঁর অগ্রজ বাবু রামবিনোদ সিংহ তো অসহযোগের সময়ে ছাপরায় আমার সহযোগী ছিলেন। সর্বপ্রথম আমি তাঁকে তখনই দেখেছিলাম যখন মিহি সুতো কাটার কোনো প্রতিযোগিতায় তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। সে-সময় কে জানত যে সেই বালক দুর্দান্ত ভবঘুরে হবে, একের পর একটি ভাষা ফড়ফড় করে শিখে ফেলবে। আমিও ভাষা শিখেছি কিন্তু আমি নিজেকে ভাষা শেখার ব্যাপারে খুব বুদ্ধিমান মনে করি না। আমি ভাষার জন্য ভাষা শিখি নি, শিখেছি তা দিয়ে কাজ উদ্ধার করার জন্য, তাই তা কাজ চালানোর মতোই থেকে যায়। সত্যনারায়ণজী ইউরোপের অনেকগুলি ভাষা, যার মধ্যে রুশও আছে, ফড়ফড় করে বলেন। যখন মুক্ত হয়ে বিচরণ করার সুযোগ তিনি পান তখন তাঁর আসল রূপ দেখা যায়। 'ভবঘুরে' এটা কী করলেন? এই পত্নী আর পরিবার কেমন করে হলো? এখন মানছি হয়তো ঠিক সময়েই তাঁর অনেক চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। যদিও এর অর্থ এই নয় যে, তিনি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। এদিকে তিনি পার্লিয়ামেন্টে কমিউনিস্টদের ওপর জোর আক্রমণ করেছেন। আমি সেকথা স্মরণ করাতেও চাইতাম না কিন্তু তিনি স্বয়ং বুঝতেন এবং কিছু ব্যাখ্যাও করতে চাইতেন। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? কোনো ব্যাপারে আমাদের মতভেদ প্রবল হতে পারে কিন্তু সে-কারণে আমরা আমাদের পুরনো সম্পর্ক থোড়াই ছেদ করতে পারি? যখন তিনি সোভিয়েত যাওয়ার ভিসা সেই বছরই পেয়ে গেলেন তখন খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, আমাকে সোভিয়েত সরকার ভিসা দিয়ে দিয়েছে। আমি সেখানে যে কোনো জায়গায় ঘুরতে পারি এবং সে-সম্বন্ধে লিখতে পারি।' তিনি গেলেন। হালে তাঁর অনেকগুলি লেখা কাগজে বেরিয়েছে। সেগুলি ভাল।

মুসৌরীতে কাজের লোকের সমস্যা সবসময়। কয়েকজনকে তো ভাল ছিল না বলে ছাড়াতে হয়েছিল। দুজন চুরি করল। কয়েকটা ভাল লোক পেলাম কিন্তু তারা আমাদের দোষে থাকতে পারল না। ১০ মে আমরা মহেশকে কাজে রাখলাম। সে হয়তো শেষ পর্যন্ত মুসৌরীতে আমাদের সঙ্গে থাকবে। কিছু দোষ আছে, কাপ-গেলাস খুব ভাঙে, কাজ করতে করতে ঝিমুতে থাকে। রান্নাও ততটা ভাল নয়। কিন্তু এখন আমরা জেনে গেছি যে, পুরোপুরি ভদ্র চাকর পাওয়া যাবে না তাই নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার।

জেতা চোখ খোলার পরও দুমাস অব্দি কোনো জিনিস দেখতে পেত না, তারপর দেখতে শুরু করল। চার মাসে পৌঁছে সে তার আশপাশের জিনিসগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখত। জয়ার চেয়ে ১৯ দিনের বড় ছিল সত্যনারায়ণজীর মেয়ে মঞ্জু। তারা দুজনে প্রায়ই নিজেরা মেলামেশা করত। স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্ণৌতে জন্ম হওয়া বাঙালী তরুণী। বার্লিনে ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করছিলেন, সেখানেই 'ভবঘুরে'র সঙ্গে তার দেখা হলো এবং দুজনে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। সত্যনারায়ণজী সবসময় আসা-যাওয়া করতেন। তাঁর স্ত্রী শুধু একবার এসেছিলেন। মঞ্জু রোজ আসত। কয়েকটি ব্যাপারে জয়া তার চেয়ে এগিয়ে ছিল আর কয়েকটি ব্যাপারে মঞ্জু এগিয়ে ছিল। মঞ্জুর মাথায় লম্বা লম্বা চুল ছিল, যা তার মা দু-ভাগ করে রেখেছিল। জয়ার চুল ছিল ছোট ছোট। জেতার জন্মের সময় চুলের নামগন্ধ ছিল না। ১৪ মাস পর এখনও তা খুব সামান্য চোখে পড়ে।

মে মাসে ভ্রমণার্থীদের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনেক বন্ধু ও পরিচিতজন আসতে শুরু করেছিলেন। ১৫ মে ড· ভগবতশরণ উপাধ্যায় তাঁর ছোট ছেলের পুত্রের সঙ্গে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হতে লাগল। তাঁর ছেলেকে যে বয়সের দেখছিলাম কোনো এক সময়ে বাবাকেও সেই বয়সে দেখেছিলাম। ভগবতশরণের ইতিহাস-অধ্যয়ন বেশ গভীর। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, তিনি যে, কোনো বিষয় লেখার সময়, শব্দের মূল্য বুঝে তা ব্যবহার করেন। তার রচনাশৈলী অত্যন্ত সুন্দর। সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতো তাতে রুক্ষতাও থাকে না। আসলে তিনি কথা সাহিত্যিক এবং সার্থক প্রবন্ধকারও তো বটেন।

এখন রোববার দিনটা অতিথিতে ঘর ভরে যায়। বিকেলের চায়ে দশ-বারজন বন্ধু তো অবশ্যই আসত। বেশ জমজমাট হয়ে যেত।

প্রথম যাত্রায়(১৯২৩-৩৭)[১]আমি যখন সিংহলে ছিলাম তখন সেখানকার ছাত্রদের পড়ানোর জন্য আমি পাঁচটি সংস্কৃত বই লিখেছিলাম যার মধ্যে চারটে ছিল ভাষা আর পঞ্চমটি ছন্দ-অলংকার শেখানোর জন্য। সেগুলো ওখানে সিংহলী ভাষায় ও অক্ষরে ছেপেছিল। মনে হলো সেগুলি হিন্দিতে নতুন করে লিখে প্রকাশ করা গেলে ভাল হয়। এখন যখনই কেউ আমার কাছে সংস্কৃত পড়ার চেষ্টা করত তখন একথা আরও বেশি মনে হতো। মঙ্গল হৃদয়জীকে পড়ানোর সময় এই কথা মনে হলো। আমি স্থির করলাম যে সেগুলি সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে 'সংস্কৃত পাঠমালা' হিসেবে তৈরি করব।

২৯ মে আমি নিজে সেগুলি টাইপরাইটারে লিখতে শুরু করলাম। পাঁচটি বই বেশ কয়েক

---

[১] মূল গ্রন্থে ভুলবশত প্রথম যাত্রার সময় ১৭২৩-৩৭ উল্লিখিত আছে।—স·ম·

সপ্তাহ পরে তৈরি হলো। এতে পাঠগুলি সরলরীতিতে উপস্থাপিত করার চেষ্টা ছিল। ভাষার জটিলতাগুলি যাতে ধীরে ধীরে আসে সেদিকে নজর রাখা হয়েছিল। সেই সঙ্গে পাঠ হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যের বহু গ্রন্থ থেকে উদাহরণও দেওয়া হয়েছিল। এই কাজ করতে গিয়ে মনে হলো, 'সংস্কৃত কাব্যধারা'য় কেউ হাত দেয় নি, আমিই তা লিখে ফেলি না কেন? তারপর তাতেও হাত দিয়ে তা শেষ করলাম। ১৯৫৫ সালের শুরুতেও আমি ভাবি নি যে আমি সংস্কৃত সম্বন্ধে এই বইগুলি লিখব।

২৮ মে আমার কাকা বংশী পাণ্ডের ছেলে চন্দর এল। এক-দেড় বছর বয়সে আমি কতবার তাকে খাইয়েছি। এখন তার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমার দাদু জানকী পাণ্ডে বাড়ির কর্তা ছিলেন। তিনি তাঁর তিন খুড়তুতো ভাইকে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর, এমন কি আমারও জন্মের পরই তারা আলাদা হয়েছিল। বংশী কাকা সেই তিন ঘরের একটির কর্তা ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই কিন্না (কৃষ্ণ) আমার ন্যাংটো বয়সের বন্ধু। চন্দরের কাছ থেকে জানতে পারলাম, কিন্না কে জানে কোথায় চলে গেছে। বংশী কাকা মারা গেছেন। চন্দর বাড়ির অবস্থার কথা বলছিল। কনৌলাতে আবাদ করা জমির চেয়েও অনাবাদী জমি বেশি ছিল। সেগুলিতে আবাদ করে গ্রামের ব্রাহ্মণদের অবস্থা এখন ভাল হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল এইভাবে অন্তত দু-তিন প্রজন্ম ধরে নিশ্চিন্তে কেটে যাবে। কিন্তু কাল তাদের এই উদ্দেশ্য দেখে যে হাসছিল তা তারা কেমন করে জানত? কনৈলাতে বড় জাতের চেয়ে ছোট জাতের লোকসংখ্যা কিছু বেশি। আগেকার যুগে ছোট জাতের মধ্যে ছুৎ-অচ্ছুতের ভেদাভেদ খুব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। ছোট জাতের লোকেরা দেখল দারিদ্র্য ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে আমরা সবাই সমান। গ্রামের মালিক ব্রাহ্মণরা, জমি তাদের হাতে। আমরা তাদের হাল চালিয়ে, গবাদি চরিয়ে এতদিন বেঁচে থেকেছি। এখন সময় আমাদের পক্ষে। তাদের মধ্যে অনেকেই কম-বেশি জমিও পেয়ে গেল, তারা ভূমির মালিক হয়ে গেল, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এখনও ভূমিহীন মজুর। ছোট জাতের মধ্যে আহীর, ভর, চামার, দর্জি, চুড়ীহার, মেডিহার এবং কাহার আছে। পঞ্চায়েতের ভোটে একজন ভর তরুণকে সরপঞ্চ নির্বাচিত করা হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায়, তাদের মধ্যে কেউ পড়াশোনা করবে এমন সম্ভাবনাও ছিল না কিন্তু এখন অনেকে পড়ছে। চন্দরের নিজের জমি ভূমি-আধিকারীক কোনো একজন ছোটজাতের লোকের নামে লিখে দিয়েছিল। হতে পারে চন্দর তাকে চাষ করানোর জন্য রেখেছিল কিন্তু চাইত না যে জমিতে তার হক থাকুক। মোকদ্দমায় সফল হলো না। সে বলছিল, 'আপনি সুপারিশ করে দিন যে ভূমি-আধিকারীককে ওখান থেকে বদলি করে দেওয়া হোক।' আমি কী করে সুপারিশ করতে পারতাম? সে হাল-চালককে নিজের ভাল জমি থেকে চার-পাঁচ কাঠা দিয়ে রেখেছিল। সে ব্রাহ্মণ। এখন হাল চালাতে চাইছিল না। আর হাল-চালক ছাড়া চাষ-আবাদ করা যেত না। এ বছর নিজের জমিতে আখ লাগাচ্ছিল। সে হল-চালকের জমিটাও সেই সঙ্গে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিল। বোনার জন্য আখও কেটে রাতে জলে ফেলে দিল। সকালে আখ লাগানোর সময় লাঙলধারী আসতে চাইল না। সারা গ্রামে লাঙল চালায় এমন যত জাতি ছিল, সবার হাতেপায়ে ধরল, কাকুতি-মিনতি করল, কিন্তু কেউই নিজের শ্রেণীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হলো না। আজ যদি না খেত বোনা হয় তাহলে তাতে

দেওয়া জল কোনো কাজে লাগবে না এবং বোনার জন্য ভিজানো আখও খারাপ হয়ে যাবে। সারা গ্রামের ব্রাহ্মণরা ভাবল আজ এই ঘটনা চন্দরের সঙ্গে ঘটছে কাল আমাদের সঙ্গেও ঘটবে। নিজেদের তৎকালীন শত্রুতা আর মন কষাকষি ভুলে সবাই চন্দরের জমিতে উপস্থিত হলো। সকলেই হাল চালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু একদিনে হাল চালানো কি সম্ভব? সকলেই ব্যর্থ হলো কিন্তু একজন তরুণ হাল চালাতে সক্ষম হলো। খেত বোনা হলো। চন্দর আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'কী করা উচিত?' আমি বললাম, 'সংসারের চাকা উল্টো দিকে ঘোরানো যায় না। পুরনো দিন ভুলে যাও। সব পুরনো ব্যাপার কী তোমাদের এখানে চলছে?' সে বলল, 'হাল চালানোর নিয়মকে তো আমাদের পুরো গ্রাম ভেঙে দিয়েছে। আগেকার দিন হলে, এই কারণেই সারা গ্রাম বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধ করতে পারত না। কিন্তু এখন সবার বাড়িতে ভূত ঢুকেছে। তাই কেউ কারোকে আঙুল দেখাতে পারে না।

পরে সেই এলাকার এম এল এ বাবু কালিকাপ্রসাদ সিংহও বলছিলেন যে আমাদের পূর্বের জেলাগুলোতে ছোট-বড় জাতিগুলোর জোরদার অঘোষিত যুদ্ধ, বলা যায় ঠাণ্ডা যুদ্ধ, বেধে গেছে, জানি না কবে তা ঘোষিত যুদ্ধে পরিণত হবে। অন্য সময় হলে বড় জাতের লোকেরা ডাণ্ডা দেখাত কিন্তু এখন তো প্রতিদ্বন্দ্বীদের বেশি ডাণ্ডা আর বেশি সাহস আছে। এই যুদ্ধ কোথায় শেষ হবে? শেষ হবে যখন বঞ্চিতরাও তাদের অধিকার পেয়ে যাবে। ভারতে এই ভেদাভেদ থাকতে পারে না। চন্দর এটাও জানাল যে, এখন জাতির অন্য মর্যাদাগুলিও ভেঙে পড়ছে। তার এক কাকা বিধবাবিবাহ করেছে। তার ছেলে ভাল রোজগার করছে। এক দূর সম্পর্কের কাকার কথা বলছিল, সে চামারের মেয়ে ঘরে তুলেছে। এইরকম আরও কিছু ঘটনা এটাই জানিয়ে দিচ্ছিল যে, সবাই একবর্ণ হতে চলেছে। ব্যস, আর মাত্র এক প্রজন্ম দেরি।

'তাহলে কী করা যাবে?' চন্দর শুধোল।

'সারা গ্রামের সুখেই এখন একটি ঘরেরও সুখ হতে পারে। সেদিন আখ লাগানোর সময় তুমি দেখেছ যে সকলের সহযোগিতা না থাকলে কাজটি বরবাদ হয়ে যেত। পুরো গ্রাম যদি সমবায় চাষ করে তাহলেই মাথার ভার নামতে পারে।'

'তাতো মনে হয় সম্ভব নয়। কারো কাছে বেশি জমি আছে কারু কাছে কম। পুরনো যুগ থেকে এই প্রথাই চলে এসেছে যে একটি ঘর থেকে দুটি, দুটি থেকেই চারটি ঘর হয়।'

'আগে একটি জমি দু-ভাগ, দুটো জমি চার ভাগ হতো। এখন সেটা উল্টোভাবে করতে হবে।'

'আমি হয়তো আমাদের চারটে ঘরকে না পারলেও তিনটে ঘরকে একত্রিত করতে পারব।'

আমি বললাম, 'চারটি ঘরকে একত্রিত করে তুমি নিজের মাথাব্যথা কিছুদিনের জন্য কমাতে পার। আরও অসুবিধে হলে, তোমার জমির অংশের সমস্ত ঘর এক হয়ে যাবে। এটাও হতে পারে, গ্রামের তিনটে অংশই এই শর্তে একত্রে চাষ করতে রাজি হয়ে গেল যে, নিজের খেতের ক্ষেত্রফলের ওপরও তাদের বিঘা প্রতি দু-তিন মণ শস্য আলাদা করে দেওয়া হোক। কিন্তু, যদি গ্রামের সব ব্রাহ্মণ এরকম করতে সফল হয় তাহলে তার ফল অব্রাহ্মণদের ওপর কেমন হবে? তারা কি কাজ আর জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে চুপ থাকবে? পেট মানুষকে দিয়ে কী না করায়? এখন যে-যুদ্ধের আগুন ভেতরে ভেতরে জ্বলছে, তখন তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তোমার

একটাই রাস্তা আছে, দেরিতে হোক বা তাড়াতাড়ি হোক, সমস্ত গ্রামের খেত এক করে দাও। ছোট-বড় জাতের সবাইকে তাতে সামিল করো। হ্যাঁ, যার যতটা খেত আছে তার ওপরও কিছুটা শস্য দিয়ে দাও, বাকিটা প্রতিটি পরিবারের মধ্যে কাজ অনুযায়ী ভাগ করে দাও।' আমি জানতাম এটা এখনও অনেক দূরের ব্যাপার। তবে, সময় নিজেই মানুষকে দূরের জায়গায় পৌঁছে দেয়। তখন তা আর অসম্ভব থাকে না।

১ জুন চন্দর চলে গেল। চন্দর সামান্য সংস্কৃত পড়েছে। অনেক বছর আগে বেনারসে দেখা হয়েছিল। আমি তার জন্য একটি পাঠশালায় সুপারিশ করে দিয়েছিলাম। কাজ চালানোর মতো জ্যোতিষ পড়েছে কিন্তু আমাদের গ্রামে ব্রাহ্মণদের যজমানির কোনো কাজ নেই।

আচার্য গোবর্ধনের কথা আঠার আনা সত্যি। দাম্পত্য-জীবনে অকারণে খিটিমিটি লেগে যায়। আমাদের ঘরে কখনো কখনো তা লেগে যেত আর দুদিকেই মেজাজের পারা খুব চড়ে যেত। এই সময় সন্তানের মূল্য বোঝা যায়। সত্যিই, যদি সন্তান না থাকে তাহলে দাম্পত্য-সম্পর্ক শুধু হিমবিন্দুতেই নয় মাঝে মাঝে স্ফুটনাংকেও পৌঁছে বিশাল বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে।

আমাকে কেবল ঘরই দেখতে হতো না। বন্ধু-বান্ধবরা আসতেই থাকত। কয়েকদিনের জন্য গায়ত্রী দেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে এলেন। স্বামী এখন সিংহল ভিক্ষু থেকে গৃহস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। পরের দিন পণ্ডিত জগন্নাথ উপাধ্যায় শ্রীশ্যামনারায়ণ পাণ্ডের সঙ্গে এলেন। উপাধ্যায়জী বেনারস সংস্কৃত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। শ্যামনারায়ণজী কনৈলার কাছে গাজীপুর জেলায় ভুডকুডার ইন্টার কলেজের অধ্যাপক। তিনিও শাস্ত্রী অব্দি সংস্কৃত পড়েছিলেন। দুজনে একমাস এখানে থাকলেন। রান্নাঘরের ওপরের ঘরটিই খালি ছিল। সেখানে তাঁরা খুব আরামে থাকলেন। উপাধ্যায়জী তরুণ। বৌদ্ধদর্শন ছিল তাঁর আচার্য পরীক্ষার বিষয়। এখনো অধ্যয়নে তিনি আগ্রহ রাখেন। এখনই তাঁর সময় ছিল, যদি তিব্বতী ভাষা পড়তেন তাহলে অনেক কাজ করতে পারতেন। শেষে যখন তাঁর ইচ্ছে হলো তখন দু-এক সপ্তাহ তাঁকে এতটাই পড়িয়ে দিলাম যাতে তার সাহায্যে তিনি আরো এগিয়ে যেতে পারেন। আমি মোটেই চাইতাম না যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাউকে ধাক্কা দেওয়া হোক। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই মনে হতো যে কানে ফেলে দেওয়া দরকার, যদি কেউ সামনে এগিয়ে যেতে পারে।

কৌরবী লোকগীতি সংগ্রহ করার জন্য আমি বহু তরুণকে বলেছিলাম, কেউই কিছু করতে পারল না। সত্যা গুপ্তকেও কথায় কথায় বলেছিলাম, আশা করিনি যে সে অন্যরকম কিছু করবে। কিন্তু কয়েক মাস পর এসে সে যখন তার কাজ দেখাল, তখন খুব ভাল লাগল।

১১ জুন ড· সত্যকেতুর বাড়িতে একটি বেশ সুন্দর সাহিত্যসভা হলো। তাতে আমার বাড়ি থেকে আমি, পণ্ডিত জগন্নাথ উপাধ্যায়, শ্রীশ্যামনারায়ণ পাণ্ডে গেলাম। সে-সময়ে মুসৌরীতে উপস্থিত আরো অনেক সাহিত্যিক—শ্রীজগদীশচন্দ্র মাথুর, শ্রীমোহনসিং সেঙ্গর, পণ্ডিত কিশোরীদাস বাজপেয়ী এবং অন্যান্য পুরুষ ও মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীভাগবতশরণজী, বাজপেয়ী, মাথুর সাহেব আর সেঙ্গরজী সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এইরকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করাটা খুবই ভাল। এবার আমার অতিথিদের মধ্যে কলকাতার সাথী ধরণী গোস্বামীও অনেকদিন থাকলেন। তিনি মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের কেসে ধরা পড়েছিলেন এবং ভারতের

প্রথম প্রজন্মের কমিউনিস্টদের মধ্যে একজন ছিলেন। একবার কমিউনিস্ট হয়ে যাওয়ার পর মানুষ কমিউনিস্টই থাকে, যদি না স্বার্থ বা প্রলোভন তাকে ভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়।

১৫ জুন জয়ার বয়স পৌনে দুবছরের চেয়ে তিন-চারদিন কম ছিল। সে দুঃসাহসিক অভিযানের পরিচয় দিয়ে বাবাকে মাৎ করে দিল। বাবার সর্বপ্রথম ১২-১৩ বছর বয়সে পাখনা গজিয়েছিল। গঙ্গা মাসি বাজারে গেল। তারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আটকান হলো। সবাই ভাবছিল রান্নাঘরে গিয়ে মহেশের সঙ্গে হয়তো খেলছে, কিন্তু খানিকক্ষণ পর ধোপানী তাকে ধরে নিয়ে এল। ধোপানিকে শুধোলে সে বলল, 'পাচা' অর্থাৎ বাজার যাচ্ছিল। কোলে চড়ে রাস্তা চিনে নিয়েছিল। এখান থেকে কিলডেরের ফটকের দিকে গেল, তারপর পৌরসভার পথ ধরে একটা মোড়ে ঘুরল, পরের মোড়টাও ছেড়ে টোলের সামনে পৌঁছল, তারপর রতিলালের দোকানের বাইরে বাইরে পথ ধরে ওপরে যাচ্ছিল। লোকে দেখেছে কিন্তু ভেবেছে আগে আগে কেউ যাচ্ছে হয়তো। প্রায় বিড়লা নিবাসের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সময় সামনের দিক থেকে আসা ধোপানীর সঙ্গে দেখা হলো। ধোপানীকে জয়া চিনত। তাকে জিজ্ঞেস করলে বলল, পাচা। সে তাকে তুলে নিয়ে এল। যদি ধোপানীর সঙ্গে দেখা না হতো তাহলে এই দুঃসাহসিক অভিযান কোথায় শেষ হতো কে জানে।

১৮ জুন আলিগড় ইউনিভার্সিটির আরবীর অধ্যাপক, ইউরোপিয়ানদের মতো ফর্সা, আলমামুন সাহেব এলেন। ৬৫ বছরের বৃদ্ধ। জন্মস্থান সিরিয়া। ৩১ বছর বয়স থেকে তিনি ভারতে আছেন, আর এখন ভারতের নাগরিক হয়ে গেছেন। রুশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি, তুর্কী আর আরবী জানেন। আরবী তো তার মাতৃভাষাই। উদার ভাবনা এবং সুফি মতকে তিনি মানেন। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তারপরে তিনি একদিন এলেন।

১৯ জুন শ্রীজয়গোপাল আর শ্রীশিবগোপাল মিশ্র এলেন। জয়গোপালজী হচ্ছেন নিরালাজীর প্রধান শিষ্য এবং কবি। কবি হওয়ার জন্য আবশ্যক যোগ্যতার অভাব তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর অনুজ রসায়ন শাস্ত্রের একজন ভাল ছাত্র। ডি ফিল করেছে, তাঁর প্রতি অনেক আশা আছে। কিন্তু সে-ও তার অগ্রজের মতো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় সাহিত্যে দিচ্ছে, এটি ভাল লক্ষণ নয়।

জুন মাসে নেহেরু তিন মাসের জন্য রাশিয়া ভ্রমণে গেলেন। সেখানে সব জায়গাতে তাঁকে ভদ্রভাবে স্বাগত জানানো হলো, যার খবর আমাদের কাগজগুলি আর মস্কো রেডিও থেকে জানা যাচ্ছিল। এই যাত্রার ফলে আমাদের দেশ দুটি একে অন্যের অনেক কাছাকাছি আসবে ভেবে ভাল লাগল।

২৮ জুনের আগতদের মধ্যে আজমগড়ের উকিল শ্রীপদ্মনাথ সিংহ, এম এল এ-ও ছিলেন। কনৈলা তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রে পড়ে অর্থাৎ তাঁর ভোটারদের মধ্যে আমাদের ঘরের লোকেরাও রয়েছে। তিনিও চন্দরের কথা সমর্থন করছিলেন এবং বলছিলেন যে, আমাদের জেলায় ছোটজাত-বড়জাতের সংঘর্ষ খুব উগ্র।

১ জুলাই শ্রীমুকুন্দীলালজী[১] এলেন। প্রতি সিজিনে তাঁর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি।

[১] মূলগ্রন্থে ভুলবশত কোথাও কোথাও 'মুকুন্দলালজী' ছাপা হয়েছে।—স·ম·

আমি পেশোয়ার কাণ্ডের বীর চন্দ্রসিংহ গাড়োয়ালীর জীবনী লেখা স্থির করেছিলাম। মুকুন্দীলালজী সেই মোকদ্দমায় গাড়োয়ালীজীর তদারকি করেছিলেন। আমি তাঁকে লিখেছিলাম। তিনি মোকদ্দমার ফাইল আমাকে দিয়ে গেলেন, যা থেকে আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম।

প্রথমে তো মনে হলো গঙ্গা ম্যাট্রিকে ফেল করেছে। নেপালীর জায়গায় তড়িঘড়ি করে হিন্দি-মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়েছিল আর তাও নিজের মতো করে পড়ে। ২ জুলাই পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের যে-তালিকা পাওয়া গেল তা থেকে জানা গেল সে পাস করে গেছে। বাড়ির সকলের খুব আনন্দ হলো। তার মুসৌরী আসা সফল হলো। আমরা দুজনেই চাইছিলাম সে দিল্লীর নার্সিং কলেজে ভর্তি হয়ে যাক। ভর্তি হওয়ার সময় পেরিয়ে গিয়েছিল, তবে তবে মাঝখানে কোনো মেয়ে চলে গিয়েছিল বলে এবং বন্ধুদের প্রভাবের ফলে সেই জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু গঙ্গার নার্স নয়, অধ্যাপিকা হওয়ার ইচ্ছে ছিল, তাই আমরা সে-খেয়াল ত্যাগ করলাম এবং শেষে সে ট্রেনিং নেয়ার জন্য কালিম্পং চলে গেল।

সিজিনে ঠাকুরানী গুলাবকুমারী অর্টেনে এসে থাকতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ঝি কান্তি প্রায়ই খেলার জন্য জয়াকে তার সঙ্গে নিয়ে যেত। বাচ্চারা খেলনা ভালবাসে আর তাদের পক্ষে সেটা ভালও। আমাদের এখানে তার তেমন সুবিধে ছিল না। বেচারা যখন খেলনা চায় তখন তাকে ধমক খেতে হয়। কখনো কখনো মা একটু মারধোরও করে যার ফলে সে কান্তির সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। এক বছর দশ মাসেরও সে হয়নি। একদিন কান্তি আসতেই বলল, 'কাল এসো।' এখন সে কালের অর্থও বুঝতে শুরু করেছিল। আসল ইচ্ছে ছিল এই যে আমি এসে তোমার সঙ্গে খেলব।

এই বছরে জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে একবার বৃষ্টি হলো তারপর থেমে গেল। লোকের নানারকমের আশংকা হতে লাগল। এই বৃষ্টির ফলে চারদিকে শ্যামলিমা দেখা যাচ্ছিল।

ড· বদ্রীনাথ প্রসাদের পুত্র প্রকাশচন্দ্রের বিয়ের নেমন্তন্ন এল। লক্ষ্ণৌতে বিয়ে হচ্ছিল। পাত্রী পাঞ্জাবী, তার ওপরে শিখ। তরুণরা পুরনো সীমানাগুলিকে ভাঙবে, দেশে যার দরকার খুব বেশি। ড· প্রসাদের কেবল বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে নিজের জাতের মধ্যে। ছেলে পাঞ্জাবী মেয়েকে বিয়ে করেছে। তার ছোট বোন পাঞ্জাবী ছেলেকে বিয়ে করে ধার শোধবোধ করে দিয়েছে।

কনৈলা ছিল খুব পিছিয়ে থাকা এবং শহর ও রেললাইন থেকে অনেক দূরে অবস্থিত গ্রাম। কিন্তু আজকে এরকম দেখা জায়গা সবসময় এইরকমই থাকবে তা নয়। আমাদের কাশী-কৌশলের জনপদে মানুষের ইতিহাস খুব পুরনো। আমি শুনেছিলাম, আমাদের গ্রামের বড় পুষ্করিণীতে বড় বড় ইট বেরোয়। সে দিন চন্দর জানাল, আজকের মাটির কয়েক হাত নীচে অনেক দূর অব্দি থাকা এই ইট দিয়েই সেই পুষ্করিণীর ঘাট বাঁধানো হয়েছে। এখন লোকেরা গাড়িতে করে খুঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। শ্যামলালকে লিখলে সে জানাল ইটগুলোর দৈর্ঘ্য ১৯·৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮·২ ইঞ্চি, বেধ ২·২ ইঞ্চি। এগুলি যে মৌর্য-শুঙ্গ যুগের ইট তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীপদ্মনাথজীও তাঁর গ্রামের প্রাচীন জায়গাগুলির সন্ধান জানিয়ে ছিলেন। বড় পুষ্করিণীর এই বড় ইটগুলো মাথায় নাড়া দিল এবং আমি মৌর্যযুগের সামন্তের 'বড়ী রানী'-র নামে একটি

গল্প লিখে ফেললাম। এটাও প্রকাশ করলাম যে প্রাচীন যুগে মঙ্গই নদী বাণিজ্যিক পথের কাজ করত। তার তীরে কয়েক মাইল ধরে বিস্তৃত সিসওয়ার ধ্বংসাবশেষ ছিল এক সামন্তের রাজধানী। মঙ্গই-এর দুদিকে রাজধানী আর তার উপনগর বিস্তৃত ছিল। কনৈলা ছিল তারই ভেতরে। এবং সম্ভবত তার 'কর্নহট' ছদ্মনামটি পুরনো। শ্যামনারায়ণজী সিসওয়া থেকে চার ক্রোশ পূর্বে মঙ্গই-এর তীরে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া বহু মুদ্রার ছাপ পাঠাল যা প্রমাণ করে দিল যে মঙ্গই-উপত্যকা মৌর্যযুগে একটি সমৃদ্ধ উপত্যকা ছিল।

১৫ আগস্ট পর্তুগিজদের থাকা গোয়ার মুক্তি আন্দোলন সত্যাগ্রহের রূপ নিল। ঈশ্বরের দূত পর্তুগালের কাছ থেকে আর কী-ই বা আশা করার ছিল? ৩১ জন সত্যাগ্রহীদের পর্তুগিজরা গুলি করল এবং বহুজনকে আহত করল। সত্যাগ্রহের প্রভাব সেখানে পড়তে পারে যেখানে শিষ্টতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং জনমতের সম্মান আছে। পর্তুগালে শালাজারের স্বেচ্ছাচারিতা বহু বছর ধরে চলে আসছে। যে নিজের লোকদের খুন করতে দ্বিধা করে নি, সে ভারতীয়দের কেমন করে ক্ষমা করতে পারে? তার ওপর তার পিছনে আমেরিকা আর ইংলন্ডের স্বেচ্ছাচারী শাসকরা আছে। যদিও আমেরিকান পুঁজিপতিরা অনেক পরে খোলাখুলি বলেছিল, গোয়া পর্তুগালের প্রদেশ কিন্তু তখনও চেহারা কি রকম। কারুর কাছে গোপন ছিল না যে আমেরিকার মতলবটা যে কি তা পর্তুগাল আর স্পেনের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি আমেরিকার কি এত প্রেম? এটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়, আমেরিকাতেই জোরদার পুঁজিপতিদের স্বেচ্ছাচারিতা আছে। এইজন্য কমিউনিজমকে সে ভয় পায় এবং সারা পৃথিবীতে অন্যদেরও ভয় দেখিয়ে বেড়ায়—'কমিউনিজম থেকে সাবধান।' কিন্তু এতে তার বিশ্বাস নেই যে বিপদের সময় লোকগুলো তার কাজে লাগবে। এটা কোরিয়ায় দেখা গেছে, ভিয়েতনামে দেখা গেছে। যেখানকার জনগণকে ফ্র্যাংকো আর সালাজারের মতো স্বেচ্ছাচারী শাসকরা পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছে সেই দেশকে আমেরিকা নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে করে। ভারতের পুঁজিপতিরা তো আমেরিকার জয়গান করেই থাকে। এখানকার প্রভুদের মধ্যেও একটি প্রভাবশালী দল আছে যারা আমেরিকার কাছে নিজের দেশকে বিক্রি করতে প্রস্তুত। তাদের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ উঠে গেছে এবং নেহেরু তাদের সঙ্গে নেই বলে আমাদের পুঁজিপতিরা মনের দুঃখে থেকে যায়। আজ যদি গোয়া পরাধীন থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা পর্তুগালের জন্য নয়, আমেরিকার জন্য। পাকিস্তান আজ প্রতি বছর অনেক জায়গায় আমাদের সীমানার ভেতর ঢুকে গুলি চালায়, তার কারণও আমেরিকা। আমেরিকা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার কথা বলে। আজকের কমিউনিজম ৩৮ বছর আগেকার কমিউনিজম নয় যে 'দুর্বলের বউ সারা গ্রামের বৌদি' হবে। কমিউনিজম যদি আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তানের 'তীসমার খাঁ'[১] এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে। পাকিস্তানকে আমেরিকা যেসব নতুন নতুন হাতিয়ার দিচ্ছে, তা আমাদের বিরুদ্ধে এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পরেও হবে, একথা কারো কাছে গোপন নেই। ডলেস বা আইজনহাওয়ার লুকিয়ে শিকার করতে পারে না। ভারত জানে, 'মুখে রাম রাম বলে আর বগলে ছুরি' লুকিয়ে কেউ ভক্ত হয়ে উঠতে পারে না।

[১] সাহসী ব্যক্তি (ব্যঙ্গার্থে)।—স·ম·

আমাদের প্রতিবেশী জন ল্যাডলি ডেয়ারি খুলে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। সিজিনের সময় গোটা মুসৌরীতে সেই দুধ যেত। নিজেরও দশ-বারোটা গরু আর দু-তিনটে মোষ আছে। কিন্তু সেটুকু দুধে আর কি হয়? গ্রামের লোকদের কাছ থেকে দেখেশুনে দুধ নিয়ে তা বাড়ি বাড়ি পাঠান। শীতে কোনো কাজ থাকে না তাই বাইরের দুধ নিয়ে মেশিনে ক্রিম বানঐান, ক্রিম ওজন করে তবেই দাম দেন। এখানে জল মিশিয়ে কোনো লাভ হয় না। ক্রিম থেকে বানানো ঘি খাঁটি হয়। লোকে তা আগ্রহের সঙ্গে নেয়। গত শীতে তিনি ৪০-৫০ টিন ঘি বানিয়ে ছিলেন। এবারের সিজিনে বিক্রি খুব কম হলো তাই কয়েক টিন বেঁচে গেল। দোকানীকে দেখালে সে বলল, 'এর স্বাদ তো নষ্ট হয়ে গেছে।' স্বাদ নষ্ট হয়েছে বলে আমার তো মনে হলো না। তিনি এখন প্রতি সেরে চার-আট আনা ক্ষতি করে বিক্রি করছিলেন, চাইছিলেন যে, কোনোরকমে তাড়াতাড়ি শেষ হোক। এদিকে লোকে যখন দেখল যে হর্নলজে ডেয়ারি জমে উঠেছে তখন প্রতিযোগিতা করার লোকও জুটে গেল। ক্রিম বানানোর মেশিন কিনে দু-একজন গ্রামে গিয়ে দুধ কিনতে শুরু করল। কেউ কেউ সিজিনের সময় ডেয়ারি খুলল। কিন্তু তার জন্য ল্যাডলির বেশি লোকসান হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা, হর্নলজের খাঁটি ঘি-এর ব্যবসা জমে গিয়েছিল।

সিমলা ভ্রমণের সময় পুরনো বই বিক্রেতাদের কাছ থেকে একটি বই এনে ছিলাম। তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বীরদের জীবনী তথ্যাদিসহ বড় আকর্ষণীয় ঢঙে দেওয়া হয়েছিল। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ইংরেজরা কীভাবে তাদের প্রভূত্ব বিস্তার করেছে এবং আমাদের দুর্বলতার সাহায্য নিয়েছে তার বর্ণনা এতে ছিল। আমি ২২ আগস্ট থেকে তা অনুবাদ করতে শুরু করে কয়েক দিন পরই শেষ করে ফেললাম।

ভাইয়া আর ভাবীজী এবার অনেক দিন পরে আগস্ট মাসে এলেন। আশা করেছিলাম, দেড় দু-মাস তো অবশ্যই থাকবেন কিন্তু তার এল যে অমৃতসরের বাড়ির ছাদ পড়ে গেছে। তাই ২৩ আগস্ট ভাইয়া এখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কয়েকদিনের মধ্যে ভাবীজীও চলে গেলেন। ছাদের কড়িকাঠগুলোতে চিড় ধরেছিল। বিশ-পঁচিশ বছর হয়ে গিয়েছিল, এর চেয়ে আর কত বেশি আয়ু হবে? ওপরে বসার ঘরের ছাদ নীচের ছাদটাকে নিয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ল। ফার্নিচার, আয়না, ছবি যা কিছু ঘরে ছিল সব চুরমার হয়ে গেল।

আমার পৈতৃক গ্রাম কনৈলা তার গর্ভে শুধু মৌর্য-শুঙ্গযুগের অবশেষই লুকিয়ে রাখে নি, উপরন্তু আদিম মুসলিম-যুগেরও চিহ্ন সেখানে বর্তমান। সৈয়দ বাবার কেল্লা আর তার অত্যাচারের কত কথা আমিও বৃদ্ধদের মুখে শুনেছিলাম। আমাদের গ্রামের সব চুড়ীহার আর দর্জি মুসলমানরা সম্ভবত সেই সময়েরই পরিচায়ক। ৪ সেপ্টেম্বর আমি 'সৈয়দ বাবা' গল্পটি লিখে ফেললাম। মনে হতে লাগল যে, কনৈলার ওপর আরো ঐতিহাসিক গল্প লেখা যেতে পারে। 'কনৈলা কী কথা'র বীজ মনে গেঁথে গেল।

'ভোল্‌গা সে গঙ্গা'-র বাংলা অনুবাদ সদ্য প্রকাশিত হয়েছিল। আজ ভারতের সব ভাষায় এই বইটি অনূদিত হয়েছে কিন্তু যেমন বাংলায় তার শৈল্পিক প্রচ্ছদ হয়েছে তেমনটি কোনো ভাষাতে হয় নি। 'হোমশিখা' নামে একটি পত্রিকায় কেউ একজন এর ওপর আলোচনা করে দোষ-গুণ তো দেখিয়েইছে কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলে দিয়েছে যে, এই বইটি ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর জোরালো আঘাত তাই সরকারের উচিত এর প্রচার বন্ধ করে দেওয়া। হিন্দিতে যখন সর্বপ্রথম

এই বই বেরিয়েছিল তখন অনেকে শোরগোল তুলেছিল কিন্তু কেউ এত দূর যাওয়ার বোধহয় প্রয়োজন মনে করে নি যত দূর বাংলার এই সমালোক গিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে আমাদের খাওয়া-দাওয়া বেশভূষা আর রীতি-রেওয়াজের বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে আমাদের পুরনো গ্রন্থ তথা পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীগুলি। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমার হৃদয়ে কারুর চেয়ে কম ভালবাসা নেই। সত্যি বলতে গেলে, অন্যদের ভালবাসা হচ্ছে লোক দেখানো। তাদের কাছে ঈশ্বর, ধর্ম, বেদান্ত, যোগ, যাদু-টোনা ইত্যাদি অনেক শ্রদ্ধা-সম্মানের জিনিস রয়েছে, যার সামনে ভারতীয় সংস্কৃতি গৌণ হয়ে যায়। আমার কাছে তো ওটাই সব। তার বদলে যাওয়াটা দোষ নয়, গুণ। তা এখনও বদলে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তার পথ কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। সেই লেখকের লেখা পড়ে আমি ভাবলাম যে 'সপ্তসিন্ধু' উপন্যাস লেখার আগে তার মূল বিষয়-বস্তুর ওপর একটি প্রবন্ধ লেখার সিদ্ধান্তটি সঠিক। সমালোচক আগে তা পড়ে আক্ষেপ করুক তারপর তাকে উপন্যাসের উপরে কলম চালানোর অধিকার জন্মাবে।

এই সময়ের কাজের মধ্যে বড় ভাই চন্দ্রসিংহ গাড়োয়ালীর জীবনী লেখাটাও ছিল। আমি ৭ সেপ্টেম্বর তাতে হাত দিলাম। বড় ভাই তাঁর জীবনী আগে নিজেই লিখেছিলেন যা কেউ সংশোধিত সম্পাদনা করে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এসেছিল। আমি বড় ভাইকে লিখে দিয়েছিলাম যে এর জন্য তাঁকে এখানে আসতে হবে।

দিল্লী—বিদেশী ভাষাস্কুলে তিব্বতীর পরীক্ষা নিতে আমাকে ডেকেছিল। আরো অন্যান্য কাজ আছে দেখে আমি যেতে রাজি হয়ে গেলাম। ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে দেরাদুন পৌঁছে গেলাম। প্রফেসর রূপনারায়ণ মিশ্রর পায়ে খুব আঘাত লেগেছিল। বাবার মতো তারও শিকারের শখ ছিল। অনেকগুলো বড় বড় বাঘ তিনি মেরেছিলেন আর তার চেয়েও বেশি বাঘ সেই রাজা সাহেবকে দিয়ে শিকার করিয়ে ছিলেন যাঁর তিনি সেক্রেটারি ছিলেন। জমিদারী উঠে যাওয়ার আগেই চাকরি ছেড়ে তিনি অধ্যাপনা শুরু করে দিয়েছিলেন। এটা ভালই করেছিলেন। শিকারের শখ ছিল, যখনই ছুটি পেতেন শিবালিকের জঙ্গলে চলে যেতেন। আর ছুটিগুলোতে তো দূর-দূরান্তে দৌড়োতেন। গত বছর গরমে তিনি মহারাজের ওমরার সঙ্গে কুলুতে লাল ভালুক শিকার করতে গিয়েছিলেন। এই বছর গঙ্গোত্রীর দিকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। দুর্গম পাহাড়েও নির্ভুল হেঁটেছেন। কিন্তু দেরাদুন শহরে জিপে করে যাওয়ার সময় একটি মোড়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেন, পা ভেঙে গেল। কয়েক সপ্তাহ ধরে প্লাস্টার বেঁধে খাটে শুয়ে থাকলেন। এখন তিনি চলতে পারছিলেন কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিন্তে পা ফেলতে এখনও দেরি ছিল।

সাথী মহমুদ জফর এখানেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তার ওপর হৃদরোগের জোরালো আক্রমণ তখনই হয়েছিল যখন আমি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সংঘের সম্মেলনে গিয়েছিলাম। তিনি সংঘের সেক্রেটারি ছিলেন। এখন ভাল ছিলেন যদিও হৃদরোগে ভালমন্দের কোনো ঠিক নেই। মহমুদ লেখায় পারদর্শী কিন্তু শৈশব থেকেই ইংরেজি ভাষাতেই সব কিছু শিখেছেন বলে তাতেই তাঁর দখল আছে। আমি বললাম, 'এবার এদিক-সেদিকে ঘোরার ভাবনা ছাড়ুন আর লিখতে শুরু করুন। ইংরেজিতে লিখে তার হিন্দি অনুবাদ শুনে নিন।' যাকে বলে হীরের টুকরো এই মহমুদ হচ্ছেন তাই। তিনি কখনো ধন-সম্পত্তিপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন দেখেন নি।

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাঁকে ছুঁতে পর্যন্ত পারে নি। নিজের প্রিয় পত্নী রশিদাকে হারানোর খুব খারাপ প্রভাব পড়েছিল তাঁর মনে তাতে সন্দেহ নেই। যদিও তাঁর সহজ হাসি দেখে সে ব্যাপারটি কেউ ধরতেও পারত না।

শুক্লজীর সদ্য সদ্য নাতনি হয়েছিল। জন্মানোর সময় চার প্যাউণ্ড ওজন ছিল অর্থাৎ জয়া আর জেতার ওজনের অর্ধেকেরও কম। খুব রোগা-পাতলা ছিল কিন্তু তার কালো কালো ঘন চুল সে অভাব পূরণ করে দিয়েছিল। চিন্তা করার কোনো কারণ ছিল না। আমাদের আজকের সমাজে মেয়েদের মূল্য যতই কম হোক, যতই তাদের উপেক্ষা করা হোক, প্রকৃতি তাদের খুব মজবুত শরীর দেয় যার ফলে তারা সমস্ত বিপত্তিকে ফেলে সামনে এগিয়ে যায়।

দিল্লীগামী রাতের গাড়ি ধরলাম। আগে থেকে রিজার্ভেশন না করা সত্ত্বেও ফার্স্ট ক্লাসের ভাল কম্পার্টমেন্টে নীচের সিট পেয়ে গেলাম। অন্য সিটে আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন এবং নীচেরই তৃতীয় সিটটি খালি ছিল। শ্রীমতী বর্কতুল্লা অন্য কোনো কম্পার্টমেন্টে একলা ছিলেন। আজকাল প্রায়ই ট্রেনে খুন হওয়ার খবর বেবোত বলে তিনিও এটাতে চলে এলেন। তিনি ছিলেন ক্রিশ্চান মহিলা। তাঁর স্বামী বর্কতুল্লা পাঞ্জাবে তাঁর সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় পাদরী ছিলেন। শ্রীমতীরও ধর্মপ্রচারের বেশ নেশা ছিল। আমি তো শ্রোতাই ছিলাম, তিনি খানিকটা লেকচার দিলেন, তারপর পাহাড়ে প্রদত্ত খ্রিস্টের উপদেশগুলির একটি পুস্তিকা দিয়ে পড়েছি কিনা শুধোলে বললাম, 'ত্রিশ বছর আগে পড়েছিলাম। আচ্ছা, আবার পড়ে নেব।' সে-সময় কোনো কাজ ছিল না তাই ভাবলাম বৃদ্ধার লেকচার শোনার চেয়ে ভাল এই বইটিই পড়ে শেষ করে ফেলি। শেষ করার পর আবার লেকচার শুরু হতে দেখে আমি বললাম, 'আমার খ্রিস্টের ভক্ত আর ভগবানের ভক্তের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে মনে করি যে, পৃথিবীতে ভগবান নামে কোনো বস্তু নেই।' আমি খানিকটা নরমভাবে আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছিলাম যাতে বৃদ্ধার হৃদয়ে আঘাত না লাগে।

১৫ সেপ্টেম্বর ছটা বাজার কিছুটা আগে অন্ধকার থাকতেই দিল্লী পৌঁছে গেলাম। রিক্সা নিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দেখি সাথী ফারুকী আমার জন্য রিক্সা নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছেন। প্রথমে সাথী যজ্ঞদত্ত আর সরলাজীর বাড়িতে গেলাম। ভাবীজীর বাড়িতেই ওঠার কথা ছিল কিন্তু অনেক কাজ থাকায় ভাবলাম এখানে দেখা করেই যাই। চা খেলাম। সরলাজী দিল্লী পৌরসভার সদস্যা। গঙ্গাকে নার্সিং স্কুলে ভর্তি করার কথা তাঁকে বলে ছিলাম। তিনি প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলে ঠিকও করেছিলেন কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে গঙ্গার সেটা পছন্দ হলো না। ভাবীজী চা-জলখাবার খাওয়ালেন। সেখান থেকে পার্টি-অফিসে গেলাম। এখন হর্নক্লিফ বিক্রি করাটা স্থির হয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়েছিলাম যে, সাথী ডাঙ্গে ট্রেড-ইউনিয়নের জন্য মুসৌরীতে কোনো বাড়ি কিনতে চাইছেন। আমি ভাবলাম যদি লোকসান দিয়েই বিক্রি করতে হয় তো ট্রেড ইউনিয়নকেই দিই না কেন? সাথী ডাঙ্গে দাম শুধোলেন। আমি বললাম, 'দশ-হাজার।' তিনি বললেন, 'এবমস্তু।' অক্টোবরে এসে লেখাপড়া করে নেওয়ার কথাও স্থির হয়ে গেল। আমার খুব আনন্দ হলো। যাক, একটা বড় চিন্তা দূর হলো, কিন্তু তখনও কাপ আর ঠোঁটের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব ছিল।

আজকের মধ্যাহ্নভোজন হলো সাথী ফারুকী আর তাঁর পত্নী বিমলাজীর বাড়িতে। ফারুকীর

পূর্বজরা মোঘল বাদশাহদের গুরু ছিলেন। ৫৭ সালের বিদ্রোহে যখন চেলাদের বিপদ এল তখন গুরু আর কী করে বাঁচে? সেজন্য গুরু পালিয়ে মুজফফরনগর জেলার কোনো গ্রামে চলে গেল। সেই গুরু ঘরানাতে 'ডুবা বংশ কবীর কা উপজে পুত কমাল' অনুযায়ী কমিউনিস্ট ফারুকী জন্মালেন এবং বিয়ে করলেন একজন কাফের কমিউনিস্ট মেয়েকে। মধ্যাহ্ন ভোজনে দিল্লীরও কয়েকটা রান্না ছিল। সরলাজী কয়েক প্রজন্মের নিরামিশাষী। স্বামী যজ্ঞদত্ত শর্মাও তাই। সরলাজী গুপ্ত থেকে শর্মা হয়ে দুটো সিঁড়ি ওপরেই উঠেছেন। কিন্তু আজকাল তো মুড়িমুড়কির সমান দর। নিরামিষ আহারের ইচ্ছে তো দুজনের মন থেকেই চলে গেছে কিন্তু সরলা বেচারা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মাংস খায় না।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। গরমের চোটে শরীরের অবস্থা নাজেহাল, তবু রিক্সা নিয়ে এদিক-সেদিক যেতে হলো। ১৫ সেপ্টেম্বর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোলাম। প্রথমে মাচবেজীর বাড়ি গেলাম। সেখানেই মারাঠীর মহান নাট্যকার মামা বরেরকর-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মধ্যাহ্নভোজন এখানেই করার ছিল। সাহিত্য অকাদেমির কৃপালনীজীর সঙ্গেও দেখা হলো। সকলেই মাচবে-দম্পতির বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রিত ছিলেন। কমলার ফরমাশ ছিল, খাদির একটি রেশমী সিল্কের শাড়ি নিয়ে যাওয়ার। শুনলাম কনাট্ প্লেসে খাদির খুব বড় একটা দোকান খুলেছে যেখানে হাতে তৈরি অনেক জিনিস বিক্রি হয়। আমি সেখানে গেলাম। বাস্তবিক এই দোকানটি দিল্লীর দেব-দেবীদের পক্ষে অনুকূল ছিল। আধুনিক কায়দায় কিন্তু শিল্পগুণ আর সুরুচির সঙ্গে সব জিনিসগুলি সাজানো হয়েছিল। অনেক মেয়ে-বিক্রেতা ছিল যারা ফড়-ফড় করে ইংরেজি বলছিল। আমি আশা করিনি যে এখানেও আমার কোনো পরিচিত বেরিয়ে যাবে। নৈনিতালের কাউন্সল বাঁকেলালের ছোট ভাই এখানেই কাজ করতেন। আরও এক বিহারীকে পেয়ে গেলাম। দোকানের কাজ শুরু হতে সামান্য দেরি ছিল। কাউন্সলজী বললেন, 'আমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে একটু দেখা করুন। ম্যানেজারের অফিস ছিল ওপরে। খুব আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু আমি এমন সময়ে পৌঁছে ছিলাম যখন সাড়ে দশটায় দোকান খোলার আগে ভগবানের প্রার্থনা আবশ্যক। ম্যানেজার সাহেব সহজভাবে বললেন, 'আপনিও চলুন।' আমিও সহজভাবে জবাব দিলাম, 'আমার ভগবানে বিশ্বাস নেই।' কর্মচারীদের রাখার সময় ভগবানে বিশ্বাস থাকাটা জরুরি মনে করা হয় না তো? ভগবান কতদিন লাঠি হাতে মানুষের মনকে শাসন করবে? আমি সেখানে বসে থাকলাম। দোকান খুলল। একটি শাড়ি কিনলাম। এগারোটার সময় পরীক্ষা নিতে আমাকে প্রতিরক্ষা বিভাগের বিদেশী ভাষা স্কুলে যেতে হবে। এখন তার মাত্র দশ-পনের মিনিট বাকি ছিল। জায়গাটা আগে দেখা ছিল না। ট্যাক্সি নিলাম, ঘোরানো রাস্তা দিয়ে সেখানে সে পৌঁছে দিল। পরিচালক সাহেব জানালেন, 'আপনার কাছ থেকে সম্মতিসূচক সংবাদ পাইনি।' কিন্তু আমি তো জবাবী তার করে দিয়েছিলাম। সরকারি-তারবার্তাকেও যদি এই রকম উপেক্ষা করা হয় তাহলে সাধারণ লোকের কথা আর কী বলার আছে? যাক্ গে, যে তিনজন ছাত্রের পরীক্ষা নেওয়ার ছিল তাঁরা সবাই এখানকারই সেনা-অফিসার ছিলেন। আধ ঘণ্টা থেকে পৌনে একঘণ্টা সময় লাগল। টেলিফোন করে সকলকে ডাকানো হলো। আমি তাদের পরীক্ষা নিলাম। দেখা গেল, সেখানকার শিক্ষক আমার সিকিমের পূর্বপরিচিত। খুব করে বললেন যে আমি আবার এলে যেন তাঁর বাড়িতে

উঠি।

এখান থেকে ছুটি নিয়ে মাচাবেজীর বাড়িতে খেতে গেলাম। বরেরকরজী ছিলেন সাহিত্যিক। কৃপালনীজী তো বিশ্বভারতীতে বহু বছর থেকেছেন, সেখানকার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। চা খাওয়ার জন্য এই নতুন দিল্লীতেই চন্দ্রগুপ্তজীর বাড়ি যাওয়ার ছিল বলে অন্য অতিথিরা চলে যাওয়ার পরও আমি ওখানেই বিশ্রাম করতে লাগলাম। অসঙ্গ এখন আর নিজেকে অচিংগা বলত না। তার বোন টুনাও খুব কথা বলছিল। তার সঙ্গে খেলা করে বেশ ভাল লাগছিল। 'সংস্কৃত পাঠমালা' তৈরি হয়ে গিয়েছিল। 'সংস্কৃত কাব্যধারা'-র ও কিছু অংশ তৈরি করে নিয়েছিলাম। শ্রীচন্দ্রগুপ্তজীর বাড়িতে চা খেলাম। তিনি তাঁর এক প্রকাশক বন্ধুর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে তিনি এই বইগুলো ছেপে দেবেন। তাই সেগুলো তাঁর কাছেই রেখে দিলাম। শ্রদ্ধেয় পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন এখন এখানেই ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তজীর সঙ্গে সেখানে চললাম। পথে ড· সত্যনারায়ণের সঙ্গে দেখা। দেখেই বললেন, 'বাবা, আমি রাশিয়া যাচ্ছি। সোভিয়েত দূতাবাস সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' আমি অভিনন্দন জানালাম। ট্যান্ডনজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হলো। অন্ধকার হয়ে এলে ফৈজবাজারে ফিরলাম। ভাবলাম, মোতিমহলের মুর্গমসল্লম একলা খাওয়াটা ঋষিদের বচন-বিরুদ্ধ কাজ—কেবলাধো ভবতি কেবলাদী' (একলা যে খায়, সে শুধু পাপ খায়)। আমার বিশ্বাস ছিল না যে গরম থাকা সত্ত্বেও উনুনে ভাজা মুর্গমসল্লম মুসৌরী অব্দি ভালভাবে পৌঁছে যাবে। আপসোস হতে লাগল যে দুটো কেন আনলাম না। রাতে দেরাদুনের গাড়ি ধরলাম।

পরের দিন সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে দেরাদুন পৌঁছোলাম। আড়াই টাকা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি পেলাম। নটার সময় কিংক্রেগে থামতে হলো। আধ ঘণ্টা পর গেট খুললে লাইব্রেরি পৌঁছলাম। সেখান থেকে রিক্সা নিয়ে প্রায় দশটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

এখন আবগারী অফিসারদের এখানেই কনফারেন্স হচ্ছিল। শ্রীযমুনাপ্রসাদ বৈষ্ণব অশোকও তাতে এসেছিলেন। দেখা করতে এলেন। অশোকজী হিন্দি কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে সম্মানীয় স্থান অর্জন করে নিয়েছেন। হিমালয় কত উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যকের জন্ম দিয়েছে কিন্তু তার মধ্যে এমন খুব কমই আছেন যাঁরা তাঁদের সৃষ্টিতে নিজের জন্মভূমির ছাপ পড়তে দিয়েছেন। অশোকজী তাঁর গল্পে গাড়োয়ালকে ভুলতেন না, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য।

এখন ছিল মুসৌরীর দ্বিতীয় সিজিন। তাই বহু পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পরের দিন রোববার শ্রীজুত্সীজীর সঙ্গে শ্রীমোহিনীজী এলেন। এই বছর তিনি এখানে এসে আলমোড়া চলে গিয়েছিলেন। মূক-বধির স্কুলের শিক্ষকদের সম্মেলন হচ্ছিল। পাটনা থেকে শ্রীগোরখনাথ পাণ্ডে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এলেন। আজমগড়ের কথা বলছিলেন কিন্তু এখন আমার মতো তাঁরও আজমগড়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছিল না।

২০ সেপ্টেম্বর জয়ার জন্মদিন ছিল। আজ সে দু-বছরের হয়ে গিয়েছিল। শুধু শব্দই নয়, এখন বাক্যও বলে ফেলত। একদিন শুনলাম। দেখা গেল তার শব্দকোষে প্রায় একশোটি শব্দ আছে। চা-পার্টিতে উষা-বাবা, ড· সত্যকেতু, শীলাজী, ঠাকুরানী গুলাবকুমারী, শ্রীমুকুন্দীলাল, শিল্পী নৌটিয়াল আর অন্য বন্ধুরা এলেন। জয়া এখন তার জন্মদিনের কী বোঝে? হ্যাঁ, এটা সে দেখছিল যে কত পরিচিত-অপরিচিত মানুষ একসঙ্গে বসে খাচ্ছে।

২৪ সেপ্টেম্বর নাগাদ আমার কাছে সঞ্চিত তথ্যের সাহায্যে বড় ভাইয়ের জীবনী লিখে ফেলেছিলাম। তাঁর আসার প্রতীক্ষায় ছিলাম। তিনি ২৬ সেপ্টেম্বর এসেও পড়লেন। বার্ধক্যের পুরো ছাপ পড়েছিল, যদিও উৎসাহ এখনো তরুণদের মতোই ছিল। এখন অপরাহ্ণে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নোট নেওয়া এবং পরের দিন পূর্বাহ্ণে জীবনী টাইপে ডিকটেট করার কাজ শুরু হলো। বড় ভাইয়ের ব্যবহারে কমলাও খুব খুশি। নির্ভীকতা আর লোভহীনতার তিনি সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। তিনি নিজের ভাবনায় এমন দৃঢ় যে কোনো আর্থিক কষ্টকেই পরোয়া করেন না।

২৭ সেপ্টেম্বর জুত্‌শজী আর তাঁর ছোট ছেলে যোগীনাথও এলেন। যোগীজী ছিলেন আলমোড়ায় ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর বয়স এখন তিরিশ বছরও হয়নি কিন্তু তাঁর স্ত্রী মারা গেল। দুটি যমজ মেয়ে ছাড়া একটি ছেলে আর এক মেয়ে—চারটি বাচ্চা আছে। তাদের দেখানোশার ভার ঠাকুমা অনেকটাই নিচ্ছিলেন। সেই অসুবিধের জন্য তাঁরা এ বছর প্রথম সিজিনে আসেন নি। যোগীজী ছেলে-মেয়েদের নৈনিতাল কনভেন্টে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তিনি বলছিলেন, 'বাচ্চাদের সামলানো মায়ের পক্ষে অসুবিধেজনক। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটিও ভর্তি করার মতো হলে তাকেও ভর্তি করে দেব।' মোহিনীজীর বক্তব্য ছিল—ওখানে খরচও অনেক পড়বে আর সেই সঙ্গে পারিবারিক স্নেহও তারা পাবে না।' তবু ছেলের মতামতের গুরুত্ব স্বীকার করতেন। মা-বাবা তাঁদের যুবক ছেলেকে বিপত্নীক দেখতে চাইছিলেন না—বিশেষ করে মোহিনীজী। আমাদের এখানে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের মাত্র কয়েক হাজার পরিবার আছে যারা একে অন্যের সঙ্গে সুপরিচিত। মেয়েদের বিয়ে দেওয়াটা তাদের এখানেও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো কন্যাপক্ষ মা-বাবাকে হয়তো চাপ দিচ্ছিল তাই তাঁরাও তাঁদের ছেলের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। ছেলে বলছিলেন, 'এখন আমি বিয়ে করার মতো অবস্থায় নেই, বাচ্চাদের জন্য অনেক খরচ করতে হয়। পরিবারের জন্য টাকা কোথেকে আসবে?' মা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে সৎ মা এসে বাচ্চাদের সামলে নেবে।

ভাইয়া ২ অক্টোবর অমৃতসর থেকে এলেন। এখনও ছাত বানানোর কাজ শেষ হয় নি। তিনি অন্য পলকা ছাতটিকেও ভেঙে ফেলে ভুল করেছেন। ভেবেছিলেন একই সঙ্গে লোহা-সিমেন্ট দিয়ে পাকা ছাত বানিয়ে নেব। কিন্তু এ বছর পাঞ্জাবে ভীষণ বন্যা হয়েছে, হাজার হাজার ঘর নষ্ট হয়ে গেছে। সিমেন্ট পাওয়া সমস্যা হয়ে পড়েছে। ভাবীজী আগেই চলে গিয়েছিলেন, ভাইয়ার কোনো কাজ ছিল না তাই ভাবলেন দু-চার দিন মুসৌরী ঘুরে আসি। তিনি প্রথম থেকেই আমাদের বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। বলছিলেন, 'কুল্‌হড়ী বা লাইব্রেরির আশেপাশে কোনো বাংলো নিয়ে নাও। আমরাও এসে ওখানেই থেকে যাব।' কমলা বাজারের অত কাছে থাকতে চাইত না। আমিও এ ব্যাপারে একমত ছিলাম। যদি ভাড়া করা বাংলোয় থাকতে হয় তাহলে সামান্য দূরে থাকাই উচিত। পরের দিন ভাইয়া প্রায় সারাটা দিন এখানে কাটালেন। বড় ভাইয়ের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হলো। পেশোয়ার-কাণ্ডের বীর গাড়োয়ালীদের নাম কে না শুনেছে? ভাইয়া বলছিলেন—এখন সারাজীবন হায়-হায় করা ভাল নয়। জানকীকে দিল্লীতে বসিয়ে দিয়েছি। তার জন্য বাড়ি ভাড়া থেকে পাঁচ-ছ হাজার টাকা আসবে। ফার্মেসি থেকে মাসিক পাঁচ-ছশো টাকা আমি পেয়েই যাব। আর কী করার আছে? চার মাস মুসৌরী আর

চার কী মাস করে এদিক-ওদিকে কাটিয়ে দেব।' তিনি আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড় ছিলেন, চুল একেবারে সাদা কিন্তু এখনও তাঁর শরীর দুর্বল হয় নি। হাঁটাচলায় হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন।

এবারের ছোট সিজিনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যসচিব শ্রীসম্পূর্ণানন্দজী।

৬ অক্টোবরের চিঠিপত্রের মধ্যে অহরৌরা (মির্জাপুর)-এর পুরনো বন্ধু শ্রীরাম খেলাবনজী প্রহরী 'বৃদ্ধ কবি'-র চিঠিও ছিল। বার্ধক্যে আত্মীয়া বন্ধু-বান্ধব খুব কমই অবশিষ্ট থাকে। সে সময় পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ হলে খুব আনন্দ হয়। শ্রীরামখেলাবনজী ১৯২৭ সাল থেকেই কংগ্রেসের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ছেলে ম্যাট্রিকে ফেল করে গেছে। বাড়ির আর্থিক অবস্থা তো ৪০ বছর আগেও ভাল ছিল না। চাইছিলেন ছেলের কোথাও একটা চাকরি হয়ে যাক কিন্তু আজকাল চাকরি পাওয়া সহজ নয়। সাদা ভাষায় সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আমি আর কী-ই বা করতে পারতাম?

৭ অক্টোবর বড় ভাই গেলেন। বড় উদ্দীপনাপূর্ণ, কর্মঠ আর পরিষ্কার মনের মানুষ। জ্ঞান সঞ্চয়ে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল না নইলে আরও শিখতে পারতেন। তবু তিনি যথেষ্ট শিখেছেন। বিয়ের ফলেও বাধা উপস্থিত হলো। আর্থিক দূরবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে। নিজের জন্য নয় বাচ্চাদের জন্য তাঁর খুব দুশ্চিন্তা—আমার পরে কে তাদের দেখাশোনা করবে, এটাই চিন্তা করেন। স্ত্রী খুব কষ্ট সহ্য করেছেন। আর্থিক সংঘর্ষে পড়ে মেজাজ রুক্ষ হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের নয়।

৮ অক্টোবর রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবিত শহীদদের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি তিনি। আমি ভাবতাম বয়স সত্তরের ওপর হবে কিন্তু এখন তাঁর বয়স মাত্র ৬৮ বছর। এই অবস্থায় স্বাস্থ্য যেমন হয়—তা দেখতে খারাপ ছিল না। সংসার-সংঘের চিন্তা তাঁর মাথায় অনেকদিন থেকেই আছে। জানেন, কথা শোনার লোক পাওয়া গেলেও তা মেনে চলার লোক পাওয়া যায় না। তবু উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি তিনটে ভাষায় তাঁর 'সংসার-সংঘ' বেরিয়েই যাচ্ছে। আমি আমার বাড়ি বিক্রি করার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। সে ব্যাপারেই তিনি কথা বলতে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো স্বাস্থ্যের লোকের এত দূরে বাড়ি নেওয়াটা কী করে ঠিক হতো? বাড়ির কথাবার্তা মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল এবং অন্যান্য আলোচনা শুরু হয়ে গেল। তিনি এক নম্বর ভবঘুরে। রাজ্য-টাজ্য ছেড়ে কোনো কিছু না নিয়েই দেশ থেকে বেরিয়ে পড়েন। ইংরেজের কুকুরা তাঁর পিছনে লেগে থাকত। আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর গন্ধকেও ভয় পেতেন। তবু সারাজীবন তিনি নিজস্ব ভাবনা নিয়ে নির্ভীকভাবে থেকেছেন। ইংরেজদের প্রতি তাঁর অপার ঘৃণা কখনও কমে নি। কতবার তিনি বিশ্ব-পরিক্রমা করেছেন। শুধু হোটেল, রেল আর জাহাজের পথেই যান নি উপরন্তু তিব্বতের দুরারোহ পর্বতও পার হয়েছেন। এই রকম মানুষের জীবন কত আকর্ষণীয় আর প্রেরণাদায়ক হবে তা ভাবলে আমার মনে হতো সেটা লিখে ফেলি। তিনি তাঁর ইংরেজিতে ছাপানো জীবনী পাঠালেন যা আমার কাজের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। প্রথমত সেটা তাঁর সারা জীবনের ছিল না, আর দ্বিতীয়ত তা ছিল নোটের মতো। সঠিক জীবনী তখনই লেখা সম্ভব হতো যখন আমি কাছে বসে জিজ্ঞেস্ করে করে নোট করতাম। পরে আমি লিখলাম কিন্তু তিনি এক নাগাড়ে দু-চার সপ্তাহ সময় দিতে পারছিলেন না। তাঁর পায়ে এখনো চাকা বাঁধা আছে বলে

রাজপুরে দু-চার দিন থাকার পর আবার তিনি কোনো দিকে বেরিয়ে পড়েন। জীবনী লেখার সংকল্প মনের মধ্যেই থেকে যাবে মনে হচ্ছে।

১২ অক্টোবর জেতার জ্বর এল। সে দুধ খেল না। ওদিকে পায়খানাও বন্ধ হয়ে গেল। চতুর্থ দিনে রেড়ির তেল দিয়ে পায়খানা করালাম, বেচারা সুস্থ হয়ে গেল। জ্বর ধীরে ধীরে ছাড়ল। আমি ভাবলাম, সাধারণ জ্বর হয়েছে। কয়েক দিন পর বুঝতে পারলাম যে, সে তার ডান হাতটা তুলছে না। 'পোলিও'-র নাম শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। কল্যাণ সিংহের মেয়ের দুই পা আর দুই হাতে পোলিও হয়েছিল। ডাক্তাররা নিরাশ করে দিয়েছিলেন কিন্তু ভাইয়া বললেন, 'মালিশ করো। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।' জেতার ব্যাপারে লিখলে তিনি একটি ওষুধ পাঠালেন এবং বললেন, 'ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সময় লাগবে কিন্তু হাত ঠিক হয়ে যাবে।' কয়েক মাস আমাদের খুব চিন্তা হতে থাকল। তারপর হাত একটু একটু উঠতে লাগল। আজ পাঁচ মাস পর হাতে তার পুরো নিয়ন্ত্রণে আছে, মুঠো পাকাতে তো কখনোই তার অসুবিধে হয় নি। কিন্তু এখনো বাঁ হাতের মতো জোর ডান হাতে নেই।

সরকারি অফিসের সঙ্গে যখন যোগাযোগ করতে হয় তখন আমাদের মতো লোকেরও খারাপ লাগে। অন্যদের নিশ্চয় আরো খারাপ অবস্থা হয়। প্রতি বছর ইনকাম ট্যাক্সের জন্য অফিসের দ্বারস্থ হতে হয় কিন্তু সেটা কোন মাসে তা নির্দিষ্ট থাকে না। কখনো মে-জুন মাসে, কখনো তার পরে। এবার তো অক্টোবরের ১৯ তারিখে। তাও দেরাদুনে ডাকা হয়েছে। তবু একজন ছাড়া আর যতজন অফিসারকে পেলাম সকলেই ভদ্রলোক ছিলেন। এ বছরের রোজগার ৬৭০০। তার মধ্যে কিছু ছিল অগ্রিম আর কিছু সরকারি সফরের খরচ ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো আলাদা করে বিচার করার চেয়ে সেগুলোর ওপরও কিছু ট্যাক্স ধরে নেওয়াটা আমার ভাল মনে হয়। দেরাদুন গেলাম। কাজ সারতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল। শুক্লজীর বাড়িতে চা খেলাম আর স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সেদিন সন্ধেতেই মুসৌরী ফিরে এলাম।

২২ অক্টোবর ডা· জয়নারায়ণ গিরি তাঁর স্ত্রী গুঞ্জনের সঙ্গে এলেন। আমাদের বাড়িতে আমি ছাড়া সবাই নেপালী ও আধা-নেপালী বলে নেপালী অতিথি এলে খুশি হওয়ারই কথা। গিরিজী আর তাঁর স্ত্রীর স্বভাবও এমন মধুর যে তাঁরা এলেই ঘরের লোকের মতো মনে হয়। ডাক্তারী পাস করে গিরিজী এখন লক্ষ্ণৌতে বিশেষ শিক্ষা নিচ্ছিলেন। স্ত্রীকে এই শর্তে বিয়ে করেছিলে যে তিনি পড়বে। বাবা তাঁর একেবারে অশিক্ষিতা মেয়ের জন্য আর কোনো উপায় দেখলেন না এবং মাস্টার রেখে তাঁকে পড়ালেন। গুঞ্জন ম্যাট্রিক পাস করলেন। এখন পাটনায় এফ এ পড়ছিলেন। আমি বললাম, 'এঁকে জীববিজ্ঞানে এফ এস সি করিয়ে ডাক্তারীতে ঢুকিয়ে দিন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার, খুব ভাল হবে।' কিন্তু গিরি পরিবার ধনাঢ্য। এখনো অনেক পুরনো ভাবনা তাঁদের মাথায় ঘোরে—আমাদের কাছে খাওয়া-পরার জন্য অনেক আছে, কষ্ট করার কী দরকার? বড় এক ভাই ডাক্তার হয়ে আরও পড়ার জন্য বিলেত যাবেন ঠিক ছিল। টাকা নিয়ে এলেন,তারপর আর বিলেত কে যায়? পাটনায় হোটেল খুলে বসে গেলেন। সবচেয়ে বড় ভাই নেপালের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন। কৈরালা মন্ত্রিসভার সময় মোরঙ্গ-এর রাজ্যপাল হয়েছিলেন এবং কৈরালার ভগ্নীপতি হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। জাত-পাতের ব্যাপার শুধু ভারতেই ভাঙছে না, নেপালেও তার ছোঁয়া লাগছে। পুরনো

আচার-বিচারের ঠিকেদার স্বয়ং মাহিলা-গুরুর ছোট সাহেবজাদা একজন রাণাকুমারীকে বিয়ে করেছেন। গিরি ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে করেছেন। নেপালের সমাজে গিরি-পুরীর স্থান আমাদের এখানে গিরি গৃহস্থদের মতোই।এটা নিশ্চিত যে কলিযুগ শুধু ভারতেই আসবে না।

২৭ অক্টোবর শ্রীমুকুন্দীলালজী এলেন। এ বছর এটা ছিল তাঁর শেষ ভ্রমণ। পরিবারকে সমতলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন। গাড়োয়ালে রূপকুণ্ডের বরফে কয়েকশো লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সে ব্যাপারে নানা রকমের কল্পনা-জল্পনা চলছিল। মুকুন্দীলালজীর বক্তব্য ছিল, 'জম্মুর জেনারেল জোরাবর সিংহের সাথীদের লাশ এগুলি হতে পারে না। আমাদের এখানে পাহাড়ে মাঝে মাঝে নন্দাদেবীর কুম্ভ লাগে যাতে হাজার হাজার নরনারী দর্শন করার জন্য যায়। তারাই তুষার ঝড়ে কোনো সময়ে চাপা পড়ে মারা গেছে।' তিনি এটাও জানালেন যে, সেখানে গণেশের মূর্তিতে উৎকীর্ণ 'যশোধর' পাওয়া গেছে। যখন চামড়া মাংসসহ অনেক লোকের লাশ সেখানে আছে,তাদের পায়ের চপ্পল আর অন্যান্য জিনিসপত্রও আছে, তাহলে আর খোঁজ পেতে কী অসুবিধে হতে পারে? কিন্তু ১৫-১৬ হাজার ফুট ওপরে বিশেষজ্ঞদের যাওয়াটাও তো মুশকিল। জোরাবর সিংহের সাথীদের লাশ হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় আপত্তি হলো যে, সেখানে স্ত্রীলোকদের লাশও পাওয়া গেছে। আজ থেকে একশো বছর আগে, কাশ্মীরের হাতে যাওয়ার আগে, জম্মুর জেনারেল জোরাবর সিংহ লাদাখের পশ্চিম-তিব্বত দখল করতে চাইল। শীতে তারা সদলবলে মারা গেল। তার কিছু লোক পালিয়ে আলমোড়া হয়ে ফিরেছিল। ১৬—১৭ হাজার ফুট ওপরে হিমালয়ের মাটিতে আরো কত রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে। কারণ সর্বদা হিম হয়ে থাকা মাটি নিজের ভেতরে বহু শতাব্দী ধরে প্রাচীন সামগ্রী সুরক্ষিত রাখতে পারে। তিয়ানশান আর সাইবেরিয়ায় হাজার হাজার বছরের পুরনো মানুষ আর জন্তুদের মৃতদেশ পাওয়া গেছে। এখন আমাদের এখানে লোকে ইয়েতি বা নরবানরকেই খুঁজে বের করার জন্য হয়রান হচ্ছে। কিন্তু যে সব গুরুত্বপূর্ণ অবশেষ সেখানে পাওয়া যাবে তা ওপরে চলাফেরা করে না বরং নীচে চাপা পড়া অবস্থায় পাওয়া যাবে।

শীতের যাত্রা

শীত আসছিল। গত বছর তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির নীচে নেমে যাওয়ায় বুকে কষ্ট হচ্ছিল। এবছরও ভয় ছিল বলে, ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, শীত বাড়লে সমতলে চলে যাব। জেতার ডান হাতটা তেলো থেকে কব্জি পর্যন্ত ঠিকভাবে কাজ করছিল, কিন্তু কাঁধের কাছে এখনও তা করছিল না বলে মালিশ চলছিল।

সরহ-র দোঁহাকোষের আট ফর্মার প্রুফ আমি ড· শহীদুল্লার কাছে ঢাকা পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি সেটা রাজশাহীতে পেয়েছিলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অবসর নিয়ে এখন তিনি

রাজশাহীতে অধ্যাপনা করছিলেন। ড· শহীদুল্লা সংস্কৃত আর অপভ্রংশের পণ্ডিত। সরহপা আর কন্‌হপার অপভ্রংশ দোঁহার ওপর তিনি তাঁর ডক্টরেটের থিসিস লিখেছিলেন। আমি চেয়েছিলাম, মর্মজ্ঞদের কাছে প্রুফ আকারে কোষ পাঠিয়ে দিতে যাতে তাঁদের পরামর্শ পেতে পারি। ড· শহীদুল্লার উত্তর এসেছিল বিশুদ্ধ হিন্দিতে। বাংলা ভাষাভাষীর কাছে উর্দুর চেয়ে বিশুদ্ধ হিন্দি সহজ। বরং বলা উচিত যে যদি তাঁরা উর্দুর শব্দ আর ক্রিয়ারূপ জানেন তাহলে উর্দুর জন্য যেখানে হাজার হাজার আরবী ফার্সী শব্দ খুঁজতে হবে সেখানে তাদের বাংলা শব্দ ব্যবহার করে উচ্চমানের হিন্দি লিখতে পারেন। বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের মাতৃভাষার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে এবং শেষে পাকিস্তান সংবিধান সভাকে টুঁ-শব্দটি না করে উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকার করতে হয়েছে। ড· শহীদুল্লা তাঁর বাংলার খুব অনুরাগী এবং সেবক। সংবিধান যদিও বাংলাকে মেনে নিয়েছে কিন্তু ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ গণরাজ্যের উদ্‌ঘাটনের সময় করাচীতে যে ভাষণ হলো তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, পাকিস্তানের ধনী ব্যক্তিরা 'পঞ্চো কা ন্যাও সির-মাথে পর, লেকিন পনালা ওহি রহেগা'[১] জাতীয় প্রবাদকে মানছে। কয়েকটি ইংরেজি বক্তৃতা বাদ দিলে রেডিওতে নেতাদের সমস্ত বক্তৃতা হলো উর্দুতে, সেখানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কোনো চিহ্ন ছিল না। নিশ্চয় এই বজ্জাতি বেশিদিন চলবে না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা আরও একরকমভাবে পাকিস্তানী বাঙালীদের মূলোৎপাটন করার জন্য তৈরি। পাকিস্তানী বাঙালীরা দেখাত যে আমাদের সংখ্যা পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি। তাদের সমর্থক মোল্লারা পূর্ব-বাঙলায় এমন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে যাতে ওখানকার হিন্দুরা পালিয়ে ভারতে চলে আসে এবং এইভাবে পাকিস্তানে বাঙালীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা শেষ হয়ে যায়।

মানুষ, বিশেষ করে ভবঘুরে, একলা থাকলে আর্থিক দুশ্চিন্তায় পড়ে না। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা এইরকম ছিল। কিন্তু ঘর-সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা হওয়ার পর এইরকম বেপরোয়া ভাব থাকতে পারে না। তার আগামী দিনের জন্য চিন্তা হয়, এবং আরো চিন্তা হয় সেই সময়ের জন্য যখন সে থাকবে না। আমার মাথায় এই ভাবনাই ঘুরছিল। যদিও কিতাব মহলের লোকেরা রয়্যালটি ২০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ করে নেয়ার পর মাসিক ৫০০ টাকা নিয়মিতভাবে দেবে বলে কথা দিয়েছিল। চীন বা চেকোশ্লোভাকিয়ায় যাওয়ার কথা বললে কমলা একটুও নরম হতো না আর বলত, 'অন্যদেরও তো বাচ্চা আছে, নাকি?' হ্যাঁ, এটা ঠিক যে অন্যদেরও বাচ্চা আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সহায়-সম্বলহীনদের অবস্থা কী রকম হয় তাও আমরা দেখতে পাই। 'অন্তত দু-তিন বছরের জন্য চলো।' কিন্তু তার তো 'হমে হ্যায় প্যারী হমারী গলিয়াঁ'[২]। মনে পড়ে। সে ভাবে যে, এম এ করতে আর তো এক বছর মাত্র বাকি। কালিম্পঙে পড়ানোর কাজ যোগাড় করে ফেলব। কিন্তু পড়িয়ে মাসে এক-দেড়শো টাকার বেশি পাওয়া যাবে না, তার অর্ধেক তো বাড়ির ভাড়া দিতেই চলে যাবে।

নভেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে আমার দিনলিপি ছিল এই রকম—সকাল সাতটায় ওঠা, সাড়ে-সাতটায় চা-জলখাবার খাওয়া, তারপর বসে সাড়ে এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত বই লেখা,

[১] 'পাঁচজনের রায়কে মাথা পেতে নেব কিন্তু আমার মতটাই থাকবে।'—স·ম·

[২] 'আমার গলিই আমার প্রিয়।'—স·ম·

সাড়ে বারোটার সময় খাওয়া, খবরের কাগজ ও চিঠিপত্র পড়া। সংশোধন করতে করতে তিনটে-সাড়ে তিনটে বেজে যেত। কখনও এক-আধ ঘণ্টার জন্য ঘুমোনো, পাঁচটায় চা-খাওয়া। তারপর রাত সওয়া আটটা পর্যন্ত লেখানো কাগজ বা প্রুফ দেখা, আধঘণ্টা রেডিওর খবর শোনা, আবার কাজ করতে করতে রাত প্রায় সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়া। এরই মাঝে জয়া আর জেতার সঙ্গে খেলাও ছিল। জয়া এখন অনেক কথা বলতে শুরু করেছিল।

২৪ নভেম্বর রীওঁয়া জেলার তরুণ ভবঘুরে শম্ভুদয়াল ত্রিপাঠী এলেন। বয়স হবে বছর কুড়ি। খুব কষ্টে ম্যাট্রিকে প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছেন। সায়েন্স পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু এগোনোর কোনো রাস্তা নেই। কয়েক বছর ধরে স্কুলে মাষ্টারী করলেন। ৬০-৭০ টাকা পেতেন। আরো লেখাপড়া করা এবং ঘোরার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিল না। আমার কয়েকটি বই পড়ে ফেলেছিলেন। ভেবেছেন পশ্চিমে ভারতের সীমানা পেরিয়ে গেলেই পাকিস্তান এসে পড়বে যার সঙ্গে লেগে রয়েছে আফগানিস্তান, তারপর তো দু-পা গেলেই সোভিয়েত রাশিয়া। যদি সেখানে চলে যাই তাহলে সায়েন্স পড়ার রাস্তা খুলে যাবে। কোনো রকমে সীমানা পার হয়ে পাকিস্তানী পাঞ্জাবে পৌঁছই। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। 'কেন এসেছ?' শুধোলে আজেবাজে গল্প শুরু করলেন—'পাকিস্তানে তরুণদের পড়াশোনার খুব ভাল ব্যবস্থা আছে, এই ভেবে আমি চলে এসেছি।' জবাব পেল—'এসেছ ভাল করেছ। আইন ভেঙেছ বলে একমাস গোলঘরে চলো।' সাজা পার হওয়ার পর আবার সীমানার কাছে এনে বলা হলো—'এখন তুমি এখান থেকে চলে যাও।' বেচারা অমৃতসর এলেন, কাছে কোনো পয়সাকড়ি ছিল না কিন্তু সততার সঙ্গে কোনো কাজ করতে ভবঘুরের ইতস্তত করা উচিত নয়, এই কথাটি তাঁর জানা ছিল। কয়েক সপ্তাহ হোটেলে গিয়ে বাসন ধুতে লাগলেন তারপর সেখান থেকে হেঁটে চণ্ডীগড় এলেন। কোথাও পড়াশোনা করার সুযোগ মিলল না। শেষে ঘুরতে ঘুরতে মুসৌরী পৌঁছলেন। আমি কী সাহায্য করতে পারি? তরুণকে দেখে খুব করুণা হচ্ছিল। ভিখিরির মতো ময়লা আর ছেঁড়া পোশাক। খালি পা, গায়ে ঢাকা দেবার জন্য বস্তা জোগাড় করেছিলেন। কে জানে কত ক্ষুধার্ত ছিলেন। খাওয়ালাম। অনেকগুলো পরিচয়পত্র দিলাম। একটি জায়গার নাম বললাম যেখানে টেকনিক্যাল শিক্ষা পেতে পারেন। এটাও বললাম, 'তুমি যদি সায়েন্স ছেড়ে সংস্কৃত পড়তে চাও তাহলে তো সাধু হয়ে এই কাজটি সহজে করতে পার।' কিন্তু সে সাধু হতেও রাজি ছিল না, সংস্কৃত পড়ারও ইচ্ছে ছিল না। 'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ (তোমার কল্যাণ হোক)—এই কামনাটুকুই আমি করতে পারতাম।

এবার যোধপুরের ঠাকুরানী গুলাবকুমারী ২৮ নভেম্বর মুসৌরী থেকে গেলেন। এ অবস্থা শুধু তাঁরই ছিল না, পুরনো রাজা, জায়গীরদার ও জমিদার শ্রেণীর এই রকমই অবস্থা। তাঁরা নিজেদের রাজধানীতে থাকতে চাইতেন না। যেখানে বহু প্রজন্ম ধরে তাদের নিরঙ্কুশ শাসন ছিল সেখানে জনসাধারণের মতো কিভাবে থাকতে পারতেন? থাকলেও তোষামুদে মোসাহেবরা এসে ঘিরে ধরত। কারো ঘরে বিয়ে, কেউ ছেলেদের পড়াশুনো চালাতে পারছে না, কারো ঘরে খরচ চালানোর টাকা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি সত্যিমিথ্যে বলে তারা কিছু প্রত্যাশা করত। না দিলে তাদের রাগ আর নিন্দাভাজন হতে সহ্য হতো। সংকোচ করেও কিছু দিতেই হতো। রোজগার সামান্য এবং গোনাগুনতি। এদের সবার হাত থেকে বাঁচার জন্য, মুসৌরীর মতো কোনো

পাহাড়ী জায়গায় যাঁদের থাকার ব্যবস্থা আছে তাঁরা এখানে সবার আগে আসেন আর শীতের সময়েই ফেরেন। তালুকদাররা তাদের প্রাসাদের মতো বাড়ি ভাল ভাল ভাড়ায় কোনো সরকারি অফিসকে দিয়ে দিয়েছেন এবং নিজেরা ভাড়ায় ছোটখাটো বাংলো নিয়ে রেখেছেন, সেখানে তাঁরা শীতের দু-চারটে মাস কাটিয়ে দেন। সবচেয়ে উচ্চশ্রেণীর আজ এই অবস্থা। তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো টাকা যদি পেয়েও যায় তাহলে সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে কখনোই শেখে নি। কয়েকজন তো মহারানা উদয়পুরের মতো মনে করে যে নিজের সারাটা জীবন পুরনো দিনের মতোই কাটিয়ে দাও, পরের কথা পরবর্তী প্রজন্মের লোকরা বুঝবে।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ 'সংস্কৃত কাব্যধারা' (৫০ জন কবির কাব্য সংগ্রহ) শেষ হয়ে গেল। আমি প্রতিটি কবির ততগুলি করে উদাহরণ দিতে চাইলাম যাতে কবির বৈশিষ্ট্য পাঠক বুঝতে পারে। পুস্তকের বাম দিকে মূল সংস্কৃত আর ডানদিকে প্রতি পঙক্তির হিন্দি অনুবাদ রাখা হয়েছে। কবিদের কালানুক্রমিকভাবে রেখে পরিচ্ছেদগুলি তৎকলীন কথ্যভাষার অনুরূপ কাল-বিভাজন দ্বারা উপস্থিত করা হয়েছে। ছন্দস্ বা সংস্কৃত কালের জন্য ঋগ্বেদের বহু কবি (ঋষি)-কে নিয়েছি। পালি-যুগের জন্য মহাভারত আর রামায়ণ থেকে উদাহরণ নিয়েছি। প্রাকৃত-যুগে অশ্বঘোষ থেকে কালিদাস-শূদ্রক পর্যন্ত কবিদের কবিতা দিয়েছি। অপভ্রংশযুগে দণ্ডী থেকে হীর-পুত্র শ্রীহর্ষর নমুনা দিয়েছি। মুঘল যুগেরও তিনজন কবি ও মহিলা কবি এসেছেন। কালানুক্রমিকভাবে এই কবিতাগুলি পড়লে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ভাষা আর ভাবের বিকাশ ভালভাবে বোঝা যায়। পুরো বইটির ওপর একটি সুন্দর ভূমিকা এখনই লিখতে হবে। প্রত্যেক যুগের জন্য একটি ছোট্ট ভূমিকা আর প্রত্যেক কবির পরিচয় পাঁচ-দশ লাইনে দিয়ে দিয়েছি। সংক্ষিপ্ত করার ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থ ৫০ ফর্মার হয়ে গেল।

৭ ডিসেম্বর 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস' (১ম)-এর কয়েক গ্যালি ফার্স্ট প্রুফ এল। দ্বিতীয় খণ্ড লক্ষ্ণৌ-এর ন্যাশন্যাল হেরল্ড প্রেসে পচছে। প্রথম খণ্ড সম্মেলন মুদ্রণালয়ে ছাপা হচ্ছিল। দেখি এখানে কীরকম অভিজ্ঞতা হয়। নানান প্রেসের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ ছিল। ৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির চিঠি এল। তিনি লিখেছিলেন, 'চীনের পাসপোর্টের জন্য আমি পন্তজীকে লিখে দিয়েছি এবং দেখা হলেও বলে দেব।' আসলে, পাসপোর্ট যাঁর নাম সই হয়ে পাওয়া যায়, তিনিই যদি রাজি থাকেন তাহলে পাসপোর্ট পেতে আর কী অসুবিধা হতে পারে? কিন্তু যতক্ষণ তা হাতে না আসছে ততক্ষণ বিশ্বাস করা যায় না।

১১ ডিসেম্বর ২২ বছর পর লাহুলের ঠাকুর পৃথ্বীচন্দ তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলেন। ১৯৩৩ সালে লাদাখ থেকে ফেরার সময় লাহুলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং বিভিন্ন জায়গা দেখার সময় তিনি আমার সঙ্গে থেকে ছিলেন। মাতৃভাষা তিব্বতী হওয়ায় কলেজের পড়াশোনায় খুব অসুবিধে হচ্ছিল, সেজন্য সে সময় তা ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসেছিলেন। পরে টেরিটোরিয়্যাল ফৌজে ভর্তি হয়ে গেলেন। যুদ্ধের দিনগুলোতে তিনি আর তাঁর খুড়তুতো ভাই (ঠাকুর মঙ্গলচন্দের ছেলে) খুশহালচন্দ কমিশন পেয়ে গেলেন। এখন দুজনেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল ছিলেন। কোথায় সেই সময়কার নবযুবকের শরীর আর কোথায় এখনকার ৪৫ বছরের প্রৌঢ়! স্ত্রী হচ্ছেন ধর্মশালার নেপালী মেয়ে যাকে ১৫ বছর আগে তিনি বিয়ে করেছিলেন। কোনো সন্তান নেই। ভাই আর শ্বশুরবাড়ির পরিবারের বাচ্চাদের

পালন-পোষণ করেই সন্তুষ্ট। দেরাদুনে এক বছরের বেশি তাঁদের থাকা হয়ে গিয়েছিল এবং হঠাৎ কেউ আমার মুসৌরীর ঠিকানা দিল। ইন্দো-চীনে যেসব ভারতীয় সামরিক অফিসাররা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ঠাকুর পৃথ্বীচন্দও ছিলেন। সেখানে তিনি ভিয়েতনামী কমিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমি লাদাখ সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে বিশেষ করে শুনতে চাইছিলাম। আমি শুনেছিলাম তিনি লাদাখের প্রতিরক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। বলছিলেন যে পাকিস্তানীরা যখন লাদাখ আর জাঁস্করের ওপর হামলা করেছিল তখন আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। যতই হোক, লাহুলের সীমা ছিল তার গায়ে লাগানো। আমরা দুজনে নিজেদেরকে সরকারের কাজের জন্য অর্পিত করে বললাম, 'আমরা লাদাখ যেতে চাই।' সরকারের সমস্ত মনোযোগ ছিল কাশ্মীর উপত্যকার দিকে। লাদাখের গুরুত্ব সে বুঝত না। আমরা ২৫ জন সৈনিক, প্রায় দুশো বন্দুক আর গুলি পেলাম। তাই নিয়ে আমরা লাদাখ পৌঁছলাম। পাকিস্তানীরা লেহ-এর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। লাদাখীরা তাদের বস্তা-বিছানা বেঁধে তিব্বত পালানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের তিব্বতী ভাষাভাষী এবং বৌদ্ধ হওয়াটা সে-সময় খুব কাজে লেগেছিল। আমরা তাদের আটকাতে সক্ষম হলাম। কয়েকজন তরুণকে দ্রুত গুলি চালাতে শেখালাম। শেখানোর জন্য তো দু-চারটে দিনও ছিল না। তাই কার্তুজ ভরা আর ঘোড়া টেপাটুকু শিখিয়ে আমাদের দু-একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনার সঙ্গে তাদের নিয়ে পাকিস্তানীদের পিছনে লাগলাম। যখন দু-এক মাইল আমরা তাদের তাড়াতে সফল হলাম তখন লাদাখীদের সাহস বাড়ল, তারা সানন্দে স্বেচ্ছাসেবক হতে শুরু করল। কিন্তু আমাদের কাছে অত হাতিয়ার ছিল না। যখন প্রায় তিনমাস হয়ে গেল তখনও আমরা পাকিস্তানীদের পিছনে ধাওয়া করতে লাগলাম। সাহায্য এল। আর ওদিকে জোজিলা থেকে আমাদের ট্যাঙ্কও করগিলের দিকে এল। পাকিস্তানিরা পালাল। আমরা সিন্ধু উপত্যকা থেকে তাদের তাড়াতে পারতাম কিন্তু এই সময় অস্থায়ী সন্ধি হয়ে গেল এবং আমাদের থেমে যেতে হলো। পৃথ্বীচন্দ আর কর্নেল খুশহালচন্দ দুজনেই এই বীরত্বের জন্য 'মহাবীর চক্র' পেয়েছেন। বন্ধুদের এই কাজ আমার পক্ষেও ছিল গর্বের ব্যাপার।

ঠাকুর পৃথ্বীচন্দ উত্তর-ভিয়েতনামের অবস্থা দেখে খুব প্রভাবিত হয়েছেন। বলছিলেন, পিঁপড়েদের মতো সেখানে প্রতিটি মানুষ কাজে লেগে রয়েছে। যুদ্ধের ফলে দেশের সর্বনাশ হয়েছে, অনেক জিনিসের সেখানে ভীষণ অভাব, তবু সমস্ত লোক খুশি মনে নিজের দেশের নব-নির্মাণে যুক্ত হয়েছে। আমাদের এখানে বিশেষ করে সামরিক অফিসারদের অবস্থা দেখে তিনি তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। বলছিলেন যে, এখানে উন্নতির জন্য চালাকি আর সুযোগ থাকলে ঘুষ-টুষ খুব চলে। যার জন্য সৎ সামরিক-অফিসাররা বিরক্ত হয়ে গেছে। তারা বলে, 'আমরা আমাদের ছেলেদের এখন সেনাবিভাগে পাঠাব না।' আমি শুধোলাম, 'আর যদি দেশের সংকট উপস্থিত হয়?' ঠাকুর সাহেব বললেন, 'তাহলে তো আমাদের সর্বস্ব দিয়ে তা ঠেকাতে হবে? আমরা আমাদের স্বাধীনতা দ্বিতীয়বার হারাতে রাজি নই।'

কমলা তার শিক্ষিকা কালিম্পঙের হাইস্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে লেখার সময় জানিয়েছিল যে, এম এ করে সে হয়তো কালিম্পং চলে যাবে। তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করে লিখলেন, 'তোমার নিজের স্কুলে এসে পড়ানো উচিত।' আরো একটি খুঁটির জোর পাওয়া গেল। এখন সে শুধু কালিম্পঙেরই স্বপ্ন দেখতে লাগল।

দেরাদুন—গত বছর ১৮ ডিসেম্বর বুকে ব্যথা হয়েছিল। সে জন্য ১৪ ডিসেম্বর এখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশে মেঘ ছিল, মুসৌরীতে ঠাণ্ডা ছিল ভীষণ। দেড়টার সময় ঘর থেকে বেরোলাম। জয়া কাঁদতে লাগল। গোপালু জিনিসপত্র নিয়ে পেছনে রয়ে গিয়েছিল বলে বাস পেলাম না। বিকেলে ট্যাক্সি ধরে শ্রীগয়াপ্রসাদ শুক্লজীর বাড়িতে যখন পৌছলাম তখন অন্ধকার হতে শুরু করেছিল।

সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ আর বুলগানিন তিন সপ্তাহের জন্য ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের আশাতীতভাবে স্বাগত জানানো হলো। ভারতের অধিকাংশ লোক গরিব অথবা অনিশ্চিত জীবনযাপনকারী। তারা গত দেড় প্রজন্ম ধরে রাশিয়ার নিশ্চিন্ত জীবন সম্বন্ধে শুনে আসছিল এবং সকলেই কামনা করত যে আমাদের দেশও কবে সেই রকমের হবে। দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিরা সবসময় হাজার রকমের মিথ্যা কথা বলে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার করেছে কিন্তু আমাদের জনসাধারণের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি। আজ যখন তাদের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া গেছে, তখন তারা প্রত্যেক জায়গার প্রদর্শনী আর সভাগুলিতে কেন পুরনো রেকর্ড ভাঙবে না? আজই রুশ নেতা দিল্লী থেকে কাবুল গেছেন। আমাকে লোকে জিজ্ঞেস করছিল, 'এর প্রভাব কী রকম হবে?' আমি বললাম, 'পুঁজিপতিদের এবং তাদের হাতে যারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে তাদের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না, তারা ঈর্ষায় দগ্ধ হবে। যাঁরা আগে থেকেই সোভিয়েতের হিতৈষী ছিলেন তাঁদের উৎসাহ দ্বিগুণ হবে। মাঝের দ্বিধাগ্রস্ত লোকেদের মধ্যে অনেকে সত্যিকারের ব্যাপারটি জানতে পারবে এবং তারা আমেরিকান প্রোপাগাণ্ডার জাল থেকে বেরিয়ে আসবে।'

যদিও হিমালয়ের দুটি বই ছাড়া বাকি সব বই দ্বিধার মধ্যে পড়েছিল, তবু আমাকে নিজের কাজ সম্পূর্ণ করতেই হতো। 'হিমাচল প্রদেশ' আর 'জৌনসার-দেহরাদুন'ও আমি লিখে ফেলেছিলাম। দেরাদুন জেলা সম্বন্ধে আরো কিছু ব্যাপার সংযোজিত করতে চাইছিলাম। ১৫ ডিসেম্বর কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি গাড়ি পাওয়া গেল। তাতে চড়ে শুক্লজী আর মেহতাজীর সঙ্গে আমি বেরোলাম। চুহড়পুর বাজার হয়ে যমুনা পুল পেরোনোর আগেই ডানদিকে আরো কিছুদূর গিয়ে, পাকা রাস্তা থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে সেই জায়গায় পৌছলাম যেখানে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রাজা শীলবর্মা যজ্ঞ করেছিলেন। সাহারনপুরের লালা জগতপ্রসাদ জঙ্গলের কয়েকশো একর জমি নিয়ে এখানে নিজের ফার্ম বানিয়েছিলেন। বুলডোজার দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করলে তার ফালে কয়েকটি ইট আটকে গেল। খোঁড়ার পর অনেক ইট দেখে লালাজী ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগকে খবর দিলেন। গত দু-বছরে তারা খনন করেছে। জানা গেল, শীলবর্মা এখানে অন্তত চারটে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। অনেক ভাঙা ইঁটে কুষাণ-ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা ছিল। সম্পূর্ণ লেখাটি দিল্লী নিয়ে গিয়েছিলেন। তা ছিল এইরকম—

নৃপতেবর্ষিগণ্যস্য পৌণাষষ্ঠস্য ধীমতঃ
চতুর্থস্যাশ্বমেধস্য চিত্যায়ং শীলবর্মণঃ।
সিদ্ধং। ওঁ, যুগেশ্বরস্যাশ্বমেধে যুগশৈলমহীপতেঃ।
ইষ্টকা বাষর্গণ্যস্য নৃপতেঃ শীলবর্মণঃ।

শীলবর্মার চতুর্থ অশ্বমেধের এটি ছিল চিতি (বেদি)। খনন করার পর কাছেই আরো দুটি

চিতি পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু চতুর্থটি পাওয়া যায় নি। অশ্বমেধ চুপি চুপি করা যায় না। তাতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে প্রতিবেশী রাজাদের যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ জানানো হতো, তাতে অনেক রাজা সমবেতভাবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। কাজেই শীলবর্মা নিশ্চয় শক্তিশালী রাজা ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সেই সময় কাছের পাহাড়টির নাম ছিল যুগশৈল, তিনি ছিলেন যার মহীপতি। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের উত্তর-ভারতের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। এটুকুই জানা যায় যে, কুষাণ-রাজত্ব এখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল এবং প্রতাপশালী গুপ্তযুগ আসতে এক শতাব্দী না হলেও বেশ কয়েক দশক দেরি ছিল। এই সময়েই হয়তো কুরু আর উত্তর-পাঞ্চাল নিয়ে পুরো পাহাড় জুড়ে শীলবর্মার শাসন ছিল। তার থেকে চার-পাঁচশো বছর আগে এখান থেকে যমুনা পেরিয়ে কিছুটা দূরে আধুনিক কালের একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল, যার গুরুত্ব বুঝে অশোক তাঁর শিলার ওপর নিজের ধর্মলিপি খোদাই করিয়েছিলেন। আমরা অশ্বমেধ যজ্ঞের বাজের (শ্যেন) আকারের চিতিটি দেখছিলাম। সেই সময় লালাজীর গোমস্তা এসে পড়লেন। চৌকিদার বলছিল, 'এতে ঘোড়ার হাড়ও পাওয়া গিয়েছিল। কারপর্দাজ সাহেব আর্যসমাজী ছিলেন, তিনি কী করে মানতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্মযুগে যখন বেদ ও ভগবানের প্রভাব চারদিকে, তখন কেউ ঘোড়া মেরে যজ্ঞ করতে পারে? ঘোড়া শুধু মারতই না উপরন্তু যজ্ঞের সমাপ্তি হিসেবে তার প্রসাদও পুরোহিত এবং যজমান গলাধঃকরণ করত—এটা তিনি কি করে মানেন? তিনি বললেন যে, কয়েকজন পণ্ডিত হাড়গুলি ঘোড়ার বলে জানিয়েছেন কিন্তু এতে সন্দেহ আছে। সন্দেহের কথা তিনি তাঁর মতো লোকেদের পক্ষ থেকে বলছিলেন। আমি বললাম, 'সন্দেহ আছে? ওই বিরাট জানোয়ারের হাড় ঘোড়ার না হলে এমন কোনো জানোয়ারের হবে যা মেনে নেওয়া আপনার পক্ষে আরো খারাপ হবে।' কিন্তু এটা গোমেধ ছিল না কারণ শীলবর্মা স্বয়ং এটাকে অশ্বমেধ লিখেছেন। আসলে এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে তর্ক করাটাই খারাপ।

সেখানকার ফার্ম খুব বড়। পুঁজিওলা লোকেরা ফার্মগুলি থেকে পয়সা রোজগার করতে চায় আর তা এমন জায়গায় করতে চায় যেখানে ঝামেলা সবচেয়ে কম। আগে জমিদারি এর জন্য উপযুক্ত মনে করা হতো এখন তারও মূলোচ্ছেদ হয়েছে। খেতও একটা মাত্রা পর্যন্ত রাখতে পারা যায় কিন্তু ফল বা অন্যান্য জিনিসের আধুনিক ঢঙের ফার্মে একরের কোনো সীমা নেই, এটি জেনে এখন তারা এই ধরনের ফার্মে টাকা ঢালতে শুরু করেছে। সেখানে বুলডোজার আর ট্রাক্টর ছিল, নিয়মমাফিক অফিস ছিল। খেত সদ্য-সদ্য বোনা হয়েছিল। হাজার হাজার বছর ধরে যেখানে জঙ্গলের গাছের পাতা পচছে আর জমি মাটিতে পরিপূর্ণ, সেখানে অবশ্যই ফসল প্রচুর হবে। আমরা ফিরে ডান দিকের পথে এলাম। বাঁয়ে এবং সামনের দিকে সেই রকমই একটা পথ অশোক আশ্রমের দিকে গেছে দেখা গেল। শ্রীধর্মদেব শাস্ত্রীজী আসার জন্য অনেকবার বলেছিলেন, এখন ভাল সুযোগ ছিল। কয়েকটি খেতে খেতে তারপর আবার জঙ্গল হয়ে আধ মাইল যেতে হলো। শাস্ত্রীজী আশ্রমেই ছিলেন। আগের বারে ১৯৪৩ সালে যখন কালসী এসেছিলাম তখন তিনি জেলে ছিলেন আর একটি ভাঙাচোরা মতো বাড়িতে ছিল অশোক আশ্রম। তাকে আরো বড় করার জন্য এই জঙ্গলে আনা হয়েছিল। আশ্রমে যথেষ্ট জায়গা আছে, সেখানে চাষবাস এবং শাক-সবজিও হয়। আশ্রমের কাজ অনেক বেড়ে গেছে। তারা হিমালয়ের

হরিজন আর পিছিয়ে থাকা প্রজাতিদের সেবার কাজ করছিল। কনৌরের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা অঞ্চল হঙ্গরঙ্গ, চম্বার পাঙ্গী আর এই রকমই দূর দূর জায়গায় তারা পাঠশালা, হস্তশিল্প ও চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই সময় বহু কর্মকর্তা শিক্ষণ শিবিরের জন্য এসেছিলেন। পরের দিন পিছিয়ে থাকা প্রজাতির বড় অফিসার আসার ছিল। সাড়ে চারটেতেই আমাদের গাড়ি মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার ছিল বলে প্রতিটি মিনিট হিসেব করে খরচ করতে হচ্ছিল। কিন্তু শাস্ত্রীজীর ছাত্রদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখা এবং সামান্য জলখাবার খাওয়া অনিবার্য ছিল। বেচারা শুক্লজীর স্ত্রী কুম্ভ ও অর্ধকুম্ভ ছাড়া দেরাদুন থেকে বাইরে খুব কমই গেছেন। এই সময় তাঁকেও নিয়ে এসেছিলাম। সঙ্গে তাঁর দুই নাতনি মধু আর সুধাও ছিল। অশোক আশ্রমের কাজে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, যদিও তার অর্থ এই নয় যে, সেটা রোগের অব্যর্থ ওষুধ।

মোটরে করে ফিরে পাকা রাস্তায় এসে যমুনার পুল পার হলাম। কালসী যাওয়ার নীচের রাস্তা ছেড়ে ওপরে চলে গেলাম। সেদিক দিয়েও একটি রাস্তা বাজারে যাচ্ছিল। বাজারে পৌঁছলাম। যদিও এখনো কালসী বারো বছর আগের মতোই ধুঁকছিল কিন্তু এবারে পাঁচ-ছটি দোকান দেখলাম। শীতে চকরৌতা তহসিল এখানে উঠে আসে, হয়তো সে-কারণেই এটা হয়েছে। খেতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল আর সুধা-মধুর খিদে পেয়ে গিয়েছিল। বাজারে একটি মন্দিরের সামনে বাঁধানো বেদি পাওয়া গেল। সেখানেই খাওয়ার ব্যাপারটা সেরে ফেলতে শুরু করলাম। পাশের দোকানদার দেখা গেল খুব ভদ্র।শতরঞ্চি এনে বিছিয়ে দিল। কাছেই নির্মল জলের নালা বইছিল। এটা সম্ভবত অশোকের সময়ও এইভাবেই বইত। এখানেই বসে খাওয়া-দাওয়া করলাম। শুক্লজীর স্ত্রী নানান রকমের খাবার বানিয়ে এনেছিলেন। ঘরে পাতা দইও আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি বললাম যে ঝাঁকুনিতে সব দই পড়ে যাবে। যাকগে, পুরী ছিল, আর তা এত বেশি পরিমাণে ছিল যে ড্রাইভারসহ আমরা সবাই খেয়ে শেষ করতে পারলাম না। কপিলজী এখন চকরৌতা তহসিলে পেন্সন পেয়ে গ্রাম-সংস্কারের কাজে সময় দিচ্ছিলেন, তিনি এখন এখানেই ছিলেন। তিনি নীচের রাস্তায় আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন আর আমরা অন্য পথ দিয়ে চলে এলাম। ফেরার সময় তাঁর দেখা পেলাম। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল আর ওদিকে সময়েরও অভাব ছিল. তাই সামান্য কথাবার্তা হলো। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, এখানে কালসীর খেতগুলিতেও কোথাও কোথাও পুরনো গ্রামের অবশেষ পাওয়া যায়।

ফেরার সময় সরকারি ডেয়ারিটিও দেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আর সময় ছিল না, তবে অশোকের অভিলেখটা দেখা জরুরি ছিল। পাকা রাস্তায় মোটর রেখে আমরা যমুনার তীরে সেই শিলার কাছে গেলাম যার ওপর অশোকের অভিলেখ আছে এবং যেটাকে রক্ষা করার জন্য বাড়ি বানিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। দরজায় তালা লাগানো ছিল, চৌকিদার ছিল না। আমরা বাইরে থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকলাম। ফেরার সময় দশ পা দূরে একটি বাড়ি আর একজন ফর্সা মতো লোককে দেখলাম। তিনি জানালেন, 'আমি কাশ্মীরের দরদ।[১] ব্যবসার ব্যাপারে এখানে এসেছি আর বাড়ি বানিয়ে এই জমিতে চাষ করেছি। আমরা সাড়ে চারটের সময় দেহরা পৌঁছে গাড়ি

[১] কাশ্মীরের একটি সম্প্রদায় বিশেষ।—স·ম·

ফেরৎ দিতে সফল হলাম।

১৬ ডিসেম্বর এখানকার এক সম্ভাবনাময় তরুণ ভাবী উকিল সস্ত্রীক এলেন। তিনি এম এ, এল এল বি এবং ফারসীতেও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত। স্ত্রী এম এ। তিনি চাইছিলেন যে, তাঁর স্ত্রীর পি এইচ ডি-র নির্দেশক আমি হই। যেসব মেয়েদের বাড়িতে খুব কাজ থাকে না তারা যদি নিজেদের সময় আরো কিছুটা পড়ায় ব্যয় করে তাহলে ভালই হয়। কিন্তু আমাদের এখানে অধিকাংশ মেয়ের ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি এখন অলংকারের কাজ করে। তাদের শরীরে যেমন কয়েক হাজার টাকার সোনার আর জড়োয়ার অলংকার দরকার, তেমনই এম এ পি এইচ ডি-ও তাদের শোভার জিনিস। আমি তাঁকে বললাম, 'রহিমকে নিয়ে আপনি গবেষণা করুন। রহিম সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য ফারসীতে পাওয়া যায়, যে-ব্যাপারে আপনার স্বামী সাহায্য করতে পারবেন।'

দিল্লী—সেই দিনই সন্ধের গাড়ি ধরলাম। ১৭ তারিখে সাড়ে পাঁচটায় দিল্লী পৌঁছে গেলাম। রিকশা নিয়ে ভাইয়ার বাড়ি গেলাম। সেখানে তালা বন্ধ ছিল। অন্ধকার না কাটা পর্যন্ত বসে অপেক্ষা করতে হলো। দিল্লী আসতে হয়েছিল প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের জন্য, যা আজই শুরু হওয়ার ছিল। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্ত উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। তারপর সভাপতি শ্রীঅনন্ত শয়নম্ আয়াঙ্গার সভাপতির ভাষণ দিলেন। দিল্লীর দেবতাদের মধ্যে দুজন হিন্দির পক্ষ সমর্থন করলেন কিন্তু যতক্ষণ স্তূপের ওপর সাপ বসে আছে ততক্ষণ হিন্দির পথ পরিষ্কার হয় কী করে? প্রধান মন্ত্রী কখনো কখনো মুখে হিসেব দিয়ে দেন, সে-ও একদিক দিয়ে যদি তিনি হিন্দিকে কিছুটা সমর্থন করেন তো অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে দ্বিগুণ উপাদান দিয়ে দেন। শিক্ষামন্ত্রণালয় তো এইজন্য তৈরি হয়েছে যাতে হিন্দির পথে পদে পদে বাধা পড়ে। আমি এই কথাগুলি আগের দিনের ভাষণে বলেছি। সেখানে আচার্য চতুরসেন শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে খুব ভাল লাগল। তিনি আমাদের প্রজন্মেরই লোক এবং আমারই মতো সংস্কৃত থেকে কথা-সাহিত্যের জগতে এসেছেন।

১৮ ডিসেম্বর সাথী অজয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি শুনেছিলাম, তাঁর স্ত্রী ড· গোপীচন্দ ভার্গবের কন্যা, কিন্তু এটা বুঝিনি যে তিনি আমার পূর্বপরিচিতাও। তারপর চন্দ্রগুপ্তজীর বাড়ি গেলাম। দিল্লী কেন, আমাদের কোনো জায়গার আমলারা জনতার প্রাণের কথা মোটেই ভাবে না। বর্ষায় বন্যা হলো, নর্দমার জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশে গেল। স্বাস্থ্য বিভাগ সেটা গ্রাহ্য করল না আর এখন সেই কারণে লোকের জণ্ডিস হচ্ছিল। চন্দ্রগুপ্তজীও জণ্ডিসে ভুগছিলেন। জ্বর ভীষণ উঠে গিয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন, আনাড়ি ডাক্তার ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ায় জণ্ডিস হয়েছে কিন্তু এখন জানা গেছে যে, জণ্ডিসের কারণ ইঞ্জেকশন ছিল না।

আড়াইটের সময় সম্মেলনের সাহিত্য পরিষদের অধিবেশন শুরু হলো। সভাপতি পদের ভাষণ আমি দিলাম। দিল্লীর দেবতাদের দুর্বিনীত মনোভাবের ওপর বেশ কড়া করে বলে দিলাম। এই কথাগুলি দেবতাদের কান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তার জন্য তো ইংরেজিতে বলা দরকার। কিন্তু আমি দেবতাদের ওপর বিশ্বাস রাখি না। আমার কাছে জনতাই সব কিছু।

হিন্দিকে যদি সংবিধানে সংঘের ভাষা বলে স্বীকার করা হয়েছে তাহলে তা দেবতাদের কারণে নয়, জনতার কারণে। দেবতারা জানতেন যে ভোট চাইতে লোকের কাছেই আমাদের যেতে হবে, হিন্দির বিরোধিতা করলে আমরা অনেক ভোট হারাব, এইজন্য দেব-মহাদেব সকলকেই হিন্দির পক্ষে হাত তুলতে হয়েছিল। আরও কয়েক হিন্দি সাহিত্যিক ভাষণ দিলেন। পণ্ডিত বেনারসী দাস চতুর্বেদীর ভাষণ ছিল খুবই সুন্দর এবং মজার। জৈনেন্দ্রজী দর্শন আউড়ালেন। নরেন্দ্র শর্মাও ভাল বললেন। সভা সমাপ্ত হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়লাম যাতে লালকেল্লায় শ্রীমতী সুন-ইয়াৎ-সেনের স্বাগত সভায় উপস্থিত হতে পারি। সাথী ফারুকী আধঘণ্টা অপেক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু দেরি করে এলাম, সময়ে যানবাহন পেলাম না আর যেতেও পারলাম না। দিল্লীতে থাকতে থাকতে, ছাপার অপেক্ষায় পড়ে থাকা আধ ডজনেরও বেশি বইয়ের জন্য প্রকাশক ঠিক করার ছিল। কিন্তু একটি মাত্র বই 'শাদী' (উপন্যাস) দিতে পেরেছিলাম, তাও ফেরৎ এল। সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলাম 'হিমাচল প্রদেশ' আর 'সংস্কৃত কাব্যধারা'-র জন্য। 'সংস্কৃত কাব্যধারা'র জন্য মাচবেজী লাড সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে খুব করে বললেন। তাঁর বাড়িতে প্রায় সাতটা নাগাদ পৌঁছলাম। একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর তিনি অফিস থেকে এলেন। পাণ্ডুলিপিটি দেখালাম। কিন্তু এই ধরনের সংস্কৃত কাব্য-সংগ্রহ অকাদেমি অন্য পণ্ডিতদের দিয়ে তৈরি করাচ্ছিলেন, এইজন্য তাঁদের পক্ষে এটা নেওয়া সম্ভব ছিল না। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। তারপর সেখান থেকে বেরোলাম। তাঁর বাংলো ছিল আওরঙ্গজেব রোডে, বাস স্ট্যান্ড থেকে অনেক দূরে। সে-রাতে কোনো যানবাহন পাওয়া যাচ্ছিল না, খুব হয়রানি হলো। অনুতাপ হচ্ছিল যে, কেন এই রাতে আসতে রাজি হলাম। যাকগে, আমার সঙ্গে শিবশর্মাও ছিলেন, তাই আমরা গিয়ে বাস ধরলাম। রাত প্রায় দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরলাম।

২০ ডিসেম্বর সকালে বেরোলাম। আমাদের যদিও দেখার ছিল আবদুর রহিম খানখানার সমাধি কিন্তু কাছেই নিজামুদ্দিনের দরগাও ছিল, যার ভেতরে আমীর খুসরোও শুয়ে আছেন। আশা করেছিলাম সেখানে হয়তো খুসরোর কয়েকটি বই পাওয়া যেতে পারে। তা পাওয়া গেল না। জানা গেল পাশেই গালিবের সমাধি-মন্দির। সেখানে গেলাম। কবরখানায় অন্যান্য কবরের মতো গালিবের কবরও হয়তো ছিল, কিন্তু এখন তার ওপর শ্বেতপাথরের মন্দির বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এক মহাকবিকে এরকম সম্মান দেওয়া হয়েছে দেখে খুব ভাল লাগল। সেখান থেকে বেরোলাম। মথুরাগামী রাস্তায় এলাম। কিছুদূর গিয়ে রহিমের বিশাল সমাধি-মন্দিরটি পেলাম। আকার হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরের মতোই। মাঝখানে কয়েক তলা উঁচু গম্বুজ আর চারদিকের চৌকো বেদির নীচে কয়েকশো ঘর আছে। সমাধি-মন্দিরের চারদিকে ন-দশ একর খালি জমি আছে। দু-এক বছর ধরে হিন্দির লোকেরা রহিমের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। এখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিক্ষা-মন্ত্রণালয়েরও মনোযোগ এদিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছে। 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও' বলছি এইজন্য যে, ভেঙে পড়া গম্বুজের সারানোর কাজ যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে এই শতাব্দীর শেষেও সারানো সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। যাকগে, জমির চারদিকে তার লাগানোর ব্যবস্থা চলছে। শিক্ষা-মন্ত্রণালয় ভালভাবেই জানে যে, এর ফলে হিন্দির পক্ষ মজবুত হবে। হিন্দির লোকেরা রহিমের সমাধি-মন্দিরকে নিয়ে নিজেদের কাবা খাড়া করবে। কিন্তু কাবা হিন্দির লোকেরা তৈরি করেনি, তা তো আগে থেকেই ওখানে বিদ্যমান আছে। রহিম দিল্লীতে

মারা গেছেন, সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে, এটা হিন্দির লোকেদের কাজ নয়। রহিমের জন্ম লাহোরে, ১৭ ডিসেম্বর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আর মৃত্যু হয়েছিল জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি, ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে।

রহিম ভাল দিনও দেখেছিলেন আবার খারাপ দিনও দেখেছিলেন। আকবর তাঁকে জাহাঙ্গীরের অতালীক (গুরু) বানিয়েছিলেন। সেই জাহাঙ্গীরই তাঁর ছেলের মাথা কেটে খরমুজের উপহার হিসেবে থালায় রেখে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। রহিমকে এখন উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, এটা ঠিক। সমাধি-মন্দিরে বসানো মার্বেল পাথরের অনেক অংশ সফদরজং তাঁর নিজের নামে তৈরি হওয়া ইমরাতের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখনও কিছু মার্বেল পাথরের খণ্ড বর্তমান আছে। ইমারতটি দর্শনীয় করে তুলতে হলে বেশ কয়েক লাখ টাকার দরকার হবে। আবার সব জায়গায় মার্বেল পাথরের খণ্ড বসিয়ে তার ওপর রহিমের অমূল্য দোঁহাগুলি লিখিত থাকা দরকার। এখানে গ্রন্থাগার, রঙ্গমঞ্চ করা হোক। এই সমাধিতেই রহিমের মূর্তি স্থাপিত হোক। আশপাশের জমিতে ফুলের বাগান করা হোক। লোকে এখানে এসে সাহিত্যসভা আর সমারোহ করুক। আজ থেকে একশো বছর পর রহিমকে নিয়ে দিল্লীর গর্বের সীমা থাকবে না।

ইচ্ছে হলো জামিয়া-মিলিয়াও চলে যাই। শিবশর্মা আর আমি একটা বাস ধরলাম। ভাল মানুষ গোছের ড্রাইভার জামিয়ার কাছ অব্দি পৌঁছে দিল। আমরা ঠিক সময়ে আসিনি। জামিয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের পরিচিত অধ্যাপক ড· সলামতুল্লা আর অন্যান্যরা ছুটি কাটাতে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। স্কুল দেখলাম। তারপর ট্রেনিং কলেজের দিকে গেলাম। কলেজের পরিচালক শ্রীহামিদ আলি খাঁকে পেলাম। তিনি তাঁর কাজ দেখালেন। এখান থেকে বয়স্কদের বিশ্বকোষ 'জ্ঞানসরোবর'-এর দশ খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডটি সদ্য সদ্য বেরিয়েছিল। বইটি কাজের ছিল। হিন্দির পক্ষপাতী কোনো লোক তাতে কোনো দোষ বের করতে পারত না। হামিদ আলি সাহেব বলছিলেন, 'আমরা এর পরে এটি প্রকাশ করা বন্ধ করে দিয়েছি কারণ সাম্প্রদায়িক হিন্দু সরকারের জামিয়া-মিলিয়াকে টাকা দিয়ে এই কাজটি করানোর জন্য বিশ্রী সমালোচনা হচ্ছে।' আমি জোর দিয়ে বললাম, 'অন্তত এর বাকি নটি খণ্ড না বেরোনো পর্যন্ত আপনি হাত গুটিয়ে নেবেন না। হিন্দি হিন্দুদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। কুতবন, মঞ্ঝন, জায়সী, রহিম এই ধরনের অধিকারকে মিথ্যে প্রমাণিত করেছে। মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলিতে মুসলমানরা উদাসীন থেকেছে কিন্তু সেই সময় খুব শিগগিরই আসছে যখন মুসলমানরা হিন্দির ভাল ভাল গল্পকার, প্রাবন্ধিক আর কবি হবেন। পুরো হিন্দি-এলাকায় মুসলমান তরুণ-তরুণীরা হিন্দি পড়ছে। তাদের নিজেদের যোগ্য স্থান পাওয়া থেকে কে বঞ্চিত করতে পারে? আচ্ছা, মুসলমান হওয়ার জন্য কি হিন্দি সাহিত্যিকরা বিভেদের মনোভাব দেখাবেন? যদি কিছু সংকীর্ণ মনের লোক এমনটি করতেও চান তাহলে তাঁরা তা করতে সফল হবেন না, এটা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

এটা ঠিকই যে, জামিয়া-মিলিয়ায় এখনো হিন্দির প্রতি উপেক্ষা রয়েছে এবং উর্দুকেই সর্বেসর্বা করে রাখা হচ্ছে। এখানকার ছাত্রদের মধ্যে এইরকম মনোভাব তৈরি করা হয় যার জন্য এখান থেকে বেরোনো তরুণ-তরুণীরা নিজেদেরকে বিশাল ভারতীয় জাতির অভিন্ন অঙ্গ না মনে করে পুরনো বিভেদকেই ধরে রাখে। ইতিহাসের এক তরুণ অধ্যাপক আমার দেওয়া

উপহার 'ভোল্‌গা সে গঙ্গা'-র উর্দু সংস্করণ এই কারণে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন যে, তাতে আকবরের এক মুসলমান আমীরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল হিন্দু ধনীর ছেলের সঙ্গে। এর ফলে সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। কিন্তু সময় এমন প্রতিক্রিয়াশীল লোকেদের সহায়ক হতে পারে না। হিন্দি জাতি এক হয়ে থাকবে, ধর্ম কেউ মানুক আর না মানুক। আমি মনে করি জামিয়ার সমস্ত লোক এইরকম অদূরদর্শী নয়। আমার রহিম-সম্বন্ধীয় বইয়েব বিষয়ে কিছু জানার ছিল। হামিদ আলি সাহেব গ্রন্থাগারিক নবী সাহেব এবং ভাইস চ্যান্সেলর মুজীব সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য বললেন। নবী সাহেব কয়েকটি বইয়ের নাম বললেন। মুজীব সাহেব খুব সহৃদয়তার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি দু-তিনটে বইয়ের কথা বললেন আর সেই সঙ্গে আমার ঠিকানা লিখে নিলেন। পরে তিনি অনেক বইয়ের নাম লিখে পাঠান।

সন্ধেতে রাষ্ট্রপতি ভবনে মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। জানতে পারলাম কালসীর খননে পাওয়া ইট এখানেই রাখা আছে। এখানেই শ্রীবৃন্দাবন ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জানতাম যে তিনি এখানে চলে এসেছেন। আজ থেকে ২৭ বছর আগে তাঁর বাবা রাখালবাবুকে আমি যে-বয়সে ইউনিভার্সিটিতে দেখেছিলাম তার চেয়েও এঁর বয়স বেশি মনে হচ্ছিল। সে-সময় কাজের ব্যাপারে শুধোলে রাখালবাবু বলেছিলেন, 'এখন তোমাদের কাজ করতে হবে। আমি তো বুড়ো হয়ে গিয়েছি।' রাখালবাবু আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ ছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মও সেই পথেই চলছে। বৃন্দাবনবাবু অনেক কথা জানালেন।

সেদিন আমার সভাপতির ভাষণের সময় যোধপুরের এক যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি হিন্দির গদ্যকাব্য লেখিকা শ্রীমতী দিনেশনন্দিনী চোরড্যার বাড়িতে উঠেছিলেন। দিনেশনন্দিনী এখন চোরড্যা নন, এখন তিনি ডালমিয়া—এখনো সাহিত্যের তাঁর প্রতি অনুরাগ আছে, আর লেখেনও। যুবকটি যখন এসে বললেন, 'উনি কথা চলতে চান' তখন আমি সম্মত হলাম এবং ২০ ডিসেম্বর সন্ধেতে ডালমিয়া ভবন গেলাম। দিনেশনন্দিনীজীর সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গ রাজনীতিতে চলে গেল। আমি তা নিয়ে উতলা ছিলাম না। এরই মাঝখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়াও এসে পড়লেন। আমাকে তিনি কী করে ভোলেন? একবার ডালমিয়া নগরে রাশিয়ার ওপর বলার তিনি বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে শোনার জন্য শেষ অব্দি বসে থেকেছিলেন। শ্রীমতীজী বলছিলেন, 'ধনী লোকেরা সুখে ডুবে থাকে, এই ধারণা ভুল।' আমি বললাম, 'পয়সার মূল্য ধনীরা ততটা বুঝতে পারে না যতটা বুঝতে পারে দুদিন ছাড়া আধপেটা খাওয়া গরিবেরা। শ্মশান-বৈরাগ্য তো সকলেরই আসে কিন্তু তা হচ্ছে দু-মিনিটের। ধনীও যখন বিপরীত পরিস্থিতিতে পড়ে তখন তাঁর এইরকম বৈরাগ্য আসে।' সম্প্রতি ডালমিয়াজী যেরকম সংকটে পড়েছিলেন তাতে তাঁর পরিবারে এইরকম শ্মশান-বৈরাগ্য আসাটা অনিবার্য ছিল। তাঁর নিজের ছেলের চক্রবর্তী হওয়া আর নিজের পরের জন্মে কোনো দেশের রাজা হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীরা করেছিল। ডালমিয়াজী সেই খেয়ালেই চলছিলেন। শেষে যখন তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের সংখ্যা প্রায় এক ডজনের কাছাকাছি হয়ে গেল তখন দাবার ঘুঁটি উল্টে গেল। সাট্টা খেলায় তিনি কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন আর সেই সাট্টাই আজ এমন অবস্থা করে দিয়েছে যে, তাঁর সবকিছু জামাই-এর হাতে চলে গেছে। তাহলে তাঁর পরিবার কেন চিন্তা করবে না? আজকের সামাজিক ব্যবস্থা কি নিষ্ঠুর!

২১ তারিখে ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কেউ কলা খেয়ে খোসা ফেলে দিয়েছিল। দেখিনি, পা পড়ল আর পিছলে পড়ে গেলাম। বাঁ হাঁটু ছড়ে গেল। রক্ত বেরোয় নি কিন্তু লাল হয়ে গেল। ডায়াবিটিসের রোগীদের এ ব্যাপারে খুব সাবধানে থাকতে হয়। কিন্তু বারোমাস তিরিশদিন লোকে প্রতি মুহূর্তে কত সাবধানে থাকবে? কখনো মানুষের ভুল হয়েই যায়। তাড়াতাড়ি পেনিসিলিন মলম লাগালাম। পরের দিন কানপুর যাওয়ার ছিল।

কানপুর—পরের রাতেই ট্রেনে বসলাম। ২২ তারিখে সাতটার সময় স্টেশন পৌঁছলাম। সেকেন্ড ক্লাসে জায়গা পেয়ে গেলাম। সকলের কাছেই প্রচুর জিনিসপত্র ছিল যার ফলে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গাজিয়াবাদে শ্রীমতী কমলা চৌধুরী এলেন। কামরায় একজন পরিচিত লোক যদি মিলে যায় তাহলে জায়গা পাওয়াই যায়। তাঁর সঙ্গে ছোট মেয়েও ছিল, যাকে আমি দেড় দু-বছরের দেখেছিলাম। এখন সে কনভেন্টে পড়ছিল। বাবা মারা গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারেই কমলাজী মির্জাপুর যাচ্ছিলেন। এখন বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছিল। এদিকে তাঁরও ডায়াবিটিসের সমস্যা ছিল। সারা রাস্তা সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হলো। সাড়ে চারটেয় গাড়ি কানপুর পৌঁছল। অভ্যর্থনার জন্য বন্ধুরা অন্য কোনো দিকে আমাকে খুঁজছিলেন। কামরার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে যথেষ্ট অসুবিধে হলো। ভাবলাম অনেকটা সময় চলে গেছে তাই কোনো বন্ধু এখানে এসে পৌঁছতে পারেনি। অপেক্ষা না করেই কুলির মাথায় মালপত্র তুলে দিয়ে পুলের ওপারে টাঙায় উঠে সোজা মনিরামের বাগানে শ্রীপুরুষোত্তম কাপুরের বাড়িতে পৌঁছলাম। সেখানে জানা গেল, লোকে ফুলমালা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে।

কানপুরে যখনই আসি তখন প্রচুর প্রোগ্রাম থাকে। তার ফলে সামান্য অসুবিধে হলেও এত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আমার ভালই লাগে। কানপুরের অনেকগুলি সাহিত্য-সংস্থার পক্ষ থেকে সন্ধেতে স্বাগত জানানো হলো। প্রিন্সিপ্যাল সদ্‌গুরুশরণ অবস্থী ছিলেন সভাপতি। আমিও স্বাগত ভাষণের উত্তর দিলাম। ফিরে, বাড়িতেই প্রগতিশীল তরুণ লেখকদের সভা ছিল। তাতে দু-এক ঘণ্টা কাটল।

২৩ ডিসেম্বর জুহারী দেবী এবং মিউনিসিপ্যাল মহিলা ইন্টার কলেজে ভাষণ দিতে হলো। জুহারী দেবীতে শ্রীপুরুষোত্তমজীর স্ত্রী শ্রীমতী বিমলা কাপুর পড়ান। ডবল এম এ করলে সেটা কিছুটা কাজে লাগা দরকার ভেবে আমার খুব ভাল লাগল। কিন্তু পুরুষোত্তমজী এখন বাজেভাবে ফেঁসে গিয়েছিলেন। অংশীদারীতে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা ছিল। এক অংশীদারের ওপর এত ভরসা করে ফেলেছিলেন যে বহু বছর তিনি হিসেবপত্তর করেননি। তারপর জানা গেল যে, সেই অংশীদার কয়েক লাখ টাকা ভোগবিলাসে উড়িয়েছেন। আচমকা মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়ল। বহু সম্পত্তি বিক্রি করে দেনা পরিশোধ করেন। বলছিলেন এখনও ৫০ হাজার টাকা বাকি আছে। বসবাস করার বাড়িটিও বন্ধক আছে। যে-সময়টা ভারমুক্ত হওয়ার জন্য কষ্ট করছিলেন ততখানি সময় যদি আগে দিতেন তাহলে কি আর এমনটা হতো? কিন্তু আমাদের যৌথ পরিবারে এখনও এমন কোনো কড়া নিয়ম তৈরি হয়নি যাতে পরিবার অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় পৌঁছনোর আগেই তার বিপদের খবর পেয়ে যায়। পুরুষোত্তমজী খুব সহৃদয় আর উদার

মানুষ। তাঁর এই অবস্থা দেখে আমারও দুঃখ হলো। তাঁর বাড়িতে সাথী সন্তোষীর মতো কমিউনিস্ট জন্মেছে যে-কারণে বাড়ির স্ত্রী-পুরুষরাও কমিউনিজমকে ভয় পান না। পুরুষোত্তমজী আর তাঁর স্ত্রী নিজের চোখে রাশিয়া দেখে এসেছেন। তাঁরা জানেন সেখানকার জীবন সকলের পক্ষে কি নিশ্চিন্তের আর সুখের। আমার প্রোগ্রামগুলি সম্পন্ন করার জন্যে পুরুষোত্তমজী সবসময় তাঁর গাড়ি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

রাত নটায় শ্রীচন্দ্র কৌশলের বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল। কয়েক বছর ধরে আমি রাতে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এখন একবারে ভরপেট খাওয়াটা ঠিক নয়, তা রাতেও ভাগাভাগি করে খেতে চাইছিলাম। কিন্তু এখন শরীরের পক্ষে তাও ভাল ছিল না। ফের রাতের বেলায় পঞ্চাশ-একশো ক্যালোরির শাকসব্জি খেতে রাজি হলাম। এটা একদিক দিয়ে ভালও, কেননা এর ফলে কোনো বন্ধুকে নিরাশ করা থেকে বেঁচে যেতাম। কৌশলজীর বাড়িতে শাকসব্জি তৈরি ছিল। আগের এক যাত্রায় আমি কমলার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে উঠেছিলাম। সে-সময় দু ভাই আর ছোট-বড় জায়েরা খুব সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন। কৌশলজীর স্ত্রী বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কমলাজীকে কেন আনলেন না?' আমি বললাম, 'এম এ-এর শেষ বছর, পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটবে বলে আনি নি।' কৌশলজী টেকনোলজিতে বি এস সি করেছিলেন। আমার পরিভাষার কাজে তিনি খুব সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু টেকনোলজির জায়গায় তিনি টোল-মহল্লাবাসীদের ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে এটাই ব্যবসার রূপ নিল আর এখন তো তিনি এল এল বি হয়ে পুরোপুরি উকিল হয়ে নিজের ব্যবসাতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সেদিনই সন্ধেতে বাঙালী ভদ্রজনের সম্মিলনীতে হিন্দি ভাষা আর রাষ্ট্রভাষার সমস্যার ওপর আমি ভাষণ দিলাম। ছোটমতো সভা কিন্তু সকলেই ছিলেন সুশিক্ষিত আর সংস্কৃতিবান। সেই রাতেই আরো একটি সাহিত্য-সভায় যেতে হলো যেখানে কানপুরের সাহিত্য-রাজনীতির পিতামহ শ্রীনারায়ণপ্রসাদ অরোড়া এবং কানপুরের কয়েকজন কোটিপতিও উপস্থিত ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্য-আলোচনা হলো।

২৪ ডিসেম্বর সকাল নটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পাঁচ জায়গায় বক্তৃতা দিতে যাওয়ার ছিল, যার মধ্যে একটি ছিল ডি এ বি কলেজের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের কাছে। এক স্তরের শ্রোতাদের কাছে বলতে আমার খুব সুবিধে হয় আর বিভিন্ন স্তরের সামনে বলতে বেশ অসুবিধে হয়। এর কারণ এটাই যে আমি শ্রোতাদের দেখে বলি। শ্রোতাদের সামনে যেমন-তেমন করে বক্তৃতা দিয়ে ফেলতে চাই না। সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজন হলো শ্রীখৈতানজীর বাড়িতে। খৈতানজী মারোয়াড়ী। প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রচার ও প্রকাশনার কাজ তিনি তাঁর কারেন্ট বুক ডিপো দ্বারা করেছেন। বই বিক্রি আর প্রকাশনার ব্যবসা মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা পছন্দ করে না। এতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বিন্দু বিন্দু জল জমা হয় আর তাদের চাই দ্রুত মোটা মোটা লাভ যাতে দু-চার বছরে দু-চার কোটি কামিয়ে ফেলা যায়। তাদের সামনে এরকম উদাহরণও যথেষ্ট আছে। তার ওপর খৈতানজী তো সাধারণ প্রকাশক নন, তিনি প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রকাশক, যাতে আরো কম লাভের অবকাশ রয়েছে। নিজের প্রগতিশীলতা তিনি শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রেই দেখাননি উপরন্তু নিজের জাতিকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী মুসলিম মা আর হিন্দু বাবার সন্তান।

মারোয়াড়ীদের পক্ষে এটা কতখানি কঠিন কাজ। যুবকটির সাহস যে কতটা প্রশংসনীয় তা বলার দরকার নেই। সেদিন রাতের নিরামিষ ভোজন হলো শ্রীললিতকুমার অবস্থীর বাড়িতে। আগে ললিতজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কাজটি অনিশ্চিত তাই এখন তিনি কলেজের প্রফেসর। এ কাজটি সাহিত্য-সাধনার সহায়ক। তাঁর বৃদ্ধা মা এখনও জীবিত। তিনি দেয়ালে ছাপ দিয়ে রেখেছিলেন। জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, কনৌজীদের মধ্যেও অহোই-এর পুজো চলে। ভোজপুরীদের মধ্যে তা না দেখে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, এটা শুধু পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ আর রাজস্থানের ব্যাপার।

২৫ ডিসেম্বর বড়দিনেও সকাল নটা থেকে রাত পর্যন্ত লাগাতার সভা ছিল। এক জায়গায় রাষ্ট্রীয় সেবা সংঘের কংগ্রেসী তরুণদের সামনে জগৎসংসারের উৎপত্তির ওপর এবং শেষ সভাতে তিব্বতের অনুসন্ধান নিয়ে বললাম। এখানে ঘটনাচক্রে শ্রীদেবীপ্রসাদ শুক্ল (প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়)-কেও পেলাম। ৮০-র কাছাকাছি বয়সে পৌঁছেও তিনি এখনো যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান।

সেদিন দুপুরের খাওয়া হলো শ্রীজগদম্বাপ্রসাদ হিতৈষীর বাড়িতে। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদের খাবার। তাতে প্রাধান্য ছিল মাংসের। রাতে শ্রীকৈলাস কাপুরের বাড়িতে নিরামিষ-ভোজন হলো। গতবারে কৈলাসজীকে অরবিন্দর অনন্য ভক্ত মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন তিনি মহর্ষি রমণের ভক্ত ছিলেন। দুই মহাপুরুষই এখন সংসার ছেড়ে চলে গেছেন। 'ভারত মেঁ ব্রিটিশ রাজ্য কে সংস্থাপক' বইটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার জন্য শ্রীখৈতানজী নিয়ে গেলেন। একটি ভার তো কমল। তার কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করে এখানে দিয়ে দিয়েছি।

প্রয়াগ—২৬ ডিসেম্বর ভোর পৌনে পাঁচটাতেই পুরুষোত্তমজী স্টেশন নিয়ে গেলেন। সওয়া পাঁচটায় ট্রেন এল। প্রথম শ্রেণীর একটি ছোটমতো কম্পার্টমেন্ট পাওয়া গেল। অন্ধকার থাকতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। এলাহাবাদ জেলায় ঢুকে গিয়েছিল, যেখানে মনৌরীর কাছে এক জায়গায় মাটির ছাতের বদলে খোলার চাল ছিল। আমার কাছে এই পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা মাটির ছাত রাশিয়াতে আমি উরাল পর্বতমালা থেকে শুরু হতে দেখেছিলাম।

স্টেশনে শ্রীনিবাসজী, ড· উদয়নারায়ণ তিওয়ারী, শ্রীবাচস্পতি পাঠক, শ্রীজয়গোপাল মিশ্র এবং অন্যান্য বন্ধুদের দেখা পেলাম। সেখান থেকে আমরা শ্রীনিবাসজীর বাড়িতে গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রথমে সম্মেলন মুদ্রণালয়ে ছাপার গতির্বিধি দেখতে গেলাম। এখন প্রেস সম্মেলনের পরীক্ষা-সম্বন্ধীয় কাগজ ছাপতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। যে-গ্যালি প্রুফ আমি দেখে ফেরত দিয়েছিলাম তার সংশোধনও সম্ভব হয়নি। জেনে ভাল লাগল যে বই পাঞ্চ করা হচ্ছে। শ্রীনিবাসজীর বাড়িতে দেখলাম, 'কার্লমার্কস'-এর ১৮ ফর্মা ছাপা হয়ে গেছে। 'সংস্কৃত কাব্যধারা' ছাপতে তিনি ইতস্তত করছিলেন কিন্তু পরে সম্মত হয়ে তা সম্মেলন মুদ্রণালয়ে ছাপাতে রাজি হলেন।

কমলার চিঠি পেয়ে চিন্তা দূর হলো। হ্যাপিভ্যালিতে রতিলালার বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে এবং চোর ক্রমাগত আসছে। মঙ্গল পরীক্ষা দিতে দেরাদুন চলে এসেছিলেন। সে-সময় ভরসা বলতে ছিল শুধু ভূত। কমলা রিভলভারে হাত দিতে চাইত না। এবার লিখেছিল, 'এজন্য আমার আপসোস হচ্ছে। বন্দুক আর রিভলভার দুটিকেই আলমারি থেকে বের করে খাটের পাশে

ঝুলিয়ে রেখেছি।' আমি লিখে দিলাম, 'কল্যাণ সিংহের দায়িত্বে বাংলো রেখে তুমি দেরাদুন বা অমৃতসর চলে এসো।'

পরের দিন সম্মেলন মুদ্রণালয়ে গুপ্তেজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস' জানুয়ারি নাগাদ বের করে দেবেন বললেন। শুনে আমার আনন্দ হবে কেন? আমি জানতামই যে প্রেসের লোকরা যত তাড়াতাড়ি বের করার কথা বলবে দেরি করবে ততটাই। সেই দিনই নিরালাজীর সঙ্গে দেখা করলাম। শরীর খারাপ বলে মনে হলো না, এমনিতে বয়সের ছাপ তো ছিলই। ইদানিং তিনি শুধু ইংরেজিতে কথা বলতেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমি সেখান থেকে উঠলে তিনিও বাইরে বেরিয়ে এলেন। ফটো তুললাম। নমস্কার করে বিদায় নিলেন। খাওয়া-দাওয়া করার ছিল ড· তিওয়ারীর বাড়িতে। পুরনো আমলের বাড়িটিকে তিনি কয়েক হাজার টাকা খরচ করে নতুন রূপ দিয়েছেন। এখন তা প্রফেসরের বাসযোগ্য হয়েছে। পিছনে একটুখানি শাক-সবজি লাগানোর জায়গাও বের করে নিয়েছেন। কিন্তু মালিকের কাছ থেকে কোনো কাগজপত্রে তিনি লিখিয়ে নেননি জেনে চিন্তা হলো।

২৮ তারিখ সকালে মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। শ্রীসতীশচন্দ্র কালা সমস্ত জিনিস দেখালেন। মিউজিয়ামের এখন নিজস্ব সুন্দর বাড়ি হয়ে গেছে। আমি প্রথমবার এসে ছিলাম। এখন স্থান অপর্যাপ্ত ছিল আর কাছেই আরো কয়েকটি বাড়িও বানানো হচ্ছিল। প্রাচীন ভগ্ন শিল্পগুণসম্পন্ন মূর্তি জমা হওয়া দরকার, তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়ি তৈরি করে নেয়—এ কথার যাথার্থ্য আমি এখানে দেখলাম। শুনে দুঃখ হলো যে, এই জেলাতেই অবস্থিত কৌশাম্বীর সামগ্রী এখানে জমা করা হচ্ছে না। তার মধ্যে কিছু লক্ষ্ণৌ যাক তাতে আপত্তি নেই কিন্তু সেগুলিকে বাদ দিয়ে যারা কোশাম্বী দেখবে তারা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হবে।

সেইদিনই ফতেহপুর জেলার একডলা-এর শ্রীওমপ্রকাশ রাউতজী তাঁর পূর্বজন্মের সংগৃহীত চিত্রগুলি দেখালেন। কিছু ছবি খুবই ভাল। কছওয়াহার রাজা মানসিংহের ছবি তার একটি। রাগিণীর দুটি সেট আছে যার মধ্যে একটি খুবই সুন্দর। একডলার মতো আরো কিছু অজানা জায়গা আমাদের দেশে থাকতে পারে যেখানে প্রাচীন, বহুমূল্য সামগ্রী, সুরক্ষিত রয়েছে। কুতবন-এর 'মৃগাবতী' আর মঞ্ঝনের 'মধুমালতী'-ও তাদের সংগ্রহে পাওয়া গেছে। সেখানে সংস্কৃততে হস্তলিখিত অনেক বইও আছে। আমি পরামর্শ দিলাম যে, এই চিত্রগুলি দিল্লীর রাষ্ট্রীয় চিত্রালয়ে পাঠানো উচিত, তবেই এগুলি সুরক্ষিত থাকতে পারে। এই 'রাউত' এক বিশেষ জাতির লোক। এদের রীতি-রেওয়াজ রাজপুতদের কিন্তু তাদের সঙ্গে বিয়েশাদি হয় না। সকলের গোত্র হচ্ছে কাশ্যপ। এক গোত্রেই বিয়ে করতে হয়, কেবল মূলস্থান বাদ দিয়ে।

কিছুক্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণদাসজীর বাড়ি গেলাম। তাঁর স্ত্রী ম্যাট্রিক পাস করে গেছে এবং এফ এ-তে বসছে। আমি এজন্য শ্রীকৃষ্ণজীকে কৃতিত্ব দেব ভাবছিলাম কিন্তু জানা গেল যে, স্বামীর কাছ থেকে পড়ার ব্যাপারে কোনো অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়নি। স্ত্রী বাস্তবিক সাহসের কাজ করেছিলেন। মধ্যাহ্নভোজনের জন্য শ্রীগণেশ পাণ্ডের বাড়ি এলাম। মাংস ও মাছ দুইই বালিয়ার কায়দায় রান্না হয়েছিল। তারপর সেখানকারই রাধারমণ কলেজ এবং অগ্রবাল ইন্টার কলেজে বক্তৃতা দিলাম। ফেরার সময় ড· বদ্রীনাথ প্রসাদের বাড়ি গেলাম। তাঁর বড় মেয়ে ও ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ছোট মেয়ে অরুণার বিয়ে হতে যাচ্ছিল ২৩ জানুয়ারি। ডাক্তার সাহেবের

খুব ইচ্ছে ছিল এবং আমিও খুবই চাইছিলাম কিন্তু পরের প্রোগ্রামগুলোর জন্য আবার ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। এই বিয়ে আর ড· বদ্রীনাথ প্রসাদের পরিবার নতুন ভারত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিল। শুধু বড় মেয়ের বিয়ে নিজের জাতে হয়েছিল, ছেলে এবং ছোট মেয়ে জাত-পাত আর প্রান্ত-প্রদেশের সীমানা ভেঙে ফেলেছিল।

সেদিন রাতে পার্টি অফিসে সভা হলো। নাগার্জুন তাঁর কবিতা শোনালেন। তরুণ পাণ্ডা খুব সুন্দর বুন্দেলী গান গাইলেন।

২৯ ডিসেম্বর সকালে প্রথমে ড· ভগবতশরণ উপাধ্যায়ের কাছে গেলাম। তাঁর বাবার শরীর শুকিয়ে গেছে, পেটে ক্যান্সার হয়েছে। চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন আর সংসারের গাড়ি টেনে চলেছেন। ভগবতশরণজী এখানেই কিছু কাজ করছেন। যদি হিন্দি বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদক আমাকে হতে হয় তবে তাঁকে সবচেয়ে বেশি দরকার বলে আমি মনে করি। কিন্তু এখন তো সেটা কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের জন্য দ্বিধার মধ্যে পড়েছিল। সেদিন মধ্যাহ্নভোজন হয় ড· বদ্রীনাথ প্রসাদের বাড়িতে। খেতে খেতে বারবার লক্ষ্মীজীর কথা মনে পড়ছিল। এই বাড়িতে আমি কত মাস, কত সপ্তাহ আর কে জানে কত বার নিজের বাড়ির মনে করে থাকতাম, লক্ষ্মীজী খাওয়াতেন। এখন তিনি চিরদিনের জন্য বাড়ি শূন্য করে চলে গেছেন।

সন্ধেতে নিরালা পরিষদের পক্ষ থেকে সভা হলো। পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র, গিরীশজী আর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ঘটনাচক্রে শ্রীনারায়ণ চতুর্বেদীও এসে পড়েছিলেন। মিশ্রজী তাঁর গ্রামের প্রাচীন অবশেষ সম্বন্ধে জানালেন যা থেকে বোঝা গেল যে, আজমগড়ে কে জানে কত গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক স্থান অনুসন্ধানকারীদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। সম্মেলনে ঝগড়ার ফলে কাজকর্মের গতি ব্যাহত হয়েছিল। তার ফলে হিন্দিভাষী এলাকার সাহিত্যিকদের, সম্মেলনের সুযোগে মিলিত হয়ে ভাবনা-চিন্তা করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার সেইরকম একটি সম্মেলন ওয়ার্ধায় হতে যাচ্ছিল। সেখানে অনেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে ভেবে আমিও যেতে রাজি হয়ে গেলাম।

ওয়ার্ধা—সেদিন সন্ধে সাড়ে সাতটায় কাশী এক্সপ্রেস ধরলাম। যদিও ভিড় ছিল তবে ওপরে বিছানা পাতা হয়ে গিয়েছিল বলে ঘুমোনোর আরাম ছিল। এই ট্রেনেই প্রয়াগ থেকে আরো কয়েকজন বন্ধু যাচ্ছিলেন কিন্তু তখন জানতে পারি নি। ৩০ ডিসেম্বর সকাল সাতটায় আমাদের ট্রেন ইটারসী পৌঁছল। এখান থেকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক ধরার ছিল। শ্রীওমপ্রকাশ (রাজকমল), শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ নির্মল এবং আরো তিন-চারজন সঙ্গী ওয়ার্ধার জন্য জড়ো হয়েছিলাম। গাড়িতে খুব কষ্টে জায়গা পাওয়া গেল। আমি আর ওমপ্রকাশজী নিজেদের জিনিসপত্র সৈনিকে ভর্তি একটি কম্পার্টমেন্টে রেখে অন্য কামরায় চলে গেলাম। ডাইনিং কারে মধ্যাহ্নভোজন করে কিছুটা সময় কাটালাম। আমিষ আহার পাঁচ সিকেতে মন্দ ছিল না। এবার আমাদের জিনিসপত্রের কামরায় এলাম। সৈনিকরা সকলেই ছিল শিক্ষিত আর মাদ্রাজী। কাশ্মীর থেকে ছুটিতে যাচ্ছিলেন। সকলেই ইংরেজি জানতেন এবং উত্তরে থাকায় হিন্দিও বলছিলেন। সৈনিকদের অবশ্যই বেশ পরিবর্তন এসেছে। তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট ভদ্রতাবোধ দেখতে পেলাম। হতে পারে, শিক্ষিত হওয়ার ফলেই এটা হচ্ছে।

অমল-এর কাছে টুকরিতে কমলালেবু বিক্রি হচ্ছিল। দু-টাকায় ৮৫টির একটি টুকরি আমিও কিনে নিলাম। আধঘন্টা লেটে ট্রেন ওয়ার্ধা পৌছল। স্বেচ্ছাসেবকরা দেখা গেল প্রস্তুত। আগে ভয় হচ্ছিল যে এই ভিড়ে মালপত্র কীভাবে বের করব, দরজা খোলারই জায়গা ছিল না। কিন্তু বের তো করতেই হবে। আমি কোনো রকমে বেরিয়ে এলাম।

হিন্দিনগর পৌছলাম। ড· উদয়নারায়ণ তিওয়ারী ড· হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, ড· রামকুমার বর্মা, ড· নগেন্দ্র, ড· দশরথ ওঝা, শ্রীবলদেব নারায়ণ মিশ্র ইত্যাদি অনেক সাহিত্যিক এসেছিলেন। মীরাট থেকে প্রেমজীও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এসে উপস্থি হলেন। আমরা একই ঘরে ছিলাম। এবারেও সমিতির বাড়িটি বাড়ানো হয়েছিল। বিশেষ করে প্রতিনিধিরা যেখানে উঠেছিলেন সেগুলি ছিল নতুন কামরা। তাঁবুও খাটানো হয়েছিল। সেখানেই কনৈলার কাছে উমরপুরের তিওয়ারীজী এলেন চাণ্ডুকের এক বৃদ্ধ শেঠজীর কাছে। দুজনেরই সাহিত্যে অনুরাগ আছে। শেঠজী হচ্ছেন আর্যসমাজের ভক্ত। সেজন্য অনেক খরচ করে সেখানে সংস্থা চালু রেখেছেন। তিওয়ারীজী নিজের গ্রামের কথা জানিয়ে বললেন, 'এখন তো জীবিকার সংস্থান এখানেই হয়ে গেছে তাই দু-চার বছরে কখনো একবার বাড়ি যাই।'

৩১ ডিসেম্বর সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠক হলো। একটি প্রস্তাব এই বিষয়েও গৃহীত হলো যে, সম্মেলনের ব্যাপারে সরকার একটি বিশেষ আইন করুক। সেখানেই বোম্বাই প্রবাসী শ্রীমাধবাচার্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি কেন, যে কোনো লোকেরই তাঁর কথা শোনামাত্র প্রথম প্রথম মনে হতে পারে যে, এই লোকটি খুব লঘু। মাধবাচার্য নিজেই অনেক রকম সত্য-মিথ্যা কথা বলে এই আশংকা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু কিছুক্ষণের কথাবার্তায় আমি বুঝতে পেরে গেলাম, মানুষটি সংস্কৃতের দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি সেই সব পণ্ডিতদের একজন যাঁদের সংখ্যা দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। ব্রজতে জন্মেছিলেন, তারপর কাঞ্চীর প্রতিবাদী ভয়ংকর গুরুর পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন। পরের দিন আবার আমি মন খুলে কথা বলব ঠিক করেছিলাম কিন্তু জানতে পারলাম তিনি সকালেই চলে গেছেন। আমার খুব অনুতাপ হলো। তার পাণ্ডিত্য যতটা কাজে লাগা উচিত তা লাগছিল না। বোম্বাইতে কোনো একটি কলেজে সংস্কৃত পড়াচ্ছিলেন।

অপরাহ্ণ-অধিবেশনে প্রস্তাব পাস হলো। আশা করা হয়েছিল যে, প্রয়াগ সম্মেলনের বিরোধী দলের লোকেরা এখানে আসবেন এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলে কোনো রাস্তা বেরিয়ে যাবে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ এলেন না। সভাপতি ছিলেন শ্রীদ্বারিকাপ্রসাদ মিশ্র। অধিবেশন খুব সফল হলো। তা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বছর শেষ হচ্ছিল।

এ বছর আমার কাজের মধ্যে 'লেনিন', 'বচপন কি স্মৃতিয়াঁ' এবং 'সরদার পৃথ্বী সিংহ' (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হলো। 'বিস্মৃত যাত্রী' আর 'মার্কস' প্রায় ছাপা হয়ে গেছে। 'সংস্কৃত পাঠমালা' ও 'সংস্কৃত কাব্যধারা'র পাণ্ডুলিপি তৈরি আছে। 'শাদী' আর 'ভারত মেঁ অংগ্রেজী রাজ্য কে সংস্থাপক' প্রেসে আছে। সময়কে কাজে লাগিয়েছি দেখে আনন্দ হলো।

ছোট্ট ভ্রমণ

১ এবং ২ জানুয়ারি ওয়ার্ধাতেই থাকতে হলো। ওয়ার্ধায় এলে সেবাগ্রামে যাওয়াটা জরুরি হয়ে পড়ে। ১ তারিখে সকাল সাতটায় শ্রীহরিহর শর্মা (মাদ্রাজ)-র সঙ্গে মোটরে করে গিয়ে নটায় সেবাগ্রাম পৌঁছলাম। বাপুর কুটিরটি শূন্য ছিল কিন্তু সেখানে যত্রতত্র সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদি শিষ্যদের ওপর ভরসা করতে হতো তাহলে গোটা আশ্রমই শূন্য থাকত। তালিমী সংঘের কল্যাণ হোক। তা অনেকগুলি শিক্ষণ সংস্থা চালু করে ঘর ভরে দিয়েছে। শ্রীমতী আশাদেবী আর্যনায়তে। তাঁর স্বামী এবং আরো অনেক আশ্রমবাসীর সঙ্গে দেখা হলো। শ্রীমতী আশাদেবী গান্ধীবাদী কিন্তু এমন নয় যে 'বাদ'-এর সীমার ভেতর তিনি সতী হওয়ার জন্য প্রস্তুত। স্বামী দ্রাবিড় আর তিনি নিজে বাঙালী। বাঙালীদের বহুমুখী সাংস্কৃতিক প্রগতির প্রভাব তাঁর মতো শিক্ষিতা মহিলার ওপর পড়বে না তা হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর খুব ইচ্ছে হলো যে এখানকার শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীদের সামনে আমি কিছু বলি। একটি বড় হলের মতো ঘরে একটু পরেই দেড়শো শ্রোতা জমা হয়ে গেল। আমি মূলত তিব্বত-যাত্রা আর সেখানকার সাংস্কৃতিক সম্পদের বিষয়ে ভাষণ দিলাম।

সেখান থেকে ফিরে মহিলা আশ্রম গেলাম। সেখানে পরের দিন সাড়ে আটটায় বলার জন্য অনুরোধ করা হলো। এই সময়েই ছাড়া পেয়ে গেলে ভাল হতো। সেদিন সন্ধেতে সওয়া আটটায় টাউন হলে সাময়িক সমস্যাবলীর ওপর বললাম এবং অন্য জায়গায় সভা বসে এগারোটা পর্যন্ত তা চলতে থাকলো।

পরের দিন সাড়ে আটটায় মহিলা আশ্রমের ছাত্রীদের সামনে বলতে হলো। আগেরবারে ছাত্রীদের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু এখন ট্রেনিং নেবে এমন পঞ্চাশ জন তরুণীও থাকার ফলে তাদের সংখ্যা একশো বারো হয়ে গিয়েছিল। যারা ট্রেনিং নিচ্ছে তারা মাসিক পঁচিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি পায়। গান্ধীজীর প্রেরণায় ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই সংস্থা খোলা হয়েছিল। এটা স্থাপন করা এবং তার জন্য সাহায্য করায় বাজাজজী আর তাঁর পরিবারের বড় ভূমিকা ছিল। আমি ভারতীয় সংস্কৃতির ওপরই বলা আবশ্যক মনে করলাম আর বললাম—আমাদের সংস্কৃতি কখনো একাঙ্গবিশিষ্ট ও আস্তিক হয়ে থাকে নি। এখানে যেমন পরমভক্তরা জন্মে এসেছেন, তেমনি পরমানাস্তিকও জন্মেছেন। সংস্কৃতি কোনো পাথরের রেখা নয়, তা হচ্ছে নদীর প্রবাহ। তা সর্বদা, প্রতিমুহূর্তে, বদলে যেতে থাকে।

চলার সময় একটা ধাপ বাকি আছে তা খেয়াল করি নি। আঙুলে চোট লেগে রক্ত বেরিয়ে গেল। ডায়াবিটিসে এটা খারাপ আর খারাপ জিনিসটাই সবচেয়ে আগে এসে উপস্থিত হয়।

কমলার কালিম্পঙে গিয়ে থাকার ইচ্ছে হচ্ছিল। তাকেই দীর্ঘ সময় কাটাতে হবে। তাই থাকার ব্যাপারে তার মতামত গ্রাহ্য করাটা সবচেয়ে জরুরি। আনন্দজী এখন অধিকাংশ সময়ে কালিম্পঙে থাকেন। তিনি বলছিলেন এখানে শাকসবজির দাম দার্জিলিঙের চেয়েও বেশি। লোকজনের মধ্যে বেকারি ভীষণ, সম্পত্তির মূল্য কমে গেছে। সম্পত্তির মূল্য তো আরো কমবে,

বেকারি আরো বাড়বে, কারণ লাসা ও তিব্বতের ব্যবসা কালিম্পঙকে গড়ে তুলেছিল। এখন লাসা থেকে যে মোটর-সড়ক টোমো (চুম্বী) উপত্যকার প্রান্ত পর্যন্ত এসেছে, সেটা গ্যাংটক থেকে কাছে হয়। এখনো দুদিকের রাস্তার প্রান্তদ্বয়ের মাঝে মাত্র দু-তিন দিনের পায়ে হাঁটা পথের দূরত্ব, যা আরো কমানো যেতে পারে। মালবহনের জন্য যদি সীমানার দুপ্রান্তে রোপওয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয় তো তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। লাগানো যদি নাও হয় তবু এখন আমদানি-রপ্তানির দ্বার কালিম্পঙ হবে না, হবে গ্যাংটক। পরে মণিহর্ষজীর কাছে জানলাম এখনই ভারি কিন্তু অপেক্ষাকৃত কমদামের জিনিসগুলি গ্যাংটক থেকে লাসা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মূল্যবান জিনিসপত্র যারা আমদানি-রপ্তানি করে তাদের নিজেদেব কালিম্পঙের ঘরগুলিকেও দেখতে হবে। লরিতে গেলে দামের দু-এক পয়সা হেবফের হয়। তারা তা নিয়ে চিন্তা করে না। তবু আধুনিক যাতায়াতের যে সুবিধা গ্যাংটকে আছে তার জন্য কেনা-বেচা করা লোকেরা দুদিক থেকেই সেখানে বেশি যাবে। এটা শুনলে বিস্ময় জাগবে না যে, কয়েক বছর পরই কালিম্পঙের ভাগ্যলক্ষ্মী পালিয়ে গ্যাংটকে চলে গেছে।

সেই দিনই তিনটের সময় আমার সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির বৈঠক হলো। আসলে এর জন্যেই আমি একদিন থেকে গিয়েছিলাম নইলে কালই অন্য বন্ধুদের সঙ্গে চলে যেতাম। শ্রীমোহনলাল ভট্ট দ্বিতীয়বার সচিব নির্বাচিত হলেন। বাজেট ছাড়া অন্য সব স্থির করে নেওয়া হলো।

ছাউনি (মালবা)-র শ্রীবৈজনাথজী ওখানকার যোগীরাজ বলছিলেন। আগে যোগীরাজের কাছে অঢেল সম্পত্তি আসত। তিনি কয়েক বছর ধরে লাখ লাখ টাকা খরচ করে মন্দিব তৈরি করাচ্ছিলেন যাতে ইটালিয়ান মার্বেল পাথর লাগানো হতো। প্রতিটি ব্যাপারই রহস্যময় করে রাখা হতো। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রহস্যময়তা বজায় রাখা মুশকিল আর যোগীরাজ অরবিন্দ বা মহর্ষি রমণের মতো সাধকও নন, তাই পাইকারী দোকান থেকে কাজ হচ্ছে না দেখে তিনি খুচরো বিক্রিও শুরু করে দিয়েছেন। ধর্ম প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতিব খুব সেবা করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে তার এই দোকান এবং দোকানের শেঠবা, যাবা চোখে ধুলো দিয়ে দুনিয়াকে ভেড়া বানাতে চায়।

প্রয়াগ—৩ জানুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটাতেই আমরা স্টেশন পৌঁছে গেলাম। গাড়ি লেট ছিল। দিনভর যাত্রা করতে কোনো অসুবিধে ছিল না কিন্তু ইটারসী থেকে প্রয়াগ যাওয়ার ছিল রাত্রে। গতবার যে অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার জন্য ভাবলাম যে টিকিট প্রথম শ্রেণীরই নেওয়া যাক। গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক ছিল দূরাগত ট্রেন। তা এখান থেকে সোজা ইটারসী যায়। জায়গটা ভাল। নাগপুরের অনেক হরিজন কর্মকর্তা খুব আশা করেছিলেন যে, আমি এখানে একদিনের জন্য নেমে যাব। কিন্তু সময়ের অভাব ছিল। ট্রেনে ড· আম্বেদকরের অনুগামী অনেক তরুণ এল। তারা আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার সময় তাদের নেতার সঙ্গে বিপুল সংখ্যায় বৌদ্ধ হবে। তাদের উৎসাহে ঘা দেওয়া খুব মুশকিল ছিল কিন্তু আমি নাচার। তারা এক ঝুড়ি নাগপুরের কমলালেবু রেখে দিল। এই সময়টা কমলালেবুর মরশুম ছিল।

সন্ধে ছটায় ইটারসী পৌঁছলাম। এখান থেকে কাশী এক্সপ্রেস ধরার ছিল আর তার জন্য তিন

ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো। ট্রেনের ক্লার্ক জানাল যে প্রথমশ্রেণীতেও খুব কষ্টেই জায়গা পাওয়া যাবে। অপরাধ তো হবে না। কিন্তু এখন তো প্রথমশ্রেণীর টিকিট কেটে ফেলেছিলাম। প্রতীক্ষালয়ে লোক ভর্তি ছিল। এক জেন্টলমেন আর তাঁর লেডি তাঁদের বাক্সের পাশের চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁদের মেয়ে ছিল জয়ার বয়সী। তার মুখে আধো আধো হিন্দি বেরোচ্ছিল। সে সবসময় জয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। অপরিচিত ব্যক্তিকে লজ্জা পাওয়া বাচ্চাদের স্বভাব।

আটটায় কাশী এক্সপ্রেস এল। চার সিটের একটি কম্পার্টমেন্ট খালি ছিল আর চড়বার লোক ছিল তিনজন। একটি সিট পরে ভর্তি হয়ে গেল। মানিকপুর পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল ছটা বাজল। রাতে ঘুমোনোর পালা শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই কামরায় যদি শোয়ার জায়গা না থাকে তো তাতে কোনো অসুবিধে ছিল না। সাড়ে সাতটায় গাড়ি স্টেশন পৌঁছল। রিক্সা নিয়ে আমি শ্রীনিবাসজীর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। কমলার তিনটে চিঠি পেলাম। তাকে লেখা আমার চিঠিগুলো বড় হওয়া উচিত, তাতে বেশি কথা থাকা দরকার। তা না হওয়ায় কমলার আমার প্রতি এটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। কারণ নিজের যাত্রারই কত কথা লিখতে পারতাম কিন্তু সব সময় তো সভা-সমিতি আর বন্ধুদের লাইন লেগে থাকত। কার্ড পছন্দ না হওয়ায় আমি ছ-পয়সার চিঠি লিখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু তাতেও তার পছন্দের কথা বেশি লিখতে পারতাম না।

শ্রীনিবাসজীর সঙ্গে ঠিক হয়েছিল যে আমি রয়্যালটি ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ নেব আর তিনি রয়্যালটির থেকে মাসিক পাঁচশো টাকা অগ্রিম দিয়ে যাবেন। যতদিন রয়্যালটি বার্ষিক ছ হাজার টাকা না হচ্ছে ততদিন তাঁকে অবশ্য বেশি দিতে হবে যা তিনি পরে কেটে নেবেন। তিনি আশা করেছিলেন যে দু-এক বছরে রয়্যালটি অতটা করে পাওয়া যাবে। মুসৌরীতে গড়ে মাসিক পাঁচশো টাকায় খরচ অবশ্যই চলে যায়। এটাও একটা কারণ ছিল, যার জন্য কমলার কালিম্পং যাওয়ায় আমার মত ছিল। ওখানে বোধহয় তিনশো টাকায় কাজ চলে যেত। পৃথিবীর আজকের অবস্থা, বিশেষ করে সাম্যবাদী দেশগুলির বাইরে, এমনই যাতে নিশ্চিন্ত জীবন কাটানো কষ্টকর। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং অনেক বন্ধু আছে এমন মানুষের পক্ষে আর্থিক দুশ্চিন্তা খুবই কষ্টদায়ক।

সেদিন রাতে শ্রীঅশোক (যমুনাপ্রসাদ বৈষ্ণব)-এর বাড়িতে সন্ধেতে খাওয়ার জন্য গেলাম। সন্ধেতে আমি স্টার্চবিহীন সামান্য শাক-পাতাই খাই। কিন্তু সেখানে অনেক পাহাড়ী অঞ্চলের সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো।

৫ জানুয়ারি নাগার্জুনজী এলেন। তিনি একটি উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রকাশক তাঁকে খাঁচায় বন্ধ করে রেখেছিল যাতে সময়ে বইটি তিনি শেষ করতে পাবেন। আমি ভেবেছিলাম 'সংস্কৃত কাব্যধারা' তিনিই লিখবেন। কয়েক বছর অপেক্ষা করার পর যখন দেখলাম তা হচ্ছে না তখন নিজেকে হাত লাগাতে হলো। 'পালি কাব্যধারা'র ব্যাপারেও কোনো দাতাকে খুঁজছি, দেখি তা পাওয়া যায় নাকি তাও নিজেকেই করতে হয়।

সেদিন সকালে শ্রীরামনাথ ত্রিবেদী এলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছিল, তার কথা বলছিলেন—বড় জাতের লোকেরা খুব ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু বারে বারে বহুলোককে কী করে ঠকানো সম্ভব? সেইদিনই মহাদেবীজীর মহিলা

বিদ্যালয়েও গেলাম। দেড় ঘন্টা ধরে সেখানে সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। নিজের হয়রানির কথা বলছিলেন। পণ্ডিত সুন্দর দাসের মতো মহাদেবীজীও 'শহরের চিন্তায় রোগা হলো কাজী'র চক্রে পড়ে সাহিত্যিকদের সাহায্য করতে চান। সকলেই নিজের নিজের ইচ্ছে নিয়ে আসে। মহাদেবীজীর কাছে অক্ষয় ভাণ্ডার তো আর নেই। যদি কারু ইচ্ছাপূরণ না হতো তাহলে তিনি বিরোধী হয়ে উঠতেন। এমনও আছে যারা তাঁকে ঢাল বানিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে চান। তাঁদের দুর্নামটাও তাঁর ওপরই এসে পড়ে। কিন্তু তিনি তার স্বভাবের কাছে নিরুপায়। বয়সও এখন এমন হয়ে গেছে যখন ঘা খেয়ে শেখাটা মুশকিল। মানুষ, তো কচ্ছপ নয় যে যখন ইচ্ছে মাথা-হাত বাইরে ছড়িয়ে দেবে আর যখন ইচ্ছে ভেতরে তা গুটিয়ে নেবে।

সেদিন সন্ধে ছটায় শ্রীপতিরায়জীর বাড়িতে চা-পান আর সভা হলো। শ্রীপতিরায় খুব ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তবে খারাপ অর্থে নয়। এর পরিচয় তো তাঁর গাড়িটিই দিচ্ছিল। তিনি এমন একটি ছোট ট্রাক নিয়ে রেখেছিলেন যাতে ড্রাইভারেব সিটে আরও দুজন লোককে বসানো যেত আর পিছনে সাত-আট মন মাল সহজেই রাখা যেত। বলছিলেন, 'আমি সপরিবারে পাহাড়েও এই নিয়ে ঘুরে এসেছি।' হ্যাঁ, ব্যবসায়ীর এই রকমই গাড়ি দরকার। তিনি দুটি গাড়ির কাজ একটি দিয়ে করে নিচ্ছিলেন। সভায় কবি শ্রী সি বি রাও, ড· ভগবতশরণ উপাধ্যায় আর অন্য অনেক তরুণ সাহিত্যিক এসেছিলেন। সাহিত্য নিয়েই আমাদের কথাবার্তা হতে লাগল।

বেনারস—প্রয়াগ থেকে ছোট বড় দুটি লাইনই বেনারস যায়। আমি বরাবরই ছোট লাইনে যাতায়াত করি। এর কারণ সম্ভবত ট্রেনের সময়ের দিক দিয়ে সুবিধে। যদিও এখন সেই সুবিধে ছিল না। ট্রেন অন্ধকার থাকতেই পাঁচটায় ছাড়ার কথা সে জন্য সাড়ে চারটাতেই স্টেশনে (রামবাগ) যাওয়া দরকার ছিল। পাঁচটা বাজতে যখন আধ ঘণ্টা বাকি তখন শ্রীনিবাসজীর ড্রাইভারের আশা ত্যাগ করতে হলো। তার দরকারও ছিল না কেননা আমার আশংকা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো এবং আনন্দভবনের সামনে অনেক রিকশা তখনও দাঁড়িয়েছিল। স্টেশনে পৌছলাম। পাঁচটা বেজে ১০ মিনিটে গাড়ি ছাড়ল। 'সংস্কৃত কাব্যধারা' প্রকাশের জন্য আমার সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল। শ্রীনিবাসজী তা নিয়ে নিলেন আর গুপ্তেজী সম্মেলন মুদ্রণালয়ে ছাপতে রাজিও হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ছাপার খরচপত্র স্থির করতে যথেষ্ট সময় লাগল। তবুও আমি তার একশো পাতা দিয়ে এসেছিলাম। ট্রেনের বাইরে দেখছিলাম—সরষে ও মটর ক্ষেতে ফুল ফুটে আছে। আলুর চাষও হতে শুরু করেছে। দেহাতেও বিদ্যুতের থাম্বা দাঁড়িয়ে আছে দেখে অবাক হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের উত্তরপ্রদেশ আর বিহারের অনেক অংশের সমস্যা হচ্ছে সেচ। যতদিন না মাটির নীচে বয়ে যাওয়া গঙ্গাকে ওপরে আনা যায় ততদিন প্রতি দ্বিতীয়-তৃতীয়-বছরে ফসলের মোটা লোকসান রদ করা সম্ভব নয়। টিউবওয়েল বসানোর জন্য বিদ্যুতের খুব দরকার। এই বিদ্যুৎ শুধু তাতেই খরচ হবে, কেননা আমাদের গ্রামে যেরকম দারিদ্র্য রয়েছে তাতে গ্রামের বোধহয় দু-একটি ঘরই বিদ্যুৎ নিতে পারবে।

স্টেশনে শ্রীসত্যেন্দ্রজীর বাবা আর পণ্ডিত দেবনারায়ণ দ্বিবেদী উপস্থিত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রজীর বাবার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি জানিয়ে দিচ্ছিল যে তিনি প্রাচীনপন্থী নন। আর পরে তো তাঁর সাহিত্য-ভাবনাও খুব উদার বোঝা গেল। সোজা সেবা উপবন গেলাম। সত্যেন্দ্রীজীর সেই দিনই তাঁর প্রেসের কাজে কলকাতা যাওয়ার ছিল কিন্তু তাঁর ছোট ভাই আর বাড়ির শিক্ষিতা মহিলারা ছিলেন। গিয়ে প্রথমে স্নান-খাওয়া করলাম। সত্যেন্দ্রজীর দুই ভগ্নীপতি সেনা-অফিসার, একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আর অন্যজন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন সাহেব তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এই সময় শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন। বেনে সেনা-অফিসার হয়েছে, এটা হয়তো আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু ভারতের এইরকম আলাদা-আলাদা ভাবে থাকা বেনে, ক্ষত্রিয় বা অন্য কারুর দরকার নেই। সেই পুরনো কাঠগড়া আগেও টিকে থাকতে পারে নি আর এখন তো কালের সঙ্গে লড়াই করে তা বাঁচতেই পারে না। আসলে অগ্রবালরাই তো আজ থেকে মাত্র দেড় হাজার বছর আগে দুর্ধর্ষ জয়মন্ত্রশালী যৌধেয় ক্ষত্রিয় ছিল। তাদের গণরাজ্য ধ্বংস হলো। তাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোনো সম্ভাবনা থাকল না, তারপর অগ্রবাল আর তাদের বন্ধুরা তলোয়ারের বদলে দাঁড়িপাল্লা ধরে নিল। এখন যদি তারা আবার দাঁড়িপাল্লাকে তলোয়ারে বদল করে তো তাতে বলার কী আছে? কোনো পেশাই কারু পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। যার সেই ব্যাপারে রুচি আর ক্ষমতা আছে, তার তা করা উচিত।

বেনারসে সত্যেন্দ্রজীর আতিথ্যে থাকার অনেক সুবিধে আছে। বাড়িতে আত্মীয়তা অনুভব করা যায়। যদিও সত্যেন্দ্রজীর স্ত্রী আর তাঁর ছোট জা সুশিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না মহিলা হওয়ায় তাঁরা আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চান। এটা আমার পক্ষে তাঁদের আতিথ্যের ঋণ শোধ করারও ভাল সুযোগ কিন্তু সবসময় কোনো না কোনো বন্ধু আসতেই থাকে অথবা আমাকেই দেখা করার জন্য তাদের জায়গায় যেতে হয়। এই জন্য আমি আমার ঋণ শোধ করতে পারি না। সেদিন তিনটের সময় মোটরে করে বেরিয়ে প্রথমে অস্‌সীঘাটে জগন্নাথ মন্দিরে গেলাম। ছেলেবেলার একবার ঘর থেকে পালিয়ে দু-তিন দিন যাঁর সঙ্গে ছিলাম, সেই পূজারী দশরথজীর দেখা পেলাম। তাঁর পুরো মাথা সাদা এবং তিনি পুরোপুরি বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বড় ভাই আর ইহলোকে ছিলেন না। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা হলো। তারপর মোতিরামের বাগানে গেলাম। মোতিরামের বাগান এখন বলা উচিত নয়, এটি গোয়েংকার পাঠশালা। কিন্তু মোতিরামের বাগান নামটি আমার কাছে যত প্রিয়, এই নাম ততটা প্রিয় নয়। বিশেষ করে আমি যখন দেখি যে তাঁর সময়ের অকপট সন্ত, মহাবিদ্বান এবং প্রকৃত অর্থেই সন্ত মঙ্গনী ব্রহ্মচারীর নাম ডুবিয়ে এই বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। কালের প্রতি আমার এই বিশ্বাস আছে যে অন্যর নাম মুছে বানানো এই সংস্থার নাম মুছে যাবে। শেঠরা কেউ ধর্মপথে অর্থ উপার্জন করে নি যে তাদের যা খুশি তাই করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে।

তারপর হিন্দু ইউনিভার্সিটির সংগ্রহালযে গেলাম। দশ লাখ টাকার বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এখন শুধু তার নীচের কয়েকটি ঘরই তৈরি হয়েছে। জিনিসপত্র এখানে এসে গেছে। রায় কৃষ্ণদাসজী এই সংস্থার ভিত্তি স্থাপন করে চিত্র, মূর্তি আর অন্যান্য জিনিস খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নাগরী প্রচারিণী সভায় একত্রিত করতে শুরু করেছিলেন। এখন সেটা একটা বড় সংগ্রহালয়ের বুনিয়াদ হতে যাচ্ছে। এখানকার চিত্রের সংগ্রহের মধ্যে কবি রহিমের ছবিও আছে। সেখানেই কূটস্থ, অটল বিদ্বান জিজ্ঞাসুজীকেও পেয়ে গেলাম। মার্কণ্ডেয়র মতো তাঁর ওপর কালের কোনো প্রভাব পড়ে

না। বলছিলেন 'আপনি ঋগ্বেদের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখছেন. তবে বই বেরিয়ে যেতে দিন আমি তাঁর জবাবে প্রমাণ করে দেব যে ঋগ্বেদ দুই অর্বুদ বৎসর আগে সৃষ্টির আদিতে ভগবানের দেওয়া জ্ঞান। ভাবনায় মতভেদ থাকলেও জিজ্ঞাসুজীর নিষ্ঠা ও বেদাধ্যয়নকে আমি সবসময় শ্রদ্ধা করি। আসলে আর্যসমাজ থেকে আমিও কিছু ব্যাপার শিখেছি, সে-উপকার আমি ভুলতে চাই না। এখানেই ড· রাজবলী পাণ্ডেকেও পেলাম। সেখান থেকে ড· বাসুদেব শরণ অগ্রবালের বাড়িতে খানিকটা সময় বসলাম। বাসস্থানে আসার পব আচার্য জগন্নাথ উপাধ্যায় এবং কত তরুণের সঙ্গে দেখা হলো।

কাগজে আমার আসার খবর ছাপা হয়েছিল। কাগজ হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীব মহান অবদান। আর খবরের কাগজের এটাও একটা সুবিধে যে নিজের বন্ধুদের আসার খবর দেওয়ার জন্য আমার আলাদা আলাদা চিঠি লেখার দরকার হতো না। ৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা থেকেই সাক্ষাৎ করতে লোকেরা আসতে শুরু করল এবং বারোটা পর্যন্ত নাগাড়ে তা চলল। দুপুরে খাওয়ার পর শ্রীঅত্রিদেব বিদ্যালংকারেব বাড়ি গেলাম। গুরুকুলেব স্নাতক প্রাচীন সাহিত্য আর শিক্ষা সম্বন্ধে এত সম্পদশালী হন যে চাইলে তাঁরা অনেক কিছু করতে পারেন। অত্রিদেবজী আয়ুর্বেদকে নিজের বিষয় করেছিলেন। তার ওপর তিনি অনেক বই লিখেছেন। তাঁর কাছেই ইংরেজির অধ্যাপক ড· ওঝার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি ভাবছিলাম, এই মুখ কোথাও দেখেছি কিন্তু মনে পড়ছিল না যে ১৯৪৮ সালে প্রয়াগে আমরা দুজন কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়াতাম। ইতিমধ্যে তিনি অনেক বছব আমেরিকায় থেকে এসেছিলেন। সেখানকার প্রগতি দেখে খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভাবতেন, ভারতেও সেই পথেই প্রগতি আসবে।

সেখান থেকে ভারতীয় মহাবিদ্যালয় (কলেজ অফ ইন্ডোলজি)-তে প্রিন্সিপ্যাল রাজবলী পাণ্ডের সভাপতিত্বে তিব্বতের বিষয়ে বক্তৃতা দিলাম। আমি তো ভেবেছিলাম হিন্দু-ইউনিভার্সিটিতে এই একটাই বক্তৃতা হবে। বিদ্যার্থীরাও বোধ হয় এই রকমই ভেবেছিল। এজন্য বড় লেকচার-হলেও তাদের কি করে ধরত? সে জন্য তো হলঘরেব প্রয়োজন ছিল। সেখান থেকে সাহিত্যিকদের সভায় গেলাম। সেখানেই শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদীকে পেয়ে গেলাম। সভার পর আমরা একসঙ্গেই রিক্সা করে গেলাম। শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদীর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত সাধারণ, করুণাময় এবং সেই সঙ্গে আকর্ষণীয়ও। তাঁকে দেখলে অষ্টাবক্র মুনির আকৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি পুরোপুরি স্বনির্মিত পুরুষ আর ভাষার তো মহান কারিগর। প্রতিটি শব্দ মেপে আর সাজিয়ে লেখেন। সরলও ভীষণ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর প্রতিভার অভাব আছে। আসলে স্বভাব হচ্ছে বুদ্ধির চেয়েও বড় জিনিস শান্তিপ্রিয়জীর সবচেয়ে অসুবিধে বোধ হয় খাওয়ার। ওই শরীরের জন্য কটা আর রুটি চাই? কিন্তু তাঁর থাকার জায়গা থেকে তা পাওয়া যায় না অথবা তাঁর রুচি অনুযায়ী তার ব্যবস্থা হয়ে ওঠে না। এখন তিনি কোনো বৃদ্ধার বাড়িতেরুটি খাচ্ছিলেন। শান্তিপ্রিয়জীর বিকেল চারটেয় অথবা রাত বারোটায় রুটি দরকার, এত দেরিতে তো কি পাওয়া সম্ভব? আমি বললাম, 'বিয়ে করছন না কেন?' বিয়ের কথা শুধোতে গিয়ে আমার বাচস্পতি পাঠকের কথা মনে পড়ছিল। দুজনেই একই শহরের বাসিন্দা ছিলেন বলে অনেক আগে থেকে তাঁরা একে অন্যের পরিচিত ছিলেন। তুলসীদাস ঠিকই বলেছেন,

'তুলসী ওহাঁ ন জাইয়ে, জহাঁ জনম কো ঠাঁও। ভাওভক্তি কো মরম ন জানে ধঁরে পাছিলো নাঁও।' ছেলেবেলায় শান্তিপ্রিয়জীর নাম হয়ে গিয়েছিল মুচ্ছন। তাঁর কখনো বড় বড় গোঁফ ছিল, এটা বিশ্বাস হয় না, তাই এই নামটি একেবারেই অনুপযুক্ত ছিল। কিন্তু পুরনো বন্ধুরা এখনো তাঁকে মুচ্ছন বলে ডাকতে অভ্যস্ত। অনেক পরিশ্রম করে এত সুন্দর শান্তিপ্রিয় নামটি পেয়ে ছিলেন। এখন তা আবার ঘুরে 'পুনঃ মূক' কি করে হওয়া সম্ভব? নিজের পুরনো বন্ধুদের বিশ্বাস করাটা মানুষের স্বভাব। পাঠকজীকেও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যখন পাঠকজী বললেন যে, 'আমি তোমার জন্য একটি বৌ খুঁজেছি।' পঞ্চাশ বছরের একটি বৌও তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন। ঠিক আর কি করেছিলেন, তাকে দিয়ে অভিনয় করানোর জন্য তৈরি করে নিয়েছিলেন। শান্তিপ্রিয়জীর খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই স্থির করা হয়েছিল। ভাবী স্ত্রী মহান সাহিত্যিকের সম্মানের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে পথ চেয়ে বসে ছিলেন। মহিলা কোনো স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন, খুবই রুচিশীলা আর শিক্ষিতা। তাঁর এক-একটি শব্দ যেন মধু দিয়ে আবৃত। পাঠকজী ইশারা করার চেষ্টা করলেন যে, এই আপনার ভাবী স্ত্রী কিন্তু শান্তিজীর মন তা মানতে পারছিল না। আসলে তিনি কী করে বিশ্বাস করবেন যে, তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু তাঁর সঙ্গে মজা করছে। মজা নয়, এটাকে তিনি ধাপ্পাবাজিই মনে করতে পারতেন। সেই বৃদ্ধা রমণীকে দেখে কেমন করে বিশ্বাস করবেন যে এর সঙ্গে নিজের সারা জীবন তাঁকে নৌকো বাইতে হবে। কিন্তু নাটক তো এমনি এমনিই করা হয়েছিল। শান্তিজী এটা টেরও পাননি যে, বিয়ের ব্যাপারটা নিছক মজা ছিল না। এমনটি না হলে তিনি বৃদ্ধাকে বিয়ে করতে রাজি হতেন কিভাবে? যতই হোক, তিনি তো কবির হৃদয় পেয়েছিলেন, তাঁর নিজের শরীর আর মুখাবয়ব অনুযায়ী নয়, বরঞ্চ তাঁর শিল্পী আর জ্ঞান অনুযায়ী স্ত্রী হওয়া উচিত। সত্যিই এটা খুব দুঃখের কথা বলতে হবে যে এত সুন্দর সাহিত্যিকের গুণগ্রাহী একজনও তরুণী সারা জম্বুদ্বীপে পাওয়া গেল না। আমিও পাঠকজীর ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতার ভাব দেখিয়ে এটাই পরামর্শ দিলাম, 'আপনি নিজের বয়সী অথবা চল্লিশোর্ধ্বা কোনো মহিলাকে বিয়ে করুন, খাওয়ার কষ্ট চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে।' কিন্তু এ কথা তাঁর মাথায় ঢুকবেই না। শান্তিপ্রিয়জীর প্রতি আমার যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা রয়েছে সেরকমটা খুব কম লোকের আছে। আমি স্বপ্নেও একথা ভাবতে পারি না যে, তাঁকে আমার কোনো দুষ্ট আচরণে দুঃখ দেব।

সন্ধে সাড়ে ছটায় গাড়িতে করে গোধুলিয়ার চৌরাস্তার কাছে বেনারস লজে সাংবাদিকদের সামনে বক্তৃতা দেবার ছিল। বেনারসের রাস্তা আজকের যুগের জন্য বানানো হয় নি, বিশেষ করে চৌমাথা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং চৌমাথা থেকে স্টেশন যাওয়ার রাস্তা। এত ভিড় থাকে যে সেখানে রাস্তা পাওয়া সমস্যা হয়ে পড়ে। সব সময় ভয় হতো যে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। চৌমাথা তো আগেই জমে উঠেছিল, এখন গোধুলিয়া থেকে দশাশ্বমেধ পর্যন্ত রাস্তাও দোকানে ভরে গেছে। এখানেই ছিল বেনারস লজের এই সুন্দর হোটেলটি যা এখনো পুরোপুরি তৈরি হয় নি। সাংবাদিক-পিতামহ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গর্দে ছিলেন সভাপতি। যথেষ্ট সংখ্যায় সাংবাদিক সেখানে জমা হয়েছিলেন। আমি যখন আমার ছাত্র-জীবনের বেনারসের সঙ্গে এর তুলনা করতাম তখন মনে হতো কাশীও কালের প্রবাহে বয়ে যাওয়া থেকে রেহাই পায় নি। এই সব সাংবাদিকদের জমায়েত আর এই সুন্দর হোটেলটি তার সাক্ষী ছিল।

সারনাথ—৮ জানুয়ারি সারনাথের প্রোগ্রাম ছিল। পণ্ডিত দেবনারায়ণজী সঙ্গে ছিলেন। মোটরে করে বোধহয় এই শেষবার সারনাথ যাওয়া হচ্ছিল, কারণ চৌমাথা থেকে সোজা সারনাথ যাওয়ার রাস্তার জন্য বরুণা নদীতে পুল তৈরি হচ্ছিল, যা এই মে মাসেই বুদ্ধের ২৫তম শতাব্দীর মহোৎসবের সময় হয়ে যাওয়ার কথা। আমরা নটার সময় সারনাথ পৌঁছলাম। গত বছরের থেকে এমনিতেই কিছু পরিবর্তন হতো কিন্তু ২৫তম শতাব্দীর জন্য তো এখানে নির্মাণ কার্যে খুব তৎপরতা দেখা যাচ্ছিল। কয়েক লাখ টাকা আমাদের সরকার খরচ করছিল। স্টেশন পুরনো জায়গা থেকে সরিয়ে এখন মুলগঞ্জ-কুটী বিহারের কাছে নরোখর দীঘির পূর্ব পাড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর নরোখরের মাঝখান থেকে সড়ক বানিয়ে সোজা বিহারে আনা হচ্ছিল। পুরনো স্টেশন থেকে আসা সড়ক থেকে বেরিয়ে যে কাঁচা সড়ক বিহারের দিকে যাচ্ছিল সেটাও পাকা করা হচ্ছিল। মহাবোধি ইন্টার কলেজের পিছন দিকে ইটের তৈরি অনেকগুলি পাকা বাড়ি অতিথিদের জন্য বানানো হচ্ছিল। হাজার হাজার লোক পিঁপড়ের মতো নব-নির্মাণকার্যে নিযুক্ত ছিল। চীনা মন্দির তার আশপাশের অনেকটা জমি কিনে নিয়েছে কিন্তু তার অল্প শিক্ষিত ভিক্ষু সরকারের কোনো সাহায্য নিতে রাজি নয়। ভয় পাচ্ছে, সরকারের অধিকার জন্মে যাবে। সে নিজের হাত-পাকে বেশি বিশ্বাস করে। দু-তিনজন আছে তবু নিজেদের জমি চাষাবাদ করে খাওয়া-পরায় সাবলম্বী হয়ে গেছে। কিছু টাকা কলকাতার চীনা বৌদ্ধ ভক্ত দিত। নতুন চীন যদি নিজস্ব কোনো বৌদ্ধ বিহার বা অন্য সংস্থা করতে চায় তো তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে এটা। মহাবোধি চিকিৎসালয়ের কাছে তিন বিঘা জমি নিয়ে একজন তিব্বতী লামাও মন্দির তুলতে শুরু করেছে। দুটি ঘর তৈরি হয়ে গেছে। এখন অধিকাংশ তিব্বতী যাত্রী সেখানেই ওঠে। দেশ অনুসারে ধর্মীয় সংস্থা বানানোর এটা একটা খারাপ দিক। তাহলে সব দেশের লোকেদের এই স্থানে একই পরিবারের মতো থাকা সম্ভব হবে কী করে? এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে বিহারের কাছাকাছি অনেক উর্বর জমি এখন আর চাষের জন্য পড়ে থাকবে না। এমনিতেও ঘর পিছু এত জমি লোকের ছিল না যাতে একজন লোকও সারা বছর তাতে উৎপন্ন শস্য দিয়ে জীবিকা চালতে পারে। বিহার, ধ্বংসাবশেষ, চীনা মন্দির আর তিব্বতী লামার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে বর্মী ধর্মশালায় গেলাম। কিত্তিমা বাবা এখন বর্মা গিয়েছিলেন। আমার ভাইপো উদয়নারায়ণ পাণ্ডে আর তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলাম। উদয়নারায়ণের শরীর এখনই বেশি মোটা আর মাথায় টাক হয়ে গিয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, বয়সের পরিবর্তন? আসলে এক্ষেত্রে পরিবর্তনটা কারণ নয়, বরং কালের গতিকে যাচাই না করাটাই কারণ। কেঁটে যাওয়া কুড়ি বছর আমার কাছে গতকাল বলে মনে হয় কিন্তু তা এত ছোট তো নয়? তাঁর ছোটভাই রামবিলাসও এখানেই উঠেছিলেন। টি বি সন্দেহ করা হয়েছে। বাড়ির আরো দুটি ভাই ম্যাট্রিক পাস করে ঘরেই খেতের কাজে যুক্ত রয়েছে কিন্তু বাবার ইচ্ছে যে তারাও কোনো চাকরিতে ঢুকে যাক। ম্যাট্রিক পাস ছেলে মাসিক ৫০ টাকা পাবে অথচ মুসৌরীতে খেয়ে-পরে মাসিক ত্রিশ টাকা সাধারণ রাঁধুনেকে দিতে হয়। বুদ্ধিজীবীর চেয়ে শরীরজীবীর মূল্যই বেশি। তাঁদের বাড়িতে ৩০-৪০ একর খুব ভাল উর্বর জমি আছে। যদি চাষ করে তাহলে কত ভালভাবে থাকতে পারে। কিন্তু পুরনো মাথা কিছু ভাবতে পারে না। তারা বিগত যুগের চালাকি দিয়ে পার হতে চায়। যা এই সময়ের পক্ষে কোনো কাজের নয়। উদয়নারায়ণ জানালেন, 'পাশের গ্রামে আমাদের খুব

ভাল জমি ছিল যার মূল্য তিন হাজার টাকা সহজেই পাওয়া যেত। আমি বললাম, বিক্রি করে দাও, কারণ আমরা তাতে চাষ-আবাদ করতে পারব না। বাবার সে কথা পছন্দ হলো না। তিনি পুরনো যুগের কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন আমার নামে যখন জমি তখন তা কে নিয়ে নিতে পারে? কিন্তু আজকের যুগে জমি সেই নিজের হাতে রাখতে পারে যে তার দেখাশোনা করতে পারে, তাতে লাঙল চালাতে পারে। কেউ মামলা করে দিল, পাটোয়ারকে পঞ্চাশ-একশো টাকা দিল আর কাগজে সে তার নাম যখন লিখে দিল তখন সেই জমি অমনিই চলে গেল।'

শ্যামলাল তার ভাগ্যকে আর দুনিয়াকে দোষ দিতে পারে। হয়তো এটা ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারে যে এই লোকে না হলেও পরলোকে অবশ্যই ন্যায় পাবে। কিন্তু ন্যায়ের রাস্তা বড় দুর্গম। তাদের পূর্বজরা কি ন্যায় করে কনৈলা গ্রামের সমস্ত জমি নিজেদের দখলে এনেছিল? আসলে সেখানকার বড় জাতের লোকেরা পালিয়ে যাওয়ার পর যে লোকেরা এখনো বাতি জ্বালিয়ে আসছিল তারা সেখানে থাকছিল এবং নিজেদের সংখ্যা আর সামর্থ অনুযায়ী সামান্য জমিও চাষ করছিল। কিন্তু রাজ্য হিন্দুর হোক বা মুসলমান অথবা ইংরেজের হোক, সকলেই চায় জমির খাজনা নিয়মমাফিক আসুক। এ রকম মোটা আসামীকে তারা ধরতে চায় যে দফায় দফায় টাকা দিতে পারবে। ছোট জাতকে বিশ্বাস করতে পারতেন না বলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে যখন বড় জাতের ইচ্ছা পাণ্ডে তাঁর চক্রপানপুর গ্রাম থেকে কনৈলা আসার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন পুরনো বাসিন্দাদের কথা একটুও না ভেবে গ্রাম তাঁর নামে লিখে দেওয়া হলো। এটা কি কোনোভাবে ন্যায় ছিল? আর তা যদি ন্যায় ছিল তাহলে আজকের ন্যায় হচ্ছে—যে চাষ করে, জমি তার।

ফেরার সময় শংকুধারায় রামানন্দ বিদ্যালয়ের আগ্রহেও সাড়া দিতে হলো। এই বিদ্যালয় আমার বন্ধু স্বামী ভাগবতাচার্য স্থাপন করেছিলেন। সংস্থা একবার স্থাপিত হয়ে গেলে এবং যদি সেটার প্রয়োজন থাকে, তাহলে হাজার অসুবিধের সম্মুখীন হলেও তা মরে না। এর উদাহরণ এই বিদ্যালয়। এখানে অনেক বিষয় আচার্য অব্দি পড়ানো হয়। ছাত্রদের মধ্যে রামানন্দী (বৈরাগী) বৈষ্ণবই বেশি। আমাদের সময়ে বড়জোর দু-একজন আচার্য বৈরাগী পাওয়া যেত। এখন শিক্ষায় বেশি প্রগতি হয়েছে। শিক্ষা আর কাল দুইয়ে মিলে মানুষকে বেশি উদারও করে দিয়েছে। আমি এক সময় বৈরাগী ছিলাম, আর্যসমাজী হয়েছি, বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়েছি, আর তারপর বুদ্ধের প্রতি অপার শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও মার্কসের শিষ্য হয়ে গেছি। এটা আমার কাছে আনন্দের ব্যাপার যে, যেসব ঘাট দিয়ে আমি গেছি তারা সবাই আমার প্রতি আত্মীয়তা পোষণ করে। এখানে সেই রকমই আত্মীয়তা দেখলাম। বক্তৃতা দিতে বলায় আমি বললাম, ভবঘুরেমি এবং সংস্কৃত ভাষা তথা সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব যতদিন বৈরাগী নিজের কাছে রাখবে ততদিন কেউ তার একচুলও ক্ষতি করতে পারবে না। শংকুধারার সঙ্গে লাগোয়া খুজবা মহল্লা। আজ থেকে মাত্র ত্রিশ বছর আগে এটাকে শহরের এলাকা নয়, বরং গ্রামের মতোই মনে হতো। কিন্তু এখন জনসংখ্যা বেড়ে গেছে, দোকানও রয়েছে অনেক। ত্রিশ বছর আগে কয়েকজন তরুণ খেলাচ্ছলে সময় কাটানোর জন্য একটি গ্রন্থাগার করেছিল। তারা খানিকটা জমিও নিয়েছিল। ধীরে ধীরে দোতলা বাড়ি হয়ে গেল। এখন সেটা ভাল একটি গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে। তাদের গুরুজনদের মধ্যে কয়েকজন এখনও বর্তমান যাঁরা ছেলেদের এই খেলাটিকে উপহাস করতেন।

কিন্তু আজ তাঁরা দেখছিলেন যে, নতুন প্রজন্ম এই গ্রন্থাগার থেকে খুব উপকৃত হচ্ছে। সেখান থেকে গিয়ে বিদ্যাপীঠে ভাষণ দিলাম। তারপর দিলাম সংস্কৃত গভর্নমেন্ট কলেজের হলে। যখন অন্ধকার হলো তখন ফিরলাম। এখানেও লোক আসতে লাগল। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকাটা আমি খারাপ বলে মনে করি না। একান্তে থাকার জন্য মুসৌরী তো আছেই। এখানে পরিচিত লোকজন আর বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলে মিলিত হওয়া যাক।

৯ জানুয়ারি বারোটা পর্যন্ত বাড়িতেই আড্ডা চলতে লাগল। খাওয়ার পর শহরে গেলাম। প্রেমচন্দের স্ত্রী শ্রীমতী শিবরানী দেবীর সঙ্গে দেখা করলাম। এখন খুব রোগা হয়ে গেছেন, হাড় আর চামড়াটুকু মাত্র সার। ছেলেরা দুজনেই প্রয়াগে, কারণ বইয়ের ব্যবসার জন্য ওখানকার চেয়ে প্রয়াগ বেশি উপযুক্ত বলে তাঁদের মনে হয়েছে। শ্রীপতি তো তার ভাল বাংলো বানিয়ে ফেলেছেন আর অমৃত কমিউনিজম করতে গিয়ে ফকির হয়ে গেছেন। শিবরানীদেবীর মেয়ে এই সময় এখানেই ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে কারুর কাছে থাকা দরকার। এখনও তিনি কখনো কখনো লমহীতে প্রেমচন্দের বাল্যস্মৃতিগুলি দেখে আসেন। তিনি এখন পাকা ফল। নতুনের জন্য পুরনো প্রজন্মকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়ই। কিন্তু সমবয়সীদের এজন্য অবশ্যই দুঃখ হয়।

ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করলাম। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম ছাত্রদের একটি সাধারণ সভা হবে কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংঘের বার্ষিক উদ্বোধন আমাকে করতে হবে। বাইরে সামিয়না টাঙানো হয়েছিল। প্রচুর সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব জায়গাতেই বৃদ্ধরা হন যিনি তাঁর পুরনো অভিজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকেন এবং সময়কে চিনতে পারেন না। তাঁরা একদিকে তো প্রচার করতে চান যে 'ছাত্রদের স্বাধীনভাবে তাদের সংগঠন আর ভাবনা প্রকাশ করার সুযোগ আমরা দিই' আর অন্যদিকে চান যে 'তারা আমাদের হাতের মুঠোয় থাকুক।' উদ্বোধন করার জন্য তাঁরা যাদের পছন্দ করতেন নতুনরা তাদের পছন্দ করত না। এই জন্যই কাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হবে তা স্থির করা যেত না। আমি আসায় একদিক দিয়ে ছাত্ররা একমত হয়ে গেল যে আমি উদ্বোধন করব। এইরকম উপলক্ষে বলার জন্য আমার অনেক কথা ছিল কিন্তু উদ্বোধনের ব্যাপারটা তো জানলাম তখন যখন শামিয়ানায় পৌছলাম। উপাচার্য এ ব্যাপারে একমত ছিলেন না এবং তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সংঘের সচিব তা দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন, এতে লেখা আছে যে তাঁর এই বিরোধিতাপূর্ণ চিঠিটি ছাত্রদের সামনে পড়ে দেওয়া হোক।' সত্যিই সেটা পড়ে দেওয়ার অর্থ আগুনে ঘি ঢালা, ছাত্ররা ক্ষেপে যেত এবং কোথাও কাঁচ-দরজা-জানলা ভাঙতে শুরু করলে তাদের অনুশাসনহীন আর উচ্ছৃঙ্খল বলে দুর্নাম করা হতো। সচিব এবং সভাপতি সেই চিঠি পড়লেন না। পুরনো প্রজন্ম বেশি চিন্তাশীল না নতুন প্রজন্ম, তা এখানেই যাচাই করা যেতে পারে। অশুভ মস্তিষ্ক বেশি খারাপ—তার যদি কোনো ক্ষমতা না থাকে তবুও। তারা কিছু দিতে পারে না কিন্তু পণ্ড করতে পারে অনেক কিছু। আমার মত খাটালে বলব পঞ্চাশের বেশি বয়সের কোনো লোক যেন এই রকম উত্তরদায়ীর পদে নিযুক্ত হতে না পারে। আমি সংক্ষিপ্ত ভাষণই দিলাম। চা-পার্টিতে যোগদান করলাম। বাবু রাধারমণের মোটর এসেছিল, তাই তাতে করে মণ্ডুয়াডী হয়ে তাঁর বাড়িতে গেলাম।

রাজা মোতিচন্দের অজমতগড় প্রাসাদটি আমি তখনই দেখেছিলাম যখন তা সদ্য সদ্য তৈরি হয়েছিল। এটা ছিল বেনারসের নতুন কায়দায় আকর্ষণীয় ইমারত। তার কাছেই অন্য একটি প্রাসাদও যে তৈরি হয়ে গেছে তা আমার জানা ছিল না। শ্রীরাধারমণ বেনারসের বড় বড় ধনীদের মধ্যে একজন। নাবালক অবস্থায় তাঁর অভিভাবক ছিলেন রাজা মোতিচন্দ, যাঁর উত্তরাধিকারী ও ভাইপো শ্রীচন্দ্রভূষণজী এবং আরও পাঁচ-সাতজন গন্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকিশোরী রমণজী হচ্ছেন ভক্তবৈষ্ণব। আমি শুধু নাস্তিক ছিলাম না, পঁচিশ বছর ধরে নিজের মুখে আমি ভক্তদের ভগবানের ওপর জোর আঘাত করে আসছি। ভক্ত শিরোমণি ব্রহ্মচারী প্রভুদত্তের মত খাটলে গরম সাঁড়াশি দিয়ে এই জিভ মুখ থেকে টেনে বের করে নিতেন। কিন্তু আজকের ভক্তরাও মনে হয় কলিযুগের হয়ে গেছে। তারা ভগবান আর শয়তান দুজনকেই সন্তুষ্ট রাখতে চায়। দেড় ঘণ্টা ধরে সেখানে সভা হলো। অতি উত্তম চায়ের সঙ্গে রান্না করা খাবারও ছিল। কিন্তু এখন আমার খাবার খাওয়া চলত না। বেনারসের পান সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিখ্যাত। সেখানকার সবচেয়ে ভাল পানের খিলি খুব সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছিল। মনে মনে অনুশোচনা হচ্ছিল যে, এর বিরুদ্ধে অজন্তায় কেন প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি? কিন্তু কোনো এক অবস্থায় প্রতিজ্ঞা যখন করে ফেলেছি তখন তা ভাঙার সাহস হতো না। আমাদের বেশির ভাগ কথাবার্তা হলো সংস্কৃতি আর সাহিত্যের বিষয়ে।

পাঁচটার সময় নাগরী প্রচারিণী সভায় পৌঁছলাম। বছরে একবার বেনারস আসতে হয় আর সাহিত্যের বন্ধুরা সে সময় স্বাগত জানানোটা দরকার বলে মনে করে। সেই অজুহাতে আমার অনেক বন্ধুর সঙ্গে একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। সভায় পৌনে এক ঘণ্টা বললাম। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম। পণ্ডিতরাজ আমাদের সময় থেকে কয়েকশো বছর আগে জন্মেছিলেন, যেমন আকবর জন্মেছিলেন। সংস্কৃতের যুগ চলে যাওয়ার পর সরস কবিতা আমরা পণ্ডিত রাজের কবিতাতেই পাই। আমার 'সংস্কৃত কাব্যধারা'-র জন্য কবিতা বাছাই করতে গিয়ে সদ্য সদ্য আমাকে তাঁর লেখাগুলি পড়তে হয়েছিল। শুধু সাহিত্যই নয়,দর্শনেরও এই অদ্বিতীয় পণ্ডিত কাশীতে জন্মে কতটা উদার ছিলেন যে, মুসলমান তরুণীকে প্রকাশ্যে নিজের ধর্মপত্নী বানিয়েছিলেন। বিরোধীরা হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁর ধর্ম আর সংস্কৃতি তাঁকে থেকে টলাতে পারেনি। তানসেন আকবরের সময়েও এমন সাহস দেখাতে পারেন নি।

সভা থেকে বেরোতেই দেখি শ্রীসত্যেন্দ্রজীর স্ত্রী তাঁর গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে পথে কথা বলার অবকাশ মিলল। আমি তাঁর অতিথি ছিলাম। কিন্তু সময় কোথায় যে কথা বলার সুযোগ বের করতে পারি। তিনি দিল্লীর মহিলা। এটা জেনে বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দও হলো যে, লোকগীতির প্রতি তাঁর খুব অনুরাগ আছে। আর যা মনে আছে তা গাইতেও পারেন। আমরা বই পড়ে হিন্দি শিখি কিন্তু তাঁর মাতৃভাষা ছিল হিন্দি। দিল্লীর পুরনো হিন্দু পরিবারগুলির ভাষা প্রায় পুরোপুরি সাহিত্যের ভাষা হয়ে গেছে কিন্তু তাদের ওপর কৌরবীর প্রভাব শেষ হয়ে যায় নি। এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে এই প্রভাবকে গুণ না মনে করে দোষ মনে করা হয় এবং তাকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। উর্দুভাষীদের মতরুক (ত্যাজ্য)-এর পরম্পরা হিন্দিও মেনে নিয়েছে। আজকাল তিনি আচার আর মোরব্বার নতুন প্রকরণ শিখছিলেন। শেখানোর জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে

কোনো মহিলাকে পাঠানো হয়েছিল। জনা চব্বিশের বেশি মহিলা তাঁর কাছ থেকে আচার এবং মোরব্বা বানানো শিখছিলেন। থাকার জায়গায় এসে আবার রাত দশটা পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা চলতে লাগল।

১০ জানুয়ারি বাইরে কোথাও গেলাম না। বারোটা পর্যন্ত এখানেই আড্ডা হতে লাগল। বেরোনোর একটু আগে চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজের মালিক শ্রীজয়কৃষ্ণদাসজী এলেন। তিনি ছাপার জন্য কয়েকটি বই চাইলেন। আমি 'সংস্কৃত পাঠমালা'-ই দিলাম আর তিনি সানন্দে তা নিয়ে গেলেন। তিনি 'সংস্কৃত কাব্যধারা'ও চাইছিলেন কিন্তু সেটা তো প্রয়াগে দিয়ে এসেছিলাম।

বারোটায় বেরোলাম। চৌমাথা থেকে দ্বিবেদীজীও সঙ্গ নিলেন। শ্রীশ্যামনারায়ণ পাণ্ডে বেনারসে প্রায় চিরদিন থেকেছেন। তিনি ভরকুড়ার উচ্চতর মহামাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে নিজের অন্য আদর্শগুলিও প্রচার করতে চান, বিশেষ করে সংস্থার নোংরামি দূর করার জন্য তাঁকে খুব তৎপর দেখা যেত। এই রকম কাজ যাঁরা শুরু করেন তাঁদের খুব বিরোধিতার সম্মুখীনও হতে হয়, যা তাঁকেও হতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সংকল্প ছিল—'ন্যায়ত্ পথঃ প্রবিচলন্তি ন পদং ন ধীরা' (ন্যায়ের পথ থেকে ধৈর্য্যশীল মানুষ এক পা-ও বিচলিত হন না)। তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শরীরে শুধু হাড় আর চামড়াই চোখে পড়ছিল। তিনি জমানিয়া পর্যন্ত এই ট্রেনেই গেলেন। আমাদের কম্পার্টমেন্টে অন্য কোনো লোক ছিল না। দ্বিবেদীজী তাঁর উপন্যাস 'কতর্ব্যাঘাত' দিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা পড়তে লাগলাম। গত প্রজন্মের হাতের লেখা এই উপন্যাস। সরল এবং আকর্ষণীয়ও। এখনও যে লোক তাঁকে পছন্দ করে তার প্রমাণ ছিল এই নতুন সংস্করণ। আরায় পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল· বিহটাতে আরো অন্ধকার হলো, গাড়িতে আলো জ্বলে গিয়েছিল। সাড়ে ছটায় পাটনা জংশনে পৌঁছলাম। ড· বদ্রীনারায়ণ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর গাড়ি করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

পাটনা—এদিকে দু-তিন দিন ধরে দাঁতে ব্যথা শুরু করেছিল। আমি পাটনা মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যালের অতিথি ছিলাম। তাঁর ছেলেও ডাক্তার, কিন্তু দুজনের কেউই দাঁতের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। ড· দেবেশ তাঁর এক বন্ধু দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি দাঁতটি পুড়িয়ে দিলেন। এর ফলে এই লাভ হলো যে জল খেতে গেলে আগে যে-ব্যথা হতো তা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এখনো তাতে ফুটো ছিল, সেটা ভরারও দরকার ছিল। আজ দাঁতের এক্স-রে করিয়ে নিলাম। কমলার চিঠি পেলাম। লিখেছিল, 'জয়া বার বার বাবার কথা শুধোয়। সে বসে বসে অপেক্ষা করে।' বাচ্চারা কত সরল হয়। প্রিয়জনকে দেখতে না পেলে তাদেরও দুঃখ হয়।

সেদিন (১১ জানুয়ারি) বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বীরেন্দ্র বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। দেবেন্দ্র কলেজে ছিলেন। কুসুমকে পেলাম। চার মাসের আরো একটি ছেলে কোলে রয়েছে। দীপক আর দীপ্তি কন্‌ভেন্টে পড়ছে, সে জন্য লন্ডনে শেখা ইংরেজি ভুলতে পারে না। সম্মেলন ভবনে শিবপূজনবাবুকে পেলাম। ডায়াবিটিস সারানোর জন্য যবের রুটি খান আবার ইন্‌সুলিনের প্রতিও তাঁর ভক্তি রয়েছে। আমি বললাম, 'যাক্ গে, আপনাব পক্ষে তো এটা খারাপ নয়, কেননা রসগোল্লা এবং অন্যান্য মিষ্টান্ন থেকে ইহলোকে বঞ্চিত থাকলেও পরলোকে আপনি তা

পেতে পারেন। কিন্তু যদি সামান্যও সন্দেহ থাকে, তাহলে যবের রুটি দিয়ে কঠোর সাধনা করা ঠিক নয়। যবের রুটিতে চিনি উৎপাদনকারী উপাদান আছে, যাকে পচানোর কাজও ইন্‌সুলিনকেই করতে হবে। আমার কথা শুনুন। রোজ ইন্‌সুলিন নিন এবং মিষ্টি ইত্যাদি যা খাওয়ার ইচ্ছে হয় তা খান। রাতের খাওয়া ছেড়ে দেন তো ভাল কথা, এতে পেট হালকা থাকে।' মিউজিয়াম গেলাম। শের সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। অল্‌টের সাহেব রোজ আসেন না।

আজমগড় থেকে শ্রীসুখরাম সিংহের চিঠি এল। আমি সেখানকার লোকেদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে লিখেছিলাম, 'আমি পাঁচ-ছ দিনের জন্য ওখানে আসতে পারি। পুরাতাত্ত্বিক স্থানগুলি দেখার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার।' আজমগড়ের নতুন গেজেটিয়ারের সমিতিতে আমারও নাম ছিল। আমি চাইছিলাম তার জন্য কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করে দিই। সুখরাম বাবু লিখেছেন, 'যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি।' পাটনার জন্য আমি দশদিন রেখেছিলাম এইজন্য যে এখানে থেকে 'সরহ কে দোহাকোশ' দেখে প্রিন্ট-অর্ডার দিয়ে দেব, কিন্তু প্রেসের দেবতাদের হাতে ভোগান্তি ছিলই। লেখক তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারে না কিন্তু কামনা করতে পারে যে ঈশ্বর এদের হাত থেকে রক্ষা করুন। দশদিন পাটনায় থাকা অর্থহীন তাই ভাবলাম মাঝে দু-তিন দিনের জন্য ছাপরা চলে যাই।

কাগজে বেরিয়ে গিয়েছিল তাই এখানেও বন্ধুবান্ধবদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। পাটনা কলেজ আর বি এ কলেজে বক্তৃতা দিতে সম্মত হলাম। যদি আগে থেকে জানতে পারতাম তাহলে ছাপরায় খবর দিয়ে দিতাম এবং সময়টা পুরোপুরি ব্যবহার করা যেত।

১২ তারিখে মিউজিয়াম গিয়ে কিউরেটর শের সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। দু-তিনটে পাথরের মূর্তি এনে আমি ড· বদ্রীপ্রসাদের বাড়িতে প্রয়াগে রেখে দিয়েছিলাম। সেগুলি এবার পেলাম। সেখানেই মিউজিয়ামে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু দিতে পারিনি বলে সেগুলি পাটনা মিউজিয়ামকে দিয়ে দিলাম। এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটা প্রেমচন্দের জন্মভূমি লমহীতে পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল সেটা দ্বাদশ শতাব্দীর। তিব্বত থেকে আনা তালপত্র আমি 'দোহা-কোশ'-এ কাজে লাগিয়ে ছিলাম, এজন্য সেগুলি এবার যত্ন করে রাখা দরকার ছিল বলে মিউজিয়ামকেই দিয়ে দিলাম।

১৩ জানুয়ারি মাঝে মাঝে সময় বের করে 'ভারত মে অংগ্রেজী রাজ্য কে সংস্থাপক' এবং 'সংস্কৃত পাঠমালা'র দুটি বইয়ের কপি ঠিক করে প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। শ্রীবৈদেহীশরণজীর নাম অনেক বছর ধরে শুনছিলাম। তার নাতি-নাতনীদের সঙ্গে মুসৌরীতে দেখা হতো। তিনি তার 'পুস্তক ভাণ্ডার'-এ নিয়ে গেলেন। বৈদেহীশরণজী সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ তবু ব্যবসায়িক বুদ্ধি এত যে তিনি পুস্তক ভাণ্ডারের মতো বিশাল প্রকাশন সংস্থা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। পরে নিজের ভাবভক্তি নিয়ে থাকতে শুরু করলেন, চাকর-বাকরের ওপর কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন যে-কারণে তা ডুবতে শুরু করল। কিন্তু পরের প্রজন্ম সেই ভুল সংশোধন করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। প্রথমে ভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছিল লহেরিয়াসরাইতে (দ্বারভাঙ্গা)। যদিও তার জন্য পাটনা হচ্ছে বেশি উপযুক্ত জায়গা এইজন্য এখন সেখানেই ব্যবসা হচ্ছিল। ভাণ্ডারের অনেক বই তিনি উপহার দিলেন। বিহারীজী (বৈদেহীশরণ)-এর কাছ

থেকে জানলাম যে, হেমচন্দ্র, মুসলমান লেখকরা ঘৃণা প্রকাশ করে যাকে হেমু বক্কাল বলে, তিনি আসলে সহসরামের রৌনিয়ার বেনে ছিলেন। ঢুসর বেনে বলে ঐতিহাসিকরা তাঁকে পশ্চিমের লোক হিসেবে জানান।ঢুসরবেনেএখন ভার্গব ব্রাহ্মণ হয়ে গেছেন, এটা ঈর্ষার ব্যাপার নয়। ব্রাহ্মণদের নিজেদের সংখ্যা বাড়ার জন্য বেশি গর্ব হওয়া উচিত। কিন্তু হেমচন্দ্র ঢুসর নয় রৌনিয়ার ছিলেন। শেরশাহ নিজেকে সহসরামের লোক মনে করতেন। দিল্লীর বাদশাহ থাকা সত্ত্বেও তিনি কালিঞ্জরে বারুদে ঝলসানো শরীর সহসরামেই কবরস্থ করতে চেয়েছেন। শেরশাহ পাঠান ছিলেন। পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে ছড়িয়ে থাকা ভোজপুরীদের ওপর তাঁর খুব বেশি বিশ্বাস ছিল। হেমচন্দ্র যদি শেরশাহর খুব বিশ্বাসভাজন হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের যোগ্যতায় শুধু অর্থমন্ত্রীই নয় উপরন্তু বড় সেনাপতি হয়ে গিয়েছিলেন, তো তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিহারীজী জানালেন, 'আমাদের মেয়েরা বিশেষ বিশেষ সময়ে হেমু আর তাঁর বাবার গান গায়।'

মোহন প্রেস 'সরহ কে দোহাকোশ' ছাপছিল আর সেখানেই 'নেপাল'-এরও পাণ্ডুলিপি পচছিল। তিন বছর ধরে 'নেপাল' মোহন প্রেসে পড়ে রয়েছে। চারশো পৃষ্ঠার কাছাকাছি ছেপেছে। আমি বললাম, 'আরো দুশো পাতা ছেপে এর প্রথম ভাগ' বের করে দাও তাহলে তোমার টাকাও ফেরৎ আসতে শুরু করবে।' বলল,'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' বিনয়ে বিগলিত হয়ে দণ্ডবৎ করতে মোহন প্রেসের মোহনবাবু খুব সিদ্ধহস্ত। আমার বিশ্বাস হয় না যে, 'নেপাল' কোনোদিন পাঁক থেকে বেরিয়ে আসবে।

সন্ধেতে দেবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে চা খেয়ে পাটনা কলেজের সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রদের সামনে রাষ্ট্রভাষার সমস্যার ওপর ভাষণ দিলাম।

ফিরে যখন এলাম, দেখলাম প্রফেসর কাশ্যপ আছেন। তিনি ভোজপুরীর খুবই সফল নাট্যকার। ছাত্রাবস্থা থেকেই বাবু লোহাসিংহ নামে খুবই ধারালো ভোজপুরী একাংক রেডিওর জন্য লিখতে শুরু করেছিলেন। নাটকে তিনি নিজে লোহাসিংহ হয়ে কথা বলতেন। রেডিওতে অনেকবার আমি তার রস গ্রহণ করেছি। কল পেলে আমি স্বয়ং লোহাসিংহর মুখ থেকে কিছু শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। এমনিতে তাঁর অনেক নাটকের সংগ্রহ আমি সদ্য পড়েছিলাম। সাহিত্যের ভাষা হওয়া থেকে বঞ্চিত আমাদের ভাষাগুলি যে কত গুণসম্পন্ন তা এটা শিক্ষিত লোকেরা মানতে চান না। কিন্তু লোহাসিংহ বা জগড়ু (হরিয়ানী)-র মতো স্রষ্টা যখন সামনে এসে পড়েন তখন হার মানতে হয়। আমাদের অলিখিত ভাষাগুলি প্রবাদ আর চুটকিতে খুব সমৃদ্ধ, তার সামনে সাহিত্যের হিন্দি অত্যন্ত দরিদ্র। এইজন্য সাহিত্যের হিন্দির, তার নিজস্ব কৌরবী বুলির সঙ্গে, পুনরায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। প্রফেসর কাশ্যপ তাঁর নাটকের কিছু অংশ শোনালেন। সেখানে আরো শ্রোতা জমা হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীদেবকুমারজী তাঁর ছেলের সমস্যার কথা জানাচ্ছিলেন। তাকে দেরাদুনের একটি বিশেষ স্কুলে এই ভেবে ভর্তি করেছিলেন যে সে মিলিটারিতে যাবে। কিন্তু এখন তার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছিলেন। সে ফেল করে যাচ্ছিল আর শরীর-স্বাস্থ্যও ভোজপুরীদের মতো ছিল না। আমি তাঁকে নাট্যকার পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রর ছেলের সম্বন্ধে বললাম। দেবকুমারজী তাঁর ছেলের জন্য মাসে দু-চারশো টাকা সহজেই খরচ করতে পারতেন, কিন্তু পণ্ডিত

লক্ষ্মীনারায়ণ এমন অবস্থায় ছিলেন না। তাঁর ছেলে অন্যান্য ব্যাপারে খুব তুখোড় ছিল, শরীরও ছিল ভোজপুরীদের মতো কিন্তু পড়তে চাইত সেই সব বিষয় যা তার ভাল লাগে। আমাদের পাঠ্য ব্যবস্থায় এইরকম ছেলেদের কোনো স্থান নেই। জেনারেল নলেজে ক্লাসে যে সবাইকে হারিয়ে দেয়, সে-ও ততক্ষণ এগিয়ে যেতে পারে না যতক্ষণ না সব পাঠ্য বিষয়ে সে পর্যাপ্ত নম্বর পায়। পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণজী বলছিলেন, 'এখন কী করব? ও পাস করে অফিসার তো হতে পারবে না অথচ আমি এখনো পর্যন্ত ওর ব্যাপারে সবকিছু চিন্তা করেছিলাম ও সামরিক অফিসার হবে এই ভেবেই। সাধারণ ইউনিভার্সিটি-গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলে অন্য কোনো চাকরিও পেয়ে যেত, কিন্তু সেটাও আবার করে শুরু করতে হবে। সে জিদ করে, আমি সেনাবিভাগেই যাব।' মিশ্রজী এও বলছিলেন, 'ও তো সেপাইদের কাজে ভর্তি হতেও রাজি।' আমি বললাম, 'মিশ্র মহারাজ,ও একেবারে ঠিক কথা বলছে। আপনি একটুও বাধা দেবেন না। ও সম্ভাবনাময় ছেলে। আমাদের এখানে চাকরিতে অবশ্যই অবিচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সেনাবিভাগে যোগ্যতা দেখেই পদোন্নতি হয়। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, বিংশ শতাব্দীরই একজন প্রসিদ্ধ জেনারেল লর্ড রবার্ট সেপাই হয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। আপনার ছেলে সামরিক জ্ঞানে পিছিয়ে নেই, অন্যান্য যোগ্যতাতেও পিছিয়ে নেই। ও শিগ্‌গিরই উন্নতি করবে।'

এত লেখা চাওয়া হচ্ছে যা আমি পুরো সময় দিয়েও শেষ করতে পারি না। যাত্রায় দেখা হওয়া সম্পাদক-বন্ধুদের কাছ থেকে তো এই বলে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম যে, ওখানেই আসব আর লিখে দেব। সেই অনুযায়ী ১৪ ফেব্রুয়ারি একটি লেখা শ্রীশিবচন্দ্রজী 'দৃষ্টিকোণ'-এর জন্য নিয়ে গেলেন আর অন্য একটি লেখা নিয়ে গেলেন 'কিশোর'-এর সম্পাদক।

এবার কাগজের মাধ্যমে ছাপরাতেও আমার আসার খবর জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। নয়াগাঁও হাইস্কুলের হেডমাস্টার শ্রীশত্রুঘ্ন তিওয়ারীর ফোন এল তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। আমি তো সেখানে যাচ্ছিলামই। তাঁর মাধ্যমে শোনপুরেও খবর পাঠানোর ভাল সুযোগ পেয়ে গেলাম আর ফোনেই প্রোগ্রাম স্থির হয়ে গেল যে, ১৬ তারিখে শোনপুর, নয়াগাঁও আর ছাপরা তিন জায়গাতেই যাব। সেই রাতেই বীরেন্দ্রজীও এসে পড়লেন। তিনি পরের দিনই ছাপরা, একমা এবং অতরসনে দ্রুত লোক পাঠালেন। সেদিন সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় পাটনা কলেজের রাজনীতি পরিষদে তিব্বত আর ভারতের সম্পর্কের বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হলো। সভাপতি ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ প্রসাদ বর্মা—হিন্দি বা সংস্কৃতের লোক নন, বরং ইতিহাস আর রাজনীতির লোক। তাঁর বক্তৃতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল ইংরেজিতে। নিঃসন্দেহে ইংরেজি সুন্দর ছিল কিন্তু হিন্দিভাষী ছাত্রদের তা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।

নালন্দা—১৫ জানুয়ারি ভোর সাড়ে পাঁচটায় দেবকুমারজীর গাড়ি চলে এল। আমরা তাতে করে নালন্দা রওনা হয়ে গেলাম। আটটার সময় নালন্দায় ছিলাম। এবার রাজগৃহ ছাড়তে চাইছিলাম না, সেজন্য কাশ্যপজীকে খবর দিয়ে আগে চলে যেতে চাইছিলাম। কাশ্যপজীকে রাস্তাতেই দেখতে পেয়ে গেলাম। পায়চারি করছিলেন। তাঁকে বলে আমরা শিলাও হয়ে রাজগৃহ পৌঁছলাম। সোজা গিরি-মেখলার ভেতরে অবস্থিত পুরনো রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষে পৌঁছলাম। এদিকে জঙ্গলে আরো কিছু জায়গা খনন করা হয়েছে। চার-দেয়ালে ঘেরা একটি স্থান অনাবৃত

করা হয়েছে যাকে 'বিম্বিসারের কারাগৃহ' বলা হয়। এখন বাসরাস্তা পাহাড় পেরিয়ে গয়ার দিকে চলে যাচ্ছে। গৃধ্রকূটের রাস্তাও কিছুটা ভাল করা হয়েছে, কিন্তু সেখান পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমরা সময় দিতে পারতাম না। সোন ভাণ্ডারের কাছ অব্দি মোটর যেতে কোনো অসুবিধে হলো না। তার পাশের জমি বন-বিভাগ নিয়ে নিয়েছে। সেখানে তাদের বাংলো আছে আর বনবিভাগের বিস্তৃতির জন্য গাছও লাগানো রয়েছে। রাজগৃহের জঙ্গল রক্ষা পাবে বলে মনে হচ্ছিল। সোনভাণ্ডারের কাছে আরো একটি চাটান পাথর কেটে বানানো গুহা বেরিয়ে এসেছে। রাজগৃহের আশপাশে অনেক পুরাতাত্ত্বিক স্থান আছে। কিন্তু পুরাতত্ত্ববিভাগ ততটা সম্পদশালী নয়। বর্মী ধর্মশালায় ১৪ বছর ধরে সেখানকার স্থানীয় ভিক্ষু বসবাস করে এসেছে, কিন্তু আমরা পরস্পরকে দেখিনি। পনের বছর পরে পরে এলে পরিবর্তন বেশি বলেই মনে হবে। কিন্তু রাজগৃহের ইতিহাস নয়, একাধিক তপ্তকুণ্ড এটা চাইছে যে, স্বাস্থ্যের জন্য তাদের বেশি করে কাজে লাগানো হোক। এইরকমই, পুরনো রাজগৃহের কোণায় কয়েক মাইল বেষ্টিত একদা মগধের গৌরব 'সুমাগধা' নামের পুষ্করিণী ছিল, যা এই পার্বত্য ভূমির সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও জলের সমস্যার সমাধানই শুধু করত না, উপরন্তু আজও তার অস্তিত্ব বজায় থাকলে হাজার হাজার একর জমি জলসেচ করা যায়, কিন্তু এখনো তার দিকে কারু নজরও যায়নি। আজ মকর সংক্রান্তির মেলা। শুনশান রাজগৃহের একটি অংশে হাজার হাজার নরনারীর আনন্দোৎসব হচ্ছিল।

ফিরে সিলাও থেকে চিঁড়ে আর খাজা নিয়ে আমরা দশটায় নালন্দা পৌঁছলাম। ছোট পুচীর ছেলে এখন গৃহী হয়েগেছেন। স্ত্রী এবং পুত্র সেই তিব্বতী বিহারে ছিলেন। ছোট পুচী এ সময় ওখানে ছিলেন না। নালন্দা পালি ইন্‌স্টিটিউটের নাম পাল্টে 'নব-নালন্দা-বিহার' রাখা হয়েছে, যা বেশি উপযুক্ত নাম। অধ্যাপকদের চার-পাঁচটি বাংলো তৈরি হয়ে গেছে আরো বানানো হচ্ছে। নতুন বানানো বাড়িতে এখন লোক থাকতে শুরু করেছে। ছাত্রদের মধ্যে এশিয়ার সমস্ত বৌদ্ধ দেশের ভিক্ষু বা ছাত্র উপস্থিত ছিল। গ্রন্থাগারের জন্য তিন লাখ টাকায় আলাদা বাড়ি তৈরি হতে যাচ্ছিল। ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় দেবনাগরী অক্ষরে পালি ত্রিপিটক সম্পাদিত হয়ে ছাপা শুরু হয়েছে কিন্তু এমন গতিতে ছাপা চলছে যে বিংশ শতাব্দীর শেষেও হয়তো তা সম্পূর্ণ হবে না। এখন মোনোটাইপে ভাল ছাপে এমন অনেক প্রেস আছে অথচ এই কাজটি বোম্বের একটা পুরনো প্রেসকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে পিঁপড়ের গতিতে চলার জন্য বিখ্যাত। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থগুলি সম্পাদনার কাজ দেওয়া হয়েছে দ্বারভাঙ্গার মিথিলা ইন্‌স্টিটিউটকে, কে জানে এতে বুদ্ধির কী পরিচয় আছে। উচিত ছিল যে বৌদ্ধ গ্রন্থের জন্য, তা সে যে ভাষাতেই হোক, নালন্দায় ব্যবস্থা করা। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি মিথিলা ইন্‌স্টিটিউটে আর জৈন গ্রন্থগুলি বৈশালী ইন্‌স্টিটিউটে দেওয়া। কিন্তু তাদের ভাষা অনুসারে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ তিনটে প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের জন্য রাখা হয়েছে যা মোটেই ঠিক নয়। তিব্বতী আর চীনা গ্রন্থের অনুবাদ বা সম্পাদনার জন্য কাকে বাছা হবে? নালন্দাকেই তো?

আরো একটি অসন্তোষজনক ব্যাপার দেখতে পেলাম। সিংহল, বর্মা, থাইল্যান্ড, কাম্বোজ ইত্যাদির ছাত্ররা ভারতে এসে সংস্কৃত-পালি ছাড়া হিন্দিও অধ্যয়ন করতে চায়। তার কারণ হিন্দি ভারতের সংঘরাষ্ট্র ভাষা হওয়ায় তাদের দেশে তার গুরুত্ব আছে। আলাদা সময়ে, অধ্যাপকরাও

বিনা বেতনে পড়াতে প্রস্তুত কিন্তু নতুন পরিচালক এখানে হিন্দি পড়াটা অর্থহীন বলে মনে করেন। এখনো আমাদের কত অহিন্দি-বিদ্বানদের মাথায় হিন্দির গুরুত্ব প্রবেশ করছে না। তারা ইংরেজিকে প্রথম স্থান দিতে প্রস্তুত, সে কাম্বোজ, চীন ইত্যাদি দেশে তার গুরুত্ব না থাকলেও। তারা চায় যে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি অধ্যয়ন করা হোক। আমি অবৈতনিক পরিচালক কাশ্যপজীকে বললাম, 'পালি-ত্রিপিটকের অন্তত একশো বা পঞ্চাশটি কপি হ্যান্ডমেড পেপারে অবশ্যই ছাপাবেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা ও অন্য অনেক জায়গা থেকে বহু প্রকাশিত বইয়ের পাতা এখনই এত জীর্ণ হয়ে গেছে যে সেগুলি খুলে বেরিয়ে আসে আর সামান্য অসাবধানী হলেই ছিঁড়ে যায়। কমপক্ষে একশো কপি তো দু-চারশো বছর থাকার মতো করে ছাপা হোক।

সেখান থেকে আমরা বড়গাঁও গেলাম। আসল গ্রামটি এই নামেই খ্যাত। সূর্য-মন্দিরের জন্য তাকে সূর্যতীর্থ বানিয়ে পাণ্ডারা নিজেরাই কাজে লেগে পড়েছে। মন্দিরটি মূর্তির সংগ্রহালয়ের চেহারা নিয়ে নিয়েছে। ভেতরে আর বাইরে চারটির বেশি বৃক্ষধারী সূর্যের মূর্তি আছে। পালযুগেরও অনেক মূর্তি আছে। গ্রামে পঞ্চায়েত আছে, কিছুটা রাস্তাও ভাল করা হয়েছে, কিন্তু গ্রামের সমৃদ্ধ জীবন এখনো অনেক দূরের ব্যাপার।

পাটনা ফেরার সময় বিহার শরীফের বড় দরগা দেখতে গেলাম। এটা মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক যুগে আগত এক ফকিরের দরগা। বিহার শরীফ প্রারম্ভিক মুসলিম শাসকদের শাসনকেন্দ্র ছিল। তারা ভেবেছিল যে মূর্তি ভাঙলে, মন্দিরে আগুন লাগালে খুব পুণ্য হয়। তাই নালন্দার বিস্ময়কর গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করতে তারা বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করে নি। বিহার আর তার নিকটবর্তী লোকেরা আতংকে মুসলমান হয়ে গেল। বিহার শরীফে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল যারা নিজেদের হিন্দি-সংস্কৃতির ছোঁয়া থেকে দূরে রাখার জন্য সব রকমের চেষ্টা করত। আজ যদিও আমাদের সরকার চেষ্টা করে যে, ভারতের সমস্ত নাগরিকদের সমান অধিকার থাকুক কিন্তু সমাজ থেকে যারা নিজেদের আলাদা করে রাখার ভীষণ চেষ্টা করেছিল তারা এখন কেন একাকিত্ব অনুভব করবে না? আমাদের দরগা দেখানোর জন্য এক সম্ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক পাওয়া গেল। কথায় কথায় তাঁর নিরাশা ব্যক্ত হয়ে পড়ছিল। অন্যদিকে আমাদের ড্রাইভার মেঁহদী মিয়াঁকে দেখছিলাম। তিনি উচ্চশ্রেণীর মুসলমান ছিলেন না। সাধারণ জোলা বা অন্য কোনো জাতের ছিলেন। তিনি হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েও ভাষা, বেশভূষায় হিন্দুদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য রাখতেন না। মেঁহদী মিয়াঁ ধুতি-পাঞ্জাবী পরেছিলেন। হোটেল মালিক ব্রাহ্মণও তাঁকে থালায় খাবার দিতে রাজি ছিল। যতক্ষণ তাঁর নাম না শুধোনো হচ্ছে ততক্ষণ কেউ বলতে পারত না যে তিনি মুসলমান। বস্তুত ভারতের জন্য এইরকম হিন্দু-মুসলমানেরই দরকার। মেঁহদী সেনাবিভাগের কর্মচারী ছিলেন। যখন দেশ ভাগাভাগি শুরু হলো তখন না-না করা সত্ত্বেও তাঁর নাম পাকিস্তানে লিখে দেওয়া হলো। বাধ্য হয়ে কয়েক মাস ধরে লাহোরে থাকেন। সেখানে সবসময় তাঁর চম্পারণকে মনে করে কাঁদতেন। খুব চেষ্টা করলেন, শেষে নিজের দেশে ফিরে এলেন। মেঁহদী মিয়াঁকে আমি দেখছিলাম আর ওদিকে দরগার সেই পথ-প্রদর্শককে। মেঁহদী মিয়াঁকে নৈরাশ্য স্পর্শও করতে পারেনি। তিনি নিজের মতো করে ছিলেন। একদা হিন্দুরা তাঁর হাতের অন্ন-জল গ্রহণ করত না কিন্তু এখন হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিত

আর সম্ভ্রান্তরা এই ছুৎমার্গকে অনেক দূরে ফেলে এসেছে।

চারটে নাগাদ আমরা পাটনা ফিরে এলাম। পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদী আর শ্রীধূপনাথজী এসে পড়েছিলেন। ত্রিবেদীজী সেই রাতেই ফিরে গেলেন। পরের দিন আমারও ছাপরা যাওয়ার ছিল।

ছাপরা

সোনপুর—ভোর পাঁচটায় অন্ধকার থাকতে অন্যের ওপর ভরসা করে গাড়ি ধরাটা খুবই অসুবিধের ব্যাপার। এইরকম সময়েই, মহেন্দ্র ঘাটে গঙ্গার ওপারে নিয়ে যাওয়ার স্টিমার ধরার ছিল আমার। বীরেন্দ্রজী সঙ্গে রিকশা নিয়ে এসেছিলেন নইলে সেটাও সমস্যা ছিল। ঘাটে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর জাহাজ এল। খুব ভিড় ছিল। ছটার পর আমি পলেজা ঘাট পৌছলাম। সোনপুরে যে খবর চলে গেছে তা রবীন্দ্র বিশ্বকর্মার স্বাগত সম্ভাষণ থেকে বুঝতে পারলাম। রবীন্দ্র হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের লোক। তার দাদু খুব ভাল মিস্ত্রি আর সোনপুর স্বরাজ্য আশ্রমের প্রতিবেশী ছিলেন। আশ্রমের বাসিন্দারা পাল্টে পাল্টে যেতেন কিন্তু মিস্ত্রি ছিলেন অনড়। তিনি আশ্রমের দেখাশোনাই শুধু করতেন না, সময়ে সময়ে আসা-যাওয়া করা লোকেদের আতিথ্যও করতেন। কে জানে কতবার আমি রবীন্দ্রর দাদুর বাড়িতে খেয়েছি। দাদু এখন আর নেই, বাবাও বুড়ো হয়ে গেছেন আর নাতি হচ্ছে যুবক। দাদু এরকম নিরক্ষর ছিলেন। বাবা কিছুটা পড়াশোনা করেছিলেন আর ছেলে এখন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবানরূপে আমার সামনে ছিল। এক এক প্রজন্মে কত পরিবর্তন হয়। ট্রেনে বসে সোনপুর স্টেশনে পৌছলাম। সোনপুর একদা আমার কাছে ঘরের মতো ছিল। মাসের পর মাস না হলেও দিনের পর দিন এখানে থাকা, কাছাকাছি গ্রামে ঘোরা আমার কাছে অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না কিন্তু এখন আমি কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় দিতে পারতাম। সোনপুর গ্রামে যাওয়ার সময় বের করতে পারতাম না। স্টেশনে পুরনো সহকর্মী ও নেতাজী বাবু যমুনা সিংহ, মাস্টার ভগবত সিংহ আর অন্য লোকেরা অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। বাবু যমুনা সিংহকে সেই সময় থেকে দশ বছর আগে লোকে 'নেতাজী' বলা শুরু করেছিল যখন শ্রীসুভাষচন্দ্র সেই নাম পাননি। তিনি এবং মাস্টার ভগবত সিংহ এখন পুরো বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। স্টেশনেই চা খাওয়ানো হলো, তারপর সেখান থেকে 'আভা' কার্যালয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বসতে হলো। এখানকার শিক্ষিতরা, বিশেষ করে ছাত্র এবং অধ্যাপকরা, এই পত্রিকাটি অনেক বছর ধরে প্রকাশ করছেন। আগে ছিল হাতে লেখা, এখন তার কয়েকটি সংকলন ছাপাও হয়েছে। তারপর স্বরাজ্য আশ্রমে গেলাম। ১৯২১ থেকে আমি এই জায়গার সঙ্গে পরিচিত। জমি ছাড়া অন্য ব্যাপারগুলিতে পরিবর্তন হয়েছে। বারান্দার সঙ্গে কয়েকটি ঘর আর সামনে যথেষ্ট বড় রোয়াক আছে। তাতে দেড়শো লোক বসতে পারে। নীচে

—১৯৫৬—

একদিকে ১৯৪২-এর শহীদদের স্মারক রয়েছে। সভায় তিনশোর কাছাকাছি লোক এল। পুরনো পরিচিতরা আর নতুন প্রজন্ম তাদের পুরনো স্বরাজ-এর কর্মীকে অকৃত্রিমভাবে স্বাগত জানাল। আমিও নিজেকে ধন্য মনে করলাম। নেতাজী খাওয়ালেন। খুব ভাল লাগল যে তিনি আর মাস্টার ভগবত সিংহ এখন বার্ধক্যে নিশ্চিন্তে আছেন। এখানেই নয়াগাঁও হাইস্কুলের হেডমাস্টার শ্রীশত্রুঘ্ননাথ তিওয়ারীর সঙ্গেও দেখা হলো। তিওয়ারীর সেই মুখও আমার মনে আছে যখন তিনি ১৬-১৮ বছরের তরুণ ছিলেন। ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। আরো পড়া এবং সেই সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করারও ইচ্ছে ছিল। এইরকম তরুণ আমি ছাপরা আর অন্যত্রও পেতাম। আমি তাদের সবসময় উৎসাহিত করতাম যে তারা তাদের সামনে যেন বড় কোনো লক্ষ্য রাখে। কিন্তু সবাই তো বড় লক্ষ্য রাখতে পারত না। সেদিন যখন তিওয়ারীর সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা হলো আর জানতে পারলাম যে, সেই তরুণ এখন একটি হাইস্কুলের খুব যোগ্য একজন হেডমাস্টার, তখন আমার খুব আনন্দ হলো। খাওয়ার পর নয়াগাঁও-এর প্রোগ্রাম ছিল।

নয়াগাঁও—যেখানে সড়ক রয়েছে সেখানে মোটর-বাস চলবে না, এটা সম্ভব নয়। যদি রেলের সুবিধে থাকে, তখনও, মোটরের জন্য সুযোগ থাকে না এটাও কোনো কথা নয়। রেলওয়ে কর্মকর্তাদের রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে, ভারতের জনগণের এক শতাংশ রেলগাড়িতে অবশ্যই চড়ে। আমি মনে করি এই এক শতাংশের মধ্যে সেই সব যাত্রীরা নেই যারা মোটরে-বাসে যাতায়াত করে। যেখানে সরকারি রোডওয়েজের বাস চলে সেখানে প্রাইভেট বাস চলে না। সোনপুর থেকে ছাপরা রেলগাড়ি যায় কিন্তু প্রাইভেট বাসও এখান থেকে সব সময় যেতে থাকে। আজমগড় সম্বন্ধে তো শুনতে পেলাম যে, যেখানে রোডওয়েজ সড়ক নিয়ে নিয়েছে সেখানে প্রাইভেট মোটর-মালিকরা মাল পবিহনের লরি চালাতে শুরু করেছে। গরুর গাড়ি ভাড়া করার চাইতে লরি ভাড়া করাটা লোকের কাছে বেশি সস্তা মনে হয়। লরিতে তিওয়ারীজী আর বীরেন্দ্রজীর সঙ্গে আমি চললাম। নয়াগাঁও-এরই হাইস্কুলের শিক্ষক হচ্ছে ভিখারী। ভিখারী শোষিত শ্রেণীর মানুষ, খুব কষ্টে ম্যাট্রিক পাস করেছে। কলেজে পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল। একদিকে আর্থিক সমস্যা অন্যদিকে দেশ থেকে শোষণ দূর করার উৎসাহ, এই দুইয়ের ফলে তাঁর পড়াশুনো এগোতে পারল না। এখন এখানেই একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়ে নিজের ভাবনাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার কাছেও লেগে রয়েছে। আমি তো এদের মতো লোককে তপস্বী বলে মনে করি।

হাইস্কুলের অনেক ঘর তৈরি হয়ে গেছে। ছেলেদের সংখ্যা বাড়ছে। সেই অনুযায়ী বাড়িও নতুন করে বেড়ে চলেছে। নয়াগাঁও অনেক শিক্ষিত আর প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে। বটোহিয়া-এর বাবু রঘুবংশ নারায়ণ এখানকারই লোক ছিলেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাসুদেব নারায়ণ এখানকারই ছিলেন। ছাপরায় মিডিল পর্যন্ত হিন্দি শিক্ষা অবৈতনিক করে চালানোর অভিজ্ঞতা যে জেলা স্কুল-নিরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল, তিনি এখানকারই ছিলেন। আশপাশের ভাঙাচোরা মূর্তি আর ধ্বংসাবশেষগুলি থেকে এটাও বোঝা যায় যে, এই মাটিতে কত ঐতিহাসিক সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে। ছাত্র এবং শিক্ষকরা স্বাগত জানালেন। আমি ভাষণ দিলাম।

এখান থেকে সাড়ে তিনটেয় জনতা ট্রেন ধরার ছিল। স্টেশনে গেলাম। ছেলেদের অনেকে স্টেশন গেল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ট্রেনে যাবে আর কয়েকজন আজকের বক্তার তামাশা দেখতে চাইছিল। ১৫-১৬ বছরের নীচের ছেলেরা আর আমার সম্বন্ধে কী জানবে? তাদের দাদুরা থাকলে কিছু কথা জানাতেন কিন্তু এখন তো তাঁরা পৃথিবীতে নেই। স্বরাজ-এর কর্মী হিসেবে আমাকে জানে এমন লোকের সংখ্যা এখন ছাপরায় খুব কমই অবশিষ্ট ছিল। তবে লেখাপড়ার শখ যাঁদের আছে তাঁরা লেখক হিসেবে রাহুলজীর নাম অবশ্যই জানেন। এই ছেলেগুলি, যারা বহুক্ষণ ধরে স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল, তারা যদি আমার কথা শুনছিলও তো তা খুব দূরাগত কোনো আওয়াজের মতো। তারা হাইস্কুলের ছাত্র ছিল। কিন্তু একশোর মধ্যে দশজনেরও পায়ে জুতো ছিল না। জামাকাপড় হয়তো ছেঁড়া ছিল না কিন্তু ময়লা অবশ্যই ছিল। দুইয়েরই কারণ হচ্ছে দারিদ্র। আমাদের নেতারা 'গরীবী নিপাত যাক্' বলে বড় বড় ভাষণ দেয়। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টায় লক্ষ্মী গরিবদের ঘরে নয়, বরং শেঠদের ঘরে দিনে দ্বিগুণ রাতে চারগুণ করে বেড়ে যাচ্ছে। তারা তাদের জীবদ্দশায় কখনোই গ্রাম থেকে দারিদ্র দূর করার কোনো আশা রাখে না এবং তার জন্য কোনো চেষ্টাও করে না।

ছাপরা—আমাদের ট্রেন সাড়ে পাঁচটায় ছাপরার কাছাকাছি পৌঁছল। পুরনো অনেক বন্ধু আর তরুণ স্টেশনে দেখা করল। ছাপরায় চিরদিনই পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদীর ঘরই আমার ঘর, তাই সোজা সেখানে গেলাম। সেই দিনই সন্ধেতে টাউন হলে বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে কিছুক্ষণ বসে সেখানে গেলাম। টাউন হলে সমস্ত লোক কি আর করে আসে, তবু হলে বেশ কিছু পরিচিতি মুখ দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। ছাপরাতে, সে শহর হোক বা দেহাত, আমি সবসময় ভোজপুরীতেই ভাষণ দিয়ে এসেছি। কিন্তু আজ কি জানি কেন এই ব্যাপারটা ভেঙে গেল। অন্যদের হিন্দিতে বলতে দেখে আমিও তাতেই বলে ফেলাম। ত্রিবেদীজীর বাসায় আসার পর আরও অনেক বন্ধু দেখা করতে এল। ছাপরায় আরও একদিন এসে থাকা দরকার।

পরসা—চেষ্টা করা হলো যাতে মোটর খুব ভোরেই পাওয়া যায় আর আমরা আজই একমা, পরসা, অতরসন আর সম্ভব হলে সিওয়ানও ঘুরে যেন রাতেই ছাপরা ফিরে আসি। কিন্তু মোটর খুব লোকের কাছেই আছে। সরকারি অফিসার আর কিছু শেঠেরই তা রাখার ক্ষমতা আছে। আগে প্রতি দু-চারটে গ্রামে কোনো একজন বড় জমিদার থাকত, যার কাছে হাতি, ঘোড়া, এক্কাগাড়ি থাকত। মোটরের যুগ যখন এল তখন তারা এই জিনিসগুলোকে মোটরে বদলে দিল। এখন জমিদারি উঠে যাওয়ায় এই সব বাবুরা আর নেই, সেজন্য মোটর পাওয়ার সুবিধে নেই। থাক্‌গে, বাস ও ট্রাকের মিলিত চেহারার একটি মোটর সওয়া দশটায় এল। তাতে করে আমরা ছাপরা থেকে বেরোতে পারলাম। সঙ্গে ছিলেন বীরেন্দ্রকুমার আর শ্রীরামানন্দ সিংহ। দুজনেই ধূপনাথজীর ভাইপো। রামানন্দ বি এ পাস করে তার সময় রাজনীতির কাজে লাগিয়েছে, কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সে একজন। আমাদের চোখের সামনেই সে সাবালক হয়েছে আর এখনই তাঁর মুখে বার্ধক্যের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। একমা পৌঁছলাম ৪৫ মিনিটে। সড়ক দিয়ে প্রচুর মোষ আর ভাল জাতের গরু-বাছুর যাচ্ছিল। জানতে পারলাম এগুলো কলকাতা থেকে

আসছে। দুধ দেওয়ার সময় মালিকরা তাদের কলকাতায় রেখেছিল। এখন দুধ আর দিচ্ছে না বলে তাদের নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। আবার বিয়োলে তাদের পাটনা পর্যন্ত হাঁটিয়ে এবং তারপর ট্রেনে চড়িয়ে কলকাতা নিয়ে যাবে। আমি এই গোপালকদের সর্বান্তকরণে আশীর্বাদ করছিলাম। কলকাতায় দুধের জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতির মোষ আর গরু আসে। তারা দিনে ১৫-২০ সের অব্দি দুধ দেয়। দুধ শুকিয়ে যাওয়ার পর তাদের রোজ দু-টাকার করে কে খাওয়াবে? অনেকে তো তেমন গরু-মোষ কসাইকে দিয়ে দেয়। অধিকাংশ উচ্চমানের দুগ্ধবতী পশুকে একটি বাচ্চা বিয়োনোর পরে যতদিন সে দুধ দেয়, তার পরেই মেরে ফেলা হয়। কি ভয়ংকর আর মূর্খতাপূর্ণ রীতিতে পশু সম্পদের সংহার হয়।

যে গরু-মোষের বংশকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করা আমাদের পরম কর্তব্য তা এই ভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অন্তত এই গরু আর মোষগুলিকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই কোনো আইন হওয়া দরকার। কিন্তু তাতে করে কি আর্থিক ক্ষতি হ্রাস পাবে? সব গোপালকই ছাপরা বা তার নিকটবর্তী বিহারের জেলাগুলোর নয় যে তারা কলকাতা থেকে নিজেদের মাল এখানে নিয়ে আসবে। এর একটাই উপায় আছে। কলকাতা আর এই ধরনের অন্য শহর থেকে পঞ্চাশ-একশো মাইল দূরে ৪০০-৫০০ একর ভাল গোচারণ ভূমি সরকার সুরক্ষিত করে দিক যেখানে শুকনো গরু-মোষ পাঁচ-দশ টাকা প্রবেশ-ফি নিয়ে রেখে নেওয়া হবে। বিয়োনের পর মালিকের আবার তাকে নিয়ে যাওয়ার অধিকার থাকবে। এ ছাড়া আরেকটা উপায় হতে পারে যে, বড় শহরগুলোতে ডেয়ারির কাজ সরকার নিজের হাতে নিক। যদিও এর ফলে হাজার হাজার লোক-বেকার হয়ে যাবে। সে দিকেও নজর দিতে হবে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই আমি যাচ্ছিলাম, এমন সময় পাশের একটি বাছুর চিৎকার করে ডেকে উঠল। দু-তিনটে বাছুর একটি দড়িতে বাঁধা অবস্থায় যাচ্ছিল। মোটর তাদের পাস দিয়ে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেল। আমার স্বপ্নভঙ্গ হলো এবং বহুক্ষণ ধরে বুক কাঁপতে লাগল। প্রথমত এই ভেবে যে মোটর যদি তাদের পায়ের ওপর দিয়ে চলে যেত! দ্বিতীয়ত, মনে হল, এ রকম হাজার হাজার বাছুর আর তাদের মায়েরা কলকাতায় পা রাখার জায়গা না পেয়ে হয়তো কসাইদের ছুরির নীচে জবাই হয়ে গেছে।

একমায় লক্ষ্মীবাবুকে বলে দিয়েছি যে আমরা সোজা পরসা যাচ্ছি। সেখান থেকে ফিরে এখানে আসব। পরসা এখন আমি ত্রিশ বছর পরে যাচ্ছিলাম। ১৯২৬ সালের পর কখনো এই মাটিতে পা রাখি নি। সে সময় কংগ্রেসী প্রার্থীর বিরুদ্ধে এখানকার খুব জবরদস্ত জমিদার শিবজী জেলা বোর্ডের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রচারের জন্য এখানে এসেছিলাম। জমিদারকে খুশি করার জন্য এমন কিছু লোক নেমে এল যাদের আমি জানতাম তারা আমার বিরোধী হতে পারে না। এই সময়েই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—যতদিন না জমিদারি প্রথা উঠে যাচ্ছে ততদিন পরসা আসব না। এখন আসার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি পরসাবাসীদের চেয়েও বেশি আগ্রহ নিয়ে এখানে এসেছিলাম। প্রথমেই ছোট মঠটি পেলাম। সেই ছোট মঠ যেখানকার ভাবী মোহান্ত বানানোর জন্য লক্ষ্মণদাসজী আমাকে বেনারস থেকে এনেছিলেন। মঠে যদিও আমি থাকতে পারি নি এবং মোহান্তও হতে পারি নি। তার জন্য অন্য কারু দোষ নেই—আমার নিজের ভবঘুরেমি আর জ্ঞানের প্রতি তীব্র

অনুসন্ধিৎসাই ছিল তার কারণ। সত্যিই ঐ ছোট্ট খোলের ভেতর থেকে আমি কী করে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে পারতাম? কী করে আমি একেক কণা জ্ঞান অর্জন করতে পারতাম? আজ ছোট মঠটির রূপ পাল্টে গিয়েছিল। দুটি মন্দির আর সমাধি এবং আরও দু-একটি ঘর ছাড়া সবই ছিল নতুন বাড়ি। খোলার চালা আর কাঁচা দেওয়াল সরিয়ে সেখানে পাকা ইমারত হয়ে গিয়েছিল। আমার গুরু মোহান্ত লক্ষ্মণদাসের পাকা বাড়ি বানানোর পাগলামি ছিল। তিনি রোজগারের জন্য কোনো চিন্তা করতেন না আর টাকা-পয়সা ধার নিয়ে নিয়ে তা ইঁট-চুনে খরচ করতেন। তিনি গোটা মঠটি ইঁট-চুন দিয়ে বানাতে পেরেছিলেন। যে সময় আমি এই লাইনগুলি লিখছি, সে সময়, ত্রিশ বছর পর মঠ দেখে আসা মাত্র তিন মাস হয়েছে। তবু মানসচক্ষে ত্রিশ বছর আগেকার সেই মঠই আঁকা রয়েছে। বার্ধক্যে বোধ হয় মনের ওপর পড়া প্রতিবিম্ব বেশি গাঢ় হয় না আর দ্রুত তা মুছেও যায়। তখন ইঁট-চুনের নয়, মাটি আর খাপরার ছিল এই মঠ। সে সময় শয়ে শয়ে সাধু এখানে থাকতেন। প্রতিটি জায়গা জমজমাট ছিল। আমি থাকাকালীনও (১৯১৩ খ্রি) খাবার সময় জনা চব্বিশেরও বেশি সাধু পঙ্‌ক্তিতে বসতেন। এখন তো সময়ই পাল্টে গেছে।

আমি বার বার পালিয়ে যাওয়ায় মোহান্তজী নিরাশ হয়ে তাঁর ভাইপো শ্রীসত্যনারায়ণ দাসকে চেলা করে মোহান্ত বানালেন। তাঁর আগে শ্রীবীর রাঘবদাস শিষ্য হয়েছিলেন। বর্তমানজী খুব সাদাসিধে। বীর রাঘবদাসজী বেশি বুদ্ধিমান আর মঠের ব্যবস্থাপনার ভারও তাঁর ওপর বেশি। আগের বার আমি যখন মঠ দেখেছিলাম তখন দুজনেই যুবক ছিলেন। এখন দুজনেরই চুল সাদা। জমিদারি প্রথা শেষ হয়েছে, মঠের ওপর আর ততটা প্রভাব পড়ে নি।. কিন্তু পণ্ডিত-মুর্খের দল মঠের কর্মকর্তাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। যখনই মঠের সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা হতো আমি ভবঘুরেমি ছেড়ে মোহান্তজীর ডাকে পরসা চলে আসতাম। আর আমি আসায় লাভও হতো। এ কথা আমার দুই গুরু ভাইও জানতেন। তাঁরা পরামর্শ চাইলেন। জানা গেল, কোনো বেয়াক্কেলে মোহান্ত শিখিয়েছেন যে আমরা আমাদের মঠের সম্পত্তি যদি প্রাইভেট বলে ঘোষণা করে দিই তাহলে তা বেঁচে যাবে। আমি বোঝালাম, জমিদারি প্রথা আর জমিদারি রূপে বর্তমান সম্পত্তি তো কখনোই আগের মতো থাকতে পারে না। যে চাষ করবে, খেতে তার অধিকার থাকবে, ব্রহ্মাও তা টলাতে পারবেন না। মঠের সম্পত্তি যদি সার্বজনিক ধর্মোত্তর সম্পত্তি বলে মনে করা হয় তাহলে আপনারা বিশেষ ছাড় পাবেন। জমিদারি থেকে বার্ষিক যে খাজনা পেয়ে আসছেন তা থেকে আদায়-তহসীল বাবদ দু-চারশো টাকা কেটে বাকি নগদ টাকা পেয়ে যাবেন। এই সুবিধে নিজস্ব জমিদারি আছে এমন কোনো লোক পাবে না। এছাড়া ব্যক্তিগত জমিদারের মাত্র কয়েক বিঘা জমিই চাষের জন্য রাখার অধিকার থাকবে। আপনাদের মঠে অনেক সাধু থাকেন, তাঁদের হিসেব করলে নিজস্ব চাষের যথেষ্ট জমি রাখার অধিকার মঠের থাকবে এবং কয়েকশো বিঘা জমি আপনারা চাষ করাতে পারেন। এই সুবিধেও থাকবে না আর আপনার মঠের জন্যেও সেই বিশ-ত্রিশ একর জমি পাওয়া যাবে, যা অন্যরা পাচ্ছে। বিহারেই শুধু নয়, উত্তরপ্রদেশেও মোহান্তদের মধ্যে এই রকম চাঞ্চল্য। কত মোহান্ত আগেই বিয়ে করে মঠের সার্বজনিক সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে ফেলেছে। এখন ব্রহ্মচারী মঙ্গলদেবজী বলছিলেন, 'এখন তো উত্তরপ্রদেশের বহু মোহান্ত একধার থেকে বিয়ে করার কথা

ভাবছে।' সার্বজনিক সম্পত্তি এইভাবে ধ্বংস ও লুটপাট হতে দেওয়াটা কোনো সরকারের পক্ষে শোভা পায় না। তাকে রক্ষা করা জন্য সরকারের বিশেষ আইন তৈরি করা উচিত।

মঠের চারদিক ঘুরে পুকুরের কিনার ধরে আমরা পুরনো মঠে গেলাম। মূল মঠ এখানেই ছিল যা গ্রামের সঙ্গে লাগোয়া এবং যেখানে গোপাল মন্দির আছে। ১৯১৩ সালেও এটা যথেষ্ট বড় মঠ ছিল। তার আগে তো এখানে বড় ফটক ছিল। তার ওপর সানাই বা নাকাড়া বাজিয়েদের বসার জায়গা এবং কয়েক শো লোকের থাকার মতো বাড়ি ছিল। মোহান্তর গদি এখানেই। এখন মঠ ছোট করে দেওয়া হয়েছে। এখানকার একটি মন্দির (রামজী) তুলে আগেকার মঠে নিয়ে গেছে। তবু অবস্থা খারাপ নয়। গ্রামের ব্যবসায়ীদের মধ্যে কারও ভক্তি জেগে উঠল এবং সে গোপাল মন্দিররের মেঝে নকল মারবেল পাথর দিয়ে বানিয়ে দিল। গ্রামের ভেতর দিয়ে স্কুলে যেতে হতো। সেখানে স্বাগত জানানোর জন্য সভা হওয়ার ছিল। ত্রিশ বছরে পরসার বহু পুরনো মানুষ মারা গেছেন। তাঁদের জায়গায় যাঁরা আছেন তাঁরা আমার পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু রামউদার বাবার নাম তো সকেলই শুনেছিলেন। যখন কোনো লেখাপড়া জানা যুবক আমার কোনো বই নিয়ে আলোচনা করছিল তখন তার কোনো গুরুজন বললেন, 'তুমি রামউদার বাবার কী জানো? তাঁকে আমরা পূজারীজী বলতাম। এই পরসা মঠেই তিনি থাকতেন। খুব ভাল ছিলেন। তিনি যদি থাকতেন, তাহলে তিনিই মঠের মোহান্ত হতেন। তিনি স্বরাজের জন্য কাজ করতে শুরু করলেন আর তারপর কে জানে কোথায় চলে গেলেন।' সেই ভিড়ে, সেই শত শত মুখের মাঝে আমার চোখ পরচিতদের খুঁজছিল। 'বাইশবী সদী'-তে আমি যে পুরনো ভাল বড় গ্রামটির ছবি তুলে ধরেছি, তা ছিল এই পরসা গ্রাম আর সেই ছবির সঙ্গে এখনো কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি। পরসা অবশ্যই খুব পুরনো গ্রাম। একটা সময় এটা এক সামন্তের রাজধানী ছিল। পরসার বাবুরা আসলে সেই সামন্তেরই সন্তান। তাঁদের নিবাসস্থলটিকে এখনো গড় বলা হয়। গড়ের চারদিকের গর্তের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান। সামন্তের রাজধানীতে বাজার আর শিল্প-উদ্যোগ থাকতেই হবে। পরসা কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও দেখলাম ঘটি ঢালাই হচ্ছে। কিন্তু তারা ভাগ্য ফেরাতে সফল হয় নি।

গ্রাম ঘুরে গড়ে লক্ষ্মীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমার সময়ে, তাঁর এবং বাবু শিবজীর ঘর ছিল খুব সমৃদ্ধ। তারপরে ছিলেন বব্বনবাবু। বাবু শিবজীর বাবা বৈজনাথ বাবুকেও আমি দেখেছিলাম। তাঁর পর বাবু শিবজীর খুব সমৃদ্ধি হলো। তাঁর ছেলে রাঘবজীও বেশ বাবুয়ানী করেই মারা যান। এখন তাঁর ছেলে আছে। জমিদারি প্রথা ওঠার আগে থেকেই জমিদাররা ভীষণভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মীবাবু ছিলেন সেই দলের লোক যাঁদের সম্পর্কে বলা যায়, 'ন উধো সে লেনা ন মাধো কো দেনা।'[১] সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। এই রকম লোককে, জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ার ঝঞ্ঝা খুব ঘায়েল করতে পারে না। অনেক তপস্যা করে একটি ছেলে হয়েছিল, সে কৈশোরোত্তীর্ণ বয়সে মারা গেল। এখন একটি ছোট্ট বাচ্চা ছিল। আমার খবর পেয়ে বব্বনবাবুও চলে এলেন। তারপর আমরা তাঁর সঙ্গে গ্রামের বাইরে স্কুলে গেলাম। এই স্কুল স্থাপিত হওয়া পঁচিশ বছরের বেশি হয়ে গেছে। এই প্রথমবার

[১] 'যার কাউকে দেওয়ারও কিছু নেই, কারো কাছ থেকে নেওয়ারও কিছু নেই।'—স·ম·

আমি স্কুলে এসেছিলাম। ছেলেরা এবং শিক্ষকরা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আয়োজন করেছিল। আমার আসার খবর তো লোকে মাত্র একদিন আগে পেয়েছিল এবং সময় নির্দিষ্ট ছিল না। এই জন্য গ্রামের আর আশপাশের লোকেরা হয়তো আমি চলে যাওয়ার পর খবর পেয়েছিল। স্কুল সামাজিক পরিবর্তনের যথেষ্ট সহায়ক। ধনী ও গরিবের ছেলে একসঙ্গে বসে পড়ে, এর ফলে তাদের মধ্যে বিভেদের ভাব কমতে শুরু করে। এখন তো সামন্ত যুগের অবশেষ জমিদারি প্রথা শেষ হয়ে যাওয়ায় এই সামাজিক বৈষম্য আরো দ্রুতগতিতে কমছে। বাবুরা আগে পড়া দরকার বলে মনে করত না। বব্বনবাবুর ছেলে এম এ করে এখন এই স্কুলেরই শিক্ষক। তিনি বিদ্যার গুণ বুঝতে পারেন। অভ্যর্থনা ও বক্তৃতার পর যাওয়ার তাড়া ছিল, কারণ আজই একমা আর অতরসনেও অভ্যর্থনা-সভা হওয়ার ছিল। স্কুল থেকে ফেরার সময় পুরো বাজারের ভেতর দিয়ে যাওয়া সড়কটি আমরা মোটরে করে ঘুরলাম। বাজারের ঘরগুলিতে কী পরিবর্তন হয়েছে তা দেখতে চাইছিলাম। দোকান কিছু বেড়েছে, বেশির ভাগ মানুষের মুখ নতুন—এই টুকুই পরিবর্তন। সভাস্থলেই এক ময়রা বুড়ি তার গুরুকে দর্শন করার জন্য এল। আমি বৈষ্ণব হওয়ার সময় তাকে মন্ত্র-দীক্ষা দিয়েছিলাম। আমার কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া স্ত্রী-পুরুষদের সংখ্যা জনা বারোর বেশি ছিল না। মোটর যখন দরজায় পৌঁছে তখন দেখলাম তার শ্বশুর জগেসরও বেঁচে আছে। কোমর বেঁকে গিয়েছিল, আর শরীরে হাড়-মাংস ছাড়া কিছু ছিল না। একটিই ছেলে। সে যৌবনে পা দিচ্ছিল। তার বৌ শ্বশুরের সেবাতেই নিজের জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। শ্বশুরের কুঁজো শরীরে কে জানে কোথা থেকে ফূর্তি চলে এল—মিষ্টির দোকানে ভাল ভাল যা মিষ্টি ছিল সব জড়ো করে আমাকে অর্পণ করল। পরসায় থাকার সময় সকালের জলখাবার এর দোকান থেকে কিনেই আমার জন্য নিয়ে আসা হতো। বুড়ি তো গদ্‌গদ হয়ে গিয়েছিল। সে আমার চরণামৃত না নিয়ে আমাকে ছাড়ে কী করে আর আমিই-বা তাতে অসম্মত হয়ে তার মনে আঘাত দিই কী করে? বড় সড়কে পৌঁছে ছোট মঠের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা আবার মঠে গেলাম। বীর রাঘবদাসজী কিছু না খাইয়ে ছাড়বেন না। ভাত, শাক, পুরী আর হালুয়া খেয়ে ১৯১৩ সালে যেরকম আনন্দ হতো সেইরকম আনন্দ হলো। সকলেই তখন আত্মীয় মনে করত আর সকলের মনেই বেশ ধরনের উৎসাহ ছিল।

একমায় পৌঁছতে পৌঁছতে একটা বেজে পেরিয়ে গেল। লক্ষ্মীবাবুও খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। যাকগে, কতটা খাব তা তো আমার হাতে ছিল। আমি এখনকার জন্যও জায়গা খালি রেখেছিলাম। কংগ্রেসে কাজ করার সময় যে সব তরুণদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল তাদের মধ্যে লক্ষ্মীবাবুর বিশেষ স্থান রয়েছে। একমা হেড কোয়ার্টার হওয়ায় এবং সেখানেই তাঁর বাড়ি থাকায় তাঁর বাড়িটি আমার নিজের বাড়ির মতো ছিল। অনেকবার হঠাৎ হঠাৎ পৌঁছে আমি তাঁর বাড়িতে হয়তো খেয়েওছি। সে সময় বাড়িতে গুরুজন বলতে ছিলেন বাবা আর কাকা। বাবা সোনবরসা রাজার তহসিলদারি করে ভাগলপুর জেলায় থাকতেন। লক্ষ্মীবাবু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। এখন ছিলেন কংগ্রেসী এম এল এ। আমি কমিউনিস্ট আর তিনি কংগ্রেসী। কিন্তু এর ফলে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে সামান্যও দূরত্ব আসা কি সম্ভব ছিল? আমার সাম্যবাদী ভাবনার কথা তো তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা তখনও জানতেন যখন আমি অসহযোগে তাঁদের সঙ্গে কাজ করতাম। 'বাইসবী সদী'-র ভাবনা তো

—১৯৫৬—

ততদিনে মাথায় গেঁথে গিয়েছিল আর ১৯২৩ সালে কাগজে তা লেখাও হয়ে গিয়েছিল।

খাওয়ার পর স্কুলে গেলাম। ছাত্ররা ছাড়াও যে সব পুরনো বন্ধু খবর পেয়েছিল, সবাই এসেছিল। রামবাহাদুর লাল ১৬-১৮ বছরের তরুণ ছিলেন যখন তিনি স্কুল ছেড়ে অসহযোগে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। এখন তিনি বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। রামউদার রায়, হরিহর সিংহের মুখ এখন শুধু মানসচোখেই দেখা সম্ভব ছিল।

অতরসন—তাড়াহুড়ো করা হচ্ছিল, অন্তত দিন থাকতে অতরসন পৌঁছে যাওয়া দরকার, যাতে সেখানে একত্রিত হওয়া লোকেরা নিরাশ না হয়। অতরসন হচ্ছে ধূপনাথের গ্রাম। তাঁর ভাই দেবনারায়ণ সিংহকে এই সময় মনে না করে থাকা যাচ্ছিল না। কিন্তু পুরনো প্রজন্মকে ধরে বসিয়ে দেওয়া যায় না। এই ঘরে বাবু রামনরেশ সিংহ অসহযোগের সময় থেকেই কংগ্রেসের কাজ করতেন আর এখনও কংগ্রেসেই আছেন। সে-সময় বাড়ির কাজকর্ম দেখতেন। এখন তিনি হোমিওপ্যাথির একজন ভাল ডাক্তার। তাঁর বার্ধক্য সম্বন্ধে কিছু বলার আর কী দরকার যখন তাঁর ভাইপো অখিলানন্দ সিংহর মাথা দেখে মনে হতো যে চুল নয়, সাদা টুপি পরে আছেন। বীরেন্দ্র, অখিলা ইত্যাদি সমবয়স্ক এই ঘরের আধ ডজনের বেশি ছেলেকে আমি বাচ্চা দেখেছিলাম। মনে হয় এই তো সেদিন। আজ বাড়িতে গেলে দেখা গেল এক ডজনেরও বেশি সেই বয়সের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এরা তাদের পরের প্রজন্ম। বাবু রামনরেশ সিংহ আর তাঁর বাড়ির লোকজনদেরই প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে এই স্কুল। প্রাইমারি থেকে তাকে মিডিল, তারপরে হাইস্কুল করেছে। এখন মানুষের শিক্ষার প্রতি কত আগ্রহ তা এর থেকেই বোঝা যায় যে এক-দেড় ক্রোশের ভেতরে এখানে একমা, পরসা, অতরসন জতপুর, বরেজা-এর পাঁচটি হাইস্কুল আছে। সব জায়গাতে ছাত্র পূর্ণ সংখ্যায় রয়েছে, সব স্কুলও স্বাবলম্বী।

অতরসনের স্কুলটা হচ্ছে গ্রামের বাইরে, বাগানের ধারে। বহু বাড়ি তৈরি হয়েছে। এখানেও সভায় ভাষণ দেওয়ার ছিল। পুরনো সহকর্মীদের মধ্যে লক্ষ্মীবাবু আমার সঙ্গেই ছিলেন। মধুবাবু আর পণ্ডিত রামদয়াল বৈদ্যও এসে দেখা করলেন। রামদয়ালজী সৌভাগ্যবান। তাঁর বাবা এখনো জীবিত আছেন এবং নাতির মুখ দেখে নিয়েছেন।

সভার পর বাবু রামনরেশ সিংহর বাড়িতে গেলাম। সেখানে আমার জন্য বিশেষভাবে নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একটি ছোটমতো চা-পার্টি হয়ে গেল। বাড়ির মহিলাদের মধ্যেও নতুন প্রজন্ম চলে এসেছিল, যারা বাবাকে দর্শন না করে ছাড়বে না। তাদেরও দর্শন দিয়ে ছটার সময় ছাপরা পৌঁছে গেলাম। সিওয়ান যাওয়া দশ-বারো বছর হয়ে গেছে। সেখানে যাওয়ার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, মোটর যদি সকালেই আসত তাহলে সেখানেও ঘুরে আসতাম।

১৮ জানুয়ারি ছাপরাতেই থাকার ছিল। সেদিন সকালে নটা থেকেই প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেল। প্রথমে আমার পার্টির সাথীদের নিয়ে প্রগতিশীল সাহিত্য সম্বন্ধে একটি ছোট সভা হলো। দেখে ভাল লাগলে যে নতুন প্রজন্ম পুরনো প্রজন্মের স্থান নেওয়ার জন্য আরো উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তুত। মধ্যাহ্নভোজন হলো নর্মদাবাবুর বাড়িতে। আগে তিনি আরো পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদী প্রতিবেশী ছিলেন। নর্মদাবাবু এবং তাঁর অনুজ জলেশ্বর বাবুর সঙ্গে আমার পুরনো ঘনিষ্ঠতা

আছে। দুপুরে রাজেন্দ্র কলেজ গেলাম। প্রিন্সিপ্যাল মনোরঞ্জন প্রসাদ যদি আমার পরিচয় দিতে গিয়ে অতিশয়োক্তি করে থাকেন তো সেটা তাঁর অধিকারের মধ্যে ছিল। 'ফিরঙ্গিয়া'-র অমর গায়কের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে যখন অধ্যাপক ছিলেন, সে-সময় সেখানে গেলে অবশ্যই দেখা করতাম। বিশ্বনাথের নগর ছাড়িয়ে তাঁকে ছাপরা নিয়ে আসায় আমারই হাত ছিল এটা বলতে তিনি ভুললেন না। মনোরঞ্জন বাবু জনগণের লোক তাই জনগণের সুখ-দুঃখ কখনোই ভুলতে পারেন না।

ছাপরায় রাজপুত স্কুল এখন 'জগদম্বা কলেজ' নামে ডিগ্রি কলেজ হতে যাচ্ছিল। এখন কলেজের দুটি শ্রেণী খুলেছে আর তাতে পাঁচশো ছাত্র হয়ে গেছে। এতে বোঝা যায় যে, শিক্ষার খুব চাহিদা রয়েছে। জগদম্বা কলেজের তরুণ প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর পুরনো ছাপরায় রাজেন্দ্র গ্রন্থাগার দেখতে গেলাম। তেরো বছর আগে একটি ছোটমতো ভাড়া ঘরে এটা খোলা হয়েছিল। আর এখন সেটা নিজস্ব পাকা বাড়িতে এবং ভাল অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষা ও সামর্থ্য বাড়লে এই গ্রন্থাগার আরো সেবা করতে পারবে। গ্রন্থাগারে দু-তিনটে বহুমূল্যবান হস্তলিখিত ফারসী পুস্তক ছিল।

সেখান থেকে ফিরে শ্রীমতী বিদ্যাবতীজীর বাণী মন্দিরে গেলাম। তাঁর স্বামী মঙ্গলসিংহর স্মৃতি খুবই দুঃখজনক। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনো ছেড়ে তিনি বইয়ের ব্যবসা শুরু করলেন। ভাল করে ব্যবসা জমাতেও পারেন নি এমন সময় যৌবনেই মারা গেলেন। বিদ্যাবতীজী গুরুকুল হরপুরজান-এর প্রতিষ্ঠাতার মেয়ে ছিলেন। সেখানেই তিনি সংস্কৃত পড়ার খুব ভাল সুযোগ পেয়েছিলেন। বিয়ে হলো মঙ্গলজীর সঙ্গে। তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা রেখে মঙ্গলজী চলে গেলেন। তাঁর বাড়ি ছিল পোখরপুর (পরসা থানা)-এর একটি ভদ্র কৃষিজীবী পরিবার। তাঁর কাকারা তিন-চার ভাই একই সঙ্গে থাকতেন। ছোট কাকা শিক্ষার সুযোগ সেরকম পান নি। কিন্তু যেটুকু শিক্ষা ছিল তা দিয়ে নিজের জ্ঞান বাড়িয়ে ছিলেন। চাষবাসের কাজে নতুন ব্যাপারগুলি অনুসরণ করার ফলে ফসল ভাল হতো। ঘরের ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের বাদ দিলে মেয়েরাও এম এ পাস। আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার ছিল এই যে, মঙ্গলজীর কাকার মেয়ে সদ্য সদ্য নিজের রাজপুত সম্প্রদায় ছেড়ে ব্রাহ্মণ ছেলেকে বিয়ে করেছে। সে ডবল এম এ। কথা উঠলে বিদ্যাবতীজী বললেন, 'এখনো ঘরের লোকেরা এসবের খবর জানে না।' এই সম্মানহানি শিক্ষিত বুড়োরা কী করে পছন্দ করে? যাঁর ছেলের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে হয়েছে তিনি বিলেত ঘুরে এসেছেন অর্থাৎ পুরনো ভাবনা অনুযায়ী ধর্মভ্রষ্ট। ইতিহাসের একজন স্বীকৃত পণ্ডিত এবং একটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। অথচ যখন জানতে পারলেন যে ছেলে রাজপুত মেয়েকে বিয়ে করেছে তখন তিনি খুব আঘাত পেলেন। কয়েকজন তো বলছিল অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন যে, অকাল কুষ্মাণ্ড যদি আর একটু অপেক্ষা করত তাহলে আমি আমার একমাত্র মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিতাম। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল মশায় ভুল ভাবছিলেন। ছেলের কারণে নিজের জাতির ব্রাহ্মণ জামাই পেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হতো না। বিদ্যাবতীজী ব্যাপারটা খুব সামলে নিলেন। নিজের দুটি মেয়েকে গ্র্যাজুয়েট করে তাদের বিয়ে দিয়েছেন। এক লাখ টাকার বাড়িও তৈরি হচ্ছে যার অনেকটাই হয়ে গেছে।

—১৯৫৬—

আবার সন্ধেতে বক্তৃতা দেবার আগে খুঁজে খুঁজে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। পাণ্ডে রঘুনাথ বুড়ো হয়ে গেছেন, চিনতেও একটু কষ্ট হলো। সোহম্ পণ্ডিত ভরতজীকে তো তাঁর সেই চেহারাতেই কত বছর ধরে দেখছি। তাঁর সংস্কৃত মাধ্যমের ছোট পাঠশালা ভালভাবেই চলছে। এখানে পড়লে সংস্কৃত বলা-টলার অভ্যেস হয়ে যায়। যে ছেলে তিন-চার বছর এখানে পড়ে সে ইউনিভার্সিটির স্তর পর্যন্ত সংস্কৃত শিখে যায়। সেজন্য ছাত্র পাওয়া সমস্যা নয়। মিউনিসিপ্যাল ময়দানে ভাষণ দেওয়ার পর সাহিত্য-প্রেসে সাহিত্য-সভা হলো। সেখানে ছাপরার তরুণ সাহিত্যকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলাম। এগারোটায় ফিরে ত্রিবেদীজীর বাড়ি গেলাম। তাঁর ছেলে বিন্দু খুব ভালবেসে মাছ কেটে রান্না করল। রাতে গুরুপাক ভোজন আমার চলে না কিন্তু ভালবেসে বানানো সেই জিনিস ছাড়তে চাইছিলাম না।

পাটনা—১৯ তারিখে অন্ধকার থাকতেই স্টেশনে পৌঁছলাম। ট্রেন ছাড়ল চারটে বেজে চল্লিশ মিনিটে। পঁয়ত্রিশ বছরের বন্ধু পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদী এখনো শরীরের দিক দিয়ে শক্ত আছেন দেখে ভাল লাগল। সবচেয়ে ছোট ছেলে এক বছর হলো বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তখন থেকে তার খবর পাওয়া যায় নি। বাকি ছেলেরা নিজের নিজের কাজে নিযুক্ত আছে। তাই তাঁর বাড়ির জন্য কোনো চিন্তা নেই। সোনপুর থেকে গাড়ি বদলে গঙ্গার তীরে পৌঁছলাম আর জাহাজে করে পাটনা পৌঁছে গেলাম এগারোটায়। সিওয়ানের মাস্টার মশায়ও এসে পড়েছিলেন। আর ড· বাঁকেবিহারী মিশ্রও সন্ধেতে এলেন। সেদিন চারটের সময় বি এন কলেজে রাজনৈতিক পরিষদে ভাষণ দিতে হলো। সাড়ে ছটায় সম্মেলন ভবনে সাহিত্য-সভা হলো। সেখানে হিন্দির অবস্থা নিয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে আমি বললাম, 'উর্দুও আসলে হিন্দি ভাষাই। তাকে পরদেশী ভাষা মনে করা উচিত নয়। তার সমস্ত মূল্যবান রচনাগুলি দেবনাগরী অক্ষরে ছেপে দেওয়া উচিত।'

২০ জানুয়ারিও পাটনাতেই থাকার ছিল। এতক্ষণে লোকে পুরোপুরি খবর পেয়ে গিয়েছিল, এ জন্য সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত একনাগাড়ে আড্ডা চলতে লাগল। মাঝে শ্রীমহেন্দ্র শাস্ত্রীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়ে গেলাম। ব্রহ্মচারী মঙ্গলদেবের সঙ্গে দেখা হলো। ছাত্রের সংখ্যা ৪০-৫০-জনের বেশি ছিল না। আগের বার এসে দেখেছিলাম, এখানকার ছাত্ররা সংস্কৃততে কথাবার্তা বলে, আর সেই কারণে সংস্কৃততে তারা যথেষ্ট উন্নত ছিল। এখন সেই নিয়ম শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল। এইরকম সংস্কৃত মাধ্যমের স্কুল লাভদায়ক প্রমাণিত হবে। আমি মনে করি, বিদ্যালয় সেই নিয়মটি না চালু রেখে নিজের উন্নতির পথে বাধা তৈরি করেছে।

সেদিনই সন্ধেতে শ্রীদ্বারিকাপ্রসাদ শর্মা এলেন। শর্মাজী ভূমিহার ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথম আই সি এস ছিলেন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি মানুষকে ডুবিয়ে না দিয়ে কি থাকতে পারে? তাঁর মাথায় বেদান্তের ভূত চাপল। তিনি পেনসন প্রাপ্তি পর্যন্তও অপেক্ষা না করে কালেক্টরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। বহু বছর ধরে বাড়ি ছেড়ে স্বামী সেজে ঘুরতে লাগলেন। বেদান্ত ভালভাবে অধ্যয়ন করলেন। এখনও তিনি অরবিন্দর ফেরে পড়ে রয়েছেন এবং দর্শনের আবর্ত থেকে বেরোতে পারেন নি। তবু সাদা কাপড় পরে নিজের ঘরে থাকাতে বোঝা যায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে। প্রচুর পড়েন, আর বলতেও কার্পণ্য করেন না। তাঁর কথা

সকলেরই বোধগম্য হয়। তাহলেও নতুন প্রজন্ম এটাকে দোষ বলে মনে করে। শর্মাজীর একটিই ছেলে ছিল যে মারা গিয়েছে। হতে পারে তার প্রভাব কিছুটা রয়েছে কিন্তু তাঁর ভাইপো ছেলেরই মতো। যখন আমাদের কথাবার্তা চলছিল সে সময় ড· বদ্রীনারায়ণ প্রসাদের পুত্র ড· দেবেশ আর তাঁর স্ত্রী এসে শর্মাজীকে প্রণাম করলেন। তিনি আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ করলেন। তারপর মেয়ে-জামাই দাদুকে চা-ও খাওয়াল। আমার এতে অত্যন্ত আনন্দ হলো। আমি এখানে দেখলাম যে, নতুন প্রজন্ম বড় বড় সমস্যা নীরবে কত সহজেই সমাধান করছে। ড· দেবেশ জাতে স্বর্ণকার। তাঁর বাবা বিহারের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং সেখানকার সবচেয়ে বড় মেডিক্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল। কাজেই শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা ধরলে তাঁরা উচ্চবর্গের লোক। তাঁর স্ত্রী আই সি এস শর্মার নাতনি আর জাতে ভূমিহার। বিহারে লোকে তো দুঃখ করে যে, সেখানে জাতপাতকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় যার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে খুব খারাপ অবস্থা এসেছে। ড· দেবেশ আর তাঁর স্ত্রী সেটা ভাঙার সাহস দেখিয়েছেন। তাঁরা সাহসী তরুণ-তরুণী। কিন্তু শ্রীদ্বারিকাপ্রসাদ শর্মার তাঁদের চেয়ে কম সাধুবাদ প্রাপ্য নয়, যিনি এই সম্পর্ককে এই ভাবে স্বাগত জানাচ্ছেন। শ্রীদ্বারিকাবাবুর ভাই লালবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অসহযোগের যুগে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। একবার কয়েক মাস আমরা একসঙ্গে হাজারীবাগ জেলে ছিলাম। সেখান থেকে আমি মুক্তি পেয়ে চলে এসেছিলাম কিন্তু লালবাবু জীবিত অবস্থায় বেরোতে পারেন নি। নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াল যে বউ, তার মুখে যখন শুনলাম যে সে লালবাবুর ভাইপোর মেয়ে, তখন তার সাহসের জন্য আমারও কিছুটা গর্ব হলো।

এই সব ব্যাপার এখন দেখা যাচ্ছে। অসহযোগের সময়ে এক পঙক্তিতে বসে খাওয়াটাও শুরু হয়েছিল আবার হিন্দু ভোজনালয়ও সেই সময় প্রথম যেখানে-সেখানে চালু হয়েছিল। আজ খাওয়ায় আর কোনো বাছবিচার নেই। এই ভাবেই এই জাতপাতের ভাঙনও, যা বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল, তা আগামী ২৫-৩০ বছরেই এত বেড়ে যাবে যে হাজার হাজার বছরের বজ্রসম দৃঢ় দেওয়াল ভেঙে পড়বে। বৃদ্ধরা তরুণদের পথে বাধা না দিয়ে ব্যর্থতার অপযশ মাথা পেতে নেবেন। আমার অন্য এক বন্ধু এ ব্যাপারে একটু কাপুরুষতা দেখালেন। তিনি নিজে গুরুকূলে পড়েছেন। আর্যসমাজের প্লাটফর্ম থেকে কতবার জাতপাতের বিরুদ্ধে বলেছেন। অসহযোগ আর কংগ্রেসে সবসময় কাজ করেছেন। নিজের মেয়েকে এম এ পড়িয়েছেন। উকিল বানিয়েছেন। সে ওকালতি করতে লাগল। নাবালিকা ছিল না। নিজের ভাল-মন্দ বুঝত। ব্রাহ্মণদের মেয়ে হয়ে সে সম্প্রতি একজন ভূমিহার প্রফেসরকে বিয়ে করেছে। তাতেই বাবার সমস্ত সংশোধিত চিন্তা হাওয়া হয়ে গেল। শুনেছি এতে তিনি এত আঘাত পেলেন যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভাবলেন, মেয়ের জন্য লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আসলে, মেয়ে যে তরুণকে নিজের সাথী হিসেবে বেছেছে সে-ও তো ব্রাহ্মণই। দ্বারিকাবাবুকে দেখলে তাঁর ব্যবহার কত ভাল মনে হতো। ড· দেবেশের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি খুবই আত্মীয়তা দেখাতেন। এটাও দরকার। তরুণীটিকে তার জাতের মহিলারা কখনো কখনো নিজেদের ব্যবহারে নিশ্চয় প্রকাশ করে দিত—'তুমি জাতের বাইরে বিয়ে করে ভাল কর নি।'

আজ রাতের নিরামিষ-ভোজন হলো দেবেন্দ্র ও কুসুমের বাড়িতে। ডাক্তার দাঁত ভরাট করে

—১৯৫৬—

দিয়েছেন। যাক, একটা বালাই থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেল। সেদিন চন্দ্রমা ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হলো। জ্ঞান হতেই তিনি দেশের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়েছেন। দেশদ্রোহীর যদি ফাঁসি না হলো সেটা দৈবযোগই বলতে হবে। তিনি কমিউনিস্ট, তাই এখনকার সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পান না। তাঁর পরিবার আর্থিক অনটনের মধ্যে রয়েছে জেনে দুঃখ হলো।

কলকাতা

কলকাতাগামী ট্রেনটি ছিল বড় অসময়ে। দু-ঘণ্টা লেট ছিল নইলে তো ভোর সাড়ে চারটেয় তা আসার কথা। ধূপনাথজীও দেখা করার জন্য এখানে এসেছিলেন এবং এখন কিউল পর্যন্ত একসঙ্গে চললেন। কিউলে ট্রেন দু-ঘণ্টা আটকে রাখা হলো। জানা গেল, ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবি সম্বন্ধে ভারত সরকার যা স্থির করেছে তার বিরুদ্ধে কলকাতায় আজ পুরো ধর্মঘট। এ খবর তো আমিও জানতাম কিন্তু ধর্মঘট সন্ধে নাগাদ শেষ হয়ে যাবে আশা করেছিলাম। ট্রেনও সন্ধে করেই কলকাতা পৌঁছনোর কথা। ইংরেজরা বহু বাংলাভাষী অঞ্চলকে বিহারের ভেতর এবং বহু হিন্দিভাষী অঞ্চলকে বাংলার ভেতর রেখে দিয়েছিল। প্রদেশ গঠনের ব্যাপারে নেহেরু সরকারও ইংরেজদের পদচিহ্ন ধরেই চলতে চায়। নেহেরু বার বার বলেন, 'এই তুচ্ছ ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? ভাষাবাদ নীচ মনোবৃত্তির পরিচায়ক।' তাঁর কথায় চললে ভাষাভিত্তিক প্রদেশের ব্যাপারটি সাত হাত নীচে চাপা দিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু লোক তো আর 'মনুষ্য রূপেণ মৃগাশ্চরন্তি' নয়। নিজের ভাষার প্রতি যে মানুষের ভালবাসা নেই, সে মানুষ সংস্কৃতিবিহীন। ভাষা শুধু শখের জিনিস নয়, তা হচ্ছে একটি বিশাল শক্তি। যদি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, যদি শাসনকার্যে জনগণকে সামিল করতে হয়, তাহলে তাদের ভাষাকে বাদ দিয়ে এক পাও এগুনো সম্ভব নয়। কিন্তু এই 'ইন্দো-অ্যাংলিয়ন' সাহেবদের আর কী বলব? তাদের তো জনগণের কোনো ভাষার প্রতি ভালবাসা ও সংযোগ নেই এবং যাদের তা দিয়ে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তাদের হীনবৃত্তি বলে। মুখে নেহেরু মাঝে মাঝে হিন্দির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও মনে মনে তিনি ভাবেন যে, ইংরেজি আমাদের শাসনের ভাষা হলে কি ভাল হতো। তাহলে ভাষা-প্রেমিক রামুলুদের কথা আর কী বলব? তাঁরা নিজেদের আত্মত্যাগ দিয়ে কোটি কোটি লোককে উত্তেজিত করেন আর জনতা পাগল হয়ে কোটি কোটি টাকার জনসম্পত্তি নষ্ট করে দেয়। ভাষার জন্য তাঁরা অহিংস সরকারের গুলি বুক পেতে নিতে প্রস্তুত। এটা খুব বড় সমস্যা। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসী নেতা বলেছেন—যদি বোম্বাইকে তার প্রদেশ মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত না করা হয় তাহলে কংগ্রেসের টিকিটে মহারাষ্ট্রে কাউকে দাঁড় করানো যাবে না আর দাঁড় করালেও সে জিততে পারবে না। নেহেরু আর তাঁর অনুগামীদের ঘুম চলে গেছে।

কিন্তু ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনে এত দ্বিধা কেন? গান্ধীজী যে সব বড় বড় তত্ত্বগুলিকে

স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তার মধ্যে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনও ছিল। এখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কী দরকার? আর এতে অসুবিধে কি? কংগ্রেসী নেতারা প্রতিটি জিনিস কেন ওপর থেকে চাপিয়ে দিতে চায় এবং তা এমন এমন জায়গায় যেখানে তার বুদ্ধি লোপ পায়। বিতর্কিত অঞ্চলগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতানুসারে কেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না? বোম্বাইয়ের লোকেদের ভোটের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করা ভাল নাকি পুলিসের গুলিতে সত্তর জন মানুষের রক্ত দেওয়া ভাল? তারপর এই সংখ্যা কি শুধু সত্তরই থাকবে? মতামত গ্রহণের জন্য খরচ এবং ব্যবস্থাপনার অসুবিধের অজুহাতও অর্থহীন। যদি খরচ এবং ব্যবস্থা করতেও হয়, তাহলেও জনগণের রক্তে হাত রাঙানোর চাইতে সেটা ভাল। যেসব নেহেরুপন্থীরা নিজেদের দূতাবাসের জন্য খরচ করতে গিয়ে মুঘল বাদশাহদের চেয়েও বেশি উদারতা দেখায় তারা খরচের অজুহাত দেখায় কী করে? তাছাড়া খরচটাও কোনো ব্যাপার নয়, কারণ বিতর্কিত অঞ্চলগুলি বিচারাধীন রেখে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

ধূপনাথজী কিউল থেকে চলে গেলেন। আমাদের ট্রেন রাত সাড়ে নটায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। শ্রীমণিহর্ষজ্যোতিজী স্টেশনে এসেছিলেন। তিনি তাঁর অফিস অন্যত্র বদলে ছিলেন। এই জন্য আমি ভেবেছিলাম বাসস্থানও হয়তো পাল্টে গেছে। কিন্তু তিনি এখনও ৪, রামজীদাস জেটিয়া লেনে থাকতেন। সমতলে নামার পর মুসৌরীর মতো ঠাণ্ডা আর ছিল না, তাহলেও পাটনাতে এসেও তা শেষ হয় নি। এখন আসল শীতের মরশুম অথচ কলকাতায় নামমাত্র ঠাণ্ডা ছিল।

২২ জানুয়ারি রোববার ছিল। কিন্তু আমার ছুটি কাটানোর ছিল না। যেসব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা দরকার তাদের কাছে ঘুরে আসতে চাইছিলাম। দশটার সময় মহাদেব ভাই এলেন এবং তারপর সেঙ্গরজীও এসে পড়লেন। বারোটার সময় খাওয়া-দাওয়া করার পর মহাদেব ভাইয়ের সঙ্গে মোটরে করে বেরোলাম। মণিহর্ষজীর নিজের কাজের জন্য গাড়ি দরকার হয় কিন্তু তিনি সেটা আমার হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে কলকাতা শহর থেকে পাঁচ দশ মাইল দূরে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার খুব সুবিধে ছিল। ট্রাম বা বাসের যাত্রা মানসিক কষ্ট তো বটেই, উপরন্তু আমাকে আঘাত ইত্যাদি থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হতো, এই জন্যও তাতে চড়া পছন্দ করতাম না। প্রথমে ড· ভূপেন্দ্র দত্তর কাছে গেলাম। এখন তাঁর ৭০-এর ওপর বয়স হয়ে গেছে। কয়েক বছর ধরে ডায়াবিটিসে ভুগছেন তাই স্বাস্থ্য ভাল দেখব এমন আশা কি করেছিলাম? কিন্তু তাঁর মাথা এখনও সক্রিয়। তাঁর বড় ভাই মহেন্দ্র দত্তর বয়স ৮০-র বেশি হয়ে গেছে। এখন বেশির ভাগ সময় শুয়ে থাকেন, স্মৃতি খুব দুর্বল হয়ে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দর অনুজ হওয়ায় মহেন্দ্রবাবুকে শ্রদ্ধা জানানোটা ভক্তরা জরুরি মনে করে। ভূপেনদা অনীশ্বরবাদী মার্কসিস্ট, কিন্তু মহেন্দ্রদা, তাঁর বড় ভাই, বিশ্ব-বিখ্যাত সন্ন্যাসীর বেদান্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। এইজন্য নববিবাহিত বর-বধূ যখন আশীর্বাদ নিতে আসে তখন তাঁদের আশীর্বাদও করেন। আমরাও প্রসাদ হিসেবে মিষ্টি মুড়কি পেলাম। খুব কষ্টে চিনতে পারলেন। কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হলো।

শ্রীগোপাল হালদারকে বাড়িতে পেলাম না, আমরা মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্যকে দর্শন করতে গেলাম। গতবারেই বার্ধক্য তাঁর ওপর চেপে বসেছিল। এই বারে তো তিনি আরো

কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। শরীরে শুধু হাড়-মাংসটুকু ছিল, হাতও কাঁপত, শ্রবণশক্তিও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চশমা ছাড়াই বই পড়তে পারতেন। তাঁর সেই পুরনো স্নেহপূর্ণ হাসি এখনও একই রকম ছিল। স্মৃতি ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও এখনও তা কাজ করছিল। তখন সামনে বই রেখে দেখছিলেন।আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। কুড়ি বছর হলো অসঙ্গের মহান গ্রন্থ 'যোগচর্যাভূমি' তিব্বত থেকে আনা হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় বারো বছর ধরে তার সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন। যদি প্রেসের সহযোগিতা পাওয়া যেত তাহলে তা এতদিনে প্রকাশিত হয়ে যেত কিন্তু তারা পিপীলিকার চালে কাজ করছিল। মহামহোপাধ্যায় গতবারেও হতাশা প্রকাশ করছিলেন আর এবার তো বলছিলেন, 'শিগগিরই আমি এটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, আপনিই এ তরি পার করবেন।' তাঁর শরীর আর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে খুব চিন্তা হচ্ছিল। যদিও নিজের জীবনের এক-একটি দিনের তিনি মূল্য উশুল করে নিয়েছিলেন তবু এমন ঋষিতুল্য পুরুষের আমাদের মধ্য থেকে চলে যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। দু-ঘণ্টা ধরে সেখানে বসে কথা বলেও দুজনের কারুরই তৃপ্তি হচ্ছিল না।

তারপর সুনীতিবাবুর বাড়িতে আড়াই ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। বয়স তাঁরও যথেষ্ট কিন্তু শরীর এখনও পুরোপুরি সুস্থ, আর মাথাও আগের মতোই কাজ করে। আমার পক্ষে এটা বোঝাও কষ্টকর যে একজন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কী করে নিজের দেশের প্রশাসন ও অধ্যয়নের কাজের জন্য ইংরেজিকে অনিবার্য মনে করেন। আসলে শৈশব থেকেই ইংরেজ আর ইংরেজির ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকার এটা হচ্ছে পরিণাম। ইংরেজি বাদ দিলে শিক্ষার মান যে ভেঙে পড়বে। কিন্তু ইংরেজির মান নিজে নিজেই খুব দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। তাকে উঁচুতে তোলার একটাই পথ আছে যে, পরীক্ষায় বসা বিদ্যার্থীদের মধ্যে দশ শতাংশের বেশি পাস না করানো। তবে এটাও দেখতে হবে যে, ফেল করা ৯০ শতাংশ ছেলে চুপচাপ এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে রাজি হবে কি না। যদি সে ক্ষমতা না থাকে তাহলে ইংরেজির মান উঁচু করার কথা বলা বাজে বকামাত্র। ইংরেজির নামে কিছু পরিবারের ছেলেদের উঁচু চাকরিতে বন্দোবস্ত করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা যায় না। ইংরেজির মান উঁচু করার দরকার কী? আমাদের ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তকের অভাবের অজুহাত দেখান নির্লজ্জতার চূড়ান্ত নিদর্শন। পাঠ্যপুস্তক লেখা আর ছাপার মতো লোক দেশে হাজার হাজার আছে। ইতিমধ্যেই বি এ বি এস সি পর্যন্ত প্রায় সব বিষয়ের বই হিন্দিতে লেখা হয়ে গেছে। যদি প্রয়োজন অনিবার্য হয় তাহলে সমস্ত রকমের পাঠ্যপুস্তক তৈরি করতে দেরি হবে না। সরকারের তাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করারও প্রয়োজন নেই। যদি এটা বলা হয় যে হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি আমাদের ভাষাগুলি এখনো বিজ্ঞান ও শিক্ষার পক্ষে অসম্পূর্ণ, তাহলে পৃথিবীতে আজ কোন ভাষা আছে যা তার জন্য নিজেকে পূর্ণ বলে মনে করে? রুশ ভাষার লোকেরা উচ্চ গবেষণা ও তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সাহিত্যের পক্ষে তাঁদের ভাষাকে অপূর্ণ বলে মনে করেন। এই জন্য সেখানে প্রত্যেক গবেষকের নিজের বিষয়টুকু বোঝার মতো জার্মান, ফ্রেঞ্চ আর ইংরেজির জ্ঞান দরকারী বলে মনে করা হয়। এই ব্যাপারটা ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ আর জার্মান ভাষার লোকেরাও স্বীকার করেন। যদি তাঁদের নিজেদের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিশারদ অন্য ভাষার গবেষণা পত্রিকাগুলি নিজে পড়তে না পারেন তাহলে তার অনুবাদ তাঁর কাছে এনে

দেওয়া হয়। আমাদের ভাষাতেও এ রকম করা যেতে পারে। সুনীতিবাবুর মতো লোকও যখন ইংরেজির অনিবার্যতার কথা বলেন তখন আমার তো সন্দেহ হতে শুরু করে যে, গোড়াতেই গলদ আছে। শুধু ইংরেজি কেন, রুশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চেরও কাজ চলা জ্ঞান আমাদের গবেষকদের থাকা দরকার। আমাদের কূটনীতিজ্ঞদের অন্যান্য ভাষাও জানা দরকার। রাশিয়া, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশগুলিতে ইংরেজির ভরসায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা ঠিক নয়। ইংরেজিতে পুরো দখল আছে এমন রাজদূতের পিকিং বা মস্কোতে কী দরকার?

সুনীতিবাবু চীন দ্বারা খুব প্রভাবিত। একটি চীনা বই দেখিয়ে বলছিলেন, 'দেখুন। ড· রঘুবীর এটা নিজের মৌলিক কাজ বলে ছাপিয়েছেন। এটা তো সরাসরি ধাপ্পাবাজী।' ড· রঘুবীরকেই কেন শুধু দোষ দেওয়া হবে? কত লোক এইরকম ব্যাপারে দক্ষ। আজকের মহাপ্রভূ কাজের গুরুত্ব কী বোঝে? সে তো স্বয়ং বড় বড় কথা বলে আর অন্যের বড় বড় কথায় প্রভাবিত হয়। 'স্বাধীনতা' কার্যালয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে রাতে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

আজ গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেজন্য দূরে কোথাও যেতে পারলাম না। এখানেই কলাকার স্ট্রিট আর আফিম চৌরাস্তা পর্যন্ত ঘুরে এলাম। আফিম চৌরাস্তার এখন ১৯০৭ বা ১৯০৯ সালের মতো চেহারা নেই। মোড়ের মাথয় একতলা মিষ্টির দোকানগুলিও নেই। নতুন রূপ যতবারই দেখি না কেন তবু পুরনো ছবিটাই মাথায় থেকে চায়। আমি এখন আরো কয়েকটি জায়গায় যাওয়ার প্রোগ্রাম করেছিলাম এবং আশা করেছিলাম ২০ বা ২১ ফেব্রুয়ারি নাগাদ মুসৌরী ফিরে যাব। আজমগড়বাসীদের বিশেষ অনুরোধ ছিল। তারা সব রকম প্রস্তুতি করে ফেলেছিল। কিন্তু কমলার এবছর এম এ ফাইন্যাল দেওয়ার কথা। তার পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছিল বলে লক্ষ্ণৌ ছাড়া বাকি সমস্ত প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি মুসৌরী পৌঁছনো দরকার। 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি' ছাপা হয়ে দু-বছরেরও বেশি হয়ে গেল পড়ে আছে। চুলোয় যাক টেকস্ট বইয়ের কাজ! 'নেপাল' সেজন্যই আটকে রয়েছে আর ওই একই কারণে 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি'ও দু-বছর ধরে বেরনোর নাম করছে না। আমি বাবু রামগোবিন্দ সিংকে বললাম, 'এই বছর বুদ্ধের ২৫তম শতাব্দী পালন করা হচ্ছে, তাতে এই বই যথেষ্ট বিক্রি হবে, এটা বের করে দিন।' আমি জানতাম কথায় কোনো ফল হবে না তাই ব্লক ঠিক করিয়ে তা ছাপিয়ে অন্তত এক কপি আমার সঙ্গে দিতে বাধ্য করলাম। যদিও এই পঙ্‌ক্তিগুলি লেখার সময় (২১ এপ্রিল ১৯৫৬) পর্যন্ত কোনো কপি আমার কাছে আসে নি। কিন্তু মহাদেব ভাই-এর চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে, বই প্রকাশিত হয়ে গেছে। তিনশো কপি বেরিয়েও গেছে। কমলার খুড়তুতো বোন এখানেই থাকে। তার স্বামী পশ্চিমবাংলার রাজ্যপালের কোনো দপ্তরে চাকরি করেন। রাজ্যপাল-ভবনটি কলকাতা রাজধানী থাকার সময় ভাইসরয়-ভবন ছিল। তাই সেটা যে কত বড় হবে তা বলার দরকার নেই। দিল্লী রাজধানী হওয়ায় তা গভর্নর (রাজ্যপাল)-ভবন হয়ে গেল। তখনও ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে গভর্নরের ভবন হওয়ায় সেখানে যথেষ্ট রাজকীয়ভাবে খরচ করা হতো। আড়ম্বরপ্রিয় সরকার আড়ম্বরের খরচ এক পয়সাও কম করার নাম করে না, সেই জাঁকজমক আরো বেশি করে রাখতে চায়। তার নিদর্শন হচ্ছে এই রাজ্যপাল-ভবন। পুরনো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (এখন জাতীয় গ্রন্থাগার)-এর পক্ষে বাড়িটি যথেষ্ট বড় ছিল না। তার জন্য একটি বড় জায়গার প্রয়োজন ছিল। সবাই এই রাজভবনটি নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিল। সে সময়

কাটজু এখানকার রাজ্যপাল ছিলেন। তিনি সেটা ছাড়তে রাজি হলেন না এবং আলিপুরের পুরনো রাজভবনে তা নিয়ে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করালেন। আমাদের নেতারা কত স্বার্থপর আর সেই সঙ্গে অদূরদর্শীও তার জ্বলন্ত প্রমাণ এটি। কাটজু চিরদিনের জন্য বাংলার রাজ্যপাল হয়ে আসেন নি এবং আলিপুরের এই বাড়িটিও একজন রাজ্যপালের পক্ষে ভাল আর বড়। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার যদি এখানে থাকত তাহলে শহরের ভেতরে থাকার দরুন তা বেশি কাজে লাগত কিন্তু একজন লোকের জন্য সেটা দূরে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হলো যেখানে অনেকগুলি বাড়ি বানিয়ে নেওয়ার দরকার পড়বে।

পুরনো ভাইসরয়-ভবন আর এখনকার রাজ্যপাল-ভবনের ভেতরটাই একটা বড় শহর। কর্মচারীদের পাঁচতলা বড় বড় বাড়ি রয়েছে। কমলার ভগ্নিপতি এখানেই কোনো এক দপ্তরের চাপরাসী, পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতন আর দু টাকা সাইকেল এলাউন্স পায়। তবে কয়েক হাতের কুঠরী সে থাকার জন্য বিনা পয়সায় পেয়েছে। ছাপান্ন টাকায় কলকাতার মতো শহরে একজন লোকের খরচ চালানো মুশকিল। অথচ সে, তার স্ত্রী এবং দুটি বাচ্চা নিয়ে মোটা চারজন প্রাণী। সে কী করে খরচ চালায় তা ভাবতে গেলেও মাথা ধরে। সে এলে আমরাও তার বাড়িতে চলে গেলাম। তার বাড়ি দেখলাম। পাশেই সেইরকম পাঁচ-ছয় হাত দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অন্য কুঠরীগুলিও দেখলাম, সেখানে তার মতো আরও অন্য চাপরাসীরাও রয়েছে। যদি এই কুঠরীগুলির সমস্ত স্ত্রীলোকরা যৌবনেই বুড়ি হয়ে যায়, বাচ্চাদের প্রতিটি হাড় গোনা যায়, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? ওদিকে রাজ্যপালের ভোজে লাখ লাখ টাকা ধ্বংস হয় আর এদিকে এইসব বাচ্চারা তাদের শৈশব এই রকম ভীষণ দারিদ্র ও অভাবের মধ্যে কাটাচ্ছে। আজ এ ব্যাপারে চিন্তা করারও ফুরসৎ কার আছে—'বড় বড় কাজ আছে। এইসব ছোট ব্যাপারগুলো কেন সামনে আনো?'

২৪ জানুয়ারি রাজ্যপাল-ভবনের চাপরাসীদের দেখে খাওয়া-দাওয়া করলাম, তারপর বাইরে বেরোলাম। এশিয়াটিক সোসাইটিতে কিছু বই দেখলাম। বিশেষ করে কবি রহীম সম্বন্ধীয় বইগুলি, যার মধ্যে 'মাআসর রহীমী'-র ছাপানো বড় পুঁথি দেখতে পেলাম। এতে রহীমের নয় কয়েকশো ফারসী কবির তাঁকে নিয়ে লেখা কবিতা সংগৃহীত রয়েছে। সেখান থেকে আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারে গেলাম। এই ভবনটি আর মাত্র কিছুদিনের জন্য পর্যাপ্ত বলা যেতে পারে। এখনও প্রতিটি বিভাগের বইগুলি পুরোপুরি গুছিয়ে রাখা হয় নি। হিন্দি বিভাগেও কয়েকজন যোগ্য লোক এসেছেন। গ্রন্থাগারের পাশেই আলিপুর চিড়িয়াখানা। কিছুক্ষণের জন্য সেখানেও গেলাম। ভেবেছিলাম সেখানে শিম্পাজী বা গেরিলা থাকবে কিন্তু তারা মরে গেছে এবং তাদের জায়গায় নতুন এসেও গেছে। আমাদের মুসৌরীর প্রতিবেশী পুসঙ্গ বোন এই আলিপুরে এসে ছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাঁর পরিচিত একজন লোক জানালেন যে তিনি এখান থেকে বাঙ্গালোর চলে গেছেন। মহাবোধি সভায় শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ২৬ জানুয়ারি বক্তৃতা দিতে বললেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

এবার কলকাতায় বেশি বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় নি, এটা খারাপ নয়। এর কারণ ছিল কাগজে খবর না বেরনো। কলকাতার হিন্দি পত্রিকাগুলি ব্রহ্মাকেও পরোয়া করে না। তাদের কাছে টাকাই হচ্ছে সব। হিন্দি পত্রিকার মান এখানে যতটা নীচে নেমে গেছে ততটা বোধহয়

আর কোথাও নামে নি।

২৫ তারিখ সন্ধেতে শহরের এক প্রান্তে একটি সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্য সভা হলো। তাতে বাছা-বাছা জনা চব্বিশ সাহিত্যিক আর সাহিত্য-অনুরাগী এলেন। সংস্কৃতি বিষয়ে আমার বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর দেওয়ার ছিল। রাতে আলিপুরের দিক দিয়ে ঘুরে ফোর্ট উইলিয়াম হয়ে গাড়ি চলল। মনে হচ্ছিল মহানগরী চারদিকে দীপমালায় সেজেছে। সেটা ছিল ১৯০৭ সাল, যখন এই ময়দানে প্রথমবার মোটরে চড়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু সে-সময় বিদ্যুতের আলো নয়, গ্যাস-বাতি জ্বলত। এখানে দিনের বেলায় গরম লাগছিল, পাখা চালাতে হচ্ছিল।

চীন থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্র-পত্রিকা এবং ভারতীয় পত্রিকায় তিব্বত সম্বন্ধে যে সব ব্যাপার এখন পড়ছিলাম তা থেকে কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল এবং চাইছিলাম যে তিব্বত থেকে আসা কোনো লোকের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারগুলি জানি। শ্রীমণিহর্ষজীর নিজের লোক লাসায় থাকেন কিন্তু এখন কোনো নতুন লোক সেখান থেকে আসে নি। শীতে তিব্বতী ব্যবসায়ীরা কলকাতায় আসত। জানতে পারলাম ১৫ নভেম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডে এসে তারা ওঠে। আমি সেখানে গেলাম। সঙ্গে আরো তিন-চারজন তরুণ ছিল। যখন পুরো দলটা সেখানে চলল তখনই আমার সন্দেহ হলো যে, ওরা ঘাবড়ে যাবে। আর হলোও তাই। পাঁচজন লোককে দেখে তারা আমার তিব্বতী ভাষাকেও গ্রাহ্য না করে সামান্য কিছুও জানাতে অস্বীকার করে দিল। মণিবাবু টেলিফোনে আলাদা করে কথা বলাতে পরের দিন এক তরুণ বাড়িতে এল। তাকে সেদিন গলিতে দেখেছিলাম। হতে পারে, সে সঙ্গে থাকলে নিরাশ হতে হতো না। এখন সে সমস্ত কথা জানাল। সে আমার নামের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। আমার প্রতিবেশী ও বন্ধু কাদির ভাই-এর মেয়ে অমীলা ছিল তার স্ত্রী। অমীলা আমার প্রথম তিব্বত যাত্রার সময় সর্বদা সাহায্য করতে তৈরি থাকত। সে সময় তার বয়স ছিল দশ-এগারো বছর। এই খবরটি আমার কাছে বেশ আনন্দের ছিল। তরুণটি জানাল যে লাসা থেকে ফরী পর্যন্ত এখন বাস আসে। শিগর্চের কাছে ব্রহ্মপুত্রের ওপর পুল আছে। শিগ্‌গিরই বাসরাস্তা টোমো (চুম্বী বেলী) পর্যন্ত হয়ে যাবে। ব্যবসার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের ওখান থেকে টাকা-পয়সা বয়ে আনার দরকার হয় না। লাসা থেকে চেক আনলে এখানে চীনা ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যায়। সড়ক আর পুল বানানোর ব্যাপারে বিস্ময়কর উৎসাহে কাজ চলছে। সে বলছিল, 'লাসার নদীতে পুল বানানো শুরু হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম তা তৈরি হতে দু-তিন মাস তো অবশ্যই লাগবে কিন্তু আমার অবাক হওয়ার কোনো সীমা থাকল না যখন দেখলাম দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই তা বানিয়ে চালু করে দেওয়া হলো।'

২৬ জানুয়ারি সন্ধেতে মহাবোধি হলে পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদের সভাপতিত্বে বুদ্ধ দর্শনের ওপর ভাষণ দিলাম। পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রাসাদকে এবার অনেক বছর পর দেখলাম। এখনও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল যদিও তাঁর বয়স আমার চেয়ে কম নয়।

২৭ তারিখে আবার ড· ভূপেন্দ্র দত্ত আর তাঁর বড় ভাই ৮৭ বছরের শ্রীমহেন্দ্র দত্তর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আজই কলকাতা থেকে চলে যাব তাই 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি'-র ব্লকগুলি ছাপিয়ে এক কপি নেওয়া দরকার ছিল। বলতে গেলে আজকের প্রায় পুরোটা সময় আর চিন্তা সেটা নিয়েই থাকল। তবে গিয়ে রাত্রে এক কপি পাওয়া গেল। আমার তিন-চারটে বই বাংলায়

অনূদিত হয়ে ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে 'ভোল্‌গা সে গঙ্গা'ও আছে। এটা ভারতের সমস্ত ভাষাতে অনূদিত হয়ে গেছে কিন্তু বাংলা বইয়ের কভারে যে রুচির পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা জানিয়ে দেয় যে, বাংলাভাষীরা এ ব্যাপারে আমাদের গোটা দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। প্রকাশকের ধারণা ছিল না যে এক বছরের ভেতর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাবে। তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েকটি কপি দিলেন।

লক্ষ্ণৌ—২৭ জানুয়ারির জন্য আগে থেকেই সিট রিজার্ভ করে নিয়েছিলাম। স্টেশনে মণিবাবু, মহাদেব ভাই, আর সেঙ্গরজী এলেন। আমার কম্পার্টমেন্টের ১২টি সিটের মধ্যে ৮টি রিজার্ভ ছিল। একজন বাঙালী পাকিস্তানী তরুণও যাচ্ছিলেন। তিনি এখন লাহোরে অফিসার ছিলেন। তিনি সেখানকার কথা জানালেন। বাঙালী মুসলমান এমনিতেই পাঞ্জাবী পাকিস্তানীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তিনি বামপন্থী ভাবনার লোক ছিলেন বলে আশা প্রকাশ করছিলেন যে কখনো আমরা আবার এক হয়ে যাব। পাশে শরণার্থী পাঞ্জাবী হিন্দু তরুণ বসেছিল। সে অন্যের কথা একটুও না ভেবে খুব উত্তেজনার সঙ্গে মুসলমানদের ক্রূরতার কথা প্রকাশ করতে লাগল। যেন সে সময় হিন্দু আর শিখরা ক্রূরতা দেখানোয় কিছু কম ছিল। সেকেন্ড ক্লাসে সিট রিজার্ভ করানোর অর্থ শুধু বসার জন্য রিজার্ভ করানো, এইজন্য বসে বসেই ঘুমোতে হলো।

ভোরবেলা দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে। নটা নাগাদ বেনারসে গাড়ি পৌঁছল। শ্রীজয়কৃষ্ণ দাসকে লিখে দিয়েছিলাম যে, কোনো লোককে স্টেশনে পাঠিয়ে দেবেন। সে 'সংস্কৃত পাঠমালা'-র প্রুফ দিয়ে যাবে আর বাকি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাবে। যে ভদ্রলোক প্রুফ নিয়ে এলেন তাঁকে আমি চিনতাম না তিনিও বোধহয় আমাকে খুব সামান্যই জানতেন। সৌভাগ্যই বলা যায় যে, দেখা হয়ে গেল। 'পাঠমালা' এখন ছাপা শুরু হয়েছে জেনে খুব খুশি হলাম। আমি দেখছিলাম মাটির ছাত কোন গ্রাম থেকে শুরু হচ্ছে। জায়সে তা শুরু হতে দেখা গেল। ফের জায়সের নামের সঙ্গে সঙ্গেই জায়সী মনে পড়তে লাগল।

লক্ষ্ণৌতে সাথী রমেশ, সাথী শিববর্মা এবং অন্য বন্ধুরা এসেছিলেন। বিপ্লব প্রেসে গিয়ে উঠলাম। যশপালজী বাড়িতেই ছিলেন। শ্রীমতী প্রকাশবতীকে ডাক্তাররা টি বি হয়েছে বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাই তিনি পুরো বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শরীরের বিশ্রামের জন্য মস্তিষ্ককেও বিশ্রাম দেওয়া দরকার কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া বিপ্লব প্রেস তো প্রকাশবতীজীর ভরসাতেই চলছিল। যশপালজীর তার সঙ্গে এটুকুই সম্পর্ক ছিল যে, তাঁর উপন্যাস আর গল্প সেখানে ছাপা হতো। দেখছিলাম প্রকাশবতীজী এখনো খাটে শুয়ে শুয়ে প্রুফ দেখায় ব্যস্ত রয়েছেন।

এমনিতে লক্ষ্ণৌতে নামতাম না কিন্তু 'মধ্য এশিয়া কা ইতিহাস (২)' ৪০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হয়ে এখন ঝুলে রয়েছে। প্রেসের লোকেরা ছাপছে না এবং ছাপতে পারবে না তাও বলছে না। এই ব্যাপারে এবার হেস্তনেস্ত করা দরকার ছিল। এখানকার অন্য একটি প্রেস অবশিষ্ট অংশ ছাপতে রাজি ছিল। আমি বিশেষ করে সেই জন্যই এসেছিলাম। সোমবারে তারা জানাল, 'আমরা বাকি অংশ একমাসে করে দেব।' পুরো বই কম্পোজ হয়ে গিয়েছিল। একমাস হচ্ছিল ২ মার্চে। কিন্তু ১৯৫৭ সালের ১০ মার্চেও তারবেরোনোর নাম নেই।

২৯ জানুয়ারি রিসালদার বাগ বৌদ্ধ বিহারে গেলাম। শ্রীপ্রজ্ঞানন্দজী তাঁর গুরুর কীর্তি খুব তৎপরতার সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকে রিকশা নিয়ে আমি সাথী সজ্জাদ-জাহীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। অনেকগুলি বছর সেখানকার জেলে ছিলেন। ষড়যন্ত্রের মামলা চলছিল। জামানত দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। এখন মামলা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ভারতেই থাকতে চাইছিলেন। এতে তার স্ত্রী রাজিয়া বেগমের সবচেয়ে বেশি আনন্দ হওয়ার কথা। তিনি বাচ্চাদের নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্ণৌতে বহু বছর ধরে পথ চেয়ে ছিলেন। তিনটে মেয়ের মধ্যে বড়টি ম্যাট্রিক পড়ে, তার উর্দুতে লিখতে অসুবিধে হয় না। মেজো হিন্দিতেই লেখে, উর্দু তার কাছে অসুবিধেজনক ঠেকে। উর্দু নিয়ে যে দীর্ঘদিন না লেগে রয়েছে তার পক্ষে তো উর্দুতে লেখা আরো মুশকিল হয়ে পড়ে। রাজিয়াজী আগে আমাকে উর্দু-বিরোধী ভেবে খুব দোষ ধরতেন কিন্তু এখন তাঁর লেখা গল্প হিন্দি পত্র-পত্রিকায় বেরোতে শুরু করেছে, পাঠকদের খুব ভাল লাগছে, এইজন্য হিন্দির প্রতিও তাঁর আত্মীয়তা হয়ে গেছে। বন্নের (সজ্জাদ জাহীর) সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। এখন তিনি রাজনীতি থেকে সরে গেছেন। পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান না কিন্তু তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব শেষ হয়ে গেছে যা আবার নিতে হবে। পাকিস্তান হওয়ার সময় ভেবেছিলেন, 'আমি ওখানে থেকে সাহিত্য আর অন্যান্য কাজের মাধ্যমে প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তা প্রচার করতে পারব।' কিন্তু আমেরিকার খপ্পরে পড়া পাকিস্তান আর তার স্বেচ্ছাচারী শাসকরা তা কি করে সহ্য করে? বন্নের কাছে দুটি মাত্র পথ খোলা ছিল। প্রথমত, পাকিস্তানে থেকে সেখানকার জেলে পচা এবং সেই সঙ্গে বউ-বাচ্চাদের ভারতে একা থাকতে দেওয়া কিংবা তাদের এখানে নিয়ে আসা আর দ্বিতীয়ত, নিজের শক্তিশালী কলম এবং ব্যাপক জ্ঞানের মাধ্যমে মাতৃভূমির উপকার করা। তিনি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছেন।

সেদিন সন্ধে ছটা থেকে সাহিত্য-সভা হওয়ার কথা কিন্তু বন্ধুরা আগে থেকেই আসতে শুরু করলেন। শ্রীভগবতীচরণ বর্মা সবার আগে এলেন। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ এখনকার বড় প্রশ্ন ছিল। দেশে জায়গায় জায়গায় লাঠিগুলি চলছিল। উর্দু আর হিন্দিরও প্রসঙ্গ উঠল। শ্রীহায়াতুল্লা আনসারী সাহেব সে ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করলেন।

৩০ জানুয়ারি শিল্পী শ্রী জে এন সিংহর সঙ্গে তাঁর স্টুডিওতে গেলাম। নিজে নিজে গড়ে ওঠা শিল্পী তিনি। ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। পিকাসোর ভাবনা তাঁকেও আকৃষ্ট করেছে। যত বড় নামের শিল্পীই হোক না কেন তাঁর প্রাকৃতিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন বিকলাঙ্গ চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রশংসা আমি করতে পারি না। যদি সামনে দণ্ডায়মান কারু হৃদয়ে দুঃখ দেওয়ার ভয় না থাকে তাহলে সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিজের ভাবনাগুলি খুলে বলতে পারি। সত্যিসত্যিই, এটা প্রতিভা ও শ্রমের অপব্যয়। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, কাব্যকলাকে এই বিকলাঙ্গ প্রতীকবাদ সর্বনাশ করেছে, যেমন আমাদের সংগীতকে ধ্বংস করেছে ওস্তাদদের গলাবাজি।

আজ ন্যাশনাল হেরল্ড প্রেসে গেলে কংগ্রেসী পত্রিকা 'কৌমী আওয়াজ'-এর সম্পাদক শ্রীহায়াতুল্লা আনসারীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি উর্দুভাষীদের ভাবনা-চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করেন। যে সময় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ভাবনা থাকাটা জাতিদ্রোহ বলে মনে করা হতো তখন আনসারী সাহেব কংগ্রেসী ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মীরাটের বাসিন্দা। উর্দু সম্বন্ধে তিনি যে কথাই

বলুন তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। চা-খাওয়া আর সেই সঙ্গে নিশ্চিন্তে কথাবার্তা হতে লাগল। আমি উর্দু-হিন্দি দুটি ভাষা বলে মনে করি না আর এটাও চাই যে এই ভাবনা শুধু মুখের কথা হয়ে যেন না থাকে বরং লোকে উর্দুও পড়ুক। তার ব্যাপক প্রচারের জন্য দেবনাগরী অক্ষরেও উর্দুর বইগুলি ছাপা জরুরি। সম্প্রতি শ্রীগোয়লীয়জী আর ফিরাক সাহেবের চেষ্টায় বহু উর্দু কবির কবিতা দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা হয়েছে, যেগুলি খুব ভালভাবে গৃহীত এবং প্রচারিত হয়েছে। উর্দুর পুরনো প্রজন্মের লোকেরা এটাকে বিপজ্জনক ব্যাপার মনে করে। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারি না যে, লিপি বদলালে ভাষার সংকট কোথায়। তুর্কী ভাষা আরবীর বদলে রোমান লিপিকে অনেক বছর আগেই গ্রহণ করেছে। তাতে তার ক্ষতি হয়নি। সোভিয়েতে মধ্য-এশিয়ার ভাষাগুলি—তাজিকী (ফারসী), উজবেকী ইত্যাদি—আরবী লিপির জায়গায় রুশ লিপিকে গ্রহণ করেছে, তাতে সেসব ভাষার কোনো ক্ষতি হয়নি। যদি উর্দু দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হয় তাহলে উর্দুর কী ক্ষতি হবে? তবে ভয় থাকতে পারে যে, লিপির জন্যই তো এই ভাষার নাম উর্দু হয়েছে। যদি লিপি চলে যায় তাহলে গালিবকেও লোকে হিন্দির কবি বলতে শুরু করবে। এমন যদি হয় তো তাতে খারাপটা কী? গালিব আর আকবর যদি দেড়-দু কোটি লোকের না হয়ে ১৫-১৬ কোটি লোকের হয়ে যায় তো মন্দ কী? তবে আমি এটাও বলছি না যে, উর্দুর জন্য উর্দুর লিপি বয়কট করা হোক। দুটি লিপিতেই বই প্রকাশিত হোক। তখন আবার উর্দুভাষীরা আশংকা প্রকাশ করবে যে, লোকে হিন্দি লিপির বইই বেশি কিনবে এবং উর্দু লিপিতে ছাপা বইগুলি বছরের পর বছর অবিক্রিত থেকে যাবে। তাদের এই সন্দেহ পুরোপুরি ঠিক। দুটি লিপিতেই ছাপা হলে উর্দু লিপিতে ছাপা বই পুরনো প্রজন্মের লোকদেরই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। নতুন প্রজন্ম, যারা উর্দুর চেয়েও ভালভাবে দেবনাগরী লিপি পড়তে-লিখতে পারে, তারা বন্নে ভাইয়ের মেজো মেয়ের মতো উর্দুর ক্রমশ ধারে কাছেও যাবে না। সংস্কৃত সম্বন্ধে আমরা জানিই যে এই শতাব্দির শুরুতে সংস্কৃত বইগুলি শুধু দেবনাগরী অক্ষরেই না, সেইসঙ্গে বাংলা, উড়িয়া, তেলুগু, গ্রন্থাক্ষর তামিল, মালয়ালম এবং কন্নড় লিপিতেও ছাপা হতো। তেলুগু লিপিতে তো খুব বেশি ছাপা হতো। আর তা তামিলনাড়ুর লোকেরাও পড়ত। কিন্তু দেবনাগরীর অক্ষর আসাতে সবাইকে পালাতে হলো। প্রথমত দেবনাগরী লিপিতে ছাপা বইগুলির সারা ভারতে তো বটেই, ভারতের বাইরে সিংহল, বর্মা, থাইল্যান্ডেও প্রচার ছিল। হিন্দি-এলাকার বাইরে দেবনাগরীকে সংস্কৃতর নিজস্ব লিপির মতোই মনে করা হচ্ছিল। এত বড় এলাকা হওয়ার দরুন দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত বইগুলি যেখানে অল্প সময়ে প্রচুর সংখ্যায় বিক্রি হয়ে যেত, সেখানে অন্য লিপিতে ছাপা বইগুলি অনেক বছর ধরে বেরোতই না। এই সুবিধের জন্য নির্ণয়সাগর আর বেঙ্কটেশ্বরের মতো প্রেস ভাল কাগজে সুন্দর অক্ষরে বিপুল সংখ্যায় বই ছাপত। বাজারে এমন বইয়ের সঙ্গে অন্যের কি তুলনা চলে? আজ সংস্কৃত সাহিত্যে দেবনাগরী লিপির একাধিপত্য। কিছুটা এই ধরনের ব্যাপার দু-তিন প্রজন্মের উর্দুর বেলাতেও ঘটতে পারে। উর্দু ভাষা দেবনাগরী অক্ষরকে গ্রহণ করলে কোনো ক্ষতি হবে না, উল্টে তার প্রচার খুব বেড়ে যাবে।

আনসারী সাহেব আর তাঁর বিদুষী পত্নীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে এই প্রসঙ্গ উঠলো। কিন্তু তাঁর একটি প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে ছিল না। তিনি বলতে লাগলেন যে, উর্দু যখন

হিন্দিই তখন হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস বা কবিতা সংগ্রহে উর্দুকেও কেন একই সঙ্গে জায়গা দেওয়া হয় না? এই প্রশ্ন উঠত না যদি ১৯৪৪ সালে তৈরি করা আমার পরিকল্পনাটি কার্যকরী হতো। আমি অপভ্রংশ-যুগের কবিতা নিয়ে 'হিন্দি কাব্যধারা' লিখে প্রকাশ করিয়েছি। পরের খণ্ডটি সম্পাদনা করার জন্য অন্য বন্ধুদের দিয়েছিলাম। সেটা তাঁরা করে উঠতে পারেন নি। তাতে এটাই মাথায় রাখা হয়েছিল যে, কবিতাগুলি যেন কালানুক্রমিকভাবে সংগৃহীত করা হয় আর হিন্দি-উর্দু কবিদেরও একই সূচিতে কালক্রম অনুযায়ী রাখা হয়। এটা করতেও হবে। হিন্দির প্রতিটি সাহিত্য-ইতিহাসে যখন মৈথিলী, অবধী, ব্রজ, ডিংগলকে কাল অনুসারে স্থান দেওয়া হয় তখন উর্দুর সঙ্গে এই বৈষম্য কেন? যদি উর্দুর অনেক শব্দই সাধারণ পাঠক বুঝতে না পারে তাহলে মৈথিলী আর ডিংগল-এরও অনেক শব্দ তারা বুঝতে পারবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হিন্দি-উর্দু কবিদের মিলিত কবিতা সংগ্রহের খুব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটা উর্দুভাষীদের খুশি করার জন্য নয়, বরঞ্চ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার সঙ্গে অপরিচিত না থাকার জন্যও প্রয়োজন। উর্দুও রাজভাষা হোক—এটাও আনসারী সাহেবের ইচ্ছে ছিল। সে ব্যাপারে আমি আমার মত-পার্থক্যের কথা স্পষ্ট করে জানালাম। আমি বললাম, 'রাজভাষা প্রদেশ অনুযায়ী হওয়া উচিত। কয়েকটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষ অনুযায়ী নয়। উত্তর-প্রদেশকেই ধরা যাক। প্রশাসনের জন্য যে-ভাষাগুলির এগিয়ে আসা দরকার সেগুলি হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা—ভোজপুরী, অবধী, ব্রজ, মধ্যদেশী অথবা কৌরবী আর পাহাড়ী, যাদের লিপি হবে দেবনাগরী। যদি দেবনাগরী লিপিতে উর্দু লেখা হয় তাহলে ভাষার সমস্যা অনেকটাই শেষ হয়ে যায়। আনসারী সাহেব এটা তো বুঝছিলেন যে, আমি উর্দুর ক্ষতি চাই না আর তাঁরই মতো তাঁর সাহিত্য সম্ভারের প্রচার এবং সংরক্ষণ চাই। এইজন্য বললেন, 'আচ্ছা, তাই সই।'

সেদিন সন্ধেতে ইউনিভার্সিটি ছাত্রসংঘে ভাষণ দিলাম। তারপর রাতে 'সমন্বয়' (বাংলা) সভায় ভাষানুসারে প্রদেশের বিষয়ে বললাম। রিসালদার বাগ বুদ্ধ বিহারেও ভাষণ দিয়ে রাতে বাড়ি ফিরলাম।

৩১ জানুয়ারিও সারাদিন ব্যস্ত থাকলাম। দুপুর পর্যন্ত আমার থাকার জায়গাতেই বন্ধুরা আসতে লাগলেন। নওলকিশোর প্রেস হচ্ছে উর্দু-ফারসী বইগুলির প্রকাশনার সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে বড় প্রেস। দুঃখ হয় যে এখন এই ধরনের বইগুলি সেখান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে না। আগেকার প্রকাশিত বইগুলিও গুদামের জঙ্গলে পড়ে আছে। চিঠি লিখলে বই তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে না তাই ভাবলাম নিজেই চলে যাই। সেখানে আমার কাজের বই মাত্র দু-চারটে পেলাম। সম্প্রতি 'কুলিয়াত নজীর' (নজীর কাব্যসংগ্রহ) প্রকাশিত হয়েছে। তার একটা কপি নিলাম। নজীর তাঁর নিজের ভাষার দারিদ্রের জন্য সরল ভাষায় কবিতা লিখতেন না। তিনি ফারসীরও কবি ছিলেন। তাঁর ফারসী কবিতা এই সংগ্রহে রয়েছে।

মধ্যাহ্ন-ভোজন হলো ড· বিশ্বনাথ মিশ্রর বাড়িতে। তাঁর স্ত্রী মহিলা কলেজে গণিতের অধ্যাপিকা। সেখানেও ভাষণ দেবার জন্য যেতে হলো। হিন্দি ঔপন্যাসিক শ্রীমতী কাঞ্চনলতা হচ্ছেন সব্বরওয়াল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। এর বিদ্যালয়-বিভাগে তিন হাজার মেয়ে পড়ে, বারো শো তো শুধু কলেজ-বিভাগেই পড়ে। তিনি বলছিলেন যে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার আর আগ্রহ খুব বেড়ে যাচ্ছে। লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার শ্রীতিওয়ারীজী বলছিলেন, 'মনে হয়

—১৯৫৬—

কিছুদিনের মধ্যে ইউনিভার্সিটি মেয়েদের হয়ে যাবে।' আমি বললাম, '১৯৪৫-৪৬ সালে আমি লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটিতেও এইরকমই দেখেছিলাম। বড়জোর একশোর মধ্যে দশজন হয়তো ছেলে ছিল।'

মহিলা কলেজ থেকে হজরতগঞ্জের একটি বড় রেস্তোরাঁয় নেপালী ছাত্রদের চায়ের পার্টিতে যেতে হলো। চল্লিশ জনের কাছাকাছি ছাত্র আর দু-একজন ছাত্রী নেপালী ছিলেন। শ্রীভগবতী প্রসাদ বর্মা, শ্রীযশপাল আর বেধড়ক বেনারসীজীও উপস্থিত ছিল। সকলেই একটু একটু বক্তৃতা দিলেন। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল নেপাল উপত্যকার। বাকিরা প্রায় সবাই পূর্ব-নেপালের। পশ্চিম-নেপালের মাত্র দু-তিন জন ছাত্র ছিল, যারা বলছিল যে, নেপালের এই অংশ শিক্ষায় খুব পিছিয়ে পড়া জায়গা।

কলকাতা থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাতে যাত্রা করার অভিজ্ঞতা ছিল। আজ আবার রাতটা বসে বসে কাটাতে চাইছিলাম না, প্রথম শ্রেণীর সিট রিজার্ভ করিয়ে নিলাম। আমাদের কম্পার্টমেন্টে একজন সরকারি অফিসার আর আমি ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল, অফিসারটি আমার নামের সঙ্গে পরিচিত। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হতে লাগল।

মুসৌরী প্রত্যাবর্তন—যত পশ্চিমে আসছি, ঠাণ্ডা ততই বাড়ার কথা। কলকাতায় যখন গরম বোধ হচ্ছিল, এখানে তখন বেশ করে কাপড় জড়াতে হচ্ছিল। হরিদ্বারে ভোর হতে শুরু করেছিল কিন্তু দেরাদুনে আমাদের ট্রেন পৌঁছল নটার সময়। শ্রীমেহতাজীকে স্টেশনে পেলাম। শুক্লজী আর অন্য বন্ধুদের লিখে দিয়েছিলাম যে, দেরাদুনে একদিন থেকে মুসৌরী যাব। কিন্তু এখন তো অনেক প্রোগ্রাম বাতিল করে আসছিলাম, তাই সে-ভাবনাও ত্যাগ করতে হলো। স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সিকে ৪ টাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এক ঘণ্টায় (এগারোটায়) মুসৌরী লাইব্রেরি পৌঁছলাম। অন্য সময় মাল তোলার জন্য কুলিরা ঝগড়াঝাঁটি করত কিন্তু এখন তারা ছিল দুর্লভ। কোনো রকমে দুজন কুলি জোগাড় করে সাড়ে বারোটায় বাড়ি পৌঁছলাম। কমলার ধারণা ছিল আমি ৩ তারিখে আসব। দেড় মাস পরে দেখায় জয়া আমাকে চিনতে একটু ইতস্তত করছিল, কিন্তু শিগ্‌গিরই চিনে গেল। এত দিনে জেতাকে দেখতে বড় লাগছিল। তার ডান হাতে পোলিওর যে সামান্য একটু প্রভাব ছিল তার অনেকটাই চলে গিয়েছিল। হাত যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে নাড়াচাড়া করতে পারছিল। কিন্তু বাঁ হাতের মতো জোর তাতে এখনও ছিল না। সেটা দেখানোর জন্য দিল্লী যাওয়া জরুরি ছিল। গঙ্গা কালিম্পঙে চলে গিয়েছিল। তার মেজো বোন মাহিলী এসে পড়েছিল। সে বাচ্চাদের সামলে কমলাকে পড়ার সময় করে দিতে সাহায্য করছিল। দেড় মাসের চিঠিপত্র পড়ে ছিল। সেগুলি নিয়ে অবশ্যই দুর্ভোগ ছিল। সম্মেলন মুদ্রণালয় থেকে 'মধ্য-এশিয়া (১)'-র অনেকটা প্রুফও এসেছিল। ঘরে এসে এক বিচিত্র ধরনের আত্মতুষ্টি বোধ হতে লাগল। জয়া-জেতাকে সব সময় মনে পড়ত। সন্তান মা-বাবাকে কতখানি আনন্দ দেয়!

৬৩-তম বছরের সমাপ্তি

মুসৌরীতে এবার বরফ পড়ে নি। সিমলায় বরফ পড়ার খবর কাগজে দেখে আমি ভেবেছিলাম, মুসৌরীতেও বোধহয় পড়েছে। তবে শীত যথেষ্ট ছিল। আসলে শীত কী করবে যদি দেবতারা বৃষ্টিই না ঝরান? বৃষ্টি হলে তবেই তো শৈত্য তাকে বরফ বানায়। যখন হাওয়া বয় তখন ঠাণ্ডা তো আপনিই বেড়ে যায়। ফেব্রুয়ারির শুরুতেই বসন্তের আশা করা অর্থহীন।

ডাকে আসা চিঠিগুলির মধ্যে রাষ্ট্রপতির ডেপুটি সেক্রেটারির একটি চিঠিও ছিল। আমি রাষ্ট্রপতিকে পাসপোর্ট সম্বন্ধে লিখেছিলাম। তারই উত্তরে এই চিঠি আর তার সঙ্গে ছিল পাসপোর্টের ফর্ম যেটা আবার সেই আগের পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হতো। ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলাম—পুরনো কাগজপত্র দিল্লী পাঠিয়ে দিন। তাঁর উত্তর এলো—এখন তা করে কোনো লাভ নেই। অর্থাৎ দশ টাকার স্ট্যাম্পে এখন আবার আর্থিক গ্যারান্টি এবং অন্যান্য ব্যাপারগুলো করতে হবে, তারপর ম্যাজিস্ট্রেট কাগজপত্রগুলো যাচাই করার জন্য পুলিসের কাছে পাঠাবেন। পুরো ন-মণ তেল পুড়বে তবে রাধা নাচবে।

এবারের যাত্রায় আমি সব জায়গায় বলে দিয়েছিলাম যে, আমরা মুসৌরী থেকে চলে যাব কিন্তু এখানে দেখি কমলার মন পাল্টে গেছে। যাকগে, এখন তো পরীক্ষা আর তার রেজাল্ট বেরোতে জুন কেটে যাবে। ততদিনে এ নিয়ে ভাবার জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। কালিম্পং প্রোগ্রামটা আমি মন্দ বলছিলাম না। ভাবছিলাম, তিব্বতী ভাষা আর বৌদ্ধ সাহিত্যের ব্যাপারে ওখানে থেকে কাজ করলে সুবিধে হবে, কেননা বড় বড় তিব্বতী পণ্ডিতদেরও সেখানে পাওয়া যাবে। বহুবছর ছেড়ে দেওয়া তিব্বতের কাজটি আবার হাতে নিলে যদি লাসায় সময় দেবার দরকার হয় তাহলে কালিম্পং থেকে তা খুবই কাছে। এখন ঘোড়ার পিঠে মাত্র দুদিন যাত্রা করা দরকার, তাছাড়া দুদিকেই বাস চলছে। বাগডোগরা থেকে লাসা বিমান চলাচল করলে যাতায়াত একেবারে সহজ হয়ে যাবে। মনে মনে কলা খেতে ভালই লাগে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারতাম যে কালিম্পঙে আমার অনুকূল সমাজ নেই।

জয়া এখন খুব কথা বলতে শুরু করেছিল। আড়াই বছর বয়সেই তার ভাষা যতটা শুদ্ধ ছিল, আট বছর পড়ার পরও তার বাবার ভাষা ততটা শুদ্ধ ছিল না। তার ভাষাও ছিল চলতি। জেতা এখনও কথা বলতে পারত না। 'জেতা' নামটা শুনে এক মহিলা 'জেতরাম' বললেন, তখন আমার টনক নড়লো। ভাবলাম জেতা সহজেই 'জীতরাম' হয়ে যেতে পারে।

'সংস্কৃত কাব্যধারা'র জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বই এখনো আসে নি আর এখনো কিছু লিখতে বাকি ছিল। তা শেষ করে, পড়ে, বাকি প্রেস-কপিও প্রেসে পাঠানোর ছিল। এদিকে ২৫তম বুদ্ধ-শতাব্দীর জন্য পত্র-পত্রিকা থেকে লেখার জন্য চিঠি আসছিল তাই বহু লেখা সেগুলিতেও লেখার ছিল। আবার সেই নিয়মমাফিক জীবন শুরু হলো। সকাল সাতটা নাগাদ চা খেয়ে চার ঘণ্টা ধরে বসে আমার বলে যাওয়া আর মঙ্গলজীর টাইপ খট্টাখট করা। তারপর পরের দিনের কাজের প্রস্তুতি এবং চিঠি ও পত্র-পত্রিকা পড়া। এবার এটাও ঠিক করে ফেলে ছিলাম যে, 'মেরী জীবন-যাত্রা'-র তৃতীয় খণ্ড আমার ৬৩তম বছরের শেষ হওয়ার ভেতরে লিখে ফেলতে হবে।

কাজের অভাব ছিল না। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে 'জীবন-যাত্রা' আরম্ভ হলো আর প্রতিদিন ১২-১৫ পৃষ্ঠা (ফুলস্কেপ সাইজ) টাইপ হতে লাগল। কাজ থেকে যে কোনো দিনই বিশ্রাম নিতে হতে পারে।

৭ ফেব্রুয়ারি ভাইয়ার (স্বামী হরিশরণানন্দ) চিঠ পেলাম। তিনি মনে করছেন, আর্থিক অসুবিধের জন্য আমি চীন যাওয়ার সংকল্প করেছি। অনেক কারণের মধ্যে সেটাও একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু সেটাই কারণ নয়। আমি সেখানে গিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজগুলি করতে চাইছিলাম। বিশেষ করে তিব্বতে এখন যেসব পুরনো গ্রন্থাগারের দরজা খুলেছে তা থেকে লাভবান হতে চাইছিলাম।

ফেব্রুয়ারি মাসে অমৃতসর কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল। কংগ্রেস কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। আগে যেখানে একটি অস্থায়ী নগর আর বিরাট মেলা গড়ে উঠত, এখন সেখানে তার প্রতি লোকেরা উদাসীন। কংগ্রেস এবং তার মন্ত্রীদের কাছ থেকে যাদের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার ছিল তারাই সেখানে এসেছিল। বহু বছর তো নেহেরু ছাড়া সভাপতি হওয়ার মতো অন্য কোনো লোকই পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন নেহেরু তাঁর টুপি শ্রীউচ্ছঙ্গরায় ঢেবরের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। পরের বার তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। আর পাঁচটা কংগ্রেস নেতাদের থেকে ঢেবর কিছু আলাদা ছিলেন না। তবু কেন জানি না নেহেরু তাঁর দিকে কৃপাদৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাতে কি এটাই জানিয়ে দেয় না যে, নেতার ব্যাপারে কংগ্রেস দেউলিয়া হয়ে গেছে? কংগ্রেসে সর্বত্র প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন তরুণের অভাব দেখা যায়। যারা আছেও তারা বৃদ্ধদের চোখে পড়ে না এবং খুঁজে খুঁজে বৃদ্ধদেরই নিয়ে আসা হয়। কংগ্রেসের সভাপতি নেহেরুর সুরে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করলেন, দ্বিভাষী প্রদেশকে সমর্থন করলেন। সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতি একেই বলে। দ্বিভাষী প্রদেশ গঠনের অর্থ হচ্ছে বায়বীয় পরিকল্পনা যা বেশিদিন চাপিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বিহার আর বাংলাকে এক করে দেওয়ার জন্য খুব উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হলো। সম্প্রতি বাংলার মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন জানিয়ে দিয়েছে যে, পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসীদের জয়ের জন্য শুধু ছল-চাতুরীর ওপরই ভরসা করতে হবে। সেটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। তাই তাদের রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে বিহারে এখনও কংগ্রেসীরা লোকের চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হতে পারে। তারা স্বৈরাচারী। সেজন্য দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির সময়েই তারা সু-দিনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। রায়-সিংহের পরামর্শে কংগ্রেসী মহাদেব উৎফুল্ল হবে না কেন? কিন্তু এই কাজ ততটা সহজ নয় যতটা সহজ মনে করেন দিল্লীর মহাদেব। প্রস্তাব রাখা হচ্ছে যে দুটি প্রদেশেই বিধানসভা, রাজধানী, হাইকোর্ট, মন্ত্রিসভা আলাদা আলাদা রাখা হোক এবং প্রদেশ দুটি একজন রাজ্যপালের অধীনে থাকুক। এইভাবে রাজ্যপালের সংখ্যা কম করাটা খারাপ ব্যাপার নয় আর তাতে বোধহয় কোনো অসুবিধেও হবে না। হয়তো ভাবছে যে, সংযুক্ত প্রদেশের যে, মন্ত্রিসভা গঠিত হবে তাতে একটি প্রদেশে বামপন্থীদের গরিষ্ঠতা থাকলে অন্য প্রদেশের সাহায্যে তাকে দাবিয়ে রাখা যেতে পারে।

অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতি 'ভূ-দান'-এর গুরুত্বের খুব প্রশংসা করলেন—'মহাত্মা ভাবে'র ওপর গান্ধীজী আবিষ্ট হন, তাঁর আত্মা ভাবের মুখ দিয়ে কথা বলছেন।' তিনি গান্ধীজীর

অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করছেন। তাঁর ভূ-দান আন্দোলনের মাধ্যমে এক জোরদার বিপ্লব হতে চলেছে। তার দ্বারা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে রামরাজ্য কায়েম হবে, শোষণ শেষ হয়ে যাবে, শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়ে যাবে, দেশে দারিদ্রের চিহ্নও থাকবে না। এমন কথা যদি ভণ্ড কংগ্রেসী নেতা বলে তো তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। প্রতি দ্বিতীয়-চতুর্থ বছরে তাদের একটি নতুন শ্লোগান পাওয়া দরকার, যা দিয়ে জনতার মন থেকে পুরনো ব্যর্থ-প্রচেষ্টার স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়া যায়। নতুন আশার জন্ম দেওয়া যায়। এটা তো তাদের কাছে খুব কাজের জিনিস। এইজন্য সমস্ত কংগ্রেসীরা একধার থেকে ভাবের জয়ধ্বনি দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সময় বের করে নেন।

কিন্তু বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক এটা কী করে মেনে নিতে পারেন? ভূ-দান দিয়ে কীভাবে রামরাজ্য আসবে? ভূমি তো আগেও হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। দানের মাধ্যমে হোক বা বিক্রির মাধ্যমেই হোক। এতে তার রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই হস্তান্তরের ফলে ভূমি বা তার উর্বরতা কি কয়েক গুণ বেড়ে যাবে? তাছাড়া এই দান করা ভূমির বেশির ভাগ তো বলা যায়, 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' অর্থাৎ কৃষক বড় জমিদারের কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নিচ্ছিল তা এই ভাবে দান করে মুক্তি পেল। এরকম লাখ-লাখ একর জমি আছে যাতে না কখনো চাষ-আবাদ হয়েছে আর না কখনো তা হওয়া সম্ভব। ভূ-দানের অর্থহীনতা অনেক কংগ্রেসী নেতাও বোঝেন কিন্তু চাঁদের আলোর মতো প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস তাঁদের নেই।

অমৃতসর আবার সমাজবাদের নাম উচ্চারণ করল। আজকের দিনে সমাজবাদের নাম করেই সমাজবাদ আসা আটকান যায়। এটা কংগ্রেসী নেতারা ভাল করেই জানে। এই জন্যই এই ছলনা তৈরি করা হয়েছে। কংগ্রেসী সমাজবাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে—যাতে গরিব আরো বেশি গরিব হতে থাকে আর পুঁজিপতি আরো বেশি ধনী হতে থাকে।

১৯ ফেব্রুয়ারি বেশ কয়েক মাস পর শীলাজী আর ড· সত্যকেতুর সঙ্গে দেখা হলো। ড· সত্যকেতু একটি খুব মজার কিন্তু সেইসঙ্গে হৃদয়বিদারক ব্যাপার শোনাচ্ছিলেন। প্রতিবেশী জেলার এক শেঠ যখন জানতে পারলেন যে, সরকার তাঁর জেলার বন্যাপীড়িতদের জন্য চার লাখ টাকা দিতে সম্মত হয়েছে তখন তাঁর পক্ষে জল হজম করাও দুষ্কর হয়ে উঠল। তিনি জানতেন চার লাখ টাকা বন্যাপীড়িতদের কাছে না পৌঁছে অন্যদের পকেটে ঢুকবে। ভাবলেন, এই লুটপাটের সুযোগ না নেওয়াটা ভীষণ বোকামি। তিনি তাঁর ছেলেকে ধমকালেন, 'তুই কেমন বোকা, সুযোগকে কাজে লাগাতে জানিস না? যা, বন্যাপীড়িত হিসেবে আমাদের নামও নথিভুক্ত করা।' যদিও বন্যাকবলিত অঞ্চলে তাঁদের এক আঙুলও জমি ছিল না এবং কোনো ঘরও ছিল না। কিন্তু সেটা কে দেখতে আসছে? কাগজ যদি তৈরি থাকে, যদি তাতে পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত লোকের হস্তাক্ষর থাকে, তাহলে আর শেঠ সাহেব আর তার ছেলের বন্যাপীড়িত হতে কে বাধা দিতে পারে? বাড়িতে নিজেদের গাড়ি ছিল। নবাবপুত্র তাতে করে বেরোল। জেলার কংগ্রেস নেতার সঙ্গে দেখা করল। তাঁকে দিয়ে সই করাল। কংগ্রেসী নেতার সবসময় শেঠকে দরকার পড়ত। ছেলে-মেয়ের বিয়ে হোক বা অন্য কোনো কাজে হোক, শেঠজী সর্বদা তাঁর আশীর্বাদ নিতে প্রস্তুত ছিলেন। এটা জানার পরও নেতা সই না করে পারেন? কংগ্রেসী এম এল এ ছাড়াও অন্য নেতাদেরও পাঁচ-ছটি সই হয়ে গেল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সেটাকে অস্বীকার

করেন কী করে? শেষমেশ শেঠের ঘরে ১৬ হাজার টাকা ঢুকে গেল। শেঠদের মাথা কি আর বিশ্রাম নিতে জানে? শেঠের বাড়িটি ভাড়া দেওয়া আছে। তার থেকে তার মাসিক তিন হাজার টাকা রোজগার। সরকার বাড়ির অভাব দেখে নতুন বাড়ি বানানোর জন্য কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে। তারও কিছুটা সদ্ব্যবহার হওয়া দরকার। শেঠজী একটি সমবায়-সমিতি বানালেন। সমিতি সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নতুন বাড়ি বানাবে। ডাক্তারবাবুকেও তিনি সমিতির মেম্বার হওয়ার জন্য বললেন। ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি তো এ শহরে থাকিই না।'

'আরে তাতে কী হলো? বাড়ি ভাড়ায় দেওয়া যাবে।'

'কিন্তু তাতে কিছু টাকা তো দিতে হয়?'

'সে কথা ভাবতে হবে না। বরং হাজার-পাঁচশো টাকা নিয়েও নিন।'

এর অর্থ হলো, শেঠজী নকল সমবায়-সমিতিতে নকল মেম্বারদের ভর্তি করিয়ে বাড়ি বানিয়ে সেগুলোও নিজের দখলে আনতে চাইছিলেন।

আজকের ভারতে যে ভয়ংকর ভ্রষ্টাচার চলছে তা কি একজন শেঠের দু-চারটে কীর্তির কথা বলে শেষ করা যায়? একটি মিউনিসিপ্যালিটির কথা ডাক্তারবাবু বলছিলেন যার সভাপতি আর সহ-সভাপতি লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটিকে যত ঠিকা দেওয়া হয় তার দশ শতাংশে 'ফকিরদের হক।' সেখানে প্রতি বছর ১৬ লাখ টাকার জিনিস কেনা হয় যার মধ্যে এক লাখ ষাট হাজার তো হক। এটা ঠিকই যে এই পুরো টাকাটা সভাপতি ও সহ-সভাপতির পকেটেই শুধু যায় নি, তবে অনেকটাই যে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দশ লাখ টাকা রাস্তার জন্য দেওয়া হলে তার থেকেও এক লাখ ধরা আছে। সভাপতি এবং সহ-সভাপতি দুজনেই লাল হয়ে গেছে। জমি-জায়গা নিজের নামে নেওয়া যায় না, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের নামে নিলে কে দেখছে? নিজের শহরে তা নেওয়া না গেলে অন্য শহরে নেওয়া যেতে পারে? কোন মন্ত্রী আর ধোয়া তুলসীপাতা যে এদের কাজে বাধা দেবে আর তাছাড়া তাদের পুজো করতেও তো এরা প্রস্তুত। রামরাজ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সারা দেশে এই রাস্তাই বানানো হচ্ছে। দেখা যাক, এই পাথরের নৌকো কতদিন ভাসে?

আমাদের প্রতিবেশী চৌধুরী হচ্ছেন হ্যাপিভ্যালির বলিষ্ঠ কৃষক। এই অঞ্চলে মাত্র দুটি বড় বড় সমতল ভূমির টুকরো আছে। চৌধুরী দুটিতেই চাষ-আবাদ করেন। মালিক আগে তাঁকে এমনিই দিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তার ওপর চৌধুরীর আইনগত অধিকার জন্মেছে। আশপাশের আরো কিছু আবাদযোগ্য জমি থাকলে চৌধুরী তাকে বেকার পড়ে থাকতে দেন না। 'কিলডের'-এর ফটকের কাছে এমনই একটি টুকরো জমি শুধু শুধু পড়েছিল। তিনি লোক লাগিয়ে একদিকে দেয়াল তুলে দিলেন আর তারপর পাথরগুলি সরালেন। আহীরের ছেলে। কৃষিবিদ্যা রক্তে আছে। তিনি সেদিন বলছিলেন, 'আমার বাবা ব্যাংকে দারোয়ান হয়েছিলেন, এটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। প্রথমে তিনি দু-টাকা মাইনে আর খাবার পেতেন। তারপর খাওয়াসহ চারটাকা আর শেষে খাওয়াসহ দশ টাকা। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি চাকরি করতে লাগলেন।' চৌধুরীও সেই সময়েই বাবার কাছে এলেন কিন্তু তাঁর দারোয়ন বা চাপরাসীগিরি পছন্দ হলো না। এদিকে ওদিকে কিছু কাজ করতেন। সব্জি বেচতেন। তারপর চাষবাসে লেগে পড়লেন। তাঁর কাছে অনেক জমি আছে। ছেলে বারাম্বকীতে নিজের গ্রামে

থাকে। সেখানেও জমি আছে। তাঁর ছেলেরও কোনো সন্তান নেই। তাঁর মেয়ের এক ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণকে তিনি এখানে এনেছিলেন। সে লেংটি পরে দেরাদুনে সাধু হয়ে গেল। চৌধুরী বহু কষ্টে তাঁর সন্ধান পেলেন। ফিরিয়ে আনলেন কিন্তু তাকে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে না দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার এই চাষবাস আপনি কাকে দিয়ে যেতে চান?' বললেন, 'সেটাই তো ভাবছি। বুড়ো হয়ে গিয়েছি, ছেলে ঘরের চাষবাস ছাড়তে পারে না।' চৌধুরীর চেয়েও বেশি বৃদ্ধা তাঁর স্ত্রী। হাড়মাত্র সার শরীরে, কিন্তু বোঝা যায় এই হাড় হচ্ছে লোহার। সর্বদা কাজে লেগে থাকেন। মুসৌরীর শীত তিনি একটি সুতির শাড়ি পরে কাটিয়ে দেন, যা দেখে অবাক লাগে। এমনিতে সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন কিন্তু যখন ঘরের দরজার দিকে যেতে হয় তখন ২৫ গজ দূর থেকেই কোমর ভাঁজ করে নেন। যতই ক্ষমতা থাক তবু বৃদ্ধা কতদিন সামলাবেন? আমি বললাম. 'লক্ষ্মীনারায়ণকেই আবার আনুন।'

'আনতে পারি, কিন্তু যদি আবার পালিয়ে যায়?'

'এখন তার কিছুটা বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয় হয়েছে। এক-আধ বছর পর তাকেই আনুন। হয়তো সে সম্পত্তির মূল্য বুঝবে।'

বার্ধক্যের কথা চৌধুরীরও মনে হয় কিন্তু গ্রামে গিয়ে থাকার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। বলছিলেন, 'নাতির বিয়েতে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আর বেঁচে ফিরতে পারব না। আসলে আমিও তো সেই মাটিতে জন্মেছি, লু-তে পুড়ে মিঠে মিঠে আম খেয়েছি। কিন্তু এখন লু-এর নাম শুনলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে মনে হয়।'

'সংস্কৃত পাঠমালা'-র প্রথম বই ৩ মার্চ ছাপা হয়ে গেল, এটা খুব ভাল লাগল। দ্বিতীয় বইয়েরও দশটি পরিচ্ছদের প্রুফ সেইদিনই এলো কিন্তু 'সংস্কৃত কাব্যধারা' এখনও মুখের কাছে এসে ঝুলে রয়েছিল। যে সময় আমি তার একশো পৃষ্ঠা শ্রীনিবাসজীকে দিয়েছিলাম এবং সম্মেলন-মুদ্রণালয়ের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে নিয়েছিলাম, তখন ভেবেছিলাম এবার তরি পার হয়ে যাবে। কিন্তু মুদ্রক আর প্রকাশকের মধ্যে বহুদিন ধরে দর কষাকষি চলতে লাগল। যদিও তার ১৩ পৃষ্ঠার প্রুফ এসে গেছে তবু যতক্ষণ না কিছু ছাপা প্রুফ আসে ততক্ষণ সন্দেহের অবকাশ থাকছেই।

১০ মার্চ কমলা তার পরীক্ষার জন্য দেরাদুন গেল। পরীক্ষা শুরু হতে চার পাঁচদিন দেরি ছিল তবু আগে যাওয়াটা তার দরকার ছিল। আমার মত খাটলে একমাস আগে পাঠিয়ে দিতাম। ওখানে পড়াশোনায় শুক্লজীর সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু বাচ্চাদের ছেড়ে সে যেতে রাজি ছিল না।

১১ তারিখে শ্রীকালিদাস, হরিশচন্দ্র আর কেশবলালার ভাইপো এলেন। এলাকার তিন-চারজন তরুণ ছাত্রের উপদ্রবের ব্যাপারে তাঁরা অভিযোগ করছিলেন। কমবয়সী মেয়েদের স্কুল যাওয়ার সময় তারা জ্বালাতন করে আর কিছু বললে মারপিট করতে এগিয়ে আসে। নিজেদের সম্মান যারা নিজেদের কাছে রাখতে পারে না, আইন তা কি করে রক্ষা করবে? তাঁরা এটাও জানালেন যে, এলাকার একজন লালা বেআইনি মদ আর জুয়া থেকে রোজগার করে। এখন মুসৌরীর ভাগ্য খারাপ হওয়ার ফলে ব্যবসায়ীদের ভাগ্যও খারাপ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় তারা রোজগারের এই নতুন পথ গ্রহণ করতেই পারে। পুলিস-চৌকি রয়েছে কিন্তু মাসিক

৫০ টাকা বাঁধা থাকলে সে কেন বাধা দিতে যাবে? সম্প্রতি একজন সেপাই অনেক জায়গায় চুরি করেছে। জানাজানি হয়ে যাওয়ায় সে পালিয়ে গেছে কিন্তু ত্যতেও লোকের প্রাণ আর সম্পদের কোনো লাভ হয়নি। পুলিসের কাজ এখন কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিরোধীদের মাথায় লাঠিবর্ষণ করা অথবা মহাপ্রভুদের স্বাগত জানাতে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা। কালিদাস মেয়ের বাবাকে জোর দিয়ে বলছিলেন যে, যিনি যেন মেয়েকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ না করেন কিন্তু লালার সাহস ছিল না।

এই মাসে আগ্রা ইউনিভার্সিটির দুটি ডক্টরেট থিসিস দেখার সুযোগ পেলাম। এমনিতে তো যেভাবে টাকা-সের দরে ডক্টরেট বানানো হচ্ছে তাতে থিসিসের মান খুব নেমে গেছে। কিন্তু এই দুটি থিসিস সে ধরনের ছিল না। শ্রীভরতসিংহ উপাধ্যায় খুব পরিশ্রম করে পালি ত্রিপিটক তার সমস্ত গল্পগুলির ভৌগোলিক তথ্যের বিশ্লেষণ করেছিলেন। অম্বালাল সুমন আলিগড়ের আঞ্চলিক ভাষা এবং তার তথ্যের সুন্দর মূল্যায়ন সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় করেছিলেন। এরকম নিবন্ধ যদি লেখা হয় তাহলে তা থেকে ডিগ্রির সঙ্গে সঙ্গে নতুন জ্ঞাতব্য বিষয়ও উঠে আসবে।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে কাগজে স্তালিনের নামে কড়া সমালোচনার খবর আসতে লাগল। আমার কয়েকজন সাথী এতে জ্বলে উঠল। সর্দার পৃথিবী সিংহ খুব উত্তেজনা আর নৈরাশ্যপূর্ণ শব্দে এ ব্যাপারে লিখলেন। কিন্তু আমি এতে খুব খুশি হলাম। এই দিনটিরই আমি প্রতীক্ষা করছিলাম, তবে এত দ্রুত নয়। মার্কস সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক রূপটি আমাদের সামনে এনেছিলেন এবং সেই দিকে যাওয়ার জন্য পৃথিবীর সবকিছুর জন্য পৃথিবীর সর্বহারা জনগণ আর মানবতার ভক্তদের প্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি মহান ছিলেন, এতে কার সন্দেহ থাকতে পারে? লেনিন পৃথিবীতে সাম্যবাদ এনে দিয়েছিলেন। পুঁজিপতিদের সঙ্গিন তা অসম্ভব করে তুলছিল। শেষে সঙ্গিনের বলে মুষ্টিমেয় লোক পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হয়ে গিয়েছিল। তাদের শোষণ আর উৎপীড়ন অক্ষুণ্ণ ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে যিনি পৃথিবীতে সাম্যবাদী শাসন কায়েম করলেন সেই লেনিন নিঃসন্দেহে মহান। লেনিন সাম্যবাদী শাসনকে সম্পূর্ণরূপে বলিষ্ঠ করে তুলতে পারেন নি। তার অর্থনৈতিক গঠনের জন্য খুব বড় পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি, কারণ সে সময় তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এইরকম সময়ে এই বিরাট ভার স্তালিন সামলালেন। তিনি পুনর্গঠনের পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূত্রপাত করলেন। এর ফলে সোভিয়েত দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এত সুদৃঢ় হয়ে গেল যে, এখন সে শত্রুদের কাছে বেশ উদ্বেগজনক। এই তৃতীয় ব্যক্তিটিও মহান ছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে বলুন বা আত্মশ্লাঘার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্যই বলুন, স্তালিন তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছরে অনেক খারাপ ব্যাপার নিয়ে আসার কারণ হয়েছেন। বাইরের দেশগুলির ষড়যন্ত্রের জন্য সোভিয়েত দেশের ভেতরে সুরক্ষার দিকে বেশি নজর দিতে হতো। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য বানানো নিয়মগুলি সবসময় জারি করে রাখা বিপজ্জনক। এই নিয়ম বিনা কারণেও সন্দেহ সৃষ্টি করে। কত নিরপরাধ লোককেও সন্দেহের কঠিন দণ্ড ভোগ করতে হয়। এত বড় শক্তিকে ঠিকভাবে ব্যবহার করাটা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। স্তালিন অন্যদের বলেছিলেন—সফলতার চোখ ধাধানো প্রখর আলো'-র সামনে এসে তিনি নিজেই তার শিকার হলেন। তিনি নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করতে লাগলেন। হাত জোড় করে সর্বজ্ঞের স্তুতি করা খোশামুদে লোকের অভাব হয় না।

যারা খোশামুদি করতে পারল না তারা তাঁর ক্রোধের শিকার হলো। এই অবস্থায় তাঁর চারদিকে চাটুকারদের ভিড় হয়ে গেল। তার মধ্যে যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর হতে পারত সে তাঁর কৃপাপাত্র হতো। বেরিয়া এই রকমই একজন ছিল, যাকে জর্জিয়া থেকে ডেকে স্তালিন গৃহ-মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিলেন। গৃহ-মন্ত্রণালয়ের কাজ ছিল ভেতরের শত্রুদের মাথা তুলতে না দেওয়া। এই ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পক্ষে বেরিয়া একেবারে অযোগ্য ছিল। সে যখন দু-চারটে উৎপীড়ন করল তখন তার নিজের চারদিকে সুরক্ষা করাটা তার কাছে জরুরি হয়ে উঠল এবং তখন নিজেরই মতো মানুষদের সে তার চারদিকে জড়ো করে নিল। এই পঙ্‌ক্তিগুলির লেখকও বেরিয়ার পুলিসকে কিছুটা দেখেছে আর বেশিটা শুনেছে। লোক নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পেত। এই রকম অবস্থা তৈরি হওয়ার পিছনে স্তালিনের অনেক ভূমিকা ছিল। প্রতিটি ব্যাপার তিনি হয়তো জানতেন না কিন্তু যে ব্যক্তিপূজা তিনি নিজের জন্য চালু করেছিলেন তার এই ছিল অনিবার্য পরিণাম। এই অবস্থাটি দূর করা সোভিয়েত দেশের সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে উঠেছিল। বাইরের কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদের হিতৈষীরা স্তালিনের কড়া সমালোচনা যদি অপছন্দও করেন, যদি এর ফলে বাইরের দুনিয়ায় সাম্যবাদের শত্রুরা কিছু সময় ধরে প্রোপাগাণ্ডা করার ভাল সুযোগও পায়, তবু রাশিয়ার পক্ষে স্তালিনের ব্যক্তিপূজাকে এক মুহূর্তও সহ্য করা ক্ষতিকারক ছিল। যে শাসন বহুজনহিতায় হবে তাতে এত বাধ্যবাধকতার দরকার কি? সোভিয়েতের নেতারা সেই বড় বাধাটি দূর করেছে যা এত দ্রুত শেষ হতে পারে বলে আমি মনে করিনি। এই নীতির ফলে গোটা সোভিয়েত দেশে একটি অদ্ভুত স্ফূর্তি এসেছে। কত যোগ্য ব্যক্তি, যাঁরা সেই যুগের ক্রূরতার শিকার হয়েছিলেন, তাঁরা আবার কার্যক্ষেত্রে এলেন।

প্রফেসর তুবিয়ান্স্কী আর প্রফেসর বোস্ত্রিকোফ সংস্কৃতের মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। ড· শ্চেবরাৎস্কী তাঁদের নিজের ছেলে মনে করে অপুত্রক হওয়ার শোক ভুলে থাকতেন। এই দুজনকে নিয়ে তাঁর খুব গর্ব ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সালে তুখাচেবস্কী ষড়যন্ত্রে যে হাজার হাজার যব ঘুণের সঙ্গে পিষে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে এই দুই পণ্ডিতকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত পণ্ডিত। নিজেদের শিক্ষার প্রতি তাঁদের লক্ষ্য ছিল, যে ব্যাপারে তাঁরা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। দুজনকেই ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। জানি না মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁরা আজও বেঁচে আছেন কি না। কিন্তু তা দিয়ে তো সেই যুগের ক্রূরতাকে লুকোনো যায় না। আমি মনে করি, স্তালিন-পূজার বিনাশে সোভিয়েতদেশে একটি বিরাট বড় কাজ হয়েছে। দু-তিনজন বন্ধু উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে এ ব্যাপারে শুধোলেন এবং আমি সংক্ষেপে এই কথাই বললাম।

২৫ মার্চ কমলা পরীক্ষা দিয়ে এল। ভাষাতত্ত্বের প্রশ্নপত্রটি তার তেমন ভাল হয় নি। 'ঘরের যোগী যোগীই নয়, ভিন গাঁয়ের যোগী সিদ্ধপুরুষ'—এটা সত্যি কথা। আমি সবসময় বলতাম যে, এটা পড়ে নাও। রাতে কথাচ্ছলেও তা শুনতে রাজি হতো না। এখন অনুতাপ করছিল। ফেল যদি করে তো ভাষাতত্ত্বের জন্যই করবে।

গরমের ভয়ে দিল্লী যেতে দ্বিধা হচ্ছিল। তবে সেখানে যাওয়াটা জরুরি ছিল। জেতার হাত অনেকটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল শুধু জোরটা একটু কম ছিল। কিন্তু দিল্লীতে যখন পোলিওর চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে তখন সেখানে তাকে দেখানোটা দরকার ছিল। দেরাদুন থেকে কমলাকে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু হোলি এখানেই পালন করার কথা বলে ৩০ মার্চই সেখানে

যাওয়া স্থির করলাম।

দেরাদুন—৩০ মার্চ সকাল সাড়ে সাতটায় জয়া, জেতা আর কমলার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরোলাম। পাহাড়ে মোটরে করে যাওয়া কমলার কাছে মরণ-বাঁচন ব্যাপার, সেজন্য সে কিছু না খেয়ে রওনা হলো। নটার সময় কিংক্রেগে গাড়ি পাওয়া গেল। সওয়া দশটায় আমরা শুক্লজীর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। পাসপোর্টের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে সই করানোর ছিল। আজ ছুটি কিন্তু শুক্লজী ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে রেখেছিলেন। মুসৌরীর সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটেরই সই করার অধিকার ছিল। দেখা গেল তিনি ভাল লোক, ফলে পাসপোর্টের ফর্মে সই করার কাজ চুকে গেল। সেদিন তিনি স্টেনোকে দিয়ে মোকদ্দমার ফয়সালা লেখাচ্ছিলেন। অনর্গল ইংরেজি ব্যবহৃত হচ্ছিল। পন্ত থেকে শুরু করে সম্পূর্ণানন্দ পর্যন্ত সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী আর মন্ত্রীরা হিন্দির পক্ষে প্রচণ্ড বক্তৃতা দেন কিন্তু তার ফল আমার সামনে ছিল। যাদের মোকদ্দমার ফয়সালা হচ্ছিল তাদের মধ্যে কেউই বোধহয় এটা বুঝতে পারবে না। একে বলে পরস্পরকে ধাপ্পা দেওয়া। যদি সত্যিই হিন্দিকে ব্যবহারে আনতে হয় তাহলে ইংরেজির স্টেনো আর টাইপস্টকে সরিয়ে তার জায়গায় হিন্দির লোক নিয়োগ করা দরকার আর নিজের অফিসারদের কড়া তাগাদা দেওয়া দরকার যাতে তাঁরা হিন্দিতেই তাঁদের ফয়সালা জানান। ঐচ্ছিক হলে তো অফিসারদের বর্তমান প্রজন্ম হিন্দির দিকে ঝুঁকতে রাজি হবেন না। 'তারা মনে করেন মন্ত্রীরা শুধু ওপর-ওপর হিন্দির কথা বলে কিন্তু তার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করতে প্রস্তুত নয়।

এখন সবে মার্চ মাসের শেষ কিন্তু এখানে চারটে পর্যন্ত অসহ্য গরম ছিল। যখন আসল গরম শুরু হবে তখন কে জানে কী অবস্থা হবে।

৩১ মার্চও আমাদের দেরাদুনেই থাকার ছিল। বেনেদের খাওয়া শুক্লজীর বাড়িতে আর ব্রহ্মভোজ পণ্ডিত হরিনারায়ণ বাড়িতে হতে লাগল। কিন্তু শুক্লজীর স্ত্রীর হাতে রান্না করা খাবারও খুব সুস্বাদু তাই আমাদের সর্বদা ব্রহ্মভোজ খেতে ইচ্ছে করত না। আজ গুরু রামরায়ের দরবারের ঝাণ্ডামেলা ছিল। ঘটনাচক্রই বলা যায় যে, আমরা এই সময় সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তার সুযোগ না নেওয়াটা উচিত কাজ হবে বলে মনে হচ্ছিল না। গদি থেকে বঞ্চিত গুরু রামরায় শিখদের সপ্তম গুরুর জ্যৈষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বঞ্চিত করার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছিল পন্থায় পন্থায় বিবাদ হওয়া। তাঁর ভাইপো গুরু তেগবাহাদুরকে ঔরঙ্গজেব হত্যা করিয়েছিলেন। অন্তিম গুরু গোবিন্দ সিংহকে জপমালার জায়গায় খড়্গ হাতে নিতে হয়েছিল। এক পক্ষ যখন ঔরঙ্গজেবের বিরাগভাজন তখন অন্য পক্ষ তো অনুরাগভাজন হবেই। এইজন্য গুরু রামরায়ের পক্ষে সুপারিশ করে ঔরঙ্গজেব গাড়োয়ালের রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সে সময় দুন অনাদিকাল থেকে গাড়োয়ালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুরু জঙ্গল আর জংলী জানোয়ারে ভরা দুন ভূমির একটি ছোট জায়গায় নিজের ডেরা বাঁধলেন, যার জন্য এই স্থানকে 'ডেরা' বা 'দেরা' বলা শুরু হলো। স্থানীয় লোকেরা এখনো দেরাদুনকে 'দেরা' বলে। গুরু রামরায় আর তাঁর উত্তরাধিকারীরা এখানকার মঠকে অনেক বড় করেছেন। কোনো গুরু ঝাণ্ডা পোঁতার রেওয়াজ চালু করেছিলেন। ১১০ ফুটের কাঠের খুঁটি ঝাণ্ডার দণ্ডের কাজ করে। একবার খুঁটি কাটলে তিন বছর থাকে। তৃতীয় বছরে পুরনোর জায়গায় নতুন খুঁটি পোঁতা হয়। এটা দেখার

জন্য লোকের ভিড় জমে যায়। একটার সময় ঝাণ্ডার মেলার জন্য যাওয়াটা খুব ভাললাগার ব্যাপার হতে পারে না কিন্তু লেখার লোভ টেনে নিয়ে গেল। শুক্লজী জানালেন, একটু আগেই যাওয়া দরকার। নইলে ভিড় ঠেলে যাওয়া কষ্টকর হবে। আমি ভেবেছিলাম, দুটো-আড়াইটে নাগাদ শেষ হয়ে যাবে।

তাড়াহুড়ো করে আমরা একটার সময় বেরোলাম। মেলার অনেকটা আগেই টাঙ্গা ছেড়ে দিতে হলো। তারপর ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে সামনে এগোলাম। লাউড স্পিকার কানের পর্দা ফাটিয়ে দিচ্ছিল। সমস্ত দোকানদাররা তা উচ্চস্বরে বাজানোর প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছিল। সার্কাস পার্টি আলাদা করে চেঁচাচ্ছিল। সব রকমের দোকান ছিল। কাপড়, মিষ্টি, খেলনা থেকে মাটির কুঁজো পর্যন্ত, যা চাইবেন তাই নিন। শুক্লজী বিশেষ আমন্ত্রণের তিনটে পাস যোগাড় করে ছিলেন। আমরা দুজন ছাড়া আগ্রার একজন প্রফেসরও সঙ্গে ছিলেন। বিশেষ অতিথিদের জন্য যথেষ্ট লম্বা একটি ছাতে চেয়ারে বসার ব্যবস্থা ছিল। সিঁড়িতে পাস দেখা হলো। আমরা ওপরে চলে গেলাম। এখনও জায়গা পুরো ভর্তি হয় নি। শুক্লজীর পরিচিত আরো কয়েকজন পরিচিত ব্যবস্থাপকের সঙ্গে দেখা হলো বলে তাঁরা আমাদের সবচেয়ে প্রথম সারিতে বসালেন। ইংরেজদের রাজত্বে সাহেব ও মেমরা এইগুলি অলংকৃত করতেন। এখন কৃষ্ণকায় নারী-পুরুষরা সেখানে বসেছিল। তাদের মধ্যে সকলেই ভাব-ভক্তিহীন ছিল না। এক বৃদ্ধা তাঁর পুত্রবধুকে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। প্রথমে জায়গা ছিল না কিন্তু আমরা জায়গা করে দিলাম। গঙ্গা-যমুনার পুল পার হওয়ার সময় যাত্রীরা যেমন পয়সা ফেলে, যার অধিকাংশই পুলের লোহার থামে ঝন্ করে লেগে গঙ্গা অব্দি পৌঁছোয়ই না, ঝাণ্ডা উত্তোলনের সময় তাঁরা হাত জোড় করে সেভাবেই তার দিকে পয়সা ছুঁড়লেন। আমাদের বসার জায়গা থেকে ঝাণ্ডার স্থান অনেকটা দূর ছিল, তাই পয়সা সেখানে কী করে পৌঁছবে?

দুটো নাগাদ জমিন আর ছাদের প্রতি আঙুল জায়গা লোকে ভরে গেল। খবর পেলাম কিছু লোক সকাল থেকেই বাড়ির ছাতে এসে তপস্যা করছে। এই রোদে স্ত্রী-পুরুষদের এই ধৈর্য বিস্ময়কর। এতে শুধু ভক্তিই নয়, বরং মজা দেখার প্রবৃত্তিও কাজ করছিল। ঘড়িতে যখন প্রায় আড়াইটে বাজল তখন আমাদের মধ্যে কয়েকজনের ঔৎসুক্য বাড়তে শুরু করল। মাথার ওপর কাপড়ের চাঁদোয়া ছিল কিন্তু এক জায়গায় ফাঁক পেয়ে রোদ সোজা মাথার ওপর পড়ছিল। আধ ঘন্টা পরে তা সরে গেল। তিনটের সময়েও মোহান্তজীর কোনো পাত্তা নেই। মোহান্তজী এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতে এম এ। শিক্ষিতদের শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে না—এটা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য তিনি বোধহয় তাঁর গুরু মোহান্ত লক্ষ্মণদাসজীর চেয়েও বেশি সময় ধরে পুজো করেন। সাড়ে তিনটে পর্যন্তও তাঁর দেখা নেই। রোদে মাথার চাঁদি গলে না গেলেও চিন্তা বাড়তে লাগল। লোকে বলতে লাগল দুটো-আড়াইটে নাগাদ ঝাণ্ডা চিরদিনই দাঁড়িয়ে যায়। ঝাণ্ডার খুঁটি আগেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ওপরে ঢাকা দেওয়া গত বছরের কাপড় খুলে প্রসাদের জন্য রাখা হয়ে ছিল। এই আবরণীর দু-আঙুল পরিমাণ কাপড়ের টুকরো থেকেও লোকের ভাগ্য গড়ে উঠতে পারে, তার দুর্ভাগ্য দূর হতে পারে। মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে। নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য লোকে আগে থেকেই মানত করে—'আমার অমুক কাজ হয়ে যাক, পুত্র প্রাপ্তি হোক, তাহলে আমি ঝাণ্ডা সাহেবকে থান দেব।' কেউ কেউ তো মখমলের খোল

দেওয়ার মানত করে। আর এমনি লোকের সংখ্যা এত বেশি হয় যে দশ বছরের আগে খুব কম লোকেরই পালা আসে। তার জন্য এক হাজার বা তারও বেশি টাকা দাতা দেন। ১১০ ফুটের খুঁটির দু-দিকে লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সবাই এক সঙ্গে ঝাণ্ডাটি হাত দিয়ে তুলতে থাকে আর তাতে কাপড় মোড়া হতে থাকে। প্রথমে হলুদ সুতির থান আর অন্য কাপড় মোড়া হলো। শেষে পুরো ঝাণ্ডার মাপের লাল মখমলের খোল মাথার ওপর থেকে গলিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ছোট রেশমী রুমাল ছোট ছোট ঝাণ্ডার মতো যেখানে সেখানে বাঁধা হলো এবং মাথায় একটি বড় ঝাণ্ডা লাগিয়ে দেওয়া হলো। এই কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর মনে হচ্ছিল যে, এবার ঝাণ্ডা খাড়া হবে। কিন্তু মোহান্তজী তাঁর অনুচরদের সঙ্গে সাড়ে চারটের সময় ঝাণ্ডার কাছে পৌঁছলেন। মাথার দিক থেকে জল ছিটোতে ছিটোতে পুজো করতে করতে তিনি তার গোড়া অব্দি পৌঁছলেন। আজ তিনি বিশেষ পোশাকে ছিলেন। তাঁর গায়ে জরির চোগা আর মাথায় ছুঁচোলো টুপি ছিল। এই পোশাক তাঁর আগে অনেক মোহান্তর শরীর সাজিয়ে এসেছে। তিনি ঝাণ্ডার পাকা বেদিতে পৌঁছলেন। তারপর হাতের ইশারা করে তিনি নিযুক্ত লোকেদের ঝাণ্ডা তোলার জন্য বলতে লাগলেন। ১১০ ফুট দৈর্ঘ্যের মোটা খুঁটি তোলা অতো সহজ নয়। একদিকে ছিল পাহাড়ের চুড়োর মতো খুঁটিটিকে ধরে থাকা লোকেরা, অন্যদিকে খুঁটিতে বাঁধা রশ্মিটি শয়ে শয়ে লোক টানছিল। হাত খানিকটা উঁচু পর্যন্তই পৌঁছত, তাই কাঠের ছোটবড় আঁকশি লাগানো হচ্ছিল। ঝাণ্ডা কিছুটা ওপরে উঠছিল আবার নীচে নেমে আসছিল। ভয় হচ্ছিল যে একটু যদি ভুল হয় তাহলে তার তলায় শত শত লোক অবশ্যই মারা পড়বে। কিন্তু ঝাণ্ডাসাহেব কোনো নির্জীব দণ্ড নন, তিনি দিব্য পুরুষ। ঝাণ্ডা উৎসবে এমন দুর্ঘটনার কথা কখনো শোনা যায় নি।

আজ ঝাণ্ডা সাহেব একটু ওপরে ওঠে বার বার কেন যেন নীচে চলে আসছিল। আগে সোজা হতে দশ মিনিটও লাগত না। কিন্তু আজ লোকে আধঘণ্টা ধরে বেকার চেষ্টা করতে লাগল। কত লোক নিরাশ হয়ে পড়ল। যাক্ গে, পৌনে এক ঘণ্টা পর ঝাণ্ডা সাহেব খাড়া হলেন। যাতায়াত নিয়ন্ত্রণকারী লাউড স্পিকার মাঝে মাঝে নিজের কাজ ছেড়ে 'গুরু রামরায় কী জয়', 'ঝাণ্ডা সাহেব কী জয়' বলছিল। মোহান্তজী আর তাঁর ম্যানেজার হাত নেড়ে লোকেদের উৎসাহ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মোহান্তজী পুজো করতে খুব দেরি করেছিলেন আর দেড়টা-দুটোর জায়গায় সাড়ে চারটের সময় ঝাণ্ডা সাহেবের কাছে পৌঁছেছিলেন। ঝাণ্ডা মহারাজ কেন উঠছিলেন না তার কারণটি ফেরার সময় আমাদের টাঙাওলা বলছিল—আগেকার মোহান্ত মহারাজদের মধ্যে তেজ ছিল। তাঁদের তেজ আর তপস্যার জোরে ঝাণ্ডা সাহেব দ্রুত খাড়া হয়ে যেতেন। বর্তমান মোহান্ত শ্রী ইন্দ্রেশচরণ দাসের গুরু মোহান্ত লক্ষ্মণদাস ঝাণ্ডা ওঠানোর সময় হাত জোড় করে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমি দেখেছি তরুণ মোহান্তজী এক পায়ে দাঁড়ান নি আর এমন কোনো ভাবও দেখান নি যাতে মনে হতে পারে যে এই দিব্য বস্তুকে তিনি শুকনো কাঠ বলে মনে করছেন না। তিনি তো লোকেদের সেই রকম ভাবে উৎসাহিত করছিলেন যা কোনো বড় লম্বা কাঠ উত্তোলনকারী লোকেদের করা হয়। বাকি ছিল শুধু 'হেই য়ো, হেই য়ো'। তাহলে আর এই দিব্য স্তম্ভ সহজে কেন উঠবে? টাঙ্গাওলা এটাও বলছিল যে, ঝাণ্ডা সাহেব শেষে যে উঠলেন তাও আগেকার গুরুদের পুণ্যের জোরেই। হ্যাঁ, মহারাজ, দপ্তরে বসে কাগজে কলম চালিয়ে কি সেই তেজ আসে যা আগেকার মোহান্ত মহারাজদের মধ্যে

ছিল? মোহান্ত ইন্দ্রেশচরণ দাসের এটি বড় কঠিন সমালোচনা ছিল। সেদিন হাজার জনের মুখ থেকে বোধ হয় এই কথা বেরিয়েছিল। তাহলে মোহান্তজীর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুজো করাটা ব্যর্থই হলো বলা যায়। যদি তিনি একটার সময়েই চলে আসতেন আর দশ মিনিটে ঝাণ্ডা দাঁড় করিয়ে দিতেন তাহলে তাঁর তেজের কাছে লোকে হার মানত। আমি শুক্লজীকে বললাম, 'আপনি এই ব্যাপারটার দিকে অবশ্যই মোহান্তজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। কারণ জনগণের কথা মানে ভগবানের কথা।' ঝাণ্ডা দাঁড় করিয়েই মোহান্তজী তাঁর সম্মানীয় অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য এলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেকে বাইরে চলে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে দেখা হলে দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাঁর তেজের ব্যাপারে টিপ্পনী আমি পরে শুনেছিলাম নইলে তাড়াতাড়িতে হলেও দু-চারটে কথা কানে ফেলে যেতাম।

এঁকেবেঁকে ঘুরে শুক্লজী আমাদের এমন রাস্তা দিয়ে টাঙ্গার জায়গায় নিয়ে এলেন যেখানে ভিড় কম ছিল। টাঙ্গাওলা তার টাঙ্গাতে বসিয়ে কম ভিড়ের রাস্তা দিয়ে বেরোল। বেচারা আশা করেছিল যে, আড়াইটে-তিনটের সময় যাত্রী পেয়ে পাবে। সেই আশাতেই সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি মুহূর্তেই লোকের আসার সম্ভাবনা ছিল তাই মাঝখানে সেখান থেকে চলে যাবে কেন? দু-তিন ঘণ্টা তাকেও প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল। সেই সময় তার মগজ নিজের ক্ষমতা দেখাল আর ঝাণ্ডার দেরি হওয়ার কারণ সে বুঝতে পারল, যে-ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি। মোহান্তজী দেরাদুন মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি। এটা বলার দরকার নেই যে, উত্তরপ্রদেশ বা তার বাইরেও এত সৎ সভাপতি বোধহয় কোনো মিউনিসিপ্যালিটিই পায় নি। যেখানে প্রতিটি ঠিকা আর বড় বড় খরচের দশ শতাংশ সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং তার সহযোগীদের জন্য ধরা থাকে, সেখানে সততা সহজে পাওয়া যেতে পারে না। কিন্তু মোহান্তজীর তার কোনো দরকার নেই, তাঁর কাছে মঠের যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, আর খরচ করার ব্যাপারে নিজের অর্ধশিক্ষিত গুরুর চেয়েও তিনি বেশি সংযমী। যদি জনতার কাজের জন্য তিনি দপ্তরে বসে দস্তখত করেন বা দেড় লাখ জনসংখ্যার নগরকে আরো ভাল বানানোর জন্য ঘোরাঘুরি করেন তাহলে তাঁর এই কাজ পুজোপাঠের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর কলমও শক্তিশালী। মার্শাল রোমেলের জীবনী হিন্দিতে তিনিই লিখেছেন। সেটা পড়ে বোঝা যায় ভাষায় তাঁর দখল আছে। তিনি সেনা-বিজ্ঞানরেও ছাত্র। তাঁর সংকল্প ছিল এই রকম অনেক সেনা-নায়কের জীবনী লেখার সূত্রে যুদ্ধের মারপ্যাঁচ, হাতিয়ার আর অন্যান্য জিনিসগুলির বর্ণনা হিন্দিতে লেখা, যা খুব বড় একটি কাজ হতো কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি তার অনেকটা সময় নিয়ে নেয়, যেটুকু সময় বাঁচে তারও অনেকটা পুজোপাঠে চলে যায়—দুঃখ এটাই যে এত সব করার পরেও তাঁর তেজ আছে বলে লোকে মানতে রাজি নয়। মানুষ যখন রামের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, আর সীতাকে দ্বিতীয়বার বনবাসের জন্য ঠেলে দিয়েছিল, তখন মোহান্তজীর কথা আর কী বলব? আমি তো মোহান্তজীকে বলব তিনি সকাল থেকে ঝাণ্ডা সাহেবের সেবায় লেগে যান আর পুজোপাঠ কম করুন কারণ মঠের কুঠরীতে সম্পন্ন হওয়া পুজো বাইরে অপেক্ষমান হাজার হাজার জনতা দেখতে পায় না। ঠিক এগারোটার সময় তিনি ঝাণ্ডা সাহেবের কাছে আসুন আর বারোটা নাগাদ তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাণ্ডা ওড়াতে শুরু করুন। তবে লোকে মানবে যে, মোহান্ত ইন্দ্রেশচরণ দাস তাঁর গুরুদের চেয়েও বেশি ক্ষমতা ধরেন।

—১৯৫৬—

দিল্লী—১ এপ্রিল মূর্খদের দিন কিন্তু কোনো প্রাচীন বা অর্বাচীন শাস্ত্র যাত্রার জন্য এই দিনটিকে বর্জন করে নি। আর লোকে এটাও মনে করে না যে, ১ এপ্রিল যাত্রা করলে তাকেও মূর্খ ধরা হবে। হোলির দিন লোকে বেরোনোটা এই জন্য পছন্দ করে না যে সেদিন আমাদের এখানে উৎপাত শুরু হয়ে যায়। শিক্ষা আর সংস্কৃতির প্রসারের ফলে আমাদের লোকেদের স্বভাবে কিছুটা গভীরতা ও কিছুটা সংযম আসা উচিত ছিল কিন্তু ব্যাপারটা উল্টোই দেখা যায়। যার অর্থ হলো, আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের ভব্যসব্য সংস্কৃতিবান বানাতে সক্ষম নয়। আগেকার দিনে শুধু হোলির দিনে দুপুর পর্যন্ত লোকে একে অন্যকে মাটি-কাদা মাখাত অথবা শহরে আবির গুলে পিচকিরি থেকে ছুঁড়ত। এখন তো এক সপ্তাহ আগে থেকেই সব ছেলে-ছোকরারা এই কাজে লেগে পড়ে। তারপর এমন রঙ ব্যবহার করে যা সহজে ধোয়া না যায়। এমন রঙ খুঁজে আনে যা জামাকাপড় চিরদিনের মতো খারাপ করে দেয়। হোলির দুপুরটুকুতেই তা সীমিতও রাখে না বরং সন্ধে পর্যন্ত এই উৎপাত আর বেয়াদবী চালিয়ে যায়। আমার নিজের ছাত্র-জীবনের বেনারসকে মনে আছে। আমাদের গ্রামে জলে আবির গুলে সন্ধে পর্যন্ত খেলা হতো কিন্তু বেনারসে দুপুরের পর শুকনো আবিরই মুখে মাখানোর রেওয়াজ ছিল। এই রকমই অন্যান্য শহরেও দেখেছিলাম। সেই সময়য়কার লোকরা বেশি সংযত ছিল নাকি আজকের? এখন তো হোলির দিনে মোটর, বাস বা রেলে চড়ে কোথাও যেতে কেউ সাহস করে না। সেদিন লোকের ছাড় আছে। কাদা-গোবর যা খুশি তারা গায়ে ছুঁড়তে থাকে। রেলের কামরায় কেউ জানলা খুলে রাখলে কম্পার্টমেন্টের ভেতরে কোনো জিনিস নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে একটু সংকোচও থাকত যে, মুসলমানরা খ্রিস্টানরা বিরোধিতা করবে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধে যাবে। এখন তারও কেউ পরোয়া করে না। মুসলমানরা সেদিনটা চুপচাপ ঘরে বসে কাটিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, কিছু লোক এর গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছে। ভাবছে যে জনগঙ্গা যেদিকে বইছে তাতে তুমিও সামিল হয়ে যাও। আজ থেকে সওয়া শো বছর আগে কবি নজীর আকবরবাদী হোলিতে অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে খুব আনন্দ করতেন, তা নিয়ে কবিতা লিখতেন। লোকে নজীরকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। আজও কোথাও এমন কোনো মুসলমানকে দেখা গেলে তাঁকে স্বাগত জানানোর কথা আর কী বলব। স্বাধীনতার পর হোলির ক্ষেত্রটি আরো বেড়েছে। আগে এটা হিন্দিভাষী অঞ্চলেরই উৎসব ছিল। বাংলাদেশ, পার্বত্য এলাকা, পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্রতেও তার দেখাদেখি কখনও কখনও অনুকরণ করতে দেখা যেত। দক্ষিণের চারটে প্রদেশ তো জানতই না যে হোলি কী বস্তু। কিন্তু এখন দেখা যায় যে, 'হোলিকা' মাতা সারা ভারতকে এক করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে। দিল্লীতে ভারতের সমস্ত অংশের লোকেরা সংসদের সদস্য। সেখানে হোলি জওহরলালকে দিয়েই শুরু হয়। সেদিন তাঁর পুরো শরীর এবং মুখ আবিরে ভরে থাকে। সব সদস্যরাও গুলাল মাখানোর জন্য একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দেয়। তাহলে আর দিল্লীর অধীনস্থ সমস্ত জায়গায় হোলিকা কেন নিজের রাজ্য কায়েম করতে চাইবে না? হায়দ্রাবাদ হচ্ছে তেলুগু ভাষাভাষী প্রদেশ। সেখানকার এম এল এ-রা হোলির আনন্দ নিতে শুরু করল, তার মানে দক্ষিণের চারটে অভেদ্য প্রদেশও ফুটো হয়ে গেল। আসলে হোলির ভয়েই আমরা আগে যাত্রা করি নি।

দিল্লী—এবার আমরা দিনের বেলায় দিল্লী যাওয়া স্থির করেছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভ্রমণ করার চেয়ে চারপাশের জায়গা দেখতে দেখতে যাওয়াটা ভাল। কমলা এর আগে দিনের বেলায় দিল্লী যায় নি, জয়া-জেতাও না। জয়া আগের রেলযাত্রা ভুলে গিয়েছিল কিন্তু এখন সে তা বুঝতে পারছিল। জেতার শুধু কৌতূহল ছিল। অন্যদের দেখাদেখি 'গাই' বলার চেষ্টা করত। খাওয়া-দাওয়া করে দশটার সময় স্টেশনে পৌঁছলাম। একটু আগে পৌঁছলে জায়গা পাওয়া সহজ। আসলে এখনকার সেকেন্ড ক্লাসটা তো আগেকার ইন্টার ক্লাস, তাই খুব ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে বোম্বাই এক্সপ্রেস ছাড়ল। এখন হরিদ্বারের অর্ধকুম্ভের সমারোহ চলছিল। যদিও তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্নান ১৩ এপ্রিল কিন্তু লোকে আগেই পৌঁছে যেতে চাইছিল। হরিদ্বারের কুম্ভ বা অর্ধকুম্ভ দুইই পড়ে এপ্রিলের ভয়ংকর গরমের খুব বাজে দিনগুলোতে। যদি পরিচ্ছন্নতার সঠিক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কলেরা অবশ্যম্ভাবী। হরিদ্বারের এই মেলায় বোধহয় তা হবে না। সরকার যে খুব সচেতন তা এর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, দেরাদুন স্টেশন থেকে হরিদ্বারের টিকিট কাটা প্রত্যেকটি লোককে সেখানেই কলেরার ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছিল। হরিদ্বারে আসার চতুর্দিকের পথে এই ব্যবস্থা ছিল। প্রয়াগ এর চেয়ে ভাগ্যবান কারণ তার কুম্ভ বা অর্ধকুম্ভ শীতের সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাসে পড়ে। সেখানেও টিকে আর ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা থাকে কিন্তু এই বছর তো দিল্লী আর লক্ষ্ণৌ-এর মহাদেব-দেবীরা সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে যাচ্ছেতাই করে দিয়েছিল। সমস্ত পুলিসকে নিজেদের সেবায় ডেকে নিয়েছিল এবং তার ফলে ব্যবস্থাপনায় তাদের অভাবের জন্য হাজার হাজার লোক পিষে মারা গেল। এতে মহা-দেবদেবীদের যে কোনো শিক্ষা হয়েছে তা বলা মুশকিল। হরিদ্বারে গরমের জন্যও তাঁরা আসতে সাহস করেন না।

আগে থেকেই চিঠি পেয়ে গিয়েছিলাম। গাড়ি হরিদ্বারে পৌঁছতেই পণ্ডিত কিশোরীদাস বাজপেয়ী এসে পড়লেন আর যতক্ষণ না গাড়ি ছাড়ল ততক্ষণ বসে কথা বলতে লাগলেন। সঙ্গে পুরী, মিষ্টি, রায়তা এনেছিলেন। পুরী তখনো গরম ছিল, আর আজকের দুনিয়ায় মানুষের যেটুকু সামর্থ সেই অনুযায়ী চেষ্টা করে খাঁটি ঘি দিয়ে তা বানানো হয়েছিল। খাঁটি ঘি বলাটা আজকাল মুশকিল। যাঁরা নিজেদের মোষ আর গরুর মাখন থেকে ঘি বানান তাঁরাই বিশুদ্ধতার কথা জোর দিয়ে বলতে পারেন। যদিও আমরা খেয়ে বেরিয়েছিলাম তবু গাড়ি চলতেই গরম গরম পুরী আমাদের আকৃষ্ট করল, সন্ধে পর্যন্তও আমরা চারজন মিলে পুরী শেষ করতে পারলাম না। কিন্তু রায়তা ফেলে রাখব না ঠিক করে নিয়েছিলাম। গাড়ি কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। কয়েক দিন আগে হলে সবুজ-সবুজ খেত দেখা যেত। এখন তা কাটা হয়ে গিয়েছিল। কুরুক্ষেত্র হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশে আর কাশী-মল্ল (ভোজপুরীভাষী অংশ) হচ্ছে পূর্বে। দুটিই এখন চিনির খনি হয়ে গেছে। এখানে প্রচুর মিল আছে। আখে ভরা খোলা ওয়াগন এদিক থেকে ওদিকে যেতে দেখা যাচ্ছিল। জায়গায় জায়গায় ওজন দাড়ির আশপাশে আখের রসে ভর্তি শয়ে শয়ে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। আখ হচ্ছে নগদনারায়ণের ফসল তাই যেখানে উৎপাদিত আখ মিলে বিক্রি করার সামান্যও সম্ভাবনা থাকে সেখানকার লোক নিজের খেতে আখ বুনতে লেগে যায়। পূর্ব-উত্তরপ্রদেশে গ্রীষ্মের লু-এর দিনে কুঁয়ো থেকে ভরে ভরে আখের খেতে জল ঢালা হয়। কুরুক্ষেত্র ভাগ্যবান তাই এখানে গঙ্গার ধারার জাল বিছানো রয়েছে এবং

জলের কোনো অভাব নেই।

চারটে বাজার পর গরম কমে গেল, যদিও পাখা ছিল আর গাড়ি চলার সময় বাইরে থেকেও হাওয়া আসছিল বলে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার ছিল না। গাড়ি যখন মিরাট ছাউনিতে পৌছল তখন সন্ধে। প্রফেসর কৃষ্ণকান্ত মিশ্র তাঁর স্ত্রী কমল আর ভাই-বোন-ভগ্নিপতির সঙ্গে এলেন এবং মীরাট শহর পর্যন্ত এক সঙ্গে গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা সাহচর্য পেলাম। কমলের মেয়ে কল্পনার যখন কয়েক সপ্তাহ বয়স তখন তাকে খুবই রোগা আর ছোট দেখাত কিন্তু এখন সে মোটাসোটা আর গাঁট্টাগোট্টা হয়ে গিয়েছিল।

রাত নটা নাগাদ আমরা দিল্লী স্টেশনে পৌছলাম। দুটি বাচ্চা এবং জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেনে ওঠানামা করতে একটু অসুবিধে তো হয়ই, তবে শ্রীশিবশর্মা স্টেশনে এসে গিয়েছিলেন। আমরা ধীরে-সুস্থে নেমে ট্যাক্সিতে উঠলাম। আর ২২ নম্বর ফৈজবাজারে ভাইয়ার বাড়ি পৌছে গেলাম। ভাইয়া-ভাবীজী আমাদের আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন।

গরমের তাপমাত্রা একশো ডিগ্রির বেশি হয় নি তবে সেটাও আমরা দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত পাখার নীচে কাটিয়ে দিতে পারতাম। যে উদ্দেশ্যে আমরা চুল্লীর আগুনে জ্বলতে এসেছিলাম সেটাই আগে পূরণ করা দরকার ছিল।

সফদরজং হাসপাতাল—শুনেছিলাম দিল্লীতে আধুনিকতম পদ্ধতিতে পোলিওর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এটাও জেনে গিয়েছিলাম যে, সেটা আছে শহরের বাইরে সফদরজং-এ। ভাইয়া, দুটি বাচ্চা আর আমরা দুজন ট্যাক্সি নিয়ে বিমান বন্দর পেরিয়ে হাসপাতালের জায়গায় পৌছলাম। যুদ্ধের সময়ের দাবি মেটানোর জন্য অস্থায়ী, নিচু ছাতের ঘরওলা একতলা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। তাকে স্থায়ী হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছিল। যদি তিনতলা, চারতাল বাড়ি হতো তাহলে লোককে অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে হতো না। আমাদের মধ্যে কেউই এখনকার বিধিব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। শিবশর্মাজীও প্রথম বার এসেছিলেন, আর ভাইয়াও তাই। পোলিও ক্লিনিক কোথায় তা জানতে খুব ঘুরতে হলো। হাসপাতালে হাজার হাজার কাজ আছে। প্রত্যেকে কাজের খোঁজ কী করে রাখা সম্ভব? যাক্ গে, বাচ্চাদের ওয়ার্ডের খোঁজ পাওয়া গেল। সেখানে গিয়ে ক্লিনিকের জায়গাও জানা গেল। জানা গেল যে, আগে নম্বর আনতে হবে। নম্বরের জন্য আবার রাস্তার ধারের বাড়িতে আসতে হলো। বারান্দায় ভিড় ছিল। অনেক দূর পর্যন্ত ছিল লাইন। একাধিক লোককে নম্বর দেওয়ার কাজে লাগালে ভিড় কমানো যেত কিন্তু লোকের কষ্টের কথা কে ভাবে? লাইনে যদি রুগীকে নিয়ে দাঁড়াতে হতো তাহলে খুব বিপদ হতো। তবে এটুকু আক্কেলের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল যে, সুস্থ লোকও রুগীর নম্বর আনতে পারত। শিবজী লাইনে দাঁড়িয়ে জেতার নম্বর নিয়ে এলেন। ফের ক্লিনিকেও প্রায় দেড় ঘণ্টা বসে থাকতে হলো তবে আমাদের পালা এল। একজন মহিলা ডাক্তার দেখে কিছু লিখে দিলেন। এবার তৃতীয় জায়গায় যেতে হলো। সেখানে বাচ্চাদের এই ধরনের রোগের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। একটি বড় ঘরে অনেক লোক অপেক্ষা করছিলেন। প্রচুর ছোট ছোট বাচ্চা ছিল। তাদের মধ্যে কারও পা বেঁকে গিয়েছিল আবার কারও হাত বেঁকে গিয়েছিল। কত সুন্দর সুন্দর ছেলে বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এখানে একজন নার্স স্লিপ এনে নাম লিখে নিল কিন্তু আমাদের

কোনো আদেশপত্র দিল না। বলে দিল, 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন।' লেডি ডাক্তার আগেই বলে দিয়েছিল, 'হাত ঠিক হয়ে গেছে।' কিন্তু আমরা যখন দিল্লী অব্দি এসেছি তখন বিশেষজ্ঞকে দেখাতে চাইছিলাম। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারবাবু দু-একজন ডাক্তারের সঙ্গে এলেন। প্রত্যেক ছেলেকে দেখে দেখে কিছু নির্দেশ লিখে দিতে লাগলেন। জেতার হাতে সামান্য মাত্রায় পোলিও হয়েছিল আর মাত্র কয়েকটা দিন সে ইচ্ছানুযায়ী তা নাড়াচাড়া করতে পারে নি। কিন্তু এখন নাড়াচাড়া করতে কোনো অসুবিধে ছিল না। খামতি শুধু এটুকুই যে বাঁ হাতের তুলনায় ডান হাতে জোর কম ছিল। এই জন্য ডাক্তারবাবু তাকে সবার শেষে দেখার জন্য রাখলেন। শেষে ওর পালা এলো। হাত দেখলেন এবং প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, 'এখন এতে পোলিওর প্রভাব বেশি নেই। যেটুকু আছে তা হাতের ব্যায়াম করলে ঠিক হয়ে যাবে।' ভাইয়া আগে থেকেই একথা বলছিলেন। কিন্তু আমি তো আধুনিক পদ্ধতির ক্লিনিক থেকে বিশেষ পরামর্শ নেব বলে এসেছিলাম। ডাক্তার কোনো রকমে তা এড়িয়ে গেলেন। আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যে তরুণীটি স্লিপ লিখেছিল সে বলছিল, 'একটু অপেক্ষা করুন,ভাল করে দেখবেন।' অপেক্ষা করতে হলো। পরে শিবজী বললেন যে সে কিছু টাকা পাবে আশা করছিল। যাক্ গে, ডাক্তার আবার দেখলেন। পরামর্শ তো তিনি আগেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

ছাড়া পেয়ে আমরা একটার সময় ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। এই গরমে বাইরে বেরোনোর সাধ্য কার? আমাদের দিল্লীর কাজ হয়ে গিয়েছিল তাই তাড়াতাড়ি দিল্লী ছাড়ার ছিল। সন্ধে ছটা পর্যন্ত আমি আর বাচ্চারাও পাখার নীচে শীতলপাটি পিছিয়ে শুয়ে থাকলাম। মহিলারা খুব দুঃসাহসী। হাট-বাজার তাদের শখের জিনিস। জয়া আর 'জেঠীমার ছেলে' কে নিয়ে কমলা আর ভাবীজী বাজারে গেল। ভাবীজীর ভাইপোকে জয়া 'জেঠীমার ছেলে' নাম দিয়েছিল।

এমনিতে তো দশ-বারো এপ্রিল পর্যন্ত থাকার জন্য তৈরি হয়ে আমরা গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বৈদ্যুতিক চিকিৎসা বা মালিশ ইত্যাদির কথা বলবেন যার জন্য কিছুদিন থাকতে হবে। এখন আরো একটা দিন অবশ্যই থাকতে হবে, দেবতাদের কৃপাই বলা যায় যে, সেই দিন সকাল থেকেই হাল্কামতো মেঘের পর্দা আকাশে ছেয়ে থাকল। সন্ধেতে একটু বৃষ্টি হলো। আমার কয়েকজন সাথী ও প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করার ছিল। পার্টি অফিসে রণদিভে, খাডিলকর, সচ্চিদা এবং অন্যদের সঙ্গে দেখা হলো। এখন সব জায়গায় চার্চিলের আলোচনাই বেশি শোনা যাচ্ছিল। স্তালিনের বিগত জীবনের যেসব ত্রুটি প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল আর যার কড়া সমালোচনা সোভিয়েত দেশে হচ্ছিল তার প্রভাব সকলের ওপরেই পড়ছিল। আমিও আমার ভাবনা ব্যক্ত করলাম। সকলেই সেটাকে কঠিন ওষুধ মনে করত কিন্তু জানত যে এটাই স্বাস্থ্যকর ওষুধ। সাম্যবাদের বিরোধীরা যদিও সুযোগ পেয়েছে কিন্তু তারা তার কিছুই করতে পারবে না। দুর্বলতা দূর করে বিশ্ব সাম্যবাদ আরো মজবুত হবে, আরো ছড়িয়ে পড়বে। সচ্চিদা জানালেন, 'এই মাসে আমি 'মাও' (জীবনী)-এ হাত দেব। রাজকমলের দেবরাজজী এখন আবার এই মাসেই 'শাদী'-তে হাত দেবেন বলে কথা দিলেন কিন্তু তা কখনোই দিলেন না।

৪ এপ্রিলও সারাদিন আমাকে দিল্লীতেই থাকতে হলো। গতকাল তো বৃষ্টি একটু সহায়তা দিয়েছিল। কিন্তু আজ সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত পাখার তলায় থাকলাম।গরমের

হাত থেকে তো বেঁচে গেলাম কিন্তু মাথা ঘুরছিল। সময়ের কিছুটা আগেই স্টেশনে পৌঁছলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুটো সিট রিজার্ভ করিয়ে নিয়েছিলাম। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রিজার্ভ করানোর অর্থ শুধু বসার জায়গা সুরক্ষিত করা, শোয়ার জায়গা নয়। এখানে আসার পর যখন দেখলাম বাচ্চাদের নিয়ে বসে বসে কাটাতে হবে তখন প্রথম শ্রেণীতে সিট খোঁজার জন্য দৌড়লাম কিন্তু সেখানে কোনো জায়গা খালি ছিল না। দেরাদুনে সৈনিক স্কুল তথা অন্যান্য সংস্থা থাকার দরুন উচ্চপদস্থ অফিসাররা সেখানে প্রায়ই যায়, আর এখন তো অর্ধকুম্ভও লোককে টানছিল। আমাদের কামরায় একজন শরণার্থী ডাক্তার তাঁর পরিবারের মহিলাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্যদের মধ্যে রেলের একজন ভূতপূর্ব কর্মচারী তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে বসেছিলেন। পাশের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় জায়গা ছিল, সেখানে হয়তো বেশি জায়গা পেয়ে যেতাম কিন্তু যখন তা জানতে পারলাম তখন মালপত্র নিয়ে অন্য কামরায় যাওয়ার অসুবিধে ছিল। আমি ওপরে মালপত্র রাখার বাংকটি দখল করলাম, ফলে কমলা দুজন লোকের জায়গা পেয়ে গেল। ঘটনাচক্রে আমাদের চারজনের বেঞ্চে একজন লোক এল না। যেমন করে হোক রাত তো কাটাতেই হতো।

হরিদ্বারের যাত্রীতেই ট্রেন প্রায় ভর্তি ছিল বলে হরিদ্বার এলে তাদের অনেকে নেমে গেল। ভূতপূর্ব রেলওয়ে কর্মচারীটি শরণার্থী ছিলেন। দেরাদুনে তাঁর আত্মীয় থাকতেন। এইজন্য নিজের মালপত্র নিয়ে আগে দেরাদুন যেতে চাইছিলেন। সেখান থেকে অর্ধকুম্ভে স্নানের জন্য আসতেন। তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী একটু বেশি মোটা ছিলেন। তাঁর পক্ষে চলাফেরা কবা কষ্টকর ছিল। তার ওপরে আবার ভীষণ ধার্মিক। হাত ধোয়ার মাটিও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হরিদ্বার স্টেশনে হাতমুখ ধোবেন ভেবে মাটি নিয়ে জলের কলের কাছে গেলেন। ফিরতে ফিরতে গাড়ি ছেড়ে দিল। পতি দেবতা দৌড়ে গাড়িতে উঠলেন কিন্তু স্ত্রী পড়ে থাকছিলেন। তাড়াতাড়ি করে গাড়ি থামানোর জন্য চেন টানলেন। প্রথমে অন্যকে চেন টানার জন্য বলে ছিলেন কিন্তু সে রাজি হয়নি। গাড়ি দাঁড়াল। গার্ড এসে বলল, 'তোমার নামে মোকদ্দমা করা হবে।' তিনি বললেন, 'আমার স্ত্রী উঠতে পারেনি বলে আমি চেন টেনেছি।' গার্ড বলল, 'এসব জবাব ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আপনি দেবেন।' মালপত্র নামিয়ে দেওয়া হলো এবং তাঁকে স্টেশনের কর্মচারীর হাতে সঁপে দেওয়া হলো।

আটটার সময় আমরা দেহরা পৌঁছলাম। আজ এখানেই থাকার কথা। বাগান পাহারা দেওয়ার জন্য টুপিওলা বন্দুক কিনেছিলাম। সেটা কোনো কাজে লাগছিল না তাই বিক্রি করে দিতে চাইছিলাম। হিমালয় আর্য-এর লোক সেটা ৬০-৬৫ টাকায় বিক্রি করেছিল কিন্তু এখন ৩০ টাকা দিতে চাইছিল। সেটা বিক্রি করে রেমিংটনের কাছে মেরামত করতে দেওয়া টাইপ রাইটারটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। দিল্লী আর দেহরায় অনেক তফাত। গরম এখানেও ছিল কিন্তু দিল্লীর মতো নয়।

মুসৌরী—৬ এপ্রিল নটার সময় ট্যাক্সি ধরলাম। পৌনে দশটায় আমরা কিতাবঘর (মুসৌরী) পৌঁছে গেলাম আর পায়ে হেঁটে আধ ঘণ্টাতেই বাড়ি। জেতার পাতলা পায়খানা হচ্ছিল, সর্দিও ছিল। 'কিলডের'-এর মালিক তথা আমাদের প্রতিবেশী কর্নেল চাঁদও এসে পড়েছিলেন।

ডাক্তারী পরামর্শ পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

অনেক পত্র-পত্রিকা বুদ্ধের ওপর লেখা লিখতে বলেছিল। ভাবলাম এই সুযোগে বুদ্ধের সম্বন্ধে একটি ছোটমতো বই তৈরি হয়ে যাবে, তাই উদারহস্তে লিখতে শুরু করে দিলাম। দিল্লী থেকে ভাইয়া(স্বামী হরিশরণানন্দ) নিজের জীবনের তথ্য দিয়েছিলেন তা নিয়েও এবার 'ঘুমক্কড় স্বামী (হরিশরণানন্দ)' দ্বিতীয়বার লেখার ছিল, সেটা ৮ এপ্রিল শুরু করলাম।

৯ এপ্রিল ছিল সোমবার, সংবৎ[১] ২০১২,চৈত্র ১৩। ৬৩ বছর আগে বৈশাখ ৮ রোববার সংবৎ ১৯৫০-এ পন্দহাতে আমার জন্ম হয়েছিল। এইখানে এসে কমলা আমার ৬০তম জন্মদিন বিশেষভাবে পালন করেছিল। আজ ৬৪তম জন্মদিন। আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, এদিন নিজের বাড়িতেই ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া করব, পার্টি-টার্টি দেব না। সকালে রোজকার নিয়ম অনুসারে তিন ঘণ্টা টাইপ করালাম। মধ্যাহ্ন ভোজনে আর বিকেলের চায়ের সঙ্গে বিশেষ কিছু খাবার ছিল। এই দিন এইভাবেই শেষ হয়ে গেল।

[১] বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ (খ্রিস্টাব্দের ৫৬ বা ৫৭ বৎসর অগ্রবর্তী)।—স·ম·